রাসায়েল ও মাসায়েল

১ম খন্ড

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

রাসায়েল ও মাসায়েল

১ম খণ্ড

ISBN 984-645-014-1

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ
আবদুস শহীদ নাসিম

রাসায়েল ও মাসায়েল ১ম খণ্ড
সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

অনুবাদ
আবদুস শহীদ নাসিম

ISBN : 984-645-014-1
শ. প্র : ১৪

প্রকাশক
শতাব্দী প্রকাশনী
৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট
ঢাকা-১২১৭, ফোন- ৮৩১১২৯২

প্রকাশকাল
প্রথম মুদ্রণ : এপ্রিল ১৯৮৯
৬ষ্ঠ মুদ্রণ : সেপ্টেম্বর ২০০৮

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন : ৯৩৪৫৭৪১, ৯৩৫৮৪৩২

মূল্য : ১৮০.০০ টাকা মাত্র

RASAIL O MASAIL Vol. I By Sayyed Abul A'la Maudoodi, Translated by Abdus Shaheed Naseem, Published by Shotabdi Prokashoni, Sponsored by Sayyed Abul A'la Maudoodi Research Academy, 491/1 Moghbazar Wireless Railgate, Dhaka-1217, Phone : 8311292. First Print : April 1989, 6th Print September 2008.

Price Tk. 180.00 Only.

আমাদের কথা

ইসলামী জ্ঞান গবেষণার বিশ্ববরেণ্য বিশেষজ্ঞ ও পন্ডিত মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (রহঃ) দাক্ষিণাত্যের হায়দারাবাদ শহর থেকে ১৯৩২ সালে 'তরজমানুল কুরআন' নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা শুরু করেন, যা অর্ধ শতাব্দীরও অধিককাল ধরে মানব জাতির কাছে ইসলামী জ্ঞান পরিবেশন করে আসছে। আজও সে পত্রিকাটি লাহোর থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

এ মাসিক পত্রিকার মাধ্যমে তিনি ইসলামের বিপ্লবী চিন্তাধারা হৃদয়গ্রাহী ভাষা ও প্রকাশভংগীতে পরিবেশন করতে থাকেন যা পাঠকবর্গের মধ্যে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করে। পাঠকদের পক্ষ থেকে উক্ত পত্রিকাটির মাধ্যমে তাঁর কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর ও ব্যাখ্যা দাবী করা হয়। মাওলানা পত্রিকাটির মাধ্যমে সেসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দেন।

এ প্রশ্নোত্তরগুলো 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনামে প্রকাশিত হতে থাকে। রাসায়েল 'রিসালাহ' শব্দের বহু বচন যার অর্থ 'পত্র-পত্রিকা', 'সাময়িকী' ইত্যাদি। 'মাসায়েল' মাস্য়ালা শব্দের বহু বচন। অর্থ প্রশ্ন বা সমস্যা। মাওলানা তাঁর সম্পাদিত ও প্রকাশিত পত্রিকাটির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রশ্ন ও সমস্যার জবাব দিয়েছেন এবং এসবের জন্যে 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনাম ব্যবহার করেছেন।

বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোক তাঁর কাছে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছেন। কেউ জ্ঞান লাভের জন্যে প্রশ্ন করেছেন, কেউ তাঁর প্রকাশিত বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করে তাঁকে পত্র লিখেছেন। এ সবের তিনি সুন্দর জবাব দিয়েছেন।

তাছাড়া প্রশ্নের ধরণ ছিল বিভিন্ন। কুরআন, হাদীস, তফসীর, ফিক্‌হ সম্পর্কে প্রশ্ন। রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে প্রশ্ন। সাধারণ জ্ঞান বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের সাথে সাথে বহু আধুনিক যুগ জিজ্ঞাসার পাণ্ডিত্বপূর্ণ ও মনজয়কারী জবাব তিনি দিয়েছেন। এসব প্রশ্নোত্তর "রাসায়েল ও মাসায়েল" শিরোনামে গ্রন্থাকারে কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানার মনীষার প্রতি

শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এ গ্রন্থের বংগানুবাদের নামকরণও আমরা করলাম 'রাসায়েল ও মাসায়েল'। গ্রন্থটি ইনশাআল্লাহ কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হবে।

আমরা মনে করি আলেম সমাজ, কুরআন হাদীস ও ফিক্হ শাস্ত্রের জ্ঞানপিপাসু, সাধারণ জনগোষ্ঠি এবং আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণী নির্বিশেষে সকলের জন্যে জ্ঞান আহরণের এ এক অমূল্য গ্রন্থ। তবে জ্ঞান লাভের জন্যে মুক্ত ও নিরপেক্ষ মন মানসিকতার যে প্রয়োজন, সম্মানিত পাঠকবর্গ সেই মন নিয়েই গ্রন্থখানি অধ্যয়ন করবেন বলে আশা করি। জবাব দাতার মূল চিন্তা ও ভাবধারাকে সামনে রেখেই প্রশ্নোত্তরগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে। জ্ঞান পিপাসু বাংলা ভাষীদের বহু আকাংখিত এ গ্রন্থখানি তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হচ্ছে বলে আল্লাহ তায়ালার দরবারে কাতর প্রার্থনা, তিনি যেন এ গ্রন্থখানি কবুল করেন এবং এতে প্রভূত বরকত দান করেন। তা হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করব।

আব্বাস আলী খান

চেয়ারম্যান

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা

ঢাকা
১লা মহররম, ১৪০৯ হিঃ
আগষ্ট, ১৯৮৮ ঈসায়ী।

ভূমিকা

বিগত কয়েক বছর থেকে 'তরজমানুল কুরআন' পত্রিকায় 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনামে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রশ্ন এবং আমার প্রদত্ত জবাব প্রকাশিত হয়ে আসছিল। সর্বসাধারণের উপকৃত হবার জন্যে এখন সেগুলো একত্রিত করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। এতে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মীয় মাসায়েল সম্পর্কে পাঠকগণ ব্যাপকভাবে এমন সব প্রশ্নাবলীর সংক্ষিপ্ত দুয়েক কথায় জবাব পেয়ে যাবেন, যেগুলো সাধারণভাবে মানুষের মনে খটকা সৃষ্টি করে। এ সংকলনে কোনো কোনো প্রশ্নোত্তর এমনো রয়েছে, বাহ্যত যেগুলোকে অতীতের ঘটনা বলে মনে হবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেগুলোর একটা ঐতিহাসিক মর্যাদা রয়েছে। তাছাড়া, সেগুলোর মধ্যেও এমন সব নীতিগত বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে, যেগুলো কখনো না কখনো মুসলমানদের বসতভূমিতে সংঘটিত হতে পারে।

প্রতিটি প্রশ্নোত্তরের শেষে সেটার প্রকাশকাল উল্লেখ করে দেয়া হয়েছে, যাতে করে পাঠক উক্ত ঘটনার ঐতিহাসিক পটভূমি ভালভাবে হৃদয়ংগম করে নিতে পারেন। কিন্তু প্রকাশের তারিখ উল্লেখ করার কারণে কেউ যেনো এমনটি মনে না করেন যে, তরজমানুল কুরআনে প্রদত্ত প্রতিটি জবাব হুবহু এখানে সংকলন করা হয়েছে। মূলত এ জিনিসগুলো সংকলনের সময় কোনো কোনো বাক্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করেছি, প্রয়োজনীয় পরিবর্জন পরিবর্ধন এবং ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছি।

আবুল আ'লা

১১ রবীউল আউয়াল ১৩৭০ হিঃ, ২০শে ডিসেম্বর ১৯৫০

সূচীপত্র

আয়াতের তাফসীর
ও
হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ

মূসা আলাইহিসসালাম ও বনী ইসরাঈল সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ 'মুসলমান আওর মওজুদাহ্ সিয়াসী কাশমকাশ'[১] বইতে আপনি লিখেছেনঃ

"প্রথম অংশ হচ্ছে, মানুষকে সাধারণভাবে আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও তাঁর নিরংকুশ কর্তৃত্বের প্রতি দাওয়াত দিতে হবে। তাঁর আইনকে নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করার দাওয়াত দিতে হবে। দাওয়াত হতে হবে সার্বজনীন এবং এ দাওয়াতের সাথে অন্যান্য অপ্রাসংগিক জিনিসের সংমিশ্রণ ঘটানো যাবেনা।"

প্রশ্ন হলো মূসা আলাইহিসসালাম তাওহীদের দাওয়াতের সাথে বনী ইসরাঈলের মুক্তির যে দাবী করেছিলেন, তা কি অপ্রাসংগিক ছিলনা?

এরপর আপনি লিখেছেন ঃ

"দ্বিতীয় অংশ হলো, এমনসব লোকদের নিয়েই দল গঠন করতে হবে যারা জেনে-বুঝে এ দাওয়াত কবুল করবে এবং নিজেদের বন্দেগী ও আনুগত্যকে আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট করে দেবে।"

এখানে প্রশ্ন হলো, বনী ইসরাঈলের সকলেই কি এসব গুণের অধিকারী ছিল? তাদের কার্যকলাপ থেকে কি এমনটি প্রকাশ পায়? ফেরাউনের ডুবে মরার আগে তাদের কেউই কি মূসার দ্বীন কবুল করতে অস্বীকার করেনি? যদি না করে থাকে, তবে কেন করেনি? অথচ কুরআন থেকে তো এমন কোনো প্রচেষ্টা ও সংঘাত সংঘর্ষের সন্ধান পাওয়া যায়না যার ভিত্তিতে মুশরেকী সমাজ ও শক্তির অধীনে থাকা সত্ত্বেও বনী ইসরাঈলের লক্ষ লক্ষ মানুষের সকলেই একদম ঈমান এনে ফেলেছিল? হযরত ঈসা মসীহ্র সংগে ইয়াহুদীরা যে আচরণ করেছিল, রাষ্ট্রশক্তির সাথে যোগসাজশ করে তখনকার কিছু বনী ইসরাঈল হযরত মূসার সংগেও সেই একই আচরণ করতে পারতো। তাদের কিছু লোক যদি কাফির থেকে থাকে, তবে ফেরাউনের সাথে তারাও নিমজ্জিত হয়েছে কিনা?

إِنِّىْ خَشِيْتُ اَنْ تَقُوْلَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىْ إِسْرَائِيْلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِىْ -

---

১. এ বইটি বর্তমানে "উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। –অনুবাদক

হযরত হারুনের এ বক্তব্যের তাৎপর্য কি? অথচ হযরত মসীহ্ বনী ইসরাঈলকে সম্বোধন করে বলেছিলেনঃ আমি তোমাদেরকে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ করাতে এসেছি।

জবাব ঃ কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। কুরআন পাকের শেষাংশে সংযোজিত প্রাথমিক মক্কী সূরা সমূহে বলা হয়েছে, মূসা আলাইহিস সালাম ফেরাউনকে খোদার দাসত্ব কবুল করার দাওয়াত দিয়েছিলেন। যেমন সূরা 'নাযিয়াত' এ এরশাদ হয়েছে ঃ

اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى - فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰۤى اَنْ تَزَكّٰى وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى -

এখানে বনী ইসরাঈলের মুক্তির কোনো প্রকার উল্লেখই নেই। অবশ্য পরবর্তী মক্কী সূরাসমূহে তা উল্লেখিত হয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হয়, হযরত মূসা আলাইহিস সালামকে দুটি উদ্দেশ্যে নবুওয়াতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। প্রথমত, ফেরাউন ও তাঁর কওমকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয়া। দ্বিতীয়ত, যদি তারা দাওয়াত কবুল না করে তাহলে ঐ মুসলমান কওমকে কাফেরদের শাসন ও অধীনতা থেকে বের করে আনার চেষ্টা করা, যারা হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সময় থেকেই মুসলমান হিসেবে চলে আসছিল এবং হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পরে চার পাঁচ শতাব্দীকালের কোনো এক সময় কাফেরদের দ্বারা বিজিত ও পরাজিত হয়েছিল।

হযরত মূসা আলাইহিস সালাম প্রথমে পয়লা উদ্দেশ্যের দিকেই দাওয়াত দিয়েছিলেন আর দ্বিতীয় উদ্দেশ্যকে পরে গ্রহণ করেছিলেন। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যকে প্রথম উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কহীন মনে করার কোনো কারণ আমি দেখিনা। প্রত্যেক নবীর মিশনের দ্বিতীয় পর্যায় অনিবার্যভাবে এটাই ছিলো যে, যারা তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছে, তিনি ঈমানদার লোকদেরকে তাদের কবল থেকে বের করে আনার চেষ্টা করেছেন।

"সকল বনী ইসরাঈল কি মূসার দ্বীন কবুল করেছিল?" আপনার এ প্রশ্ন থেকে এ কথাই প্রকাশ পায় যে, আপনার ধারণা মতে বনী ইসরাঈল সম্ভবত কাফির ছিল আর মূসা আলাইহিস সালামই ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি তাদেরকে দ্বীন ইসলামের দিকে দাওয়াত দেন।' অথচ বাস্তব ঘটনা তা ছিলনা। প্রকৃত পক্ষে বনী ইসরাঈল তো ছিল নবীদেরই বংশধর। আর হযরত ইব্রাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব আলাইহিমুসসালাম ছিলেন তাদের পূর্ব পুরুষ। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামও ছিলেন তাদেরই পূর্ব পুরুষদের একজন। মূসা আলাইহিস সালামের পূর্বে তাদের শেষ নবী ছিলেন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম। তাঁর

ইন্তেকালের পর চার পাঁচশ' বছরের বেশী অতিবাহিত হয়নি। এরি মধ্যে তারা কাফির হয়ে যায়নি, যার প্রেক্ষিতে তাদেরকে কুফর থেকে ইসলামে আনার প্রশ্ন উঠতে পারে। আর তাদের মধ্যে এমনও কেউ ছিলনা যে মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াতকে অস্বীকার করতো। তবে তাদের মধ্যে এতটুকু দুর্বলতা অবশ্যই এসে গিয়েছিল যে, তারা হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নেতৃত্বে ফেরাউন ও তার জাতীয় শক্তির বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হবার সাহস দেখাতে পারছিলনা। তাদের নওজোয়ানরা তো হযরত মূসা আলাইহিস সালামের নেতৃত্বে ইসলামী আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্যে যথাসম্ভব প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের বয়স্ক ও অভিজ্ঞ লোকেরা মনে করতো মূসার আন্দোলনের সাহায্য করা ও সাথী হওয়ার অর্থ, নিজেদের দুনিয়াকে বরবাদ করে দেয়া। কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করলে এ অবস্থার সঠিক চিত্র সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়বে। (যেমনঃ সূরা আ'রাফ, রুকু ১৫ এবং সূরা ইউনুস রুকূ ৯ দেখতে পারেন।)

এ দুর্বল ঈমানদার মুসলমানদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি ফেরাউনের পক্ষে গিয়ে মূসা আলাইহিস সালামের বিরোধিতা করেছিল, গোটা কুরআন মজীদের কোথাও এমন কথার চিহ্ন মাত্র পাওয়া যায়না।[১] বরঞ্চ কুরআন ও বাইবেল উভয় গ্রন্থ অধ্যয়ন করলে এটাই জানা যায় যে, হযরত মূসা আলাইহিস সালাম বনী ইসরাঈলের সর্বস্বীকৃত নেতা ছিলেন। এমন কি তিনি যখন বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিসর ত্যাগ করেন, তখন তাদের একজন লোকও মিসরে থেকে যায়নি।

হযরত ঈসা মসীহ্র যামানায় বনী ইসরাঈল অধঃপতনের যে নিম্ন গহ্বরে পৌছে গিয়েছিল, হযরত মূসা আলাইহিস সালামের সময়ের বনী ইসরাঈলকে তাদের সমতুল্য মনে করা ঠিক নয়। তারা যদি সে সময় এতটা নৈতিক অধঃপতনে নিমজ্জিত থাকতো, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে তাঁর দ্বীনের কাজের জন্যে মনোনীত করতেন না।

হযরত হারূণ আলাইহিস সালাম মূসা আলাইহিস সালামের নিকট যা কিছু বলেছিলেন তার তাৎপর্য প্রকৃত পক্ষে এ ছিলো যে, বনী ইসরাঈলের আসল নেতা ও তাদের জামায়াতী জীবনের মূল দায়িত্বশীল ছিলেন হযরত মূসা আলাইহিস সালাম। আর হযরত হারূণ আলাইহিস সালাম কেবল তাঁর সহযোগী ও সাহায্যকারীর মর্যাদাই রাখতেন। তাই হযরত হারুন আলাইহিস সালাম হযরত

---

১. একমাত্র কারূন ছিল এর ব্যতিক্রম। কুরআন মজীদে ফেরাউন ও হামানের সাথে তার উল্লেখ করা হয়েছে (সূরা আল-মু'মিন, রুকু-৩)। কিন্তু যদি বাইবেলের বর্ণনায় আস্থা স্থাপন করা যায়, তবে ধারণা করা যেতে পারে যে, সে মিসরে শেষ পর্যন্ত দুমুখো নীতি অবলম্বন করেছিল। কারণ হযরত মূসার (আ) বিরুদ্ধে তার যে ফিতনা সৃষ্টির কথা বাইবেল উল্লেখ করেছে, তা মিসর থেকে বের হয়ে আসার পরের ঘটনা।

মূসা (আলাইহিস সালামের অনুপস্থিতিতে কোনো অসাধারণ ও অস্বাভাবিক বিষয়ে সিদ্ধান্তকর পদক্ষেপ নিতে ভয় পাচ্ছিলেন, যাতে করে তাঁর দ্বারা এমন কিছু না হয়ে যায়, যা মূল দায়িত্বশীলের পলিসির বিপরীত হয়। আর এ জন্যেই হযরত মূসা আলাইহিস সালাম তাঁর ওজর কবুল করেছিলেন।

হযরত ঈসা মসীহ্ আলাইহিস সালামের যে বক্তব্যের উদ্ধৃতি আপনি দিয়েছেন, তা সম্পূর্ণরূপে অন্য অবস্থার সাথে সম্পর্কিত। তখন ইয়াহুদীদের মধ্যে কোনো ইসলামী জামায়াত কাঠামোর অস্তিত্ব ছিলনা, যার ফলে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের উক্ত বক্তব্যের এ অর্থ দাঁড় করানো যেতে পারে যে, তিনি সে জামায়াত কাঠামোকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেলার হুমকি দিচ্ছিলেন। অথচ হযরত হারূণ আলাইহিস সালামের সামনে বর্তমান ছিল একটি পূর্ণ ইসলামী জামায়াত কাঠামো। আর তিনি যথার্থভাবেই এ ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন, যেনো তাঁর দ্বারা এমন কোনো কিছু ঘটে না যায়, যা উক্ত জামায়াত কাঠামোকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেবে। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শাবান ১৩৬২ হিঃ, জুলাই-আগষ্ট ১৯৪৩ ইং।

আরবী কুরআনের প্রতি অনারব কেন ঈমান আনবে?

প্রশ্ন ঃ "আমি প্রত্যেক রসূলকেই তার মাতৃভাষায় (হিদায়াত দিয়ে) পাঠিয়েছি যেনো সে তাদের স্পষ্ট করে বুঝাতে পারে" আয়াতটি পড়ে চিন্তা করছি, আমাদের এবং আমাদের পূর্ব পুরুষদের ভাষা আরবী ছিলনা, অথচ কুরআন আরবী হওয়া সত্বেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণের দায়িত্ব আমাদের ওপর বর্তালো কেন?"

জবাব ঃ সম্ভবত আপনি বলতে চাচ্ছেন, প্রত্যেক জাতিকে শুধুমাত্র সেই দাওয়াতের প্রতিই ঈমান আনতে হবে, যা তার মাতৃভাষায় দেয়া হয়েছে। আর অন্য যে কোনো ভাষায় অবতীর্ণ দাওয়াত যদি তা সত্যও হয়, যদি তা আল্লাহর পক্ষ থেকেও হয়, যদি তা তরজমা, তাফসীর, ব্যাখ্যা ও আমলী নমুনার মাধ্যমে আপনার নিকট পৌঁছেও যায়, তরপরও তার অনুসরণ আপনার জন্যে ওয়াজিব হওয়া উচিত নয়, যেহেতু তা আপনার মাতৃভাষায় পাঠানো হয়নি? আপনার কথার অর্থ যদি এটাই হয়ে থাকে, তাহলে এটা আপনার একটা ভুল ধারণা, যা উপরোক্ত আয়াতের সঠিক তাৎপর্য অনুধাবন না করার প্রেক্ষিতে সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে আয়াতটির উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তায়ালা যখনই কোনো কওমের নিকট কোনো রসূল পাঠিয়েছেন, তা সে রসূল বিশেষভাবে সেই জাতির হিদায়াতের জন্যেই এসে থাকুন, কিংবা গোটা দুনিয়ার হিদায়াতের জন্যে, সর্বাবস্থায়ই তিনি তাঁর দাওয়াতের প্রথম লক্ষ্য যে লোকগুলো, তাদেরকে তাদের

মাতৃভাষায়ই সম্বোধন করেছেন, যেনো তারা তাঁর বক্তব্য ভালভাবে বুঝে নিতে পারে এবং এমন কথা বলার সুযোগ না পায় যে "আমার বন্ধুর ভাষাতো তুর্কী কিন্তু আমি তুর্কী বুঝি না!"

এ আয়াতের অর্থ এটা নয় যে, প্রত্যেক জাতির জন্যে অবশ্যই আলাদা একজন নবী আসতে হবে, যিনি সেই জাতিকে তার মাতৃভাষায়ই সম্বোধন করবেন। এর অর্থ এটাও নয়, যদি কোনো একটি জাতিকে অপর জাতির ঈমানদার লোকেরা তাদের মাতৃভাষায় বোধগম্য পন্থায় খোদায়ী হিদায়াত পৌঁছে দেয়, তখনো তারা কেবল একারণেই তা প্রত্যাখ্যান করবে যে স্বয়ং নবী আল্লাহর কিতাবকে সরাসরি তাদের মাতৃভাষায় নিয়ে আসেননি। একথা না এ আয়াতে বলা হয়েছে আর না আয়াতটির শব্দাবলীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা এমন অর্থ বের করার অবকাশ আছে। এখন বলুন, যার কাছে কুরআনী শিক্ষার মর্মবাণী তার মাতৃভাষাতেই সুস্পষ্টরূপে পৌঁছে গেছে, সে এর প্রতি ঈমান না এনে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে দাবী করার কোনো যুক্তি সংগত কারণ থাকতে পারে কি?

প্রশ্ন ঃ একজন শিখ বন্ধুকে কিছু সাহিত্য পড়তে দেয়া হয়েছিল। অধ্যয়নকালে তার পক্ষ থেকে এ অভিযোগ উত্থাপিত হয় ঃ তোমরা বল, আল্লাহ পয়গম্বরদের সাথে কথা বলেন এবং তিনি তার এসব খাস বান্দাদের মাধ্যমে গোটা মানবজাতির জন্যে একটি বিশ্বজনীন জীবন ব্যবস্থা পাঠিয়েছেন। প্রশ্ন হলো, এতো গুরুত্বপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা এমন একটি ভাষায় কেন পাঠানো হলো, যা কেবল একটি বিশেষ অঞ্চলেই ব্যবহৃত হয়। সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ কেন একটি বিশ্বজনীন ভাষা সৃষ্টি করে দিলেননা, যাতে বিশ্বের প্রতিটি মানুষই তাঁর কালাম থেকে সমভাবে উপকৃত হতে পারতো? আরবী কুরআন শরীফ তো শুধু আরবদের জন্যেই উপকারী।"

জবাব ঃ আপনার যে শিখ বন্ধুটি এ অভিযোগ করেছেন তিনি তাঁর কল্পনাকে আর একটু নাড়া দিলেই আরো অগ্রসর হয়ে এ প্রশ্নও করতে পারতেন, আল্লাহ কুরআনের একেকটি কপি সরাসরি প্রতিটি মানুষের নিকট কেন পাঠালেননা? কারণ তিনি যখন সর্বশক্তিমান, তখন একাজটিও তো করতে পারতেন।[১]

---

১. এ অভিযোগ ঠিক এমন ধরনের যেমন আগের কালের কাফির ও মুশরিকরা বলতো, নবী যদি সত্যই হয়ে থাকেন তবে তার সাথে কেন বড় বড় ধন ভান্ডার নেই, যাতে তিনি আরাম আয়েশে জীবনযাপন করতে পারেন এবং বেশী বেশী তাঁর দাওয়াত প্রচার করতে পারেন? কিংবা নবী কেন মানুষ হবেন এবং মানবিক প্রয়োজনীয়তা ও দুর্বলতা তাঁর মধ্যে কেন থাকবে? নবীকেতো ফেরেশতা হওয়া উচিত এবং তিনি অতিপ্রাকৃত শক্তিবলে তাঁর আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেবেন।

এ লোকগুলো এই প্রকৃত সত্যকে বুঝবার চেষ্টা করেনা যে, আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের জন্যে এমন কোনো পন্থা অবলম্বন করেননা যার ফলে পৃথিবীর প্রাকৃতিক ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেবে। মানবজাতির ভাষার বিভিন্নতা এবং ভাষাভিত্তিক তাদের ছোট বড় জাতি ও সম্প্রদায় সৃষ্টি হওয়া একটা প্রাকৃতিক জিনিস, যা স্বয়ং আল্লাহরই ইচ্ছাতেই অস্তিত্ব লাভ করেছে। আর এরি মধ্যে রয়েছে অসংখ্য কল্যাণ যা আল্লাহ তায়ালা ধ্বংস করতে চাননা। তিনি যেমনি সর্বশক্তিমান তেমনি বিজ্ঞও বটে। তাঁর সাম্রাজ্যের ব্যবস্থাপনা অটল ও সুদৃঢ় বিধি বিধানের ভিত্তিতে চলছে। এসব বিধি বিধানের ভিত্তিতে জাতিসমূহের ভাষা, ঐতিহ্য ও লোকাচারের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। 'স্প্রাটো' ধরনের কোনো ভাষা যদি আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করতেনও, তবুও তা সকল জাতির মাতৃভাষা হতে পারতনা এবং সে ভাষার সাহিত্যও মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করতে পারতোনা। মানুষ সে ভাষার সৌন্দর্য অলংকারও যথোচিতভাবে উপলব্ধি করতে পারতোনা। তবে আল্লাহ যদি অতিপ্রাকৃতিক পন্থায় সকল জাতির মাতৃভাষা বিলীন করে দিতেন এবং অতিপ্রাকৃতিক পন্থায়ই সকলের উপর বাধ্যতামূলকভাবে সেই বিশ্বভাষা চাপিয়ে দিতেন, তাহলে তা আলাদা ব্যাপার। যেহেতু আল্লাহ তায়ালার একটি কাজ আরেকটি কাজকে মিটিয়ে দেয়ার জন্যে হয়না, সেজন্যে মানবজাতির ভাষাসমূহের সাবেক প্রাকৃতিক কাঠামো ঠিক রেখেই আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হিদায়াতের কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন।

আরবী কুরআন শরীফ কেবল আরবী ভাষাভাষীদের জন্যেই উপকারী হতে পারে, এ অভিযোগ কেবল সে অবস্থায়ই সঠিক হতে পারতো যদি আল্লাহ তায়ালা শুধুমাত্র কিতাবই নাযিল করতেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালাতো কিতাব প্রেরণের সাথে সাথে পথ প্রদর্শকও প্রেরণ করেছেন। সেই পথ প্রদর্শক সর্বপ্রথম মানবজাতির একটি কওমকে সম্বোধন করেছেন, যাদের ভাষায় কিতাব নাযিল হয়েছে এবং সে জাতিকে কিতাবের দাবী অনুযায়ী শিক্ষা দান করেছেন, পরিশুদ্ধ করেছেন, বাস্তব প্রশিক্ষণ দান করেছেন এবং পূর্ণ সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে তাদেরকে ইপ্সিত জীবন ব্যবস্থার ছাঁচে ঢেলেছেন। অতঃপর তিনি সে কওমের উপর এ সেবার দায়িত্ব অর্পণ করেন যে, তারা তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে দুনিয়ার অপর সকল জাতির নিকট তেমনি ভাবে এ হিদায়াত পৌঁছে দেবে, তেমনি ভাবে তাদেরকে শিক্ষা দান করবে, পরিশুদ্ধ করবে, বাস্তব প্রশিক্ষণ দান করবে এবং পূর্ণ সমাজ বিপ্লবের মাধ্যমে তাদেরকে সেই ছাঁচে ঢালার চেষ্টা করবে, ইতোপূর্বে যে ছাঁচে তাদেরকে ঢালা হয়েছিল। এভাবে যেসব কওম এ আদর্শ কবুল করে নেবে, তারা অপরাপর কওমের জন্যে এ খিদমত আঞ্জাম দেবে। এটাই ছিল সে শিক্ষা ও হিদায়াতকে সার্বজনীন করার স্বাভাবিক পন্থা। দুনিয়ার যে কোনো আন্দোলনই তাদের আদর্শকে বিশ্বব্যাপী প্রচার করতে চেয়েছে এ পন্থাই অবলম্বন

করেছে, তা সেটা খোদায়ী বিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হোক কিংবা অন্য কোনো ধরনের আন্দোলন।

কোনো গ্রন্থ শুধুমাত্র সেই জাতির জন্যেই উপকারী হবে যাদের ভাষায় তা লেখা হয়েছে, এ নীতি যদি স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে পৃথিবীর জ্ঞান বিজ্ঞানের ইতিহাসকেই ভুল বলে স্বীকার করে নিতে হবে।

মানব রচিত গ্রন্থাবলীকেও ভাষার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। তরজমা এবং আন্তর্জাতিক প্রচারের বিভিন্ন মাধ্যমের উপকারিতাকেও অস্বীকার করতে হবে। অথচ এসব জিনিসের মাধ্যমেই বড় বড় আন্দোলন সমূহের দাওয়াত এবং বড় বড় বিপ্লবী ব্যক্তিত্বের বাণী বিশ্বের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে যাচ্ছে। অতঃপর কেবলমাত্র মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থাপিত কিতাবটি কি অপরাধ করলো যে, শুধু আরবী ভাষায় হওয়ার কারণে তাকে আরব জাতির জন্যে নির্দিষ্ট ও সীমিত করে দিতে হবে?

এতে যদি কোনো ব্যক্তি আশ্বস্ত না হয় এবং সে যা চায় আল্লাহকে ঠিক তেমনিই করা উচিত ছিল বলে মনে করে, তাহলে নিজ মতের উপর অনড় থাকার ইখতিয়ার তার আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এমনসব প্রশ্নকে প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড় করিয়ে কোনো ব্যক্তি যদি কোনো কিতাব বা কোনো পয়গাম থেকে ফায়দা হাসিল করতে না চায়, তবে ক্ষতিটা কার? সত্যান্বেষী লোকদের নীতি এটা নয়। তারা তো সর্বত্রই অনুসন্ধান করে বেড়ায়, কোথায় সত্যের আলো রয়েছে এবং কোথা থেকে তা লাভ করা যায়? মানুষ যদি পৃথিবীর প্রতিটি কিতাব, প্রতিটি শিক্ষার বিরুদ্ধে মন মগজে কোনো না কোনো ধরণের তালা লাগিয়ে রাখে, তাহলে তো জীবনের সত্য সরল পথে একটি কদম চলাও তার জন্যে সম্ভব হবে না। তরজমানুল কুরআন, রজব-শাওয়াল ১৩৬৩ হিঃ, জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪ ইং

নবুওয়াত লাভের পূর্বে আম্বিয়ায়ে কিরামের চিন্তা

প্রশ্ন ঃ আপনার তাফসীর তাফহীমুল কুরআনের সূরা আন' আমের নবম রুকুর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি টীকায় (৫৩ নং) আপনি লিখেছেন ঃ

"তিনি (হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস্ সালাম) هَـٰذَا رَبِّي (এই হচ্ছে আমার রব) বলার দ্বারা শির্ক করার অপরাধী হননি। কারণ একজন সত্যান্বেষী তার সত্য সন্ধানের পথে চলতে চলতে মাঝখানে চিন্তা ভাবনা করার জন্যে যেসব মনযিলে ক্ষণকালের জন্যে অবস্থান করেন সেসব মনযিল ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হয় না। বরঞ্চ যে দিকে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন সেই দিকটিই হয় আসল বিবেচ্য বিষয়।" এখন প্রশ্ন হলো, নবুওয়াত যদি 'আল্লাহ প্রদত্ত' জিনিস হয়ে থাকে, তবে তো হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের সাধারণ মানুষের মতো

আল্লাহর ইলাহ্ হওয়া না হওয়ার বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করার এবং অনুসন্ধানের প্রয়োজন হতনা। তিনি যদি সাধারণ মানুষের মতোই বুদ্ধিবিবেক ও যুক্তি দর্শনের মাধ্যমে খোদার খোদায়ী তত্বের সন্ধান পেয়ে থাকেন, তবে তো নবুওয়াত একটা গবেষণা লব্ধ জিনিসে পরিণত হলো। আর এতে করে একজন দার্শনিক ও একজন নবীর জ্ঞান লাভের পন্থায় কোনো পার্থক্য থাকলনা!

জবাব ঃ আমার মনে হয় প্রশ্নকর্তা নবুওয়াত 'আল্লাহ প্রদত্ত' হবার তাৎপর্য বুঝতে পারেননি বলে তার মধ্যে এ প্রশ্ন সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া খোদায়ী নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে সত্যের সন্ধান করা এবং দার্শনিক অনুমান অনুসন্ধিৎসার মাধ্যমে সত্যে উপনীত হবার চেষ্টা করাকে সমার্থক মনে করা হয়েছে। প্রশ্নকর্তার এ বিষয়ে ভুল বুঝার এটাও একটা অনিবার্য কারণ।

কুরআন মজীদ স্পষ্ট বলে দিচ্ছে যে, অহী আগমনের পূর্বে আম্বিয়ায়ে কেরাম যে ধরনের জ্ঞান রাখতেন, সাধারণ মানুষের জ্ঞান থেকে তা কিছুমাত্র পৃথক ধরনের হতোনা। অহী নাযিলের পূর্বে জ্ঞান লাভের ব্যাপারে সাধারণ মানুষ থেকে ভিন্নতর কোনো উৎস তাঁরা লাভ করতেননা। এ ব্যাপারে কুরআম মজীদের ভাষ্য হলো ঃ

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ۔

"কিতাব কি জিনিস আর ঈমান কি জিনিস এর কিছুই তুমি জানতেনা।" [সূরা আশ শূরা ঃ ৫২]

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدٰى ۔

"আর আল্লাহ তোমাকে পথ-অনভিজ্ঞরূপে পেয়েছেন, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন।" (আদ্-দোহা)

সাথে সাথে কুরআন মজীদ একথাও বলে দিচ্ছে যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালাম ঈমান বিল গায়েবের মনযিল অতিক্রম করতেন জ্ঞানের এমনসব সাধারণ উৎস দ্বারা, যা অন্যান্য মানুষও লাভ করে থাকে। অতঃপর অহী এসে কেবল একাজটিই করতো যে, তাঁদের অন্তর এতদিন যেসব সত্যের সাক্ষ্য দিচ্ছিল, সেগুলো সত্য হওয়ার ব্যাপারে তাদেরকে দৃঢ় প্রত্যয় ও অকাট্য সাক্ষ্য প্রদান করতো। তাদেরকে প্রকৃত সত্যসমূহ চাক্ষুস দেখিয়ে দিতো, যেনো তাঁরা পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে গোটা দুনিয়ার সামনে এসব সত্যের সাক্ষ্য দিতে পারেন। এ বিষয়টা সূরা হূদে বার বার বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথমে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً -

"যে ব্যক্তি প্রথমে তার রবের পক্ষ থেকে একটি সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণের অধিকারী ছিল (অর্থাৎ বিবেক ও প্রাকৃতিক হিদায়েত), তারপর আল্লাহর পক্ষ থেকে এক সাক্ষ্যদাতাও তার কাছে এলো (অর্থাৎ কুরআন) এবং এর পূর্বে মূসার কিতাবও পথ প্রদর্শক ও রহমত স্বরূপ বিদ্যমান ছিল, সে ব্যক্তি কি এ সত্য সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করতে পারে।" (সূরা হুদ ঃ ১৭)

সম্মুখে অগ্রসর হয়ে হযরত নূহ আলাইহিস সালামের ভাষণে বলা হয়েছে ঃ

يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ.

"হে আমার জাতির লোকেরা! চিন্তা করে দেখ, আমি যদি আমার রবের নিকট থেকে পাওয়া একটি সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে থাকি, অতঃপর তিনি আমাকে তাঁর বিশেষ রহমত (নবুওয়াত) দানেও ভূষিত করেন। আর তোমরা যদি তা দেখতে না পাও, তবে কি এখন আমি জোরজবরদস্তি করে তা তোমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবো? (হুদ ২৮ আয়াত)

অতঃপর এ বিষয়টাই ৬ রুকূতে হযরত সালেহ আলইহিস সালাম এবং ৮ রুকূতে হযরত শুয়াইব আলাইহিস সালাম পুনরুল্লেখ করেছেন। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম সরাসরি অহীর মাধ্যমে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করার পূর্বে মুশাহিদা ও চিন্তা গবেষণার প্রকৃতিগত যোগ্যতার সার্থক ব্যবহারের মাধ্যমে (উপরের আয়াতে যাকে بينة من ربى বলা হয়েছে) তাওহীদ ও পরকাল সংক্রান্ত নিগূঢ় তত্ত্বসমূহ অনুধাবন করতে সক্ষম হতেন। আর তাঁদের সত্যে উপনীত হবার এ জ্ঞান তারা দান হিসেবে লাভ করেননি, বরঞ্চ এটা তাদের চেষ্টালব্ধ। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে অহী দান করতেন। আর সেটা ছিল খোদায়ী দান, চেষ্টালব্ধ নয়।

আল্লাহর নিদর্শনাবলী প্রত্যক্ষ করা এবং চিন্তা ভাবনা ও সাধারণ বিবেক বুদ্ধিকে (Common-sense) এভাবে ব্যবহার করা দার্শনিকদের আন্দাজ অনুমান ও কল্পনা (Speculation) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। এটাতো এমন জিনিস যা

প্রয়োগের জন্যে কুরআন মজীদ প্রতিটি মানুষকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে। তাকে বার বার বলে, চক্ষু উন্মোচন করে আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখো এবং তা থেকে সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করো।

প্রশ্নকর্তা তার প্রশ্নে যে আয়াতের তাফসীর সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, তিনি যদি সে আয়াতটির পূর্বাপর বিষয়বস্তু পড়ে নেন, তাহলে দেখতে পাবেন, সেখানেও একই কথা বলা হয়েছে যে, একজন নিরপেক্ষ সত্য সন্ধানী আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা গবেষণার মাধ্যমে কিভাবে প্রকৃত সত্যে পৌঁছে যান। তরজমানুল কুরআন, ভলি্য ঃ ২৫, সংখ্যা ঃ ১, ২, ৩, ৪।

আম্বিয়ায়ে কিরামের নিষ্পাপ হওয়া

প্রশ্ন ঃ নবীরা যে মা'সূম (নিষ্পাপ) এটা স্বীকৃত ব্যাপার, কিন্তু হযরত আদম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে কুরআনের আয়াত থেকে অকাট্যভাবে প্রমাণ হয় যে, তিনি গুনাহ করেছেন এবং খোদার নির্দেশ অমান্য করেছেন। যেমন,

لَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُوْنَا مِنَ الظّٰلِمِيْنَ

আয়াতটি একথাই প্রমাণ করে। এ সম্পর্কে আপনার গবেষণার ফলাফল জানিয়ে উপকৃত করবেন।

জবাব ঃ নবীর মাসূম হওয়ার অর্থ এ নয় যে, ফেরেশতাদের মতো তাঁরও ভুল করার সম্ভাবনাই বিলুপ্ত করা হয়েছে। এর প্রকৃত তাৎপর্য হলো, জেনে শুনে নবী কখনো নাফরমানী করেননা। আর তাঁর দ্বারা কোনো ভুল হয়ে গেলেও আল্লাহ তায়ালা তাঁকে সে ভুলের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে দেননা।

এছাড়াও এখানে আরেকটি চিন্তা করার বিষয় আছে। তা হলো, হযরত আদম আলাইহিস সালাম কর্তৃক যে নাফরমানীর কাজ হয়ে গিয়েছিল তা তাঁর নবুওয়াত লাভের পূর্বেই সংঘটিত হয়েছিল। আর নবী হবার পূর্বে কোনো নবীর সে ধরণের নিষ্পাপ জীবন (عصمت) লাভ হয় না, যা নবী হবার পরে হয়ে থাকে। নবী হবার পূর্বে তো হযরত মূসা আলাইহিস সালাম কর্তৃকও একটা বিরাট গুনাহ্‌র কাজ সংঘটিত হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ তিনি একজন লোককে হত্যা করে ফেলেছিলেন। (নবুওয়াত লাভের পর) একাজটির জন্যে ফেরাউন যখন তাঁকে তিরস্কার করেছিল, তখন তিনি ভরা দরবারেই একথা স্বীকার করেছিলেন ঃ

فَعَلْتُهَا إِذًا وَّأَنَا مِنَ الضَّالِّيْنَ -

"একাজ সেসময় আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল যখন আমি হিদায়াত লাভ করিনি।" (আশ শোয়ারা ঃ ২০)

সংক্ষিপ্ত কথায় নীতিগত ভাবে আপনি একথাটিই বুঝে নিন যে, নবীর নিষ্পাপ হওয়াটা ফেরেশতাদের নিষ্পাপ হওয়ার মতো নয় যে, ভুল ক্রটি ও গুনাহ খাতা করার শক্তিই তিনি লাভ করেননি। না, তা নয়। বরঞ্চ এর অর্থ হলো, নবুওয়াতের দায়িত্বপূর্ণ পদে অভিষিক্ত করার পর আল্লাহ তায়ালা বিশেষ ভাবে তাঁর হিফাযত ও তত্ত্বাবধান করে থাকেন এবং তাকে ভুল ভ্রান্তি থেকে রক্ষা করে থাকেন। কোনো ছোট খাটো পদস্খলন যদি তাঁর দ্বারা হয়েও যায় তবে অহীর মাধ্যমে সাথে সাথেই সংশোধন করে দেন, যেনো তার ভ্রান্তি গোটা উম্মতের গোমরাহীর কারণ না হয়ে দাঁড়ায়। তরজমানুল কুরআন, রজব-শাওয়াল ১০৬৩ হিঃ, জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪ইং।

খতমে নবুওয়াত

প্রশ্ন ঃ আমার এক বন্ধু আছেন। তিনি আমার সাথে আলাপ আলোচনা করে থাকেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁর একজন কাদিয়ানী আত্মীয় আছে। সে তাকে তার দলে শরীক হবার দাওয়াত দিয়ে থাকে। কিন্তু আমার সে বন্ধু ভালভাবে তার প্রশ্নের জবাব দিতে পারেননা। তিনি আমাকে বলেছেন, আমি নিজে তার জবাব দিতে না পারায় একজন আলেমের নিকট তার জবাব জানতে চাই। কিন্তু জবাব যা পাওয়া গেছে তাতে আমি নিজেই সন্তুষ্ট হতে পারিনি। তাই এখন আপনার নিকট জানতে চাইছি।

সমস্যাটা হলো, কাদিয়ানীরা خاتم শব্দটি শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা লাভের অর্থে গ্রহণ করে থাকে, সমাপ্তি বা শেষ হওয়ার অর্থে নয়। তারা বলে, 'খাতাম' শব্দ কোথাও সমাপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। হয়ে থাকলে উদাহরণ পেশ করা হোক। তারা চ্যালেঞ্জ করেছে, যে ব্যক্তি আরবী অভিধানে 'খাতাম' শব্দের অর্থ সমাপ্তি দেখাতে পারবে সে পুরস্কার পাবে। শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা লাভ অর্থের উদাহরণ তারা এভাবে দিয়ে থাকে। যেমন কাউকেও خاتم الاولياء বলার অর্থ এ হয় না যে তার পর্যন্ত এসেই ولايت সমাপ্ত হয়ে গেছে। বরঞ্চ এর আসল তাৎপর্য হলো, ولايت এর পূর্ণতা তাঁর পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ তারা ইকবালের এ চরণটিরও উদ্ধৃতি দেয় ঃ

آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے -

তাদের মতে চরণটির তাৎপর্য এ নয় যে, জাহানাবাদে তাঁর পরে আর কোনো কবিই জন্ম নেবেনা। বরঞ্চ এর অর্থ হলো, তিনিই জাহানাবাদের সর্বশেষ পূর্ণতা লাভকারী শ্রেষ্ঠ কবি। এ নিয়মের ভিত্তিতে তারা خاتم النبيين এর অর্থ করে "নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত নবুওয়াতের পূর্ণতা লাভ শেষ হয়েছে, কিন্তু নবুওয়াত শেষ হয়নি।"

জবাব ঃ আপনার ৩রা মার্চ ১৯৫০ এর পত্রখানা পয়লা এপ্রিল আমার হস্তগত হয়েছে। আমার নিকট লেখার মতো কাগজ না থাকায় জবাব দিতে আরো দেরী হলো। আশা করি আমার অপারগতার প্রতি লক্ষ্য রেখে জবাবে বিলম্ব হওয়াকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।[১]

কুরআন মজীদের কোনো আয়াত সম্পর্কে কোনো রকম প্রশ্ন সৃষ্টি হলে সর্ব প্রথম কুরআন থেকেই তার অর্থ ও তাৎপর্য জানার চেষ্টা করতে হবে। অতঃপর অনুসন্ধান করে দেখতে হবে এর ব্যাখ্যায় কোনো সহীহ হাদীস পাওয়া যায় কিনা? এ দুটো উপায়ে যদি উক্ত প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া না যায় (যার সম্ভাবনা খুবই কম), তাহলে অবশ্যই অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করা সঠিক হতে পারে।

সূরা আহযাবে খতমে নবুওয়াতের উল্লেখ রয়েছে। আরবে পালিত পুত্রকে হুবহু ঔরসজাত পুত্রের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল। ঔরসজাত পুত্রের মতোই সে উত্তরাধিকার লাভ করতো। পালক পিতার স্ত্রী ও কন্যাদের সংগে আপন মাতা পুত্র ও ভাই বোনের মতোই সে নির্বিঘ্নে মেলামেশা করতো। পালিত পুত্র হিসেবে বরিত হবার সাথে সাথে তার মধ্যে এবং পালক পিতার মধ্যে রক্তসম্পর্কীয় যাবতীয় বিধিনিষেধ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেতো। তাদের এ প্রচলিত প্রথাকে ভেংগেচুরে ধূলিস্যাৎ করে দেয়াই ছিলো আল্লাহর ইচ্ছা। তাই তিনি এ ব্যাপারে প্রথম নির্দেশ দিলেনঃ "মুখে কাউকেও পুত্র বললেই সে প্রকৃত পুত্র হয়ে যায়না।" (সূরা আহযাব ৪, ৫ আয়াত) কিন্তু এটা বহু শতাব্দী যাবত প্রচলিত প্রথা হওয়ার কারণে তাদের অন্তরে বিধিনিষিধের যে ধারণা বদ্ধমূল ছিল তা খুব সহজেই দূরীভূত হচ্ছিলনা। তাই বাস্তবে এ প্রথাকে ভেঙে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। আর এ সময়ই সংঘটিত হয় একটি ঘটনা, যার ফলে আল্লাহর এ বিধানটি কার্যকর করার সুযোগ আসে। ঘটনাটা হলো, হযরত যায়িদ (যিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পালিত পুত্র ছিলেন) তাঁর স্ত্রী হযরত যয়নবকে তালাক দিয়ে দেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুভব করলেন,

---

১. উল্লেখ্য গ্রন্থকার এসময় কারারুদ্ধ ছিলেন। -অনুবাদক

এ জঘন্য জাহেলী প্রথাকে ভেঙে দেয়ার এটাই সুযোগ। কারণ যতোক্ষণ তিনি তাঁর নিজের পালিত পুত্রের তালাক প্রাপ্তাকে বিয়ে না করছেন, ততোক্ষণ পালিত পুত্রকে আপন পুত্রের মতো মনে করার জাহেলী ধারণা দূরীভূত হবেনা। কিন্তু তিনি এটাও জানতেন, একাজ করার সাথে সাথে মদীনার মুনাফিক দল, চার পাশে বসবাসরত ইয়াহুদী সম্প্রদায় এবং মক্কার কাফের গোষ্ঠী এক বিরাট তোলপাড় ও হৈ চৈ শুরু করবে। তাঁর বদনাম এবং ইসলামকে কলংকিত করার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার ত্রুটি তারা করবেনা। এ কারণেই তিনি বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা সত্ত্বেও কিছুটা ইতস্তত করছিলেন। অবশেষে স্বয়ং আল্লাহই তাঁকে নির্দেশ দিলেন এবং আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী তিনি হযরত যয়নবকে বিয়ে করলেন। বিয়ের পরই তাঁর পূর্ব আশংকা অনুযায়ী অভিযোগ, অপবাদ ও সন্দেহ সংশয়ের ঝড় উঠতে শুরু করলো। স্বয়ং মুসলমান জনসাধারণের অন্তরেও বিভিন্ন খারাপ ধারণা সৃষ্টি হতে লাগলো। আর এসব অভিযোগ ও খারাপ ধারণা নিরসন করার জন্যেই নাযিল হয় সূরা আহযাবের ৩৭-৪০ আয়াত।

এ আয়াতগুলোতে প্রথমেই আল্লাহ তায়ালা বলে দিলেন, এ বিয়ে আমার নির্দেশে হয়েছে। আর এ নির্দেশ এ জন্যেই দেয়া হয়েছে যেনো পালিত পুত্রের বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তাকে বিয়ে করার ব্যাপারে মুমিনদের অন্তরে কোনো প্রকার দ্বিধা সংকোচ না থাকে। অতঃপর বলে দিলেন, আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর করতে গিয়ে ব্যক্তি ও সমাজকে ভয় করা নবীর কাজ নয়। অবশেষে এ ঘোষণার মাধ্যমে প্রসংগটি শেষ করেন ঃ

"মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়, বরঞ্চ তিনি আল্লাহর রসূল ও সর্বশেষ নবী (خاتم النبين) মাত্র।" এ প্রসংগে এ সর্বশেষ আয়াত থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, আল্লাহ বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তির জবাবে তিনটি যুক্তি পেশ করছেন ঃ

প্রথম যুক্তি হলো এই যে, এটা কোনো আপত্তিকর বিয়ে নয়, কেননা যে ব্যক্তির তালাক প্রাপ্তাকে বিয়ে করা হয়েছে, সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঔরসজাত পুত্র নয় এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার প্রকৃত পিতা নন।

দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, এ বিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে কেবল জায়েযই ছিলনা, বরঞ্চ জরুরীও ছিল। কেননা তিনি তো আল্লাহর রসূল, আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর করা এবং যেসব কুপ্রথা নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে, সেগুলো ভংগ করা রসূলের জন্যে অপরিহার্য কর্তব্য।

তৃতীয় যুক্তি হলোঃ একাজ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে আরো অধিক জরুরী ছিল। কেননা, তিনি তো কেবল নবীই নন। বরঞ্চ সর্বশেষ

নবী। আর এ জাহেলী প্রথা যদি এখন তাঁর হাতে রহিত না হতো, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত তা আর রহিত হতে পারতনা। তাঁর পক্ষে কোনো সংশোধনীর কাজ বাকী রেখে যাওয়া সম্ভব ছিলনা কেননা তাঁর পরে আর কোনো নবীর আগমন ঘটবেনা, যিনি এসে উক্ত সংস্কার সংশোধনীর কাজ সম্পন্ন করবেন।'

এখন আপনি নিজেই দেখুন, বর্ণনার এই ধারাবাহিকতায় خَتَمَ শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? যদি এর অর্থ শ্রেষ্ঠত্ব ও পূর্ণতা লাভ ধরা হয় তাহলে এখানে শব্দটির ব্যবহার সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে। যে অবস্থা ও পরিপ্রেক্ষিতে শব্দটি এখানে ব্যবহৃত হয়েছে তার অনিবার্য দাবী হলো, শব্দটির অর্থ হতে হবে নবুওয়াতের ধারাবাহিকতার চির পরিসমাপ্তি হওয়া।

অতঃপর হাদীসের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'খতমে নবুওয়াতের' যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তা হলোঃ "আমার এবং পূর্ববর্তী নবীগণের দৃষ্টান্ত এরূপ, যেমন কেউ একটা অট্টালিকা তৈরী করলো। তার নির্মাণ কাজ অতি সুন্দর চমৎকার। কিন্তু তাতে একটি ইঁটের জায়গা খালি ছিল। আমিই সে ইঁট। আমি এসে সে স্থানটি পূরণ করে দিলাম এবং অট্টালিকার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলো।" হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। মিশকাত শরীফে "ফাদায়িলে সাইয়েদুল মুরসালীন" অধ্যায়েও আপনি হাদীসটি পাবেন। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী নবুওয়াতের অট্টালিকার নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে। সর্বশেষ ইঁটটির শূন্যস্থানও পুরণ হয়ে গেছে। তাহলে এখন প্রশ্ন হলো, কোনো নতুন ইঁট এসে কোথায় লাগবে, অট্টালিকার ভিতরে না বাইরে?

এরপর অভিধানের প্রতি লক্ষ্য করুন। আরবী ভাষার কোনো নির্ভরযোগ্য অভিধান খুলে خَتَمَ শব্দের অর্থ দেখে নিন। আপনি দেখতে পাবেন উপরে কুরআন হাদীসের আলোকে আমি যে ব্যাখ্যা পেশ করেছি, আরবী ভাষার অভিধানও সে অর্থই প্রকাশ করে। خَتَمَ শব্দের অর্থ হলো, মোহর লাগানো, বন্ধ করা এবং কোনো জিনিসের ধারাবাহিকতা সম্পন্ন ও সমাপ্ত করা। خَتَمَ الْإِنَاءَ মানে 'পাত্রের মুখ বন্ধ করে দিয়েছেন'। خَتَمَ الْعَمَلَ মানে 'কর্ম সম্পাদন করে তা থেকে মুক্ত হয়েছে'। خَتَمَ الْكِتَابَ মানে 'চিঠি বন্ধ করে তার উপর সীল লাগিয়ে দিয়েছে।' স্বয়ং কুরআনে সত্যকে অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে বলা হয়েছেঃ

خَتَمَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ "আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর

লাগিয়ে দিয়েছেন।" অর্থাৎ সত্য গ্রহণের ব্যাপারে তাদের অন্তর রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে আর 'ঈমান' প্রবেশ করতে পারবেনা এবং তাদের অন্তর থেকে আর 'কুফর' নিষ্ক্রান্ত হতে পারবেনা।

সুতরাং এর আলোকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে خَتْمَ النَّبِيِّيْنَ বলার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ্ তায়ালা নবী আগমনের ধারাবাহিকতার পরিপূর্ণতা ও পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তাঁকে এর উপর মোহর হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। এখন আর এ ধারাবাহিকতায় কোনো নতুন নবী প্রবেশ করতে পারবেনা।[১]

রাসূলদের গায়েব জানার প্রসংগ

প্রশ্ন ঃ একজন আলিমে দ্বীন তাঁর রচিত গ্রন্থে লিখেছেনঃ "অদৃশ্য জগত থেকে রসূলকে সেসব কথা বলে দেয়া হয়, যা আল্লাহ তায়ালা তাঁর মাধ্যমে বান্দাহদের নিকট পৌঁছাতে চান।" এর দলীল হিসেবে তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেছেন ঃ

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖٓ اَحَدًا
اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ
بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا لِّيَعْلَمَ
اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ-

অর্থাৎ "তিনি গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত। তাঁর অদৃশ্য বিষয় কারো নিকট প্রকাশ করেননা; তবে করেন কেবল সে রসূলের নিকট যাকে তিনি এজন্যে পছন্দ করে নিয়েছেন। অতঃপর তিনি তার আগে পিছে পাহারাদার নিযুক্ত করে দেন, যাতে করে সে জানতে পারে যে তারা তাদের রবের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছে।" [সূরা জ্বিন ঃ ২৬-২৮]

গ্রন্থকারের বক্তব্য থেকে এটাই বুঝা যায়, রাসূলদের ততোটুকু গায়েবী ইলমই দেয়া হতো যতোটুকু বান্দাহদের নিকট পৌঁছানো উদ্দেশ্য হতো। এর বাইরে তাঁদের কিছুই বলা হতনা। তাঁর এ বক্তব্য কি যথার্থ এবং এ ব্যাপারে যুক্তি হিসেবে পেশকৃত আয়াতটি কি সিদ্ধান্তকর?

---

১. নিউ সেন্ট্রাল জেল মুলতান, ৬ এপ্রিল ১৯৫০ ইং।

জবাব ঃ গ্রন্থকার মূলত, সাধারণ মানুষের একটি ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন করার প্রয়াস পেয়েছেন আর তা হলো, 'অতীতে যা ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যা ঘটবে রসূল এ সবই জানেন এবং আল্লাহ তায়ালা সমস্ত গায়েব ইল্ম তাঁকে দান করেছেন; এমনকি খোদা যা কিছু জানেন তাঁর রসূলও তা সবই জানেন।' এ কথা সুস্পষ্ট যে এটা একটা ভ্রান্ত আক্কীদাহ বিশ্বাস আর এ ভ্রান্ত আকীদাহ বিশ্বাস খণ্ডন করা পর্যন্ত গ্রন্থকারের বক্তব্য যথার্থ। কিন্তু 'রাসূলগণকে কেবল ততোটুকুই গায়েবের ইল্ম দেয়া হয়েছে যতোটুকু বান্দাহদের পৌছানো উদ্দেশ্য ছিলো', তার এ ধারণা ঠিক নয়। এ বক্তব্য কুরআন হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনার বিপরীত এবং গ্রন্থকার যুক্তি হিসেবে যে আয়াতটি পেশ করেছেন তা থেকেও এমনটি প্রকাশ পায় না। কুরআন মজীদে হযরত ইয়াকুব আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলা হয়েছে, তিনি তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন ঃ

إِنِّيْ أَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ـ

"আমি আল্লাহর নিকট থেকে এমনসব কথা জানি যা তোমরা জাননা।" [সূরা ইউসুফ ঃ ৮৬-৯৬]

এ ছাড়াও কুরআন মজীদের বহুস্থান থেকে একথা জানা যায় যে, বিভিন্ন জাতির উপর আযাব নাযিলের পূর্বে তাদের নবীদের সে সম্পর্কে সংবাদ দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা আযাব নাযিলের সময় এবং তার বিস্তারিত ধরন সম্পর্কে নিজ জাতিকে অবহিত করেননি। নূহ আলাইহিস সালামকে তো বেশ আগেই আযাবের সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়। এতে করে তুফান আসার পূর্বেই তিনি কিশ্তী তৈরীর কাজ সেরে নেন। কিন্তু তিনি তাঁর কওমকে এ সংবাদ দেননি যে তাদের উপর পানির আযাব আসবে। হাদীস থেকে জানা যায়, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গায়েবের এমনসব বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে, যা তাঁর উম্মতকে জানানো হয়নি। একবার খোতবা প্রদান কালে তিনি বলেছিলেনঃ

يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللّٰهِ لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَّلَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا ـ (بخارى باب الصدقة فى الكسوف)

"হে মুহাম্মদের উম্মত! আল্লাহর কসম, আমি যা জানি তোমরা যদি সেসব কথা জানতে, তবে তোমরা অবশ্যই কম হাসতে এবং অধিক কাঁদতে।"

আরেকবার তিনি বলেছিলেন ঃ

لَأَرَاكُمْ مِّنْ وَّرَائِيْ كَمَا أَرَاكُمْ - (بخاری باب عظة امام الناس)

"আমি তোমাদেরকে আমার সামনে থেকে যেমনি দেখি, পেছন থেকেও তেমনি দেখি।"

মোট কথা, রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহর বান্দাদের নিকট গায়েবের যে পরিমান ইল্‌ম পৌঁছেছে, তার চাইতে ঢের বেশী গায়েবের জ্ঞান রাসূলদের দেয়া হয়েছে। আর এমনটি হওয়াই বুদ্ধি বিবেকেরও দাবী। কারণ বান্দাদের তো কেবল গায়েবের সেসব বিষয়ই জানানো প্রয়োজন যা ঈমান ও আকীদার সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু রাসূলগণের তো এ ছাড়াও আরো অনেক কিছু সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন যা রিসালাতের দায়িত্ব পালনে সহায়ক। যেমন রাষ্ট্র প্রধানের পলিসি গোপনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে তার সহকারী ও প্রশাসকগণের একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত অবহিত থাকা জরুরী। কিন্তু সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত এসব গোপন বিষয় জানাজানি হওয়াটা কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক এমনি করে খোদায়ী সাম্রাজ্যেও বহু গোপনীয় বিষয়াদি রয়েছে। তাঁর খাস প্রতিনিধি এবং তাঁর রাসূলগণকে এসব বিষয়ে অবহিত করানো হয়। কিন্তু প্রজা সাধারণ এসব গোপনীয় বিষয়াদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। রাসূলগণের দায়িত্ব পালনে এই ইলম সাহায্যকারী হয়ে থাকে। কিন্তু সাধারণ মানুষের এ ইলম হাসিলের না কোনো প্রয়োজন আছে আর না তাদের এ ইলম ধারনের ক্ষমতা আছে। তরজমানুল কুরআন ঃ জমাদিউল আউয়াল ১৩৫৩ হিঃ, আগষ্ট ১৯৩৪ ইং।

নাস্তিকতা, জড়বাদ ও কুরআন

প্রশ্ন ঃ আপনি আপনার "কুরআনের চারটি মৌলিক পরিভাষা" গ্রন্থে চারটি পরিভাষার যে অর্থ বর্ণনা করেছেন, আপনার বক্তব্য অনুযায়ী তার সারমর্ম এই দাঁড়ায়ঃ পৃথিবীতে এমন কোনো কওম ছিলনা যাদের কাছে নবী পাঠানো হয়নি এবং নবীগণ তাদেরকে আল্লাহর সত্তাকে মেনে নেয়া কিংবা তাঁকে স্রষ্টা ও রিযিক দাতা অর্থে ইলাহ ও রব মেনে নেয়ার দাওয়াত দেননি। কেননা দুনিয়ার প্রতিটি কওমই আল্লাহর স্রষ্টা ও অস্তিত্বদানকারী হওয়ার আকীদাহ বিশ্বাস পোষণ করতো।" এ বক্তব্য থেকে বাহ্যত এ সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, সেসব কওমে খোদাকে অস্বীকারকারী কোনো লোক সমষ্টি ছিলনা। অথচ কুরআনের কোনো কোনো আয়াত থেকে এ ধরনের লোকদের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। যেমনঃ

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا - نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ -

"জীবন তো শুধু আমাদের এ দুনিয়ারই জীবন। জীবন ও মৃত্যু সবতো এখানেই। আমাদের ধ্বংস করে তো কেবল কালের প্রাকৃতিক বিধান।" (জাসিয়া-২৪)

এছাড়া মূসা ও ফেরাউন এবং ইব্রাহীম ও নমরূদের ঘটনাবলী আলোচনা প্রসংগে কোনো কোনো আয়াত সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে এরা দু জনই নাস্তিক ছিলো। যেমনঃ

أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ -

"আসমান ও যমীনের স্রষ্টা আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারেও কি কোনো সন্দেহ আছে?" [সূরা ইব্রাহীম : ১০]

অপর একটি আয়াত :

أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ -

"তারা কি কোনো স্রষ্টা ছাড়া এমনিতেই সৃষ্টি হয়েছে? নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা?" [সূরা তুর : ৩৫]

আপনি আপনার বক্তব্যের সমর্থনে অপরাপর আয়াত পেশ করে সেগুলোর যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন তাতে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারণ অন্য দৃষ্টিকোণ থেকেও তো সেগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ হতে পারে?

জবাব : আমি যতদূর কুরআন অধ্যয়ন করেছি এবং যে পরিসরে ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যাবলী আমার সম্মুখে রয়েছে এ উভয় উৎস থেকে আমি একথা প্রায় নিশ্চিত ভাবে জানতে পেরেছি যে, পৃথিবীতে এমন কোনো জাতি বা সম্প্রদায় (Community) অতীত হয়নি, যারা সামষ্টিকভাবে খোদাকে অস্বীকারকারী নাস্তিক ছিলো। ব্যক্তিগত ভাবে কেউ কেউ এবং দার্শনিক চিন্তাধারার অধিকারী এমন কিছু লোক অবশ্যই ছিলো। কিন্তু তারা মোটেই এতোটা উল্লেখযোগ্য ছিলনা যে সরাসরি তাদের উদ্দেশ্যে কোনো নবী প্রেরণ কিংবা কিতাব নাযিলের প্রয়োজন ছিলো। তাই এ ধরনের লোকদের প্রতি কুরআন মজীদ কোথাও কোথাও অবশ্যই সংক্ষিপ্ত ইশারা ইংগিত করেছে; কিন্তু দাওয়াত সরাসরি মুশরিকদের সম্বোধন করেই দেয়া হয়েছে। আর সাধারণত তাওহীদের যুক্তি হিসেবে যেসব দলীল প্রমাণ পেশ করা হয়েছে সেগুলো এমন ভাবেই করা হয়েছে যাতে শিরকের ভ্রান্তি প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে নাস্তিকতার অসারতাও উন্মোচিত হয়ে যায়। এর বিরুদ্ধে আলাদা দলীল প্রমাণ পেশ করার কোনো প্রয়োজন ছিলনা।

ফেরাউন এবং নমরূদ সম্পর্কে আপনি যা কিছু লিখেছেন, তা কেবল আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতেই লিখেছেন। নির্ভরযোগ্য তথ্যাবলী এর বিপরীত। বেবিলন ও মিশর সম্পর্কে বর্তমানে প্রত্নতাত্ত্বিক শিলালিপি থেকে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া গেছে। এসব তথ্যাবলী থেকে একথা প্রমাণ হয়ে গেছে যে, ফেরাউন বংশ এবং বেবিলনের শাসক গোষ্ঠি উভয়ই ছিলো পূরোহিত রাজা (Priest Kings)। তাদের জাতীয় জীবনে যেসব ইলাহর পূজা করা হতো তারা সেগুলোকে কেবল ইলাহই মানতনা, বরঞ্চ এ উভয় শাসক গোষ্ঠীই ছিলো সেগুলোর মহাপূজারী পূরোহীত (Chief Priests)। এদেরকেই ঐসব ইলাহর প্রতিনিধি হিসেবে মান্য করা হতো। কুরআনের বর্ণনা থেকেও একথার সত্যতা প্রমাণিত হয় এবং একথাও পরিষ্কার ভাবে জানা যায় যে, বর্তমানে নাস্তিক শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে তারা সে অর্থে নাস্তিক ছিলনা।

লা-হু-মা সালাফার তাফসীর

প্রশ্ন ঃ

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ -

"কাজেই যে ব্যক্তির কাছে তার প্রভুর পক্ষ থেকে এ উপদেশ পৌঁছবে সে যদি এর পর থেকে সুদখুরী হতে বিরত থাকে, পূর্বে যা খেয়েছে তা তো খেয়েছেই, সে বিষয়টি পুরোপুরি আল্লাহর উপর সোপর্দ।" (আল বাকারা ঃ ২৭৫)

তাফহীমুল কুরআনে সুদ নিষিদ্ধকরণ সংক্রান্ত এ আয়াতের টীকায় আপনি যে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন তাতে আমি আশ্বস্ত হতে পারিনি। আপনি লিখেছেনঃ "যে ব্যক্তি যথারীতি পূর্বের (অন্যায় ভাবে) উপার্জিত অর্থ ভোগ করবে, এ হারামখুরীর কারণে তার শাস্তি ভোগ করা অসম্ভব নয়।"

প্রশ্ন হলো, সুদ হারাম হবার পর সাহাবায়ে কিরাম কি কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন? যদি তাঁরা নৈতিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে আসল হকদারদের অর্থ ফেরত দিয়ে থাকেন, তবে আপনার যুক্তি যথার্থ। আর সাহাবায়ে কিরাম যদি এমনটি করেছেন বলে কোনো প্রমাণ থেকে থাকে তবে তাফহীমুল কুরআনে সে সূত্রের উল্লেখ করা উচিত।

জবাব ঃ এ ব্যাপারে কুরআনের শব্দগুলোর প্রতি সম্ভবত, আপনি দৃষ্টিপাত করেননি। فَلَهُ مَا سَلَفَ বলার পর যে وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ বলা হলো, তার অর্থ কি হতে পারে? তার অর্থ তো কেবল এটাই হতে পারে যে, কেউ পূর্বে যে সুদ গ্রহণ করেছে এখানে তার ক্ষমা ঘোষণা করা হয়নি।

বরঞ্চ তার মামলা বিবেচনাধীন রাখা হয়েছে। এখন সে ব্যক্তি যদি তার সুদ দ্বারা অর্জিত অর্থ সম্পদ আরাম আয়েশ ও শান শওকত লাভের কাজে ব্যয় করে, তবে তার অবস্থা ঐ ব্যক্তির মতোই হবে, যে তার অতীতের গুনাহ্র জন্যে মোটেই অনুতাপ ও লজ্জাবোধ করেনা। তাই তার সাথে আল্লাহর আচরণও ঐ ব্যক্তির চাইতে ভিন্নতরই হবে যে তার অতীতের গুনাহ্র জন্যে অতিশয় অনুতপ্ত ও লজ্জিত এবং অন্যায়ভাবে অর্জিত অর্থ-সম্পদ নিজের আরাম আয়েশের জন্যে ব্যয় করার পরিবর্তে খোদার সৃষ্টির সেবায় ব্যয় করে যেনো তার অতীতের সে যুলুম ও অন্যায়ের অনেকটা কাফফারা হয়ে যায়, জাহেলী জীবনে যা সে করে ফেলেছিল। ইতিহাসে এ বিষয়টির কোনো দৃষ্টান্ত যদি না-ই পাওয়া যায় তাই বলে তার অর্থ এই নয় যে, বিধান দাতার নির্দেশের উদ্দেশ্যের প্রতি কুরআন যে স্পষ্ট ইংগিত করছে তা থেকে আমরা চোখ বন্ধ করে থাকবো। তরজমানুল কুরআন মহররম-সফর ১৩৬৪ হিঃ, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ ইং

আলিম ও নেক লোকদের অনুকরণ

প্রশ্ন ঃ একজন আলিমে দ্বীন তাঁর গ্রন্থে লিখেছেনঃ "আলিম ও নেক লোকদেরকে ইমাম ও হাদী মেনে নিয়ে তাদের কথাকে আল্লাহর বাণীর মতো বিনা দলীল প্রমাণে মান্যকরাও এক প্রকার শির্ক।" আবার লিখেছেনঃ "প্রাচীন ইমাম ও বুযুর্গানে দ্বীনের ইলম ও জীবন চরিত থেকে জ্ঞানগত এবং ঐতিহাসিক ফায়দা হাসিল করা যেতে পারে। কিন্তু কুরআনী প্রমাণ ছাড়া তাদের কারো কথা দ্বীন হিসাবে মেনে নেয়া শির্ক।" অন্যত্র লিখেছেনঃ "আল্লাহ্র কিতাবকে বাদ দিয়ে বুযুর্গদের অনুসরণ করা গোমরাহী।" সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তিনি আরো বলেনঃ "রাসূল এবং আমীর ব্যতীত অপর কারো আনুগত্য করার নির্দেশ কুরআনে নেই, বরঞ্চ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।" শেষের দিকে একস্থানে তিনি লিখেছেনঃ "বরঞ্চ সাধারণ ভাবে মানুষের আনুগত্য করাকে কুরআন বিপজ্জনক বলে ঘোষণা দিয়েছে।" গ্রন্থকারের এসব বক্তব্য কতদূর সঠিক?

জবাব ঃ এ সব বক্তব্যে সঠিক বেঠিক দু' রকম কথাই মিশ্রিত আছে। মোটের উপর গ্রন্থকার সত্য কথা বলার সাথে সাথে কিছুটা বাড়াবাড়িও করেছেন। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে জাহেল পীর এবং স্বার্থান্বেষী অসৎ আলিমদের অন্ধ তাকলীদ ও জাহেলী আনুগত্যের যেসব নিদর্শন পরিলক্ষিত হচ্ছে, তার বিরুদ্ধে যতোই ক্ষোভ প্রকাশ করা হোকনা কেন তা যথার্থ এবং করনীয়। কিন্তু আফসোসের বিষয় গ্রন্থকার সংশোধনের ভাবাবেগ প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সীমাতিক্রম করে ফেলেছেন। তিনি সত্যপন্থী ওলামায়ে কিরাম, সালেহীন

এবং হেদায়াতপ্রাপ্ত ইমামগণের আনুগত্য অনুসরনকেও গোমরাহী বলে ঘোষণা করেছেন। শুধু কি তাই? বরঞ্চ একাজকে তিনি শির্ক বলেও আখ্যায়িত করেছেন। অথচ তাঁর বক্তব্যকে যুক্তিসংগত প্রমাণ করার জন্যে দলীল হিসেবে তিনি কুরআনের যেসব আয়াত পেশ করেছেন, সেগুলোর প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে তিনি নিজেই অনুভব করতে পারতেন যে তিনি সত্যের সীমালংঘন করেছেন। শির্ক তো একটা সাংঘাতিক জিনিস। কোনো ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অপর কাউকেও প্রকৃত অর্থে নির্দেশদাতা এবং নিষেধকর্তা হবার যোগ্য ঘোষণা করলে, কিংবা আল্লাহর আদেশ- নিষেধের মোকাবেলায় অপর কারো আদেশ নিষেধকে অবশ্য পালনীয় মনে করলেই কেবল শির্ক হতে পারে। কিন্তু এটা কোনো গোপন ব্যাপার নয় এবং সম্ভবত গ্রন্থকার নিজেও ভাল ভাবে জানেন যে কোনো অতি মুর্খ মুসলমানও এ ধরনের আকীদাহ পোষণ করেননা। সুতরাং এ ব্যাপারে শির্কের রায় প্রদান করা অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। যে ব্যক্তি বুঝে শুনে কোনো বুযুর্গ সম্পর্কে একথা মনে করে যে, তিনি সত্যপন্থী এবং খোদার শরীয়ত ও তার হুকুম আহকাম সম্পর্কে অন্যদের তুলনায় অধিক ভালো জানেন আর এরি ভিত্তিতে যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর অনুসরণ করেন তবে এমন ব্যক্তিকে কেমন করে শির্কের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যায়?

এখন প্রশ্ন হলো, কার অনুসরণ করা জায়েয আর কার অনুসরণ করা গোমরাহী? এর জবাবে কুরআন মজীদ স্পষ্ট ভাবে বলেঃ

لَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ -

"কাফের আর মুনাফিকদের আনুগত্য করোনা।"

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا -

"এমন কোনো ব্যক্তির আনুগত্য করোনা, যার দিলকে আমি আমার স্মরণ থেকে গাফিল করে দিয়েছি এবং যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলার নীতি গ্রহণ করেছে আর যার কর্মনীতি সীমালংঘনমূলক।"

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ -

"মিথ্যাবাদীদের আনুগত্য করোনা।"

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا -

"আর এদের মধ্য থেকে কোনো দুষ্কৃতিকারী পাপিষ্ঠ কিংবা সত্য অমান্যকারীর আনুগত্য করোনা।"

এসব আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে কাদের আনুগত্য ও অনুসরণ করা যাবেনা। একথা কোথাও বলা হয়নি যে আলিম ও নেক লোকদের আনুগত্য করা যাবেনা। বরঞ্চ কুরআন তো একথাই বলে যে ঃ

فَاسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ -

"নিজে না জানলে জ্ঞানীদের নিকট জিজ্ঞেস করে নাও।"

অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ فَبِهُدٰهُمُ اقْتَدِهْ -

"ঐসব লোক যারা আল্লাহ্ তায়ালার পক্ষ থেকে হেদায়েত প্রাপ্ত, তাদের পথ অনুসরণ করো।"

উপরে ইংগিত করেছি যে গ্রন্থকার ভুল ও নির্ভুলকে একাকার করে ফেলেছেন। ওলামায়ে কিরাম ও সালেহীনদের পথ প্রদর্শক বলে মেনে নেয়া গুনাহ্র কাজ নয়। বরঞ্চ যারা আলিম ও সালেহ নয় তাদের জন্যে অপরিহার্য যে তারা আলিম ও নেক লোকদের কথা মানবে ও তাঁদের অনুসরণ করবে। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তাঁদের কথাকে আল্লাহ্র বাণীর মতো মনে করা অবশ্যই গুনাহ্র কাজ। এমনি ভাবে এ কথাও ঠিক যে, আল্লাহ্র কিতাবকে পরিত্যাগ করে কেবল বুযুর্গদের আনুগত্য অনুসরণ করাও গোমরাহী। কিন্তু যে ব্যক্তি একথা মনে করে বুযুর্গদের অনুসরণ করে যে, সে নিজে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান রাখেনা এবং অতীতের বুযুর্গানে দ্বীন যে পথ অবলম্বন করেছেন তা আল্লাহ্র কিতাব মাফিক। তাহলে এ ক্ষেত্রে সে ব্যক্তির কোনো অপরাধ বা গোনাহ হবেনা। এ ব্যাপারে আপনি বড় জোর এতোটুকুই বলতে পারেন যে, সে আনুগত্যের জন্যে যে বুযুর্গদের বাছাই করেছে তার সে নির্বাচন সঠিক হয়নি।

অন্ধ তাকলীদ ও অন্ধ অনুকরনের আপনি যতো ইচ্ছা নিন্দা করুন, তাতে দোষ নেই। একথা বলার অধিকারও আপনার আছে যে, বেলায়েত, ইমামত, ইজতেহাদ এবং ইল্ম ও ফযীলত অতীত বুযর্গদের পর্যন্তই শেষ হয়ে যায়নি। এসব মর্যাদা আজো লাভ করা যেতে পারে এবং তা লাভ করার চেষ্টা সাধনাও করা উচিত। কিন্তু তাকলীদের বিরোধীতা এবং ইজতেহাদের সখ যদি অতি মাত্রায় বেড়ে গিয়ে অতীত বুযুর্গদের বিরুদ্ধে একগুঁয়েমি সৃষ্টি করে, অযথা যদি তাঁদের গড়া অট্টালিকাসমূহ ভেঙ্গে দেয়ার প্রয়োজন অনুভব করা হয়, কেবলমাত্র

নতুন নতুন পথ ও মত সৃষ্টির জন্যে অভিনব পন্থা অবলম্বন করা হয়, লোকেরা যোগ্যতা ছাড়াই ইজতিহাদ করা শুরু করে দেয় এবং আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহকে শিশুদের খেলনাতুল্য বানিয়ে নেয়, তাহলে এ গোমরাহী অন্ধ তাকলীদের গোমরাহীর চাইতেও মারাত্মক এবং দ্বীনের জন্যে অধিকতর ক্ষতিকর। মুকাল্লিদ বা অনুকরনকারীরা তো কেবল এতোটুকুই করে যে, তাদের অতীত বুযুর্গগণ যেসব প্রাচীর গড়ে গেছেন যুগের চাহিদা অনুযায়ী তারা সেগুলোর উপরে অতিরিক্ত কোনো নির্মাণ কাজ করেনা বরঞ্চ পুরাতন ইমারতকে হুবহু প্রতিষ্ঠিত রাখে। পক্ষান্তরে এ নব উদ্ভাবনপন্থীরা পুরানো প্রাচীরও ভেঙে চুরমার করে দেয় আর নিজেদের মনগড়া পন্থায় নতুন ইমারত তৈরীর চেষ্টা করে। এধরনের মানসিকতা প্রসার লাভ করলে গোটা দ্বীনই বিকৃত হয়ে যাবার আশংকা রয়েছে। আর কে জানে তার আকার আকৃতিইবা কিরূপ করে ফেলা হয়। তরজমানুল কুরআন, জমাদিউল আউয়াল ১৩৫৩ হিঃ, আগষ্ট ১৯৩৪ ইং।

কুরআন, হাদীস ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা

প্রশ্ন ঃ কুরআন ও হাদীসে এমন অনেক জিনিস বর্ণিত হয়েছে, যা আধুনিক কালের গবেষণা দ্বারা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা কি কুরআন হাদীস মানবো, না বৈজ্ঞানিক গবেষণা? যেমন ঃ

ক. কুরআন বলে গোটা মানবজাতি আদম আলাইহিস সালামের বংশধর। এর বিপরীত আধুনিক কালের বিজ্ঞানীদের দাবী হলো, মানুষ পশুর স্বগোত্রীয়। বিবর্তনের মাধ্যমে বানর ও বন মানুষ থেকে মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে।

খ. কুরআনের দাবী হলো, সূর্য গতিশীল। কিন্তু বিজ্ঞান বলে সূর্য স্থির।

গ. এমনি করে মেঘের গর্জন ও বিদ্যুৎস্ফূরণ সম্পর্কে ইসলামের অভিমত হলো, এ হচ্ছে মেঘ পরিচালনা কালে পরিচালক ফেরেশতাদের চাবুক থেকে নির্গত বিদ্যুৎস্ফুলিংগ এবং উচ্চ ধ্বনি। অথচ আধুনিক গবেষণা বলে, মেঘে মেঘে ঘর্ষণের ফলে গর্জ্জন ও বিদ্যুৎস্ফূরণ হয়।

ঘ. কানা দাজ্জাল সম্পর্কে একথাই সুবিদিত যে, সে কোথাও বন্দী হয়ে আছে। তবে সে জায়গাটা কোথায়? আজতো দুনিয়ার প্রতিটি কোণ মানুষ খুঁজে বের করেছে। তারপরও কানা দাজ্জালের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

জবাব ঃ আমার পঁচিশ বছরের ইলমী গবেষণা ও অনুসন্ধানকালে আমি আজ পর্যন্ত একটি দৃষ্টান্তও এমন পাইনি যে, বৈজ্ঞানিক পন্থায় মানুষ এমন কোন তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে যা কুরআনের খেলাপ। অবশ্য বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে যেসব মতবাদ প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার অনেকগুলোই এমন

আছে যা কুরআনের বর্ণনার সাথে সাংঘর্ষিক। কিন্তু অনুমান ভিত্তিক মতবাদসমূহের ইতিহাসই স্বয়ং একথার সাক্ষী যে, একসময় যেসব মতবাদকে সত্য মনে করে সেগুলোর প্রতি ঈমান আনা হয়েছিল পরবর্তী সময় সেসব মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে এবং মানুষ সেগুলোর পরিবর্তে অন্য কিছুকে সত্য মনে করতে শুরু করেছে। এমন স্থিতিহীন অনুমান ভিত্তিক মতসমূহকে আমরা এ মর্যাদা দিতে পারিনা যে, কুরআনের বক্তব্যের সাথে তার প্রথম সংঘর্ষ হওয়া মাত্রই কুরআনকে ছেড়ে তার উপর ঈমান আনবো। আমাদের ঈমান দুর্বল হলে শুধু তখনই হতে পারে যখন পরীক্ষা পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত কোনো সত্য কুরআনের বক্তব্যকে মিথ্যা প্রমাণিত করে। কিন্তু যেমন আগেই বলেছি, এমন কোনো জিনিস আজ পর্যন্ত আমি জানতে পারিনি।

এবার পৃথক পৃথক ভাবে আপনার পেশকৃত উদাহরণসমূহ সম্পর্কে কিছু বলছি ঃ

ক. ডারউইনের ক্রমবিকাশের মতবাদটি (Theory) এখন পর্যন্ত মতবাদই মাত্র, প্রমাণিত সত্যে পরিণত হয়নি। যে আলীগড় থেকে আপনি এ পত্র লিখেছেন, তা জ্ঞান বিজ্ঞানের একটা কেন্দ্র। সেখানে এ মতবাদের প্রতি বিশ্বাসী বিরাটসংখ্যক লোক আপনি দেখতে পাবেন। আপনি স্বয়ং তাদের জিজ্ঞেস করুন যে, এটা কি মতবাদ (Theory) মাত্র, না বাস্তব ঘটনা (Fact)। যদি তাদের কোনো একজনও এটাকে প্রকৃত ঘটনা বলে গণ্য করে থাকে, তাহলে মেহেরবানী করে তার নামটা আমাকে লিখে জানাবেন।

খ. আলীগড়ে জ্যোতিষশাস্ত্র (Astronomy) জানা লোকও নেহায়েত কম নয়। মেহেরবানী করে তাদের জিজ্ঞেস করে দেখুন, সত্যিই কি সূর্য স্থির? (এর সমর্থক), এমন লোক পাওয়া গেলে তার নামটাও গোটা শিক্ষিত জগতকে জানিয়ে দেয়া উচিত। আপনি সম্ভবত এখনো উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানকেই বিজ্ঞান মনে করে বসে আছেন। তখনকার বিজ্ঞানে তো সূর্য গতিশীল ছিলনা। আধুনিক বিজ্ঞানে সূর্য বেশ দ্রুত গতিশীল।

গ. কুরআন মজীদের এমন কোনো আয়াত আমার নযরে পড়েনি যাতে বলা হয়েছেঃ মেঘমালায় যে বিদ্যুতস্ফুরণ ও গর্জন হয় তা ঘর্ষণের ফলে নয় বরং ফেরেশতাদের চাবুক মারার ফলে সৃষ্টি হয়। এমনটি কুরআন মজীদে কোথাও বলা হয়নি। বরঞ্চ কুরআন মজীদে বৃষ্টি বর্ষণের যে পদ্ধতি (Process) বর্ণনা করা হয়েছে তা বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার সংগে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল। আর এ গবেষণা এতো সাম্প্রতিক ও আধুনিক (up to date) যে, বিগত শতাব্দীর মাঝামাঝি নাগাদ মানুষ বৃষ্টি সম্পর্কে যতোটুকু জ্ঞান লাভ করেছিল তার ভিত্তিতে

কিছু লোক বৃষ্টি বর্ষণের পদ্ধতি সংক্রান্ত এ আয়াতগুলোর তাফসীর নিয়ে খুবই অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিল।

ঘ. তথাকথিত কানা দাজ্জাল প্রভৃতি তো অলীক কাহিনী মাত্র। এসব কাহিনীর কোনো শরয়ী মর্যাদা নেই। আর এসব জিনিস অনুসন্ধানের কোনো প্রয়োজনও আমাদের নেই। সাধারণ লোকদের মধ্যে এ রকম যেসব কথা সুবিদিত হয়ে আসছে তার কোনো দায়দায়িত্ব ইসলামের নেই। আর এগুলোর মধ্যে কোনো কিছু ভুল প্রমাণিত হলেও ইসলামের কোনো ক্ষতি নেই। তরজমানুল কুরআন ঃ রমযান-শাওয়াল ১৩৬৪ হিঃ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৫ ইং।

দাজ্জাল সংক্রান্ত হাদীসের বিশ্লেষণ

প্রশ্ন ঃ জনৈক ভদ্র লোক 'তরজমানুল কুরআনে' প্রশ্ন করেছিলেনঃ "কানা দাজ্জাল সম্পর্কে একথাই সুবিদিত রয়েছে যে, সে কোথাও বন্দী হয়ে আছে। তবে সেটা কোন্ জায়গা? মানুষ আজ তো বিশ্বের প্রতিটি কোণ খুঁজে বের করেছে। তারপরও কেন 'কানা দাজ্জাল' আবিষ্কৃত হয়নি?" এর জবাবে আপনি বলেছেনঃ তথাকথিত কানা দাজ্জাল প্রভৃতি তো কল্প কাহিনী মাত্র। এসব কাহিনীর কোনো শরয়ী ভিত্তি নেই।" কিন্তু আমি যতোদূর জানি, অন্তত ত্রিশটি হাদীসে দাজ্জালের উল্লেখ রয়েছে, যার সত্যতা প্রমাণের জন্যে বুখারী, মুসলিম, আবুদাউদ, তিরমিযী, শরহে সুন্নাহ ও বায়হাকী প্রভৃতি গ্রন্থাবলী দেখা যেতে পারে। এরপর আপনার জবাবের যৌক্তিকতা কোন্ সনদের উপর প্রতিষ্ঠিত?

জবাব ঃ 'দাজ্জাল কোথাও বন্দী হয়ে আছে' এ ধারণাকে আমি কল্প কাহিনী বলে আখ্যায়িত করেছি।

বাকী থাকলো এ কথা যে, এক বিরাট ফিতনা সৃষ্টি কারী (দাজজাল) আবির্ভূত হবে। এ সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে, তার সত্যতা আমি অবশ্যই স্বীকার করি এবং নামাযে সদা সর্বদা সে দোয়ায়ে মাসূরাটি পড়ি যাতে অন্যান্য জিনিস থেকে আশ্রয় চাওয়ার সাথে সাথে এ বাক্যটিও রয়েছে ঃ

وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ۔

"আর মসীহে দাজ্জালের ফেতনা থেকেও আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই।"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দাজ্জাল সম্পর্কে যতগুলো হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সামগ্রিকভাবে সেগুলোর বিষয় বস্তুর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে

একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে যে জ্ঞান লাভ করা গেছে তা কেবল এতটুকই ছিলো যে, এক বিরাট দাজ্জাল আবির্ভূত হবে এবং তার চিহ্ন ও বৈশিষ্ট্য হবে এরূপ এরূপ। কিন্তু সে কবে কোথায় আবির্ভূত হবে একথা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলে দেয়া হয়নি। তার জন্ম কি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেই হয়েছিল না বহু যুগ পরে তার জন্ম হবে, একথাও তাঁকে বলে দেয়া হয়নি।

এসব বিষয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যেসব কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, প্রকৃত পক্ষে সেগুলো ছিল তাঁর কিয়াস অনুমান। এসব বিষয়ে তিনি নিজেই সন্দিগ্ধ ছিলেন। তাই তিনি কখনো এ ধারণা ব্যক্ত করেন যে, দাজ্জাল খোরাসান থেকে আবির্ভূত হবে। কখনো বলেছেন ইসপাহান থেকে, কখনো বলেছেন সিরিয়া এবং ইরাকের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে। আবার কখনো মদীনায় সম্ভবত দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় হিজরীতে জন্মলাভকারী ইবনে সাইয়াদ নামের এক ইয়াহুদী সন্তানকে তিনি দাজ্জাল বলে সন্দেহ করেছেন। এ সম্পর্কে সর্বশেষ হাদীসটি হচ্ছেঃ নবম হিজরীতে যখন তামীম দারী নামক একজন ফিলিস্তিনী খৃষ্টান পাদ্রী এসে ইসলাম কবুল করলেন।

তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কাহিনী শুনালেনঃ "এক সমুদ্র সফরে (সম্ভবত ভূমধ্যসাগর বা আরব সাগরে) তিনি একটি জনমানবহীন দ্বীপে গিয়ে পৌঁছেন। সেখানে এক অদ্ভুত ব্যক্তির সংগে তাঁর সাক্ষাত হয়। আর সে ব্যক্তি তাঁকে (তামীম দারীকে) বলে যে, সে-ই দাজ্জাল।" নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাঁর এ বিবরণকেও ভ্রান্ত বলে আখ্যায়িত করার প্রয়োজন মনে করেননি। অবশ্য তিনি এতে সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন যে, এ বিবরণ থেকে বুঝা যায়, সে আরব সাগর কিংবা ভূমধ্যসাগরে রয়েছে। কিন্তু আমার ধারণা সে প্রাচ্য থেকে আবির্ভূত হবে।

এ বিষয়ে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্দেহ সূচক কথাবার্তা থেকে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়। একটি হলোঃ এসব কথা তিনি অহীর ভিত্তিতে বলেননি বরঞ্চ ধারণা ও অনুমানের ভিত্তিতে বলেছেন। আর তাঁর অনুমানের ব্যাপারে কথা হচ্ছে এই যে, তা কোথাও সঠিক প্রমাণিত না হলে তাতে তাঁর নবুওয়াতের প্রতি কোনো দোষ আরোপিত হয়না। অথবা তাঁর অনুমান ভিত্তিক কথার প্রতি ঈমান আনার জন্যে আমাদের উপর কোনো দায়িত্বও দেয়া হয়নি। অতঃপর অনুমানের ভিত্তিতে তিনি যেসব কথা বলেছিলেন পরবর্তী ঘটনাবলী দ্বারা তা প্রমাণিত হয়নি, তখন এগুলোকে অযথা আকায়েদের অংগীভূত রাখার ব্যাপারে জিদ করার কি কারণ থাকতে পারে?

ইবনে সাইয়াদের ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্দেহ হয়েছিল যে, হয়তো সে-ই দাজ্জাল হবে। হযরত উমর তো কসম খেয়ে বলেছিলেন সে-ই দাজ্জাল।। কিন্তু পরবর্তী কালে সে মুসলমান হয়ে যায়, হারামাইনে জীবন যাপন করে, মুসলমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে এবং মুসলমানগণ তার নামাযে জানাযা পড়েন। এর পরও আজ পর্যন্ত ইবনে সাইয়াদকে দাজ্জাল সন্দেহ করার অবকাশ কেমন করে থাকে? তামীম দারীর বর্ণনাকে তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকটা সঠিক মনে করেছিলেন। কিন্তু এরপর সাড়ে তের শ' বছর অতিবাহিত হওয়া এবং তামীম দারী দ্বীপে যাকে বন্দী দেখে এসেছিলেন তার প্রকাশ না হওয়া একথা প্রমাণের জন্যে কি যথেষ্ট নয় যে, সে স্বয়ং দাজ্জাল হওয়ার যে কথা তামীম দারীকে বলেছিল তা সঠিক নয়? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ আশংকা ছিলো যে, দাজজাল হয়তো তাঁর জীবদ্দশায়ই আবির্ভূত হয়ে যাবে, কিংবা তাঁর ইন্তেকালের পর অদূর ভবিষ্যতেই সে আবির্ভূত হবে। কিন্তু বিগত সাড়ে তের শ' বছরের ইতিহাস কি এটা প্রমাণ করেনি যে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে আশংকা সঠিক ছিলনা?

অতএব, এসব বিষয়কে ইসলামী আকীদার অন্তর্ভুক্ত বলে বর্ণনা করাতে না ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব বলা যায় আর না এটাকে হাদীসের যথার্থ বিশ্লেষণ বলা যেতে পারে। আমি আগেও বলেছি, আবারও বলছি, এসব বিষয়ে নবীর কিয়াস ও অনুমান যথার্থ না হলেও তাতে তাঁর নবুওয়াতের কোনো প্রকার মর্যাদাহানি ঘটেনা। এতে না নবীর নিষ্পাপ হবার আকীদাহ বিশ্বাসে কোনো বিঘ্ন ঘটে আর না এসব বিষয়ের প্রতি ঈমান আনতে শরীয়ত আমাদের বাধ্য করেছে। খেজুর গাছ সংক্রান্ত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই এ নীতিগত সত্যকে সুস্পষ্ট করে বলে গেছেন। তরজমানুল কুরআন ঃ রবীউল আওয়াল ১৩৬৫ হিঃ, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ ইং।

দায়িত্ব ফাঁকি দেয়ার জন্যে হাদীসের ওসীলা

প্রশ্ন ঃ আমি আমার কোনো কোনো আত্মীয় এবং মুরুব্বীকে ফরীযায়ে ইকামতে দ্বীনের গুরুত্ব বুঝানোর চেষ্টা করছি। এ প্রসংগে এমন এক আত্মীয়ের সংগে আমার মত বিনিময় হয় যিনি পরিভাষাগত ইল্‌মও রাখেন। ফরীযায়ে ইকামতে দ্বীনের গুরুত্বও অস্বীকার করেননা। কিন্তু কর্তব্য কাজে নেমে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পরিবর্তে মূর্খ জাহিল লোকদের মতো ওযর আপত্তি পেশ করেন। তাঁর সম্মুখে রয়েছে নিম্নোক্ত হাদীসটি ঃ

"যখন দেখবে লোকেরা আত্মার সংকীর্ণতার দাসত্ব করছে, খেয়াল খুশী বা খাহেশাতে নফসানীর পিছু ছুটছে এবং প্রত্যেকই আত্মম্ভরিতায় নিমজ্জিত হয়েছে, তখন তোমার কর্তব্য হবে স্বীয় মুক্তির চিন্তা করা।"

এ হাদীসকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে তিনি নিজেকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব থেকে মুক্ত মনে করছেন। এটাকে তিনি এমন বিরাট এবং মজবুত দলিল মনে করেন যে, এর মোকাবিলায় তাঁর নিকট গোটা কুরআন এবং সমগ্র হাদীস ভাণ্ডারের দলীল প্রমাণও নিতান্তই গুরুত্বহীন। যেমন, আমি তাঁর দলিলের মোকাবিলায় ঃ

১. "মান রা আ মিনকুম মুনকিরান

২. "লাতা' খুযান্না ইয়াদাল মাস্ইয়ে

৩. "মান আহ্ ইয়া সুন্নাতী ...."

প্রভৃতি হাদীস এবং "কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাত লিন্নাসি...."

"ওয়ালতাকুম্ মিনকুম উম্মাতুঁই ইয়াদউনা ইলাল খাইর '' প্রভৃতি কুরআনের আয়াত পেশ করে তাঁকে আশ্বস্ত ও আস্থাশীল করার চেষ্টা করি। তাঁকে বলিঃ উক্ত হাদীসটির মর্ম এই নয় যে, আপনি দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব পালন থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। যাঁরাই 'আমর বিল মা'রূফ' এবং 'নাহি আনিল মুনকারের' কাজ করেছেন তাঁদের সকলের ইতিহাস একথার সাক্ষ্য যে, তাঁদের সকলের যামানায়ই নফসের সংকীর্ণতার দাসত্ব এবং খাহেশাতে নফসানীর অনুবর্তন কার্যকর ছিল। কিন্তু তাঁরা নিরাশ হননি। নিরাশ হওয়াকে তাঁরা গুনাহ মনে করতেন। তাঁরা চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। তবে কি (নাউযুবিল্লাহ্) তাঁরা ভুল করেছিলেন?

আমি এখন আপনার নিকট থেকে উক্ত হাদীসটির প্রকৃত তাৎপর্য জানতে চাই।

জবাব ঃ গোটা জাতির মধ্যে কিংবা সমগ্র বিশ্বে এখন শুধু মনের সংকীর্ণতার দাসত্ব এবং খাহেশাতে নফসানীর অনুবর্তন অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নেই, এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে অবশ্যি পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং গবেষণা অনুসন্ধানের প্রয়োজন। নিজের খেয়াল খুশী মতো কেউ এরূপ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে পারে না।

কোনো ব্যক্তি যদি মানুষকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেয় এবং দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ যথাযথভাবে পালন করার পর পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে একথা প্রমাণ হয় যে, কোনো ব্যক্তিই নফসের দাসত্ব পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নয় এবং বাতিলের পূজায় সকলেই অনড় অবিচল, তখনই উক্ত হাদীসের

বক্তব্য অনুযায়ী মানুষকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিয়ে কেবল স্বীয় মুক্তির চিন্তা করা বৈধ হতে পারে।

কিন্তু বাস্তব ময়দানে কোনো প্রকার চেষ্টা সংগ্রাম ছাড়াই মনে মনে একথা ধরে নেয়া যে, দাওয়াত ও তাবলীগ এবং উপদেশ নসীহত দ্বারা কোনো ফায়দা হবেনা, কর্তব্য পালন থেকে দূরে থাকার বাহানা ছাড়া আর কিছুই নয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এর দায় দায়িত্ব ন্যস্ত করা নিঃসন্দেহে চরম বেয়াদবী এবং সাংঘাতিক বাড়াবাড়ি। আজ যদি আমরা এ হাদীসকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করে সেই দায়িত্ব পালনের প্রচেষ্টা না চালাই, যা মুমিন হবার কারণে আমাদের উপর অর্পিত হয়েছে, তবে এতে দুনিয়াতে হয়তো আমরা নিজেদের সান্ত্বনা দিতে পারবো, কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ্র জিজ্ঞাসার জবাবে যদি আমরা আমাদের ওযর ও অক্ষমতার কারণ হিসেবে এ হাদীসটি পেশ করি এবং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তখন আমাদের মুখের উপর এর প্রতিবাদ করে বলেন যে, আমার বক্তব্য এটা ছিলনা এবং এই লোকগুলো আমার হাদীস থেকে ভ্রান্ত অর্থ বের করে শুধু দায়িত্ব এড়ানোর বাহানা খুঁজেছে, বলুনতো তখন আমাদের কাছে এর কোনো জবাব থাকবে কি?

প্রকৃত পক্ষে হাদীসটির অর্থ এইরূপ নয় যে, সামগ্রিকভাবে কোনো গোটা জনবসতি সম্পর্কে ধারণা করে নেয়া হবে, সেখানে মনের সংকীর্ণতার দাসত্ব এবং নফসের কামনা বাসনার অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই নেই। সুতরাং উপদেশ নসীহত দ্বারা সেখানে কোনো ফায়দা হবে না। বরঞ্চ হাদীসটির তাৎপর্য হলো এই যে, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অবস্থা যদি এরূপ হয় যার সামনে হকের দাওয়াত যথার্থভাবে পেশ করা হয়েছে, অতঃপর তার নীতি ও আচরণ থেকে জানা গেছে যে, সে নফসের কামনা বাসনার দাস হয়ে আছে, অতঃপর উপদেশ নসীহত দ্বারা যেন তার পিছে সময় নষ্ট করা না হয়। বস্তুতঃ কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে একথাই বলা হয়েছে ঃ

أَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ - এবং

فَذَكِّرْ اِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرٰى -

প্রশ্ন ঃ দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে বেশ ভালো জ্ঞান রাখেন এমন এক ব্যক্তি বক্তৃতা প্রসংগে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেন ঃ

"আমার পর ত্রিশ বৎসর খিলাফত চালু থাকবে। অতঃপর শুরু হবে বাদশাহী রাজতন্ত্র। অবশেষে ইমাম মাহদী আসবেন। তিনি এরূপ এরূপ গুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবেন। তিনি এসে খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন।"

এ হাদীসটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন ঃ ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের পূর্বে যারা খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্যে আন্দোলন করছে, তাদের একাজ মূলত ধোকা ও ষড়যন্ত্র ছাড়া কিছু নয়। কেবল স্বার্থ হাসিলের জন্যেই তারা আন্দোলনের নামে ধোকাবাজি করছে।

এই বক্তব্য সম্পর্কে মেহেরবানী করে আপনার মতামত জানাবেন।

জবাব ঃ হাদীস দ্বারা যারা এ ধরণের দলিল পেশ করে, আমার মনে হয় জ্ঞানের দিক থেকেও তারা বড়ই দুর্ভাগা। আর তাদের অন্তরে খোদার ভয় আছে বলেও মনে হয়না। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যতবাণীসমূহ সম্পর্কে যদি এভাবে দলিল প্রমাণ পেশ করা হতে থাকে, তবে তো মানুষ গুমরাহীর চরম সীমায় না পৌঁছে থাকতে পারেনা। যেমন ধরুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "শেষ পর্যন্ত মুসলমানরা ইয়াহুদী খৃষ্টানদের পদাংক অনুসরণ করবে। তারা যেখানে যেখানে পা ফেলেছে, এরাও সেখানে সেখানে পা ফেলবে। এমন কি তাদের কেউ যদি নিজ মায়ের সাথে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে থাকে, তবে মুসলমানদের মধ্যেও এমন দূরাচার ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটবে যে তদ্রুপ অপকর্মে লিপ্ত হবে।"

এখন কোনো ব্যক্তি যদি এ হাদীসটিকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের অনুকরণ করতে শুরু করে এবং বলে যে, 'স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই এরূপ বলে গেছেন। সুতরাং তাঁর হাদীসতো অবশ্যি আমাদের উপর সত্য প্রমাণিত হতে হবে।' তাহলে বলুনতো এমন ব্যক্তি জাহেল, গোমরাহ ও খোদার ভয়হীন হবার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ থাকতে পারে কি? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যতের দূরবস্থা সম্পর্কে যতোগুলো ভবিষ্যত বাণীই করেছেন, সেগুলোর উদ্দেশ্য এ ছিলনা যে, লোকেরা সেইসব অবস্থাকে মেনে দিয়ে সংস্কার সংশোধনের প্রচেষ্টা পরিত্যাগ করবে। বরঞ্চ তাঁর বক্তব্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য এই ছিল যে, এতে লোকেরা পূর্ব থেকেই সাবধান ও সতর্ক থাকবে এবং সংশোধনের চিন্তা করবে।

প্রশ্ন ঃ আপনি ফেরকা সৃষ্টির বিরোধিতা করেন। কিন্তু একটি হাদীস থেকেই তো এর সূত্রপাত হয়েছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ অচিরেই আমার উম্মত বাহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে পড়বে। এদের মধ্যে একটি মাত্র ফেরকা মুক্তি পাবে। এরা হবে তারা যারা আমার এবং আমার আসহাবের অনুসরণ করবে। শীয়াগণ তো আরো অগ্রসর হয়ে 'আসহাবের' স্থলে 'আহলে বাইত' শব্দ ব্যবহার করেন। এখন চিন্তা করুন, মুসলমানদের যতোগুলো

ফেরকা আছে, প্রত্যেকটিই নিজেকে 'নাজী' বা 'মুক্তি প্রাপ্ত' দল বলে মনে করে এবং অপরাপর ফেরকাগুলোকে মনে করে গোমরাহ। এমতাবস্থায় কি করে তাদের সকলকে একই মঞ্চে একত্র করা যেতে পারে? এমনটি যখন সম্ভবই নয়, তখন একথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, এ হাদীসটি গায়রুল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব বলবত থাকার গ্যারান্টি। একারণেই অনেক লোক ফেরকা মেটানোর পরিপন্থী। কেননা তাহলে নবীর হাদীস মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে।

জবাব ঃ আপনি যে ধরণের প্রশ্ন করেছেন, তা নিয়ে একটু চিন্তা করলে আপনি নিজের থেকেই তার জবাব পেয়ে যেতে পারতেন। রাসূলে খোদার হাদীসে মুসলমানদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য ছিলো ঈমানদারদেরকে এসব ফিতনা সম্পর্কে সতর্ক করা এবং সেগুলো থেকে দূরে থাকার তাকিদ করা। কিন্তু সেই ব্যক্তির মতো গোমরাহ আর কে হতে পারে যে হাদীসের ভবিষ্যতবাণীকে সত্যে পরিণত করার জন্যে নিজেকেই ফিতনা সৃষ্টিকারীতে পরিণত করা কিংবা নিজেকে ফিতনায় নিমজ্জিত করা জরুরী মনে করে। এর উদাহরণ হলো ঠিক এমন, যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছেঃ মানুষের মধ্যে অনেক মানুষই জাহান্নামে যাবে। তাহলে এখন কিছু লোক কি জেনে শুনে নিজেদেরকে জাহান্নামের উপযোগী বানাবে, যাতে কুরআনের এ সংবাদ তাদের দ্বারা সত্যে পরিণত হয়? তরজমানুল কুরআন ঃ রবীউস সানি ১৩৬৫ হিঃ, মার্চ ১৯৪৬ ইং।

ইমাম মাহ্‌দী ও তার প্রকৃত স্বরূপ

প্রশ্ন ঃ ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাবের ব্যাপারে আপনি ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন গ্রন্থে যাকিছু লিখেছেন তাতে মতপার্থক্যের অবকাশ আছে। প্রতিশ্রুত মাহ্‌দীর জন্যে আপনি কোনো বিশেষ নিদর্শনাবলী স্বীকার করেননা। অথচ হাদীসে স্পষ্টভাবে মাহ্‌দীর নিদর্শনাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। বলুন তো এ হাদীসগুলো কি করে উপেক্ষা করা যেতে পারে?

জবাব ঃ মাহ্‌দীর আবির্ভাব সম্পর্কে যেসব হাদীস রয়েছে, হাদীস বিশ্লেষকগণ সেগুলোর এতো বেশী সমালোচনা করেছেন যে, তাদের একদল ইমাম মাহ্‌দীর আগমনকেই স্বীকার করেননা। বর্ণনাকারীদের জীবন চরিত বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায়, এসব হাদীসের অধিকাংশ বর্ণনাকারী শীয়া। ইতিহাস থেকে একথাও জানা যায় যে, প্রত্যেক ধর্মীয় দলের লোকরাই রাজনৈতিক ও ধর্মীয় স্বার্থ হাসিলের জন্যে এসব হাদীস ব্যবহার করেছে এবং নিজেদের কোনো ব্যক্তির প্রতি

এসব নিদর্শন আরোপ করার চেষ্টা করেছে। এসব কারণে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, মাহদীর আবির্ভাব সংবাদ পর্যন্ত এসব হাদীসের বক্তব্য সঠিক। কিন্তু মাহদীর নিদর্শনাবলী সংক্রান্ত যে ব্যাপক বিস্তারিত আলোচনা দেখা যায় তার অধিকাংশ বর্ণনাই সম্ভবত মনগড়া এবং স্বার্থবাদী লোকেরা হয়তো পরবর্তীকালে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে নবী পাকের মূল বক্তব্যের ওপর এগুলো বাড়িয়ে নিয়েছে। বিভিন্ন যুগে যেসব লোক প্রতিশ্রুত মাহদী হবার দাবী করেছিল তাদের গ্রন্থাবলীতেও দেখতে পাবেন, তাদের যাবতীয় ফেতনাবাজীতে এসব বর্ণনাই রস সিঞ্চন করেছে।

নবী পাকের ভবিষ্যত বাণীসমূহ সম্পর্কে আমি যতোটা চিন্তা গবেষণা করেছি, তা থেকে বুঝতে পেরেছি, ভবিষ্যতে সংঘটিতব্য কোনো জিনিসের পরিচয় ও নিদর্শনাবলী সম্পর্কে এতোটা বিস্তারিত ও সুস্পষ্ট বর্ণনার পন্থা তিনি অবলম্বন করেননি, যেমনটি পাওয়া যায় মাহদী সংক্রান্ত হাদীসসমূহে। তিনি মৌলিক ও বড় বড় নিদর্শনাবলীর কথা অবশ্যি বর্ণনা করে দিতেন, কিন্তু খুঁটিনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করা তাঁর নীতি ছিলনা।

প্রশ্ন ঃ "ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলন" বইতে মাহদীর আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেয়া হয়েছে বটে, কিন্তু মাহদীর কার্যাবলী কি হবে সে বিষয়ে কোনো উদ্ধৃতির সাহায্য না নিয়ে কেবল নিজ ভাষায় বলার চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয়টি হাদীসের আলোকে আলোচনা করাটাই সমীচিন ছিলো। তাছাড়া প্রতিশ্রুত মাহদীর মরতবা, বৈশিষ্ট্য এবং আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কেও কোনো কিছু আলোচনা না করে তাঁকে সাধারণ মুজাদ্দিদের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। যদিও পূর্ণাংগ মুজাদ্দিদ এবং অপূর্ণাংগ মুজাদ্দিদের শ্রেণী বিভাগ থেকে একথা বুঝা যায় যে, এখানে "মুজাদ্দিদ শব্দটি আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, পারিভাষিক অর্থে নয়। তা সত্ত্বেও সাধারণ মুজাদ্দিদগণ যেহেতু নিষ্পাপ (মাসূম আনিল খাতা) হননা, অথচ প্রতিশ্রুত মাহদীর নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক, সেহেতু এই সুস্পষ্ট পার্থক্য বর্তমান থাকা অবস্থায় প্রতিশ্রুত মাহদীকে কি করে সাধারণ মুজাদ্দিদদের পর্যায়ে গণ্য করা যেতে পারে?

জবাব ঃ প্রথমত হাদীসে ব্যবহৃত "মাহদী" শব্দটি নিয়েই চিন্তা করুন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "মাহদী" শব্দ ব্যবহার করেছেন, 'হাদী' শব্দ ব্যবহার করেননি। 'মাহদী' মানে 'হেদায়েত প্রাপ্ত'। সত্য পথের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেক সরদার, নেতা এবং আমীরই 'মাহদী' হতে পারেন। 'আল মাহদী' শব্দটি বিশেষত্ব প্রকাশের জন্যে ব্যবহার করা হয়ে থাকবে, যদ্বারা সেই

মাহদীর বিশেষ কোনো মর্যাদা প্রকাশ করাই উদ্দেশ্য। আর সেই বিশেষ মর্যাদার কথা হাদীসে এভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, 'নবুওয়াতী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত খিলাফতের ধ্বংস এবং পৃথিবী যুলুম অত্যাচারে ভরপুর হয়ে যাবার পর সেই মাহদী পুনরায় নবুওয়াতী আদর্শের উপর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করবেন এবং পৃথিবীকেও ইনসাফ দ্বারা পরিপূর্ণ করে দেবেন।' তাঁর এ বিশেষত্বটার জন্যেই 'মাহদীর' সংগে 'আল' শব্দ জুড়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু একথা মনে করা সম্পূর্ণ ভুল যে 'মাহদী' দ্বীন ইসলামের মধ্যে কোনো এমন পদমর্যাদার নাম, যে পদমর্যাদার প্রতি ঈমান আনা এবং তার পরিচয় লাভ করা সে রকম আবশ্যকীয়, যেমনটি ঈমান, ইসলাম এবং পরকালের মুক্তিলাভের জন্যে আম্বিয়ায়ে কিরামের প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁদের আনুগত্য করা আবশ্যকীয় শর্ত। তাছাড়া 'মাহদী' নিষ্পাপ ইমাম হবেন এমন ধারণার পিছনে হাদীসে কোনো দলিল প্রমাণ নেই। প্রকৃত পক্ষে আম্বিয়ায়ে কিরাম ছাড়া অন্য কারোর ব্যাপারে নিষ্পাপ হওয়ার ধারণা পোষণ করা নিরেট শিয়া ধারণা। এর পক্ষে সুন্নায় কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ নেই।

একথা ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার, যেসব জিনিসের উপর ইসলামের ভিত প্রতিষ্ঠিত এবং যেসব জিনিসের উপর মানুষের নাজাত নির্ভরশীল, সেগুলো বলে দেয়ার দায়িত্ব স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা গ্রহণ করেছেন এবং কুরআনে সেগুলো সব বলে দেয়া হয়েছে। আর কুরআনেও সেগুলো কোনো প্রকার ইশারা ইংগিতে বলা হয়নি, বলা হয়েছে পরিষ্কার, স্পষ্ট ও খোলাখুলি ভাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ـ

"পথ দেখিয়ে দেয়া নিঃসন্দেহে আমাদের দায়িত্ব।" (আল-লাইল ঃ ১২)

সুতরাং এ ধরণের যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি বিষয়ের প্রমাণ অবশ্যি কুরআন থেকে পেতে হবে। এমন কোনো দ্বীনি বিষয়ের ভিত্তি শুধুমাত্র হাদীসের উপর স্থাপন করা যেতে পারেনা, যাকে কুফর এবং ঈমানের ভিত্তি বলে আখ্যায়িত করা হবে। (অর্থাৎ যার গ্রহণ বর্জনের প্রশ্ন ঈমান ও কুফরের সাথে জড়িত)। হাদীসসমূহ কিছুসংখ্যক লোকের মাধ্যমে কিছুসংখ্যক লোকের নিকট এসে পৌঁছে। হাদীস দ্বারা কেবল বিশুদ্ধ ধারণা লাভ করাই সম্ভব, প্রকৃত জ্ঞান (ইলমুল ইয়াকীন) নয়। একথা পরিষ্কার, আল্লাহ তায়ালা কখনো তাঁর বান্দাদের এমন বিপদে নিক্ষেপ করতে পারেননা যে, যে সেমস্ত বিষয় ইসলামের মধ্যে এতোটা গুরুত্বপূর্ণ, যা দ্বারা কুফর ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়ে যায়, সেগুলো কেবল কিছুসংখ্যক মানুষের বর্ণনার উপর নির্ভরশীল করে দেবেন। এ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দাবীই হলো, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কিতাবে সেগুলো সুস্পষ্টভাবে বলে দেবেন। আল্লাহর রাসূল সেগুলোকে নিজ নবুয়্যতী মিশনের আসল কাজ মনে করে সেগুলো সর্ব সাধারণ্যে প্রচার করবেন এবং বিলকুল

সন্দেহহীন পন্থায় প্রতিটি মুসলমানের নিকট তিনি সেগুলো পৌঁছিয়েও দিয়ে গেছেন।

এখন 'মাহদীর' ব্যাপারে যতোই টানা হেঁচড়া করা হোকনা কেন, একথা সকলেই দেখে নিতে পারে, ইসলামে তাঁর মর্যাদা এরূপ নয় যে, তাঁকে জানা এবং মানার উপর কোনো ব্যক্তির মুসলমান হওয়া এবং নাজাত পাওয়া নির্ভর করে। এরূপ মর্যাদার অধিকারী যদি কেউ হতোই, তাহলে তা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হতো। আর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁর বিষয়ে কেবল দু'চার ব্যক্তির সংগে আলোচনা করার উপর নির্ভর করতেননা, বরঞ্চ গোটা উম্মতের নিকট তার সংবাদ পৌঁছে দেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করতেন এবং এ সংবাদ পৌঁছানোর ব্যাপারে সে পর্যায়ের প্রচেষ্টাই চালাতেন। যেমনটি করেছেন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের ব্যাপারে। মূলতঃ যে ব্যক্তি দ্বীনি ইলমের ক্ষেত্রে সামান্য পাণ্ডিত্যও রাখেন, তিনি মুহূর্তের জন্যেও একথা স্বীকার করে নিতে পারেননা যে, এমন গুরুত্বপূর্ণ দ্বীনি বিষয় শুধুমাত্র খবরে ওয়াহেদের উপরে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে। তাও আবার এতোটা নিম্নমানের 'খবরে ওয়াহেদ' যেগুলোকে ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম বুখারী এবং ইমাম মুসলিমের মতো মুহাদ্দিসগণ তাদের হাদীস সংকলনসমূহে স্থান দেয়াটাই পছন্দ করেননি। তরজমানুল কুরআন ঃ মার্চ-জুন ১৯৪৫ ইং।

ইমাম মাহদী প্রসংগ

প্রশ্ন ঃ কতিপয় দ্বীনদার ও আন্তরিকতাসম্পন্ন ব্যক্তি 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' পুস্তকে আপনার ইমাম মাহদী সম্পর্কিত বর্ণনাবলীর বিরুদ্ধে হাদীসের আলোকে আপত্তি উত্থাপন করেছেন। তাদের আপত্তিসমূহ আপনার সম্মুখে পেশ করছি। একথা বলার পেছনে আমার এ অনুভূতি সক্রিয় রয়েছে যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াতের সমগ্র কাজে শরীয়তের আনুগত্য অপরিহার্য। কাজেই আপনার লেখনী প্রসূত প্রত্যেকটি জিনিস শরীয়ত মোতাবিক হতে হবে। আর যদি কখনো আপনার লেখনী ত্রুটিপূর্ণ মত ব্যক্ত করে তাহলে তা শুধরে নেবার ব্যাপারে যেন কোনো প্রকার ইতস্ততঃ ভাব না থাকে।

১. ইমাম মাহদী সম্পর্কে আপনি উক্ত বইয়ের ৩১ হতে ৩৩ পৃষ্ঠা পর্যন্ত যা লিখেছেন, তা আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী হাদীস বিরোধী। এ প্রসঙ্গে আমি তিরমিযি ও আবুদাউদের সমস্ত হাদীস অধ্যয়ন করেছি। তা থেকে জানা যায়, কোনো কোনো হাদীসের বর্ণনাকারী অবশ্যি খারেজী অথবা শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত কিন্তু আবুদাউদ ও তিরমিযিতে এমন হাদীস অবশ্যি আছে যার বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী। তারা আপনার মতের সত্যতা প্রমাণ করে না বরং তার প্রতিবাদ করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আবুদাউদের হাদীসটি দেখুন ঃ

حدثنا محمد بن المثنى..... عن ام سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قال يكون اختلاف عند موت خليفة فيخرج رجل من اهل المدينه هاربا الى مكة فياتيه ناس من اهل مكة فيخرجونه وهو كاره فيبايعونه بين الركن والمقام ـ (كتاب المهدى)

এ হাদীসটি থেকে নিয়ে শেষ হাদীসটি পর্যন্ত পড়ুন। দেখবেন সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। উপরন্তু বায়হকীর একটি বর্ণনা মিশকাতের কিতাবুল ফিতানে বর্ণিত হয়েছে ঃ

عن ثوبان قال إذَا رَأيتم الرأيات السود قد جاءت من قبل خراسان فاتوها فان فيها خليفة الله المهدى ـ

মাহদী তার মাহদী হওয়া সম্পর্কে অজ্ঞ থাকবে উপরোক্ত হাদীসগুলো আপনার একথার প্রতিবাদ করছে। বিশেষ করে এই কথাগুলো দেখুন ঃ

وجب على كل مؤمن نصره او قال اجابته.

তাছাড়া তিরমিযির একটি বর্ণনার একথাগুলো অনুধাবন করুন ঃ

قال فيجئ اليه الرجل فيقول يا مهدى اعطنى ! اعطنى ! قال فيحثى له فى ثوبه ما استطاع ان يحمله ـ

২. আপনি বলেছেন যে, মাহদী আধুনিক ধরনের নেতা হবেন।...... ইত্যাদি। আপনার এ দাবীর সপক্ষে কোনো হাদীস নেই। থাকলে লিখে জানাবেন। যারা আপনার মতের বিপরীত মত প্রকাশ করে, তাদের সপক্ষে বাস্তব প্রমাণ হলো এই যে, এতদিন পর্যন্ত যত মুজাদ্দিদ এসেছেন তাঁদের সবাই প্রধানতঃ সূফী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

৩. আপনার এ কথায় তিনি আধুনিক ধরনের নেতা হবেন, সন্দেহ পোষণ করা হচ্ছে যে, আপনি নিজেই ইমাম মাহদী হবার দাবী করবেন।

৪. "আলামতে কিয়ামত" পুস্তকে (লেখকঃ মাওলানা শাহ রফীউদ্দিন, অনুবাদকঃ মৌলবী নূর মুহাম্মদ) ইমাম মাহদী সম্পর্কে মুসলিম ও বুখারীর বরাত দিয়ে কতিপয় হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু অনুসন্ধান করার পর মুসলিম ও বুখারীতে আমি এমন কোনো হাদীস পাইনি। এ পুস্তকে উদ্ধৃত একটি হাদীসে বলা হয়েছে যে, মাহদীর হাতে বায়াত গ্রহণ করার সময় আকাশ থেকে আওয়ায আসবে ঃ

هذا خليفة الله المهدى فاستمعوا له واطيعوا ـ

এ হাদীসটি সম্পর্কে আপনার মত কি?

জবাব ঃ ১. ইমাম মাহদী সম্পর্কে যেসব হাদীস বিভিন্ন হাদীস পুস্তকে লিপিবদ্ধ হয়েছে সে সম্পর্কে ইতিপূর্বে আমি আমার গবেষণা ও অনুসন্ধানের সংক্ষিপ্তসার পেশ করেছি। যারা ইমাম মাহদী সম্পর্কে কোনো কথা স্বীকার করার জন্যে কেবল সে কথাটি হাদীসের কোনো কিতাবে উল্লেখিত থাকাকেই যথেষ্ট মনে করেন, অথবা অনুসন্ধানের হক আদায় করার জন্যে কেবল বর্ণনাকারীরা সত্যবাদী কিনা একথা জানাই যথেষ্ট মনে করেন, তাদের জন্যে সেই ধরনের বিশ্বাস রাখা বৈধ যা তাঁরা হাদীসে পেয়েছেন। কিন্তু যারা এ সমস্ত হাদীস একত্রিত করে তুলনামূলক অধ্যয়ন করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে বৈপরীত্যের সন্ধান পান; উপরন্তু যাদের সম্মুখে বনি ফাতেমা, বনি আব্বাস ও বনি উমাইয়ার মধ্যকার সংঘাতের পূর্ণ ইতিহাস আছে এবং তাঁরা পরিষ্কার দেখেন যে, এ সংঘাতে বিভিন্ন দলের সপক্ষে অসংখ্য হাদীস রয়েছে এবং বর্ণনাকারীদের মধ্যেও অধিকাংশ তারাই যাদের কোনো এক পক্ষের সাথে প্রকাশ্য সম্পর্ক ছিল, তাদের জন্যে এ হাদীসগুলোর সমগ্র বিস্তারিত অংশকে নির্ভুল মেনে নেওয়া কঠিন। আপনি নিজে যে হাদীসগুলো উল্লেখ করেছেন, তার মধ্যেও ابات السود অর্থাৎ "কালো ঝাণ্ডা" র উল্লেখ আছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, কালো ঝাণ্ডা ছিল বনি আব্বাসের ঐতিহ্য। উপরন্তু ইতিহাস থেকে এও জানা যায় যে, এ ধরনের হাদীস পেশ করে বাদশাহ মাহদী আব্বাসীকে প্রতিশ্রুত মাহদী প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছিল। এখন যদি কেউ এ বিষয়টি মেনে নেয়ার ওপর জোর দেন, তাহলে তিনি একে মেনে নিতে পারেন এবং "ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন" পুস্তকে আমি যে মত প্রকাশ করেছি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন।

প্রত্যেকটি ঐতিহাসিক, তত্বগত ও ফিক্‌হী বিষয়ে আমার কথাই সবার জন্যে স্বীকার্য হবে, এমন কোনো কথা নেই। এ সব বিষয়ে আমার কোন অনুসন্ধান কারুর জন্যে পসন্দনীয় না হলে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে প্রচেষ্টা চালানোর ব্যাপারেও আমার সাথে সহযোগিতা করা তার জন্যে হারাম হয়ে যাবে, একথা ঠিক নয়। হাদীস, তাফসীর, ফিক্‌হ প্রভৃতি শাস্ত্রে শাস্ত্রকারদের মধ্যে বিভিন্ন মতের উদ্ভব হওয়া আজকের কোনো নতুন কথা নয়।

২. প্রতিশ্রুত মাহদী আধুনিক ধরনের লীডার হবেন, আমার একথার অর্থ এ নয় যে, তিনি দাঁড়ি চেঁছে ফেলবেন, সুট কোট পরবেন এবং আপটুডেট ফ্যাসানে চলাফেরা করবেন। বরং এর অর্থ হলো, তিনি যে জামানায় পয়দা হবেন, সে জামানার জ্ঞানবিজ্ঞান, পরিবেশ পরিস্থিতি ও চাহিদা সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকেফহাল থাকবেন। সমকালীন যুগোপযোগী বাস্তব কর্মপন্থা গ্রহণ করবেন এবং সমকালীন বৈজ্ঞানিক গবেষণা অনুসন্ধানের মাধ্যমে আবিষ্কৃত যন্ত্রপাতি ও উপায় উপকরণ ব্যবহার করবেন। এটি একটি অকাট্য যুক্তিপূর্ণ কথা। এর জন্যে কোনো হাদীসের প্রয়োজন নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তার যুগে পরিখা, কাঠের কামান (Battering Ram) , প্রস্তর নিক্ষেপণ যন্ত্র প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকতে পারেন, তাহলে আগামী কোনো যুগে যে ব্যক্তি নবী করীমের স্থলাভিষিক্তের দায়িত্ব পালনে অগ্রসর হবেন তিনি অবশ্যি ট্যাংক, এরোপ্লেন, জ্ঞানবিজ্ঞান ও সমকালীন অবস্থা ও বিষয়াবলী থেকে অসম্পর্কিত হয়ে কাজ করতে পারবেননা। শক্তি ক্ষমতার আধুনিকতম উপায় উপকরণ লাভ করা এবং নিজের প্রভাব বিস্তৃত করার জন্যে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান, শিল্প ও কর্মপদ্ধতি ব্যবহার করাই হলো কোনো দলের উদ্দেশ্য সাধন ও কোনো আন্দোলনের বিজয় লাভের স্বাভাবিক পথ।

৩. এই যে কথাটি বললেন "এথেকে সন্দেহ করা হচ্ছে, তুমি নিজেই ইমাম মাহদী হবার দাবী করবে" এর জবাবে আমি এছাড়া আর কিছুই বলতে পারিনা যে, এ ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করা এমন কোনো ব্যক্তির কাজ হতে পারেনা, যে খোদাকে ভয় করে, খোদার সম্মুখে নিজের দায়িত্বের অনুভূতি রাখে এবং খোদার এ নির্দেশও স্মরণ রাখে যে ঃ

اِجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ -

"অধিকাংশ সন্দেহ থেকে দূরে থাকো, অবশ্যি অনেক সন্দেহ গোনাহর শামিল।" যারা এ ধরনের সন্দেহ প্রকাশ করে আল্লাহর বান্দাদেরকে জামায়াতে ইসলামীর সত্য দাওয়াত থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন, আমি

তাদেরকে এমন এক ভয়াবহ শাস্তি দিতে মনস্থ করেছি, যা থেকে তারা কোনক্রমেই রেহাই পাবেনা। আর সে শাস্তি হলো এই যে, ইন্‌শা আল্লাহ আমি সবরকমের দাবী থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে খোদার সম্মুখে পৌছে যাবো। অতঃপর এই লোকেরা খোদার সম্মুখে এদের সন্দেহসমূহ এবং সেগুলো প্রচার করে মানুষকে হকের পথে বাধা দেবার সপক্ষে কি সাফাই পেশ করেন, তা আমি দেখবো।

৪. 'আলামতে কিয়ামত' কিতাবে যে হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি ইতিবাচক বা নেতিবাচক কিছুই বলতে পারিনা। যদি তা নির্ভুল হয় এবং সত্যি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি এমন খবর দিয়ে থাকেন যে, মাহদীর হাতে বায়েত গ্রহণের সময় আকাশ থেকে আওয়াজ আসবেঃ

هذا خليفة الله المهدى فاستمعوا له واطيعوا -

'ইনিই আল্লাহর খলিফা মাহদী, এঁর কথা শুনো ও এঁর আনুগত্য করো। তাহলে 'ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন' পুস্তকে আমি এ সম্পর্কে যে রায় পেশ করেছি, তা ভুল। কিন্তু আমি আশা করিনা যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন কথা বলবেন। কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করে জানা যায় যে, কোনো নবীর আগমনেও আকাশ থেকে এ ধরনের আওয়াজ আসেনি। শেষ নবী হযরত মুহাম্ম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর ঈমান ও কুফরীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করার দ্বিতীয় কোনো সময় আসবেনা, তবুও তাঁর আগমনে আকাশ থেকে এমন কোনো আওয়াজ শুনা যায়নি। মক্কার মুশরিকরা দাবী করতে থাকে যে, আপনার সাথে কোন ফেরেশতা থাকতে হবে, তিনিই আমাদের জানাবেন যে, ইনি আল্লাহর নবী। অথবা এমন কোনো সুস্পষ্ট নিশানী থাকতে হবে, যা থেকে দ্ব্যর্থহীন ভাবে আপনার নবী হবার বিষয় জানা যাবে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তাদের এ সকল দাবী প্রত্যাখ্যান করেন এবং এগুলো গ্রহণ না করার কারণসমূহ কুরআনের বিভিন্ন স্থানে বর্ণনা করেছেন যে, সত্যকে পূর্ণরূপে আবরণ মুক্ত করা, যার ফলে যুক্তি ও বুদ্ধিগত পরীক্ষার অবকাশ না থাকে, এমন পদ্ধতি খোদার হিকমতের পরিপন্থী। এখন একথা কেমন করে মেনে নেয়া যেতে পারে যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁর এই নিয়ম একমাত্র ইমাম মাহদীর ব্যাপারে পরিবর্তন করবেন এবং তাঁর বায়াতের সময় আকাশ থেকে আওয়াজ দেবেন যে, "ইনিই খোদার খলিফা মাহদী, এর কথা শুনো, এঁর আনুগত্য কর।" তরজমানুল কুরআন ঃ রজব ১৩৬৫ হিঃ, জুন ১৯৪৬ ইং।

খিলাফতের জন্যে কুরায়শী হবার শর্ত

প্রশ্ন ঃ ইসলাম সমগ্র দুনিয়ার নিকট এ আহ্বান জানায় যে, মানুষ হিসেবে সকল মানুষ সমান। কালোর উপর সাদার এবং আরবের উপর অনারবের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব ইসলামে নেই। ইসলামের পবিত্র গৃহে প্রবেশ করতেই সকল উঁচু নিচু সমান হয়ে যায়। তবে পার্থক্য থাকে কেবল

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ -

এর মূলনীতি অনুযায়ী। তাহলে ঐ হাদীসটির তাৎপর্য কি যার অর্থ বা কাছাকাছি অর্থ হচ্ছে, খিলাফত কুরায়েশদের হাতে থাকতে হবে? এটাই যদি সত্য হয় তবে হিটলারই বা কি অপরাধ করেছে? সেও তো কেবল নিজ জাতিকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির উপর শ্রেষ্ঠ ও নেতৃত্বের অধিকারী ঘোষণা করেছিল। যদি কোনো কুরায়শীর এ অধিকার থাকে যে, সে কুরায়েশকে কেবল অনারবদেরই নয় বরঞ্চ গোটা আরববাসীরও উপর শ্রেষ্ঠ মনে করবে। তবে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ অন্যান্য জাতিকে নিজেদের চাইতে নিম্নতর মনে করে কি অন্যায় করে? ইসলামের উপরোক্ত আহ্বানকে এ হাদীসটির সাথে কেমন করে সামঞ্জস্যশীল করা যেতে পারে?

জবাব ঃ অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, মানুষ কোনো বিশেষ অবস্থা ও পরিবেশে কোনো কথা বলে থাকে এবং তা তখনকার জন্যে খুবই যথার্থ হয়ে থাকে। কিন্তু সে কথাটিকেই যদি উক্ত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্যত্র উল্লেখ করা হয়, তখন তার রূপ পাল্টে যায় এবং অর্থ দাঁড়ায় অন্য কিছু, যা বক্তার উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনার উল্লেখকৃত হাদীসসূহের ব্যাপারেও এমনটিই ঘটেছে। এমন কি বহু সংখ্যক ইসলামী ফিকাহবিদও এ ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত হয়ে খিলাফতের জন্যে অন্যান্য শর্তাবলীর সাথে কোরায়শী হওয়াকেও একটি আইনগত শর্ত বলে ঘোষণা করেছেন। অথচ রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য ছিলো অন্য কিছু।

মূলত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষভাবে ইসলামের মূলনীতি সমূহের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতেন, অপরদিকে একজন সুক্ষদর্শী প্রজ্ঞাবান প্রশাসক হিসেবে সময় ও সমাজ পরিবেশের প্রতিও গভীর দৃষ্টি রাখতেন এবং এমন সব কার্যক্রম গ্রহণ থেকে বিরত থাকতেন যা নীতিগত ভাবে সঠিক হলেও বাস্তব অবস্থা ও পরিবেশ বিবেচনা না করেই তা কার্যকর করতে গেলে বিরাট বিপর্যয় সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে। তখনকার আরবের পরিবেশ অতি গভীরভাবে নিরীক্ষণ করে

তিনি যথার্থ ভাবেই একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, কুরায়েশ গোত্রের কর্মদক্ষ ব্যক্তিদের যোগ্যতা এবং দেশব্যাপী তাদের বহু শতাব্দীর প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে তারা এমন এক শক্তিশালী গোত্রে পরিণত হয়েছে যে, তাদের উপস্থিতিতে তিনি তাঁর পরে কোনো অকুরায়শী ব্যক্তিকে আমীর বানিয়ে গেলে তিনি সফল হতে পারবেননা। তিনি জনগণের মধ্যে ইসলামের যে গণতান্ত্রিক প্রাণশক্তি ফুঁকে দিয়েছিলেন তার ভিত্তিতে তাঁর পরে সেই প্রাণশক্তির প্রদর্শনীর জন্যে মুসলমানদের কোনো মুক্ত দাস কিংবা কোনো নগণ্য গোত্রের শেখকে খলীফা নির্বাচিত করে নেয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বাস্তবে তখন দেশের যে সমাজ কাঠামো বিদ্যমান ছিল তার ভিত্তিতে একাজটি খুবই ভুল হতো। একারণে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, কোনো কুরায়শীরই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হওয়া উচিত।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ ধারণা এতোই সঠিক ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর পর বহু শতাব্দীর ইতিহাস এর যথার্থতা প্রমাণ করতে থাকে। কুরায়েশ গোত্রে যোগ্য লোক সৃষ্টি হওয়ার অবস্থা এরূপ ছিল যে খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজন খলীফাই সে গোত্র যোগান দিয়েছিল। আর এটাতো জানা কথাই যে, বাস্তবে তখনকার আরবে ঐ চারজনের সমকক্ষ কোনো লোক ছিলনা। এ গোত্রই বিরাট উমাইয়া সালতানাতের প্রতিষ্ঠাতা। তারাই জন্ম দেয় আব্বাসী সাম্রাজ্যের। স্পেনে এক বিরাট শক্তিশালী রাষ্ট্র তারা প্রতিষ্ঠা করে। মিসরে ফাতেমী সাম্রাজ্যের ভিত্তি তারাই স্থাপন করে। এরূপ সুযোগ্য ও প্রভাবশালী গোত্রের বর্তমানে যদি বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থাকে উপেক্ষা করে কেবল তাত্ত্বিক রাজনীতির প্রদর্শনী করা হতো তবে এর পরিণতিতে খেলাফত ব্যর্থকাম হয়ে যেতো।

আসলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যাপারে যা কিছু বলেছিলেন তা কোনো আইনগত কথা ছিলোনা। সেটা এমন কোনো বিধান ছিলনা যে খলীফাকে অবশ্যি কুরায়শী হতে হবে এবং কোনো অকুরায়শীর খলীফা হবার অধিকারই নেই। বরঞ্চ তিনি যা কিছু বলেছিলেন তা ছিলো বাস্তব রাজনৈতিক পরিবেশের প্রেক্ষিতে একটি হিদায়াত মাত্র। সাথে সাথে তিনি এ ভবিষ্যত বাণীও করে গিয়েছিলেন যে, যতোদিন পর্যন্ত কুরায়েশরা তাদের নৈতিক চরিত্র উন্নত রাখবে, ততোদিন দ্বীনের ঝাণ্ডা তাদের হাতেই থাকবে এবং যতোদিন তাদের মধ্যে দু' জন যোগ্য লোকও পাওয়া যাবে, ততোদিন পর্যন্ত রাষ্ট্র ক্ষমতা তারাই লাভ করবে।

এ যাবত যা কিছু বললাম হাদীসের অনুসরণ করলে এর পূর্ণাংগ ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

মুসনাদে আহমদে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

قريش قادة الناس ـ

'কুরায়েশ আরববাসীর লিডার।' বায়হাকীতে হযরত আলীর বর্ণনা এ কথাটিকে আরো সুস্পষ্ট করে দিয়েছে। তাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কথাটি উল্লেখিত হয়েছে ঃ

كان هذا الامر فى حمير فنزعه الله منهم وجعله فى قريش ـ

"প্রথমে আরবের নেতৃত্ব ছিলো হিময়ারদের[১] হাতে। অতপর আল্লাহ তায়ালা তাদের থেকে ছিনিয়ে এনে তা কুরায়েশদের হাতে অর্পণ করেন।" অন্যান্য হাদীসে এ বিষয়ে আরো অধিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। যেমন ঃ

الناس تبع لقريش فى الخير والشر ـ

"ভালো হোক কি মন্দ, উভয় কাজে মানুষ কুরায়শের অনুসরণ করে।" (মুসলিম ঃ জাবির থেকে)

بر الناس تبع لبرهم و فاجرهم تبع لفاجرهم ـ

"ভালো লোকেরা কুরায়েশের ভালো লোকদের এবং খারাপ লোকেরা কুরায়েশের খারাপ লোকদের অনুসরণ করে।" (মুসনাদে আহমদ ঃ আবু বকর রাঃ থেকে)

الناس تبع لقريش فى هذا الشان مسلمهم لمسلمهم و كافرهم لكافرهم ـ

"আরববাসী কুরায়েশদের নেতৃত্বই মেনে চলে। মুসলমান কুরায়েশ মুসলমানদের অনুসরণ করে আর কাফের অনুসরণ করে কুরায়েশ কাফেরদের।" (মুসলিম ঃ আবু হুরাইরা)।

সকীফায়ে নবী সায়েদার ভাষণে হযরত আবুবকরও এ বিষয়টাই বলেছিলেন ঃ

---

১. হিময়ার ইয়েমেনের বিখ্যাত কবীলা।

فاما العرب فلن تعرف هذا الامر الا لهذا الحى من قريش -

"আরবরা কুরায়েশ ছাড়া অন্য কারো নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের সাথে পরিচিতই নয়।"

এসব বর্ণনা সবই ছিলো বাস্তব ব্যাপার। তখন আরবে যে বাস্তব অবস্থা বিরাজ করছিল এবং পরবর্তী বহু শতাব্দীর ইতিহাস যে প্রকৃত অবস্থা সৃষ্টি করেছিল এসব হাদীসে তাই বলে দেয়া হয়েছিল। এসব বর্ণনার কোথাও এমন একটি শব্দ পাওয়া যাবেনা, যার এ অর্থ বের করা যাবে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরায়েশ নেতৃত্বের আকাংখী ছিলেন। বরঞ্চ এ বাস্তব ব্যাপারকে বাস্তব হিসেবেই বর্ণনা করা হয়েছে যে, কুরায়েশরা দেশের সরদার। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্মের পূর্ব থেকেই আরবে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিলো। গোটা কওমের মন মানসিকতার উপর তারা প্রভাব বিস্তার করে নিয়েছিল। প্রতিটি বিষয়ে তারা ছিলো অগ্রবর্তী এবং গোটা কওম ছিল তাদের অনুসারী। অতপর যখন কুফরীর ন্যায় ইসলামেও তারা অগ্রগামী হয় এবং গোটা আরব তাদের প্রভাবে এ দ্বীন কবুল করে নেয়, তখন তাদের এ বাস্তব ও ঐতিহাসিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করার এবং তা পরবর্তন করার চেষ্টা করে খামাখা শক্তি ক্ষয় করার কোনো কারণই ছিলনা। এরই পরিপ্রেক্ষিতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কওমকে হিদায়াত দেন যে, এ বাস্তব ব্যাপারটি স্বীকার করে নিয়ে ইসলামী যুগেও কুরায়েশদের নেতৃত্বের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকতে দাওঃ قدموا قريشا ولا تقدموها -

"কুরায়েশদের সামনে রাখো। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অগ্রবর্তী হবার চেষ্টা করোনা।" (বায়হাকী, তাবরানী)।

অতপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথাও পরিষ্কারভাবে বলে দিয়ে গেছেন যে, কুরায়েশ কেবল ততোদিনই এ মর্যাদায় অভিষিক্ত থাকবে যতোদিন তাদের মধ্যে নেতৃত্বের যোগ্যতা বিদ্যমান থাকবে এবং যতোদিন তারা এ দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেঃ

ان هذا الامر فى قريش لا يعاديهم احد الا كبه الله على وجهه ما اقاموا الدين-

"যতোদিন তারা এ দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করতে থাকবে, নেতৃত্ব কুরায়েশদের হাতেই থাকবে। যারা তাদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসবে, আল্লাহ তাদের উপুড় করে ফেলে দিবেন।" (বুখারী, বাবুল উমারা মিন কুরায়েশ)।

الائمة من قريش ماذا حكموا فعدلوا وعدوا فوفوا واسترحموا -

"নেতা কুরায়েশদের থেকেই হতে থাকবে, যতোদিন তারা ইনসাফের সাথে ফয়সালা করবে, ওয়াদাপূর্ণ করবে এবং আল্লাহ্র সৃষ্টির প্রতি অনুগ্রহ করবে।" (আবু দাউদ, তায়ালিসী, আহমদ, আবু ইয়ালী, তাবরানী, বাযযার, নাসাই, হাকেম)।

لا يزال هذا الامر فى قريش ما بقى منهم اثنان -

"এ নেতৃত্ব ততোদিন পর্যন্ত কুরায়েশদের হাতে থাকবে, যতোদিন তাদের মধ্যে দু'জন যোগ্য লোকও বাকী থাকবে।" (বুখারী, মুসলিম)।

এসব বাণীর মধ্যে একথাটি পরিষ্কারভাবে শামিল রয়েছে যে, কুরায়েশ যখন এ যোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে, তখন নেতৃত্বও তাদের হাত ছাড়া হয়ে যাবে এবং অকুরায়েশ বরং অনারব পর্যন্ত নেতা ও ইমাম হবে। ইসলামী শরীয়তে খেলাফত যদি বিধিবদ্ধভাবে কেবল কুরায়েশদেরই অধিকার হতো এবং কোনো অবস্থাতেই অকুরায়েশ এ অধিকার লাভ করতে না পারতো, তবে এ কথা কেমন করে বলা সম্ভব ছিলো? তরজমানুল কুরআন ঃ জমাদিউল উলা ১৩৬৫ হিঃ, এপ্রিল ১৯৪৬ ইং।

হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের জন্য প্রার্থী হওয়া

প্রশ্ন ঃ জামায়াতে ইসলামীর রুকনগণ সাধারণত আধুনিক কালের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। তারা বলেন, যে ব্যক্তি নিজেই কোনো পদ বা নেতৃত্বের প্রার্থী কিংবা দাবীদার হয়, সে উক্ত পদের উপযুক্ত নয় এবং এ পদে তাকে নির্বাচিত করা যায়না। এ নীতির ভিত্তিতে হযরত আলীর ব্যাপারে প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। তিনি তো খিলাফতের প্রার্থী এবং দাবীদার ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কি বলা যাবে?

জবাব ঃ হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খিলাফতের জন্যে প্রার্থী হওয়া এবং খিলাফত দাবী করার কাহিনী মূলত একটা বিরাট কাহিনীর অংশ বিশেষ। বর্ণনা বিশেষের উপর এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই অংশ বিশেষকে পূর্ণ ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবল এরই উপর আলোচনার বুনিয়াদ স্থাপন করা যেতে পারেনা। আপনি যদি এ অংশ বিশেষকে মানেন, তবে পুরো কাহিনীই আপনাকে স্বীকার

করে নিতে হবে, যেহেতু এটা সেই পুরো কাহিনীরই অংশ। অতপর এর উপর আলোচনায় আসতে হবে।

এ কাহিনীর বর্ণনাসমূহ খুবই মশহুর। ইয়াকুবী তাঁর ইতিহাসে সাকীফায়ে বনি সায়েদার পরবর্তী ঘটনাবলীর যে চিত্র পেশ করেছেন; ইবনে কুতাইবা তাঁর 'আল ইমামত ওয়াসসিয়াসাত' গ্রন্থে যে নক্শা এঁকেছেন এবং এ সম্পর্কে অন্যান্য লোক যা কিছু বর্ণনা করেছেন এসবই আপনার সম্মুখে বর্তমান রয়েছে। এ ইতিহাসের উপর যদি আপনি নির্ভর করেন, তাহলে আপনাকে কুরআনের প্রচারক, ইসলামের আহ্বায়ক এবং আত্মার পরিশুদ্ধিকারী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহর ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর শিক্ষাদীক্ষার যাবতীয় প্রভাব ও নিদর্শনাবলীর উপর ইতিরেখা টেনে দিতে হবে। আর সাথে সাথে আপনাকে একথাও স্বীকার করে নিতে হবে, সেই পবিত্রতম ব্যক্তির তেইশ বছরের তাবলীগ ও হিদায়াতের মাধ্যমে যে মহান জামায়াত তৈরী হয়েছিল এবং তাঁর নেতৃত্বে যে জামায়াত বদর, অহুদ, খন্দক ও হুনাইনের লড়াইয়ে বিজয় লাভ করে বিশ্বের বুকে ইসলামের ঝাণ্ডা উঁচু করেছিল; তাঁর নৈতিক চরিত্র, তাঁর ধ্যান ধারণা, তাঁর লক্ষ্য উদ্দেশ্য, তাঁর ইচ্ছা আকাংখা এবং তাঁর কর্ম কৌশল এ সবই সাধারণ দুনিয়া পূজারীদের থেকে বিন্দুমাত্র ভিন্নতর ছিলনা।

এ ইতিহাসে অংকিত চিত্র অনেকটা এ রকম যে, একজন সাহসী উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি কয়েক বছর প্রাণপন লড়াই করে একটি দেশ জয় করেন এবং নিজ বাহু বলে সেখানে একটি বাদশাহী কায়েম করে নেন। অতপর আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দু' চোখ বন্ধ হবার সাথে সাথে তাঁর সংগী সাথীরা রাজসিংহাসন কবজা করার চিন্তায় ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়ে। তারা সকলেই ছিল তাঁর নিজেরই হাতের গড়া এবং গোটা জীবন তিনি তাদের উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রেখে আসছিলেন। এখন যখন তাঁর পরিবার পরিজন তাঁর দাফন কাফনে ব্যস্ত, তাঁর শোকে মুহ্যমান, ঠিক এ সময় তাঁর সংগী সাথীরা এভাবে চোখ ফিরিয়ে নেয়। তারা একস্থানে একত্র হয়। প্রথমে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করতে থাকে। প্রত্যেকে চাইতে থাকে, 'এ মহা মূল্যবান লোকমাটি আমার মুখে আসুক' । অবশেষে বহু বিবাদ বিতর্কের পর তারা তাদের মধ্য থেকে একজনকে বাদশা নির্বাচন করে নেয়। একাজ যখন পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয়ে যায়, তখন বাদশাহী প্রতিষ্ঠাতার বংশধরদের নিকট এ সংবাদ এসে পৌছুল। আর ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের হাতের পাঁচ হাত ছাড়া হয়ে যায়। মরহুম বাদশার কোনো পুত্র সন্তান ছিলনা। ছিলো একজন জামাতা। সে রেগে গিয়ে বললোঃ আমি থাকতে মুকুট ও সিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর কে হতে পারে? মরহুমের কন্যাও রাগে হিংসায় অস্থির হয়ে পড়েন। তার পিতা বহু বছর প্রাণপণ সাধনা করে যে রাজ্য

প্রতিষ্ঠা করেছেন, তা কবজা করার কী অধিকার অন্য লোকদের আছে? মরহুমের বংশধররা প্রথমে পরস্পর শলাপরামর্শ করতে থাকে। অতপর তারা মরহুম বাদশার পুরাতন সাথীদেরকে তাঁর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে আবেদন করতে শুরু করে এবং জনগণের কাছে নিজেদের দাবী উত্থাপন করে। মরহুমের জামাতা তাঁর কন্যাকে সাথে নিয়ে রাজধানীর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরতে থাকে। বিভিন্ন প্রভাবশালী কবিলায় তাকে নিয়ে যায়, যাতে করে তার ফরিয়াদে লোকদের অন্তর গলে যায়। তারা মরহুম বাদশার কবরকে লক্ষ্য করেও লোকদের দোহাই দিতে থাকে, যাতে করে তাদের দাবী শক্তিশালী হয়। কিন্তু কেউই তাদের প্রতি কর্ণপাত করেনি। শেষ পর্যন্ত বেচারা ব্যর্থমনোরথ হয়ে বসে পড়ে। এরপর যখন মরহুমের কন্যাও দুনিয়া ত্যাগ করে, যে ছিল দাবীর মূল ভিত্তি, তখন এ গরীব অসহায় বেচারা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিংহাসন জবর দখলকারীর আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। কিন্তু তার অন্তরে অহরহ গোস্বা বিদ্বেষের অগ্নি জ্বলতে থাকে এবং সময় সময় কোনো না কোনো ভাবে সে তার এ রাগ ও বিদ্বেষের প্রকাশ ঘটাতে থাকে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর আহলে বাইত এবং শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের বাস্তব চিত্র কি এই? এই কি ছিল আল্লাহ্র রসূলের মর্যাদা যে, তিনি দুনিয়ার সাধারণ রাজ্য প্রতিষ্ঠাতাদের ন্যায় একজন রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন? রাসূলে খোদার তেইশ বছরের তা'লীম তরবিয়াত ও সোহবত দ্বারা কি এই চরিত্র, এই আখলাক, আর এই গুণ বৈশিষ্ট্য তৈরী হয়েছিল? আপনিই বলুন, এই চিত্রের সংগে কুরআন এবং তার পবিত্র শিক্ষায় কি সামঞ্জস্য আছে? মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং গোটা হাদীস ভাণ্ডারে ছড়িয়ে থাকা তাঁর সেই উচ্চতম নৈতিক শিক্ষার সংগে এর কি সম্পর্ক আছে? এর কি সম্পর্ক আছে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু আনহার পূতপবিত্রতর যিন্দেগীর সাথে, যে যিন্দেগীতে (এই তথাকথিত কাহিনী ছাড়া) পার্থিব স্বার্থান্বেষণের লেশ মাত্র নযরে পড়েনা? কি সম্পর্ক আছে এর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর সেই সুমহান যিন্দেগীর সাথে যার কোনো একটি রং ও দুনিয়া পূজারী লোকদের রং ঢং এর সাথে মিল খায় না? আর সাহাবায়ে কিরামের মহান জীবন চরিত্রের সাথেই বা এর কী সম্পর্ক আছে? এই কল্প কাহিনীর চিত্র তাঁদের সমষ্টির মাঝে রেখে চিন্তা করলে এর সাথে তাদের মহান চরিত্রের দূরতম কোনো সম্পর্কও আছে বলে মনে হয় কি?

অতপর নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের গোটা ভাণ্ডার যদি আমাদের সম্মুখে তাঁর নৈতিক চরিত্র, তাঁর যিন্দেগী, তাঁর মনমানসিকতা ও ব্যক্তিত্বের অন্য একটি চিত্র পেশ করে, আর কেবলমাত্র গুটিকয়েক বর্ণনা এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র পেশ করে

তবে সে অবস্থায় বিবেক বুদ্ধির রায় কি? ব্যাপারটা কি এরূপ যে হঠাৎ করে, সমুদ্রে আগুন লেগে গিয়েছিল? না কি সমুদ্রে পানিই ছিলনা, ছিল কেবল আগুন আর আগুন? নাকি আগুন লাগার কাহিনীই মিথ্যা! যেহেতু গোটা সাক্ষ্য প্রমাণ এ সত্যতাই প্রমাণ করে যে তা সমুদ্রই ছিল এবং সেখানে পানি ছাড়া আর কিছুই থাকা সম্ভব ছিলনা।

তা সত্বেও এ কাহিনী বিশ্বাস করতে যদি কারো মন চায়, আমরা তো আর তাকে বাধা দিতে পারিনা, যেহেতু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এ কাহিনী মওজুদ রয়েছে। কিন্তু এ বিশ্বাসের সাথে সাথে তাকে একথাও মেনে নিতে হবে যে, নাউযুবিল্লাহ রিসালাতের দাবীটি ছিলো একটা অভিনয় মাত্র, কুরআন কবির শব্দ ঝংকার ও ছান্দিক চাতুর্য ছাড়া আর কিছুই ছিলনা, পবিত্রতার গোটা কাহিনী ছিল নিরেট লোক দেখানো প্রদর্শনীর কাহিনী। আসলে তো এগুলো ছিল রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যে এক ব্যক্তির লোক ফাঁসানোর চল চাতুরি মাত্র। আর যে ধরনের লোকেরা পার্থিব স্বার্থান্বেষী লোকদের চারপাশে ভীড় জমায় তাঁর চার পাশেও ঐ ধরনের লোকেরাই ভীড় জমিয়েছিল এবং পবিত্রতার বাহ্যিক পর্দার অন্তরালে সে যে উদ্দেশ্যে কাজ করছিল, শেষ পর্যন্ত তার পরিবারের লোকেরা তা ফাঁস করে দেয়। মাআযাল্লাহ! মাআযাল্লাহ্!!

এর বিপরীত ইতিহাস আরো কিছু বর্ণনা পেশ করে। সেগুলোও একটু দেখে নিন। আল্লামা আবু জা'ফর ইবনে জরীর তাবারী পূর্ণ সনদ ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে এ বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন, যে, হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদের নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পরবর্তী ঘটনাবলী জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি এ সম্পর্কে বলেন ঃ

ان علی ابن ابی طالب کان فی بیته اذ جاءه من انباه ان ابا بکر قد جلس للبیعة فخرج فی قمیص له ما علیه ازار ولا رداء عجلا کراهیة ان یبطئ عنها حتی بایعه ثم جلس الیه وبعث الی ثوبه فاتاه متجلله ولزم مجلسه -

"আলী ইবনে আবু তালিব তাঁর ঘরে অবস্থান করছিলেন। এক ব্যক্তি এসে তাঁকে সংবাদ দিল, আবু বকর বায়াত গ্রহণের জন্যে বসেছেন। শুনেই আলী পায়জামা ও চাদর ছাড়াই শুধু জামা পরিহিত অবস্থায় বেরিয়ে পড়লেন।[১] কাপড় পরা পর্যন্ত অপেক্ষা করাও তিনি পসন্দ করেননি। গিয়েই তিনি বায়াত করেন। অতপর কাপড়ের জন্যে লোক পাঠান এবং তা পরিধান করে মজলিসে বসেন।"

বায়হাকীর বর্ণনা এর চাইতে কিঞ্চিত ভিন্নতর। তিনি আবু সাঈদ খুদরীর সূত্রে বর্ণনা করেন ঃ

فصعد ابو بكر المنبر فنظر فى وجوه القوم فلم ير الزبير قال فدعا بالزبير فجاء فقال قلت ابن عمة رسول الله وحواريه اردت ان تشق عصا المسلمين فقال لا تثريب يا خليفة رسول الله فقام فبايعه - ثم نظر فى وجوه القوم فلم ير عليا فدعا بعلى بن ابى طالب فجاء فقال قلت ابن عم رسول الله وختنه على ابنته اردت ان تشق عصا المسلمون؟ قال لا تثريب يا خليفة رسول الله فبايعه -

"অতপর আবু বকর মিম্বরে উঠে উপস্থিত লোকদের প্রতি তাকালেন। দেখলেন যুবায়ের উপস্থিত নেই। তিনি তাকে ডেকে পাঠালেন। যুবায়ের এলে তিনি বললেন, আমি বলছিলামঃ রাসূলুল্লাহ্র ফুফাতো ভাই ও তাঁর হাওয়ারী কোথায়? তুমি কি মুসলমানদের জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাও? জবাবে তিনি বললেনঃ হে রাসূলের খলীফা! ক্ষমা করুন। অতপর তিনি উঠে বায়াত করেন। আবু বকর পুনরায় সমাবেশের প্রতি তাকালেন। দেখলেন আলী নেই। তিনি তাঁকে ডেকে পাঠালেন। আলী এলে তিনি বললেনঃ আমি বলছিলামঃ

---

১. উল্লেখ্য, আরবদের জামা গলা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হয় এবং তাতে সারা শরীর ঢেকে যায়।

রাসূলুল্লাহ্‌র চাচাতো ভাই এবং তাঁর জামাতা কোথায় থেকে গেলো? তুমি কি মুসলমানদের জামায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে চাও? জবাবে তিনিও বললেনঃ হে রাসূলের খলীফা! ক্ষমা করুন। অতপর বায়াত করেন।"

এ উভয় বর্ণনার মধ্যে বাহ্যিক ভাবে যে কিঞ্চিত পার্থক্য দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তা মূলত সংক্ষিপ্ত এবং বিস্তারিত বর্ণনার মধ্যকার পার্থক্য। মূলত এর একটি বর্ণনা অপরটির সমর্থক। এ ছাড়া হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফের বর্ণনাটি এর আরো অধিকতর সহায়ক যা, মূসা ইবনে উকবা বিশুদ্ধ সনদের সাথে তাঁর 'মাগাযী'তে উদ্ধৃত করেছেন ঃ

ثم خطب ابو بكر واعتذر الى الناس وقال ما كنت حريصا على الامارة يوما ولا ليلة ولا سألتها سرا وعلانية فقبل المهاجرون مقالته وقال على والزبير ما غضبنا الا لانا اخرنا عن المشورة وانا نرى ابا بكر احق الناس بها- انه لصاحب الغار وانا لنعرف شرفه وخبره ولقد امره رسول الله ان يصلى بالناس وهو حى-

"অতপর (বায়াত গ্রহণের পর) আবু বকর ভাষণ দিলেন এবং নিজের ওযর পেশ করে বলেনঃ "একদিন বা একরাতের জন্যেও আমার অন্তরে নেতৃত্বের লোভ জাগেনি। গোপনে বা প্রকাশ্যে আমি এটা কামনাও করিনি। সকল মুহাজির তাঁর বক্তব্যে সন্তুষ্ট হয়। তবে আলী এবং যুবায়ের এতোটুকু মাত্র অভিযোগ করেন যে, "এ ব্যাপারে আমাদেরকে পরামর্শে শরীক করা হয়নি। আবু বকরকে আমরাও সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি বলে মনে করি। তিনিই তো রাসূলুল্লাহ্‌র গুহার সাথী ছিলেন। তাঁর মর্যাদা এবং অভিজ্ঞতার প্রতি আমাদের দ্ব্যর্থহীন সমর্থন রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবদ্দশায় তাঁকে নিজ স্থলে নামায পড়ানোর নির্দেশ দেন।"

আল্লামা ইবনে কাসীর তাঁর 'আল-বিদায়া ওয়ান নেহায়া' গ্রন্থে এ বিশ্লেষণ পেশ করেনঃ "হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার সান্ত্বনার জন্যে ছয়মাস যাবত ঘরেই থাকেন। কেননা তিনি মীরাস বণ্টনের ব্যাপারে হযরত আবু বকরের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। আর আলী

রাদিয়াল্লাহু আনহু এটা যথার্থ মনে করেননি যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালে তাঁর অন্তর যেভাবে শোকাচ্ছন্ন হয়েছে তার উপর সামান্য দুঃখও চাপিয়ে দেয়া হোক। পরে যখন হযরত ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা ইন্তেকাল করেন, তখন হযরত আলী দ্বিতীয় বার গিয়ে হযরত আবু বকরের হাতে বায়াত নবায়ন করেন এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন।' আল্লামা ইবনে আবদুল বার তাঁর 'আল-ইস্তিয়াব' গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের সূত্রে এ বর্ণনাটি উদ্ধৃত করেনঃ যখন হযরত আবু বকরের বায়াতের কাজ সম্পন্ন হয়, তখন আবু সুফিয়ান হযরত আলীর নিকট এসে বললোঃ "ব্যাপারটা কি হলো? কুরায়শের সর্বাধিক ছোট কবিলাটি এ পদে তোমাদের উপর বিজয়ী হয়ে গেলো? হে আলী! তুমি যদি চাও, তবে আমি এ মরুভূমি সওয়ারী ও পদাতিক বাহিনীতে ভর্তি করে দেবো।" তার জবাবে হযরত আলী বললেন ঃ

مازلت عدوا للاسلام واهله فما ضر ذالك الاسلام واهله شيئا انا راينا ابا بكر لها اهلا-

"গোটা জীবন তুমি ইসলাম এবং মুসলমানদের দুশমনী করে এসেছো। কিন্তু তোমার দুশমনীতে ইসলাম এবং মুসলমানদের কিছুমাত্র ক্ষতি হতে পারেনি। আমি আবু বকরকেই এ পদের সর্বাধিক যোগ্য ব্যক্তি মনে করি।"

আমরা অযথা কারো সাথে তর্কে নামতে চাইনা। এ বিষয়ের দুটি চিত্রই পেশ করে দিলাম। এখন প্রত্যেক বিবেকবান ব্যক্তির নিজেরই চিন্তা করে দেখা উচিত, এর মধ্যে কোন্ চিত্রটি কুরআনের প্রচারক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর আহলে বাইত এবং শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের জীবন চরিতের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রথম চিত্রের প্রতি যদি কারো মন আকৃষ্ট হয়, তবে তা হতে পারে। কিন্তু তার সাথে কেবল খিলাফতের প্রার্থী হওয়া এবং তা দাবী করার প্রশ্নই জড়িত নয়; বরঞ্চ গোটা দ্বীন ও ঈমানের প্রশ্ন জড়িত। আর কেউ যদি দ্বিতীয় চিত্রটি গ্রহণ করেন, তবে তাতে ঐ কাহিনীর কোনো অস্তিত্বই নেই যে, কোনো সাহাবী খিলাফতের পদের জন্যে প্রার্থী কিংবা তার দাবীদার ছিলেন। তরজমানুল কুরআন ঃ জমাদিউল আওয়াল ১৩৬৫ হিঃ, এপ্রিল ১৯৪৬ ইং।

ফিক্‌হি মাসায়েল

গায়রে মুয়াজ্জল মোহরের হুকুম

প্রশ্ন ঃ বিয়ের সময় যদি কেবল মাত্র দেন মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ করে দেয়া হয় কিন্তু তা مُعَجَّل হবে নাকি مُؤَجَّل তা ঠিক করা না হয়; তবে এ মোহরের বিধান কি হবে? তাকি معجل ধরে নিতে হবে, না مؤجل ?[১] এ বিষয়ে আলিমদের নিকট ফতোয়া চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন ধরনের জবাব পাওয়া গেছে। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি জবাব এখানে উল্লেখ করা গেল ঃ

মওলানা মুহাম্মদ কেফায়েত উল্লাহ সাহেব ও দিল্লীর অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন ঃ

"মোহর যদি مؤجل (বাকি) বলে উল্লেখও করা হয় কিন্তু অজ্ঞতাবশত পরিশোধের সময় সীমা উল্লেখ করা না হয় তবে মোহর معجل (নগদ) হয়ে যাবে। আর যদি معجل কিংবা مؤجل কিছুই উল্লেখ না করে শুধুমাত্র 'পরিশোধ করতে হবে' লেখা হয়, সে অবস্থাতেও معجل মোহর হবে। কেননা পরিশোধের সময় সীমা নির্ধারণ ছাড়া مهر مؤجل হতে পারে না।" (দুররে মুখতার)।

আযমগড় জিলার সরাইমীরস্থ 'মাদরাসাতুল ইসলাহ্‌র' মুদাররিস্ মওলানা সাঈদ আহমদ সাহেব বলেন ঃ

"সে অবস্থায়ই مؤجل মোহর হবে যখন বিবাহ অনুষ্ঠানে মোহর পরিশোধের দিন তারিখ নির্ধারণ করে নেয়া হবে। এরূপ না হলে معجل মোহর হবে। সর্বপ্রকার লেনদেনের অবস্থা এরকমই হয়ে থাকে। কেউ যদি কোনো দোকান থেকে কিছু জিনিস ক্রয় করে এবং কথাবার্তায় বাকী বা নগদ মূল্য পরিশোধের কথা নির্ধারিত না হয়ে থাকে, তবে এ ক্রয় বিক্রয় معجل (নগদ) হবে। ক্রেতা সংগে সংগে মূল্য পরিশোধ করে দিক কিংবা পরে দেয়ার ওয়াদা করুক, তাতে কিছু যায় আসেনা। معجل এর জন্যে এটা শর্ত নয় যে, বিনিময় সংগে সংগে পরিশোধ করতে হবে। বরঞ্চ পাওনাদারের এ অধিকার থাকে, সে সংগে সংগে কিংবা যখন ইচ্ছা তার পাওনা দাবী করতে পারে। আর যদি مؤجل (বাকি) নির্ধারিত হয়ে থাকে তবে নির্দিষ্ট দিন

---

১. বর কর্তৃক দেন মোহর পরিশোধের দুইটি স্বীকৃত পন্থা রয়েছে। একটি হচ্ছে নগদ বা معجل এবং অপরটি مؤجل বা বাকি।

তারিখ আসার পূর্বে পাওনাদার তার পাওনা দাবী করতে পারেনা। এ বিশ্লেষণ অনুযায়ী আলোচ্য মাসআলার মোহর مـعـجـل হবে এবং স্ত্রী যখন ইচ্ছা তা চাইতে ও দাবী করতে পারবে।"

মওলানা সাইয়েদ সুলায়মান নদভী বলেন ঃ মোহর مـعـجـل কিংবা مـؤجـل কোনোটাই যদি ফায়সালা না হয়ে থাকে তবে তা প্রচলিত নিয়মানুযায়ী পরিশোধ করতে হবে। বেকায়া গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

اَلْمُعَجَّلُ وَالْمُؤَجَّلُ اِنْ بَيَّنَا فَذَالِكَ وَاِلاَّ فَالْمُتَعَارِفُ -

"مـعـجـل বা مـؤجـل যদি পরিষ্কারভাবে ঠিক হয়ে থাকে, তবে সে অনুযায়ীই পরিশোধ করতে হবে। তা না হয়ে থাকলে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী পরিশোধ করতে হবে।"

পাতিয়ালার নায়েবে মুফতি মওলানা আবদুর রহমান সাহেব ও অন্যান্য উলামায়ে কিরাম বলেন ঃ

"এ অবস্থায় প্রচলিত নিয়ম মাফিক কাজ করতে হবে (সূত্র ঃ বেকায়া গ্রন্থ)। যে মোহর পরিশোধের সময় ঠিক করা হয়নি, প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী তা যদি শুধুমাত্র স্বামীর মৃত্যু ঘটলে কিংবা তালাক প্রাপ্ত হলেই মহিলারা লাভ করে থাকে, তবে সে স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পূর্বে মোহর আদায়ের অধিকার রাখে না।"

এ মতভেদের সমাধান কি? মেহেরবানী করে আপনি এর উপর বিস্তারিত আলোকপাত করুন।

জবাব ঃ *কুরআন হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে একজন পুরুষ তার স্ত্রীর উপর স্বামীত্বের যে অধিকার লাভ করে, প্রকৃত পক্ষে মোহর তারই 'বিনিময়'। কালামে পাকে এরশাদ হয়েছে ঃ*

وَاُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِكُمْ اَنْ تَبْتَغُوْا بِاَمْوَالِكُمْ -

"এদের ছাড়া আর যতো নারী আছে, নিজেদের ধন সম্পদের বিনিময়ে তাদের বিয়ে করা তোমাদের জন্যে হালাল করে দেয়া হয়েছে"। (নিসা, রুকু ৪)

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهٖ مِنْهُنَّ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ فَرِيْضَةً -

"আর (দাম্পত্য জীবনে) তোমরা তাদের থেকে যে স্বাদ গ্রহণ করো, তার বিনিময়ে একটি অবশ্য কর্তব্য ফরয হিসেবে তাদের মোহর পরিশোধ করো।" (নিসা রুকু ৪)

وَكَيْفَ تَأْخُذُوْنَهُ وَقَدْ اَفْضٰى بَعْضُكُمْ اِلٰى بَعْضٍ -

"আর তোমরা কী করে সে অর্থ ফেরত নিতে পারো যখন তোমরা একজন আরেক জনের স্বাদ আস্বাদন করেছ?" (নিসা, রুকু ৩)

এ আয়াতগুলো দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ হয় যে মোহরই হলো সেই জিনিস, যার বিনিময়ে স্ত্রীর উপর পুরুষের স্বামীত্বের অধিকার লাভ হয়ে থাকে। এ সম্পর্কিত রসূলে করীমের হাদীসসমূহ বিষয়টাকে আরো পরিষ্কার করে দেয়। সিহা সিত্তাহ, দারামী ও মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বাণীটি উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

اَحَقُّ الشُّرُوْطُ اَنْ تُوْفُوْا بِهٖ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهٖ الْفُرُوْجَ -

"বিয়েতে পূরণ করার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্তটি হলো তা, যার বিনিময়ে তোমরা স্ত্রীদের লজ্জাস্থান হালাল করে নাও।"

লেয়ানের সেই মোকদ্দমাহ্ যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেনঃ তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে যাবার পর স্বামী আবেদন করলোঃ হে আল্লাহ্র রসূল! আমার অর্থ সম্পদ আমাকে ফেরত দেয়া হোক। রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাবে বললেন ঃ

لَامَالَ لَكَ اِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَاِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَالِكَ اَبْعَدَ لَكَ مِنْهَا.

"সম্পদ ফেরত নেয়ার কোনো অধিকার তোমার নেই। তুমি যদি তার বিরুদ্ধে সত্য অভিযোগ এনে থাকো, তবে তুমি যে তার গোপন অংগ হালাল করে নিয়েছিলে তার বিনিময়ে তা পরিশোধ হয়ে গেছে। আর তুমি যদি তার

প্রতি মিথ্যা অভিযোগ (অপবাদ) আরোপ করে থাকো তবে সম্পদ ফেরত নেয়ার দূরতম কোনো অধিকারও তোমার নেই।"

বিষয়টি এর চাইতেও পরিষ্কার ভাষায় অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি মুস্‌নাদে আহমদে উদ্ধৃত হয়েছে ঃ

مَنْ تَزَوَّجَ إمْرَاَةً بِصِدَاقٍ وَنَوٰى اَنْ لاَّ يُوَدِّيْهِ فَهُوَ زَانٍ۔

"যে ব্যক্তি কোনো নারীকে মোহর দেবে বলে বিয়ে করেছে অথচ নিয়্যত করেছে মোহর পরিশোধ না করার, সে ব্যাভিচারী।"

এ সব দলীল প্রমাণ থেকে মোহরের যে মর্যাদা সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে তা হলো, মোহর কোনো সামাজিক ও প্রদর্শনীমূলক জিনিস নয়। বরঞ্চ মোহর হলো সেই জিনিস, যার বিনিময়ে একজন নারী একজন পুরুষের জন্যে হালাল হয়ে যায়। আর কুরআন এসব প্রামান্য দলীলের দাবী এটাই যে স্ত্রীর গুপ্তাংগ হালাল করার সাথে সাথেই পূর্ণ মোহর পরিশোধ করা ওয়াজিব। তবে স্বামী স্ত্রী উভয়ের মধ্যে যদি বিলম্বে পরিশোধের কোনো সমঝোতা হয়ে যায়, কেবল সেক্ষেত্রেই বিলম্বে পরিশোধ করা যাবে।

সুতরাং মোহর পরিশোধের ব্যাপারে معجل *কিংবা* مؤجل *কোনোটাই আসল ব্যাপার নয়। মোহরের দাবী হলো তা গুপ্তাংগ হালাল করার ক্ষণেই পরিশোধ করতে হবে। পরিশোধের ব্যাপারে স্বামীকে কিছুটা অবকাশ দেয়াটা স্বামীর প্রতি স্ত্রীর একটা মেহেরবানী মাত্র। আর অবকাশ দানের ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে কোনো চুক্তি ও সমঝোতা না হয়ে থাকলে মূলনীতি (অর্থাৎ* معجل *অনুযায়ীই কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে স্ত্রীর মেহেরবানী (অর্থাৎ অবকাশ বা* معجل *ধরে নেয়া যাবেনা। এমনটি শরীয়ত প্রনেতার ইচ্ছার সম্পূর্ণ খেলাফই মনে হয় যে, অবকাশ দান* مؤجل *কে মূলনীতি ধরা হবে এবং* معجل *কিংবা* مؤجل *অনুল্লেখ থাকলে এমনিতেই মোহরকে* مؤجل *মনে করা হবে!*

এ মাসআলাটির ব্যাপারে হানাফী মযহাবের ফকীহ্‌দের দুটি দল পাওয়া যায়। একদলের মত তাই যা আমি উপরে বর্ণনা করলাম। গায়াতুল বয়ান غاية البيان *গ্রন্থের ভাষ্য হলো ঃ*

"মোহর নির্ধারণের সময় যদি معجل *এর শর্ত আরোপিত হয়ে থাকে অথবা* معجل *কিংবা* مؤجل *কোনোটাই উল্লেখ করা না হয়ে থাকে,*

তবে তা সংগে সংগে পরিশোধ করা ওয়াজিব হবে। এমতাবস্থায় মোহর পরিশোধ করার পূর্ব পর্যন্ত স্ত্রীর স্বামী থেকে নিজেকে দূরে রাখার অধিকার থাকবে।"

'শারহে ইনায়াহ আ'লাল হিদায়াহ' গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

"অতপর যদি معجل কিংবা مؤجل এর ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করে মোহর নির্ধারিত হয়, তবে তার বিধান কি? আমি বলছি, তা সংগে সংগে পরিশোধ করা ওয়াজিব। এর বিধান হচ্ছে এমন মোহরের বিধান, যার জন্যে معجل এর শর্ত আরোপ করা হয়েছে।"

ইসতিজাবী-গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ

"যদি معجل মোহর হয়, কিংবা এ ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করা হয়, তবে নগদ পরিশোধ করা ওয়াজিব। কেননা বিয়ে হচ্ছে একটি বিনিময় বন্ধন। স্ত্রীর উপর যখন স্বামীর অধিকার নির্ধারিত হয়ে গেলো তখন স্ত্রীর অধিকার নির্ধারিত হওয়াও ওয়াজিব হয়ে যায়। আর মোহর পরিশোধের মাধ্যমেই তা হতে পারে।"

বাকী থাকলো দ্বিতীয় দলের মতামত। তারা বলেন, এ ব্যাপারে প্রচলিত নিয়মের উপর নির্ভর করতে হবে। ফতোয়ায়ে কাযীখানে বলা হয়েছে ঃ

"যদি معجل এর পরিমাণ স্পষ্টভাবে আলোচিত না হয়ে থাকে, তবে দেখতে হবে স্ত্রী কোন্ শ্রেণীর লোক এবং মোহরের পরিমাণ কি? এটাও দেখতে হবে যে, সমাজে এ শ্রেণীর মেয়েদের মোহর কি পরিমাণ معجل নির্ধারণ করা হয়ে থাকে? ব্যাস, সে পরিমাণই معجل নির্ধারণ করতে হবে। এক চতুর্থাংশ কিংবা এক পঞ্চমাংশ নির্ধারণ করে দেয়া ঠিক নয়, বরঞ্চ প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করা উচিত।"

আল্লামা ইবনে হাম্মাম ফাতহুল কাদীর গ্রন্থে এ মতেরই প্রতিধ্বনি করেছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

"যদি মোহরের কিছু অংশ معجل করার শর্তারোপ করা না হয়ে থাকে বরঞ্চ معجل কিংবা مؤجل এর বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে, তবে প্রচলিত নিয়ম দেখতে হবে। প্রচলিত নিয়মে যদি একাংশ معجل নির্ধারণ করা হয়, আর বাকী অংশ মৃত্যু পর্যন্ত কিংবা স্বচ্ছল অবস্থা আসা পর্যন্ত কিংবা তালাক পর্যন্ত বিলম্ব করা হয়, তবে স্ত্রী কেবলমাত্র এ معجل অংশ উসূল করা পর্যন্তই নিজেকে স্বামী থেকে দূরে রাখার অধিকার পাবে।"

মূলনীতির দিক থেকে প্রথম দলের রায়ই কুরআন হাদীসের দৃষ্টিভংগির সংগে অধিকতর সামঞ্জস্য রাখে। কিন্তু দ্বিতীয় দলের রায়ও ঠুক্‌কো নয়। তাদের দাবী

এটা নয় যে মোহর পরিশোধের ব্যাপারে مؤجل হচ্ছে মূল বিধান আর যখন معجل কিংবা مؤجل উল্লেখ না থাকে, তখন مؤجل নীতির দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। বরঞ্চ তাঁরা তাঁদের ফতোয়ায় আরেকটা নিয়মের অনুসরণ করেছেন। শরীয়তে সেটাও স্বীকৃত। আর সে নিয়মটা হলো, কোনো সমাজে কোনো বিষয়ে যে পন্থা সাধারণ ভাবে প্রচলিত থাকে, সেখানকার লোকদের জন্যে তার অনুসরণ করা একটা অলিখিত চুক্তির মতোনই হয়ে থাকে। সে সমাজের দুই পক্ষ যখন সমঝোতার ভিত্তিতে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং উক্ত বিষয়ের বিশেষ কোনো দিক সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ফায়সালা না করে থাকে, তবে বুঝে নিতে হবে যে সে জিনিসটা সম্পর্কে তারা প্রচলিত নিয়মের উপরই সন্তুষ্ট।

এ নিয়ম শরীয়তে নিঃসন্দেহে স্বীকৃত। আর এ হিসেবে ফকীহ্দের দ্বিতীয় দলের রায়ও ভুল নয়। কিন্তু কোনো বিশেষ সমাজে এ নিয়ম কার্যকর করার পূর্বে আমাদের একটি কথা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। আর তা হলো, ইসলামী শরীয়ত কোনো সমাজের প্রচলিত প্রথাকে আইনের উৎস (Source of Law) হিসেবে স্বীকার করেনা। যা কিছু সমাজে প্রচলিত আছে তাই সঠিক, এমনটি ইসলাম স্বীকার করেনা। বরঞ্চ এর বিপরীত ইসলাম এসব খোদা বিমুখ অন্যায় অমূলক প্রথাসমূহ পরিবর্তনের সংগ্রাম করে। ইসলাম কেবল এমনসব রসম রেওয়াজকেই স্বীকৃতি দেয় যা একটি পরিশুদ্ধ সমাজে শরীয়তের প্রাণ স্পন্দন ও তার মূলনীতির ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়। সুতরাং প্রচলিত প্রথাকে অলিখিত চুক্তি ধরে নিয়ে তাকে আইন হিসেবে কার্যকর করার পূর্বে আমাদের একটা জিনিস ভালভাবে দেখে নিতে হবে। আর তা হলো, যে সমাজ প্রথাকে আমরা এতখানি মর্যাদা দিচ্ছি তা কি একটি তাকওয়া সম্পন্ন সমাজ? এ সমাজের প্রথাসমূহ কি শরীয়তের প্রাণবস্তু ও তার মূলনীতির ভিত্তিতে সৃষ্টি হয়েছে? যদি পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা দ্বারা এর জবাব 'না' সূচক পাওয়া যায় তবে এ নিয়মটাকে আইন হিসেবে কার্যকর করা কিছুতেই ইনসাফ ও ন্যায় সংগত হতে পারেনা। বরঞ্চ এটা হবে একটা সুস্পষ্ট যুলুম।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে আমাদের দেশের বর্তমান মুসলিম সমাজের প্রতি তাকালে সুস্পষ্ট দেখা যাবে, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ব্যাপারে এ সমাজ নফসের দাসত্বের পথ অনুসরণ করে সেই সুষম ব্যবস্থার অনেক কিছুই বিগড়ে দিয়েছে যা ইসলামী শরীয়ত কায়েম করেছিল। তাছাড়া এ সমাজ এমন সব পন্থা পদ্ধতির প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, যা ইসলামী শরীয়তের মূলনীতি ও বিধিবিধান থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ। আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় এই দেনমোহরের ব্যাপারটাই চিন্তা করে দেখুন।

এদেশের মুসলমানরা সাধারণত দেন মোহরকে একটা প্রথাগত জিনিস মাত্র মনে করে। কুরআন হাদীসে মোহরের যে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে তাদের দৃষ্টিতে তার সে গুরুত্ব অবশ্যই নেই। বিয়ের সময় সম্পূর্ণ প্রদর্শনীমূলকভাবে মোহরের চুক্তি হয়ে থাকে। কিন্তু এ চুক্তি কার্যকর করার কোনো চিন্তাই তাদের মস্তিস্কে থাকেনা। মোহরের বিষয় আলোচনাকালে আমি নিজ কানে বহুবার একথা শুনেছিঃ "আরে মিঞা! মোহর দেয়ই বা কে আর নেয়ই বা কে!" এ যেনো কেবল একটা নিয়ম রক্ষার জন্যেই ধার্য করা হয়। আমার জানা মতে শতকরা আশিটি বিয়ে এরূপ হয়ে থাকে যেগুলোতে কখনো মোহর পরিশোধ করা হয়না। লোকেরা কেবল তালাকের প্রতিবন্ধক হিসেবেই মোহরের পরিমাণ নির্ধারণ করে থাকে। এভাবে কার্যত নারী সমাজের শরীয়ত প্রদত্ত একটি পাকাপোক্ত অধিকারকে বিলুপ্ত করা হলো। একথার কোনো পরোয়াই করা হয়না যে, যে শরীয়তের দৃষ্টিতে এ লোকেরা নারীদেরকে পুরুষদের জন্যে বৈধ করে নেয়, সে শরীয়তই মোহরকে নারীর যৌনাংগ হালাল করার জন্যে বিনিময় বলে ঘোষণা করেছে, আর এ বিনিময় পরিশোধ করার নিয়্যত না থাকলে খোদার নিকট পুরুষের জন্যে স্ত্রী হালালই হয়না।

আমার বুঝেই আসেনা, যে সমাজের রসম রেওয়াজ এতটা বিকৃত হয়ে গেছে, যে সমাজের প্রথা প্রচলন সম্পূর্ণভাবে শরীয়তের মূলনীতি ও বিধি বিধানের বিপরীত রূপ ধারণ করেছে, সে সমাজের রসম রেওয়াজ তথা প্রচলিত প্রথাকে শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে জায়েয ঘোষণা করা কী করে সঠিক হতে পারে? প্রচলিত প্রথা অনুসরণের সমর্থনে যেসব ফকীহ্র বক্তব্যের উদ্ধৃতি দেয়া হয় তাদের সময় না এরূপ বিকৃত হয়ে যাওয়া সমাজ ছিলো আর না শরীয়ত বিরোধী কোনো রসম রেওয়াজ ও প্রথা প্রচলন বর্তমান ছিলো। তাঁরা এ সম্পর্কে যা কিছু লিখেছিলেন, তা ছিলো একটি সংস্কার প্রাপ্ত পরিশুদ্ধ সমাজব্যবস্থা এবং তাঁরা তারই রসম রেওয়াজকে সামনে রেখে লিখেছিলেন। কোনো মুফতি কেবল তাঁদের বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েই নিজের দায়িত্ব মুক্ত হতে পারেননা। ফতোয়া দেয়ার পূর্বে শরীয়তের মূলনীতির আলোকে তাদের বক্তব্য ভালভাবে বুঝে নেয়া তাঁর কর্তব্য। তাঁকে একথারও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে নিতে হবে যে, যে পরিবেশ পরিস্থিতি সামনে রেখে তাঁরা এসব বক্তব্য ও মতামত লিপিবদ্ধ করেছিলেন আর আজকে যে পরিবেশ পরিস্থিতিতে সে বক্তব্য ও মতামত প্রয়োগ করা হচ্ছে, এ উভয় পরিবেশের মধ্যে কোনো গরমিল নেই তো? তরজমানুল কুরআন ঃ রজব শা'বান-১৩৬২ হিঃ, জুলাই আগষ্ট-১৯৪৩ ইং।

বন্দুক দ্বারা শিকার করা প্রাণীর বৈধতা ও অবৈধতা

প্রশ্ন ঃ আপনি তাফহীমূল কুরআনে 'আল্লাহু আকবার' বলে গুলি করার মাধ্যমে শিকারকৃত মৃত প্রাণীকে হালাল ব্যাখ্যা দিয়ে এক অভিনব কথা আবিস্কার করলেন।[১] আপনার এ বক্তব্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর উদয় হয়, মেহেরবাণী করে এগুলোর জবাব দিয়ে সন্তুষ্ট করবেন ঃ

১. চারজন ইমামই এ ব্যাপারে একমত যে, গুলির দ্বারা মৃত শিকার 'চোট' লেগে মারা গেলে না জায়েয ও হারাম। কাজেই কোন্ দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে আপনি এটাকে জায়েয লিখেছেন?

২. বন্দুকের গুলিতে ধারাল কিছুই থাকে না, বরঞ্চ কেবল একটা তীব্র আঘাতের দ্বারাই প্রাণীর মৃত্যু ঘটে। সাধারণত কার্টিজের উপর লেখা থাকে, এটার শক্তি এতো পাউণ্ড। কিন্তু এটাতো লেখা থাকে না যে, এটার ধার এতোটা তীক্ষ্ণ! আঘাত দ্বারা মৃত শিকার নির্ঘাত অবৈধ এবং এটা সর্বসম্মত।

৩. তাফসীরে হক্কানীতে লেখা হয়েছে, কাজী শওকানী বন্দুকের গুলিতে মৃত শিকার হারাম হবার ব্যাপারে মতবিরোধ করেছেন। কিন্তু কাজী সাহেবের মতবিরোধ মানদণ্ড হতে পারেনা। কারণ তিনি মাজরূহ (ত্রুটিপূর্ণ) হাদীস বর্ণনাকারী হওয়া ছাড়াও শিয়া মতবাদের প্রতি আসক্ত।

৪. এ বিষয়টাকে ক্ষুদ্র বা খুঁটি নাটি বিষয় আখ্যায়িত করা জনসাধারণকে ধোকা দেয়া ছাড়া কিছু নয়। হারামকে হালাল করাটাও কি প্রাসংগিক ব্যাপার?

জবাব ঃ সর্ব প্রথম আমি আপনার চতুর্থ প্রশ্নে উল্লেখিত ভুল ধারণার অপনোদন করতে চাই। আপনি প্রশ্ন করেছেন ঃ হারামকে হালাল করাটাও কি প্রাসংগিক ব্যাপার?'

এ ব্যাপারে আপনার জানা থাকা দরকার যে, এক প্রকার হালাল হারাম হলো তা, যা সরাসরি (কুরআন ও হাদীসের) অকাট্য দলীল প্রমাণের মাধ্যমে হালাল

---

১. প্রকাশ থাকে যে, তাফহীমূল কুরআন গ্রন্থাকারে প্রকাশ হবার পূর্বে যখন 'তরজমানুল কুরআন' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হচ্ছিল, এ বিষয়টা তখনই লেখা হয়েছিল। আর সে বিষয়টি সম্পর্কেই এ প্রশ্ন আমাদের নিকট এসে পৌঁছায়। অতপর দ্বিতীয়বার পর্যালোচনার সময় এ বিষয়টা তাফহীমূল কুরআন থেকে বাদ দেয়া হয়। কিন্তু তা এ জন্যে বাদ দেয়া হয়নি যে, এ ব্যাপারে আমার মত পরিবর্তন হয়ে গেছে; বরঞ্চ তা রহিত করার কারণ এ ছিলো যে সেখানে বিস্তারিত দলীল প্রমাণ উল্লেখ করার অবকাশ ছিলনা। আর দলীল প্রমাণ ছাড়াই কোনো মত প্রকাশ করার দ্বারা অনর্থক ভুল বুঝাবুঝির আশংকা থাকে। -গ্রন্থকার

বা হারাম বলে নিরূপিত হয়েছে। আর সেগুলো হলো মৌলিক ও মূলনীতিগত বিষয়। এগুলোতে কোনো প্রকার রদবদল করা কুফরী। দ্বিতীয় প্রকার হালাল হারাম হলো তা, যা সরাসরি কুরআন হাদীসের অকাট্য দলীল প্রমাণ দ্বারা নয়, বরঞ্চ তার ইশারা ইংগিতের আলোকে চাহিদা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে গবেষণা ও ইজতিহাদ করে বের করা হয়। আর এগুলোই হলো প্রাসংগিক বিষয়। এসব বিষয়ে সব সময়ই মুসলিম উম্মাহ্‌র আলিম ও ফকীহ্‌গণের মধ্যে এমনকি সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম এবং তাবেয়ীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মধ্যেও মতভেদ চলে আসছে। একই জিনিসকে কেউ হালাল বলেছেন, আবার কেউ বলেছেন হারাম। কিন্তু এমন কখনো হয়নি যে, এসব ইজতিহাদী হালাল ও হারামের বিষয়ে তাঁরা তর্ক বিতর্কে লিপ্ত হয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করেছেন যে, তোমার দ্বীন পরিবর্তন হয়ে গেছে, কিংবা তুমি আল্লাহর হারাম করা জিনিসকে হালাল করে ফেলেছো। বড়ই পরিতাপের বিষয়, এটা কেবল আমাদেরই দেশে নয়, বরঞ্চ গোটা পৃথিবীর মুসলমানদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত শরয়ী মাসায়েলের ক্ষেত্রে স্বাধীন গবেষণা ইজতিহাদ বন্ধ হয়ে আছে এবং সব লোকেরাই কোনো না কোনো ফিকহী মাযহাবের অনুকরণ ও অনুবর্তনে এতোটা অটল হয়ে আছে যে, প্রত্যেকেই নিজের অনুসৃত সেই বিশেষ মযহাবকেই মূল শরীয়ত মনে করতে শুরু করেছে। এ কারণেই লোকদের সামনে তাদের অনুসৃত সেই বিশেষ মযহাবের বিপরীত কোনো গবেষণা ইজতিহাদ পেশ করা হলে তারা তাতে এমন নাক সিটকাতে আরম্ভ করেন যেনো মূল দ্বীনের মধ্যেই কোনো রদবদল করে ফেলা হয়েছে। অথচ অতীত বুযুর্গদের মধ্যে যখন স্বাধীন গবেষণা ইজতিহাদের দরজা খোলা ছিলো, তখন উলামায়ে কিরামের মধ্যে হালাল হারাম এবং ফরয ও গায়রে ফরযের মধ্যে পর্যন্ত মত পার্থক্য হয়ে যেতো এবং এগুলো তারা কেবল বরদাশতই করতেননা, বরঞ্চ তারা প্রত্যেকেই নিজেরা যেটাকে শরয়ী বিধান বলে মনে করতেন সেটার উপর আমল করতেন এবং অন্যেরা যেটাকে শরয়ী বিধান বলে মনে করতো তাদেরকে সেটার উপর আমল করার অধিকার দিতেন।

এই পানাহারের বিষয়ে অতীতের উলামায়ে কিরামের মধ্যে যেসব মত পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছিল তার কয়েকটি উদাহরণ আমি এখানে উদ্ধৃত করছি এবং এইসব মতভেদের ব্যাপারে আপনার নিকট আমার জিজ্ঞাসা এই যে, আপনি এই বুযুর্গদের কার প্রতি হারামকে হালাল করার এবং হালালকে হারাম করার অভিযোগ আরোপ করতে পারবেন?

হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত ঃ তিনি হিংস্র জন্তুর গোশ্‌ত এবং তাদের শিরার উপরে যে রক্ত থেকে যায় তার ব্যবহারকে দোষনীয় মনে করতেননা। তাঁর এ মতের দলিল ছিলো নিম্নোক্ত আয়াত ঃ

قُلْ لاَّ اَجِدُ فِيْمَا اُوْحِىَ اِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ الاية......

"হে নবী বলে দাও ঃ আমার নিকট প্রেরিত ওহীর মধ্যে কোনো আহার গ্রহণকারীর আহারে হারাম কিছু আমি পাইনা" আর এ আয়াতেরই ভিত্তিতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসও কুরআনে হারাম ঘোষিত চারটি জিনিস (অর্থাৎ শূকর, মৃত প্রাণী, প্রবাহিত রক্ত এবং যা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে বধ করা হয়েছে তা' ব্যতীত আর কোন জিনিসকেই হারাম মনে করতেননা। দ্রষ্টব্য ঃ আহকামুল কুরআন ঃ জাস্‌সাস্‌ ঃ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২০

গৃহপালিত গাধার গোশত খাওয়ার ব্যাপারে একদলের মত হলো ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধের সময় কোন বিশেষ কারণে তা খেতে নিষেধ করেছিলেন। তাঁর এ (সাময়িক) নিষেধাজ্ঞা একথা প্রমাণ করেনা যে গাধার গোশ্‌ত মূলতই হারাম। (দেখুন ঐ পৃষ্ঠা ২১)

ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর সাথীদের মতে হিংস্র পশু এবং শিকারী পাখী পুরোপুরি হারাম। ইমাম মালিক হিংস্র পশুকে হারাম মনে করেন বটে কিন্তু শকুন ঈগল প্রভৃতি শিকারী পাখীকে হালাল বলে মত প্রকাশ করেছেন, এগুলো মৃত জীব ভক্ষক হোক কিংবা নাহোক। ইমাম আওযায়ী কেবলমাত্র শকুনকে মাকরূহ মনে করতেন। তাঁর মতে অন্য সকল প্রকার পাখী হালাল। ইমাম লাইস বিড়ালকে হালাল মনে করতেন, তবে শবখোর বনবিড়ালকে মাকরূহ মনে করতেন। ইমাম শাফেয়ীর নিকট কেবলমাত্র মানুষের উপর হামলাকারী বন্যপশু এবং মানুষের পালিত জন্তুর উপর হামলাকারী শিকারী পাখী হারাম। বন বিড়াল ও খেকশিয়াল এ সংজ্ঞার আওতামুক্ত থাকে। ইকরামার নিকট কাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেনঃ এটাতো মাংসল মোরগ' আর বনবিড়াল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেনঃ এটা হচ্ছে মোটা দুম্বা' (ঐ পৃঃ ২২)

এভাবে ভূ গর্ভে বসবাসকারী প্রাণীর গোশত খাওয়া সম্পর্কেও মতভেদ আছে। হানাফীগণ ভূ গর্ভে বসবাসকারী সকল প্রাণীকে মাকরূহ মনে করেন। ইবনে আবী লাইলার মতে সাপ খাওয়াতে কোনো দোষ নেই। তবে তিনি যবেহ করে খাবার শর্তারোপ করেছেন। ইমাম মালিকের মতও এটাই। কিন্তু ইমাম আওযায়ী যবেহ করার শর্তকেও উড়িয়ে দিয়েছেন। ইমাম লাইসের মতে জংলী ইদুর (সজারু) খাওয়া জায়েয। ইমাম মালিকের নিকট ব্যাঙ খাওয়া জায়েয। ইমাম শাফেয়ী বলেন, আরববাসী যেসব জিনিস খেতে ঘৃণা করতো, সেগুলোই নোংরা নাপাক। আর তারা যেহেতু বন বিড়াল এবং খেকশিয়ালের গোশত খেতো, সুতরাং এ উভয় প্রাণীই হালাল। (ঐ পৃঃ ২৪)

এ উদাহরণ ক'টি থেকে একথা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, যেসব ক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন হাদীসের বিধান মওজুদ নেই সেসব ক্ষেত্রে গবেষণা ইজতিহাদের ভিত্তিতে হালাল হারামের যে পার্থক্য দেখা দেয়, তা শরীয়তের কোনো মৌলিক বিষয় নয়, বরং তুচ্ছ ও খুঁটি নাটি ব্যাপার। কোনো ফিকহী মযহাবে ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোনো জিনিস হারাম হওয়ার অর্থ কখনো এ নয় যে, মূল খোদায়ী শরীয়তেই তা হারাম। কেউ যদি এ ধরণের কোনো জিনিসকে তার গবেষণা ইজতিহাদের ভিত্তিতে হালাল বলে মত প্রকাশ করে, তবে এ ব্যাপারে বিতর্ক অবশ্যই চলতে পারে। কিন্তু এটা এমন কোনো ব্যাপারই নয় যে, এজন্য ক্ষিপ্ত হতে হবে এবং এটাকে দ্বীনের মধ্যে রদবদল ও আল্লাহ্র হারামকৃত জিনিসকে হালাল করার অভিযোগ করা যেতে পারে।

এবার আমি মূল প্রসংগে ফিরে যাচ্ছি, যার প্রেক্ষিতে আপনি এসব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

আমার কাছে অবাক লাগছে, একথা আপনি কোথা থেকে জানতে পারলেন যে, বন্দুকের গুলিতে মৃত জন্তু হারাম হবার ব্যাপারে চারজন ইমামই এক মত! চারজন ইমামের কোনো একজনের যুগেও কি বন্দুক আবিষ্কার হয়েছিল? চারজন ইমামের অনুবর্তনকারী আলিমগণের কয়েকজনের কিংবা তাদের সকলের ইমাম চতুষ্টয়ের গবেষণালব্ধ কোনো মাসআলার আলোকে কোনো হুকুম বা ফায়সালা বের করা একটা ভিন্ন জিনিস আর স্বয়ং ইমামগণের কোনো হুকুম ফায়সালা বিবৃত করা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। বন্দুক তো পরবর্তী ফকীহদের যুগে আবিষ্কার হয় এবং তার গঠন প্রণালীতে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে উনবিংশ শতাব্দীতে। ফকীহগণ এ সম্পর্কে কোনো বিধান যদি বর্ণনা করেও থাকেন, তবে তা করেছেন অতীত ইমামগণের ইজতিহাদী বিধানের ভিত্তিতে গবেষণার উপর গবেষণা চালিয়ে। এর ভিত্তিতে কী করে এ দাবী করা যেতে পারে যে ইমাম চতুষ্টয় এ জিনিস হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত ছিলেন?

বন্দুক দ্বারা শিকার করা প্রাণী হালাল হবার ব্যাপারে আমি যে মাসআলা বর্ণনা করেছি, তা কাযী শওকানী থেকে আমি গ্রহণ করিনি। বরঞ্চ আমি সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিষয়টি চয়ন করেছি। ইসলামী শরীয়তে প্রাণীকে শরীয়ত সম্মত পন্থায় যবেহ্ করার যেসব বিধান রয়েছে, মৌলিকভাবে সেগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

১. এক প্রকার প্রাণী আছে আমাদের আয়ত্বাধীন। এগুলোকে আমরা সুনির্দিষ্ট পন্থায় যবেহ করতে পারি। এগুলোর যবেহ্ শুদ্ধ হবার শর্ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এ যবেহ্কে প্রচলিত অর্থে আমরা 'ইচ্ছা মাফিক যবেহ' বলতে পারি।

২. দ্বিতীয় প্রকার প্রাণী হলো সেগুলো, যেগুলো আমাদের আয়ত্বের বাইরে। যেমন বন্য পশু, কিংবা এমন পালিত পশু যা বন্ধন ছুটে বেরিয়ে গেছে এবং বন্য

পশু সম্পর্কিত বিধানের আওতাভুক্ত হয়ে গেছে। অথবা এমন পশু যা কোনো গর্তে নিপতিত হবার কারণে শরয়ী বিধিসম্মত ভাবে যবেহ্ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কিংবা এমন পশু যা কোনো কারণে মুমূর্ষ অবস্থায় পৌঁছে গেছে এবং তাকে যবেহ করার ছুরি খুঁজতে খুঁজতে তার মৃত্যু হবার আশংকা রয়েছে। এরূপ সকল পশুর যবেহ্ করার শর্ত ভিন্ন রকম, এ রকম যবেহ্কে প্রচলিত অর্থে আমরা "অনিবার্য যবেহ্" বলতে পারি।

প্রথম প্রকার পশুর যবেহ্র স্থান হলো কণ্ঠনালী। এরূপ পশু যবেহ্ করার জন্যে তাদের গলা এমনভাবে কেটে ফেলা জরুরী শর্ত, যাতে করে তাদের খাদ্যনালী ও শিরাসমূহ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

বাকী থাকলো দ্বিতীয় প্রকার পশুর যবেহ্র কথা। এ ধরণের পশু যবেহ্র স্থান সেগুলোর গোটা দেহ। যে কোন জিনিস দিয়ে, তা যাই হোক না কেন, শরীরের যে কোন স্থানে এমন পরিমাণ ছিদ্র করে দেয়াই যথেষ্ট, যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়। এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহ্ থেকে যেসব প্রমাণ পাওয়া যায়, তা ধারাবাহিকভাবে নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

(١) أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ(المائدة : ٤)

১. তোমাদের জন্যে সমস্ত পবিত্র জিনিস হালাল করে দেয়া হয়েছে। এবং যেসব শিকারী জন্তুকে তোমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে নিয়েছো যাদেরকে আল্লাহ্র দেওয়া ইলমের ভিত্তিতে তোমরা শিকার করার নিয়ম শিক্ষা দিয়ে থাকো সেগুলো তোমাদের জন্যে যেসব যন্তু ধরে রাখবে তাও তোমরা খেতে পার। অবশ্য তার উপর আল্লাহ্র নাম নেবে।"

এ থেকে জানা গেল যে, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিকারী পশুকে আল্লাহ্র নামে ছাড়া হলে নখ ও দাঁত দ্বারা বন্য পশুর শরীরে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং তা থেকে যে রক্ত প্রবাহিত হয়ে পড়ে তাতেই 'অনিবার্য যবেহ্র' শর্ত পূর্ণ হয়ে যায়। এরূপ শিকারকৃত জন্তু যদি জীবিত পাওয়া না যায় এবং তা যদি নিয়মমাফিক যবেহ করার সুযোগও না থাকে তবু তা হালাল।

২. হযরত আদী ইবনে হাতেম নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করলেনঃ আমরা কি মে'রাদ নিক্ষেপ করে শিকার করতে পারি?" তিনি তাকে জবাব দেনঃ

كل مـا خـرق ومـا اصـاب بـعـرضـه فقتـل فانـه وقـيـذ فـلا تأكلـه - (متفق عليه)

"তা যদি জন্তুর দেহ ছিদ্র করে দেয় তবে খাও। কিন্তু তা যদি চওড়া দিক দিয়ে লেগে জন্তু মারা যায়, তবে তা চোট লেগে মরা জন্তু। তা খেয়োনা।"

মে'রাদ হচ্ছে এক প্রকার ভারী কাষ্ঠ বা লাঠি যার অগ্রভাগে হয়তো লোহার শলাকা লাগানো হয়েছে নয়তো ঐ কাঠকেই শুচাঁলো করে নেয়া হয়েছে। এটার আঘাত লেগে যদি জন্তুর শরীরে কোনো অংশ এতোটা পরিমাণ কেটে যায় বা ছিদ্র হয়ে যায়, যার ফলে রক্ত প্রবাহিত হয়, তবে যবেহ্‌র শর্ত পূর্ণ হবার জন্য এটাই যথেষ্ট।

৩. রাফে' ইবনে খাদীজ বলেন, আমি আরয করলাম ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! কাল শত্রুদের সাথে আমাদের মোকাবেলা হবে, কিন্তু পশু যবেহ্ করার মত ছুরি আমাদের সংগে নেই। এমতাবস্থায় কি আমরা ফাটা বাঁশের চটি দিয়ে যবেহ্ করতে পারবো? জবাবে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ

مـا انـهـر الـدم وذكـر اسـم اللّٰـه فـكل لـيـسـت السـن والـظـفـر -

"আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যে জিনিস দিয়েই রক্ত প্রবাহিত করা হোকনা কেন তা খেয়ে নাও। অবশ্য দাঁত এবং নখ দিয়ে একাজ করবেনা।"

এ থেকে জানা গেলো, আসল জিনিস সেই অস্ত্র নয় যা দিয়ে যবেহ্‌র কাজ সম্পন্ন করা হয়। বরঞ্চ যবেহ্‌র শর্ত পূর্ণ করার জন্যে রক্ত প্রবাহিত করাটাই মুখ্য কথা। নিম্নোক্ত হাদীসটি এ কথাই সমর্থন করে ঃ হযরত আদী ইবনে হাতেম জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাদের কেউ যদি কোনো শিকার পেয়ে যায় আর তার কাছে যদি ছুরি না থাকে, তবে সে পাথরের ধার কিংবা চেরা কাঠ দ্বারা যবেহ্ করতে পারবে কি? তিনি বললেন ঃ

انـهـر الـدم بـمـا شـئـت واذكـر اسـم اللّٰـه -

"যে জিনিস দিয়ে ইচ্ছে রক্ত প্রবাহিত করে দাও এবং আল্লাহ্‌র নাম নাও।"

৪. আবুল উশরা তার পিতা থেকে শুনে বর্ণনা করেন। তিনি রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরয করেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রসূল যবেহ্‌র স্থান শুধু হলক এবং শিরাসমূহের সমন্বয় স্থল নয় কি? তিনি বললেন ঃ

لــو طــعــنــت فى فــخــذهــا لا جــزاء عــنــك ـ
(تــرمــذى ، ابــن مــاجــه ، نســائى ، ابــو داؤد)

"তুমি যদি তার উরুতেও ছিদ্র করে দাও, তাই যথেষ্ট।"

ইমাম আবু দাউদ বলেন ঃ এটা এমন সব জন্তুর যবেহ্ সংক্রান্ত কথা, যা কোনো গর্তে নিপতিত হয়েছে। ইমাম তিরমিযী বলেন ঃ সর্বপ্রকার জরুরী অবস্থায় এভাবেই যবেহ্ করতে হয়।

এতে প্রমাণ হলো, আমাদের আওতা বহির্ভূত যে কোন জন্তুর যবেহ্‌র স্থান তার দেহের প্রতিটি অংশ। এর দ্বারা এটাও প্রমাণ হলো যে, কোন্ অস্ত্র দিয়ে যবেহ্ করা হলো তা আসল বিবেচ্য বিষয় নয়। প্রকৃত বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে, প্রাণীর দেহে এমন পরিমাণ ছিদ্র করে দেয়া যাতে রক্ত প্রবাহিত হয়।

৫. কাআব ইবনে মালিক বলেন ঃ 'সিলা' নামক স্থানে আমাদের বকরীগুলো চরে বেড়াচ্ছিল। হঠাৎ আমাদের দাসী দেখতে পেলো একটা বকরীর মৃতপ্রায় অবস্থা। সংগে সংগে সে একটা পাথর ভেংগে তা দ্বারা বকরীটা যবেহ্ করে দিলো। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে বকরী খাবার অনুমতি প্রদান করেন। (বুখারী)।

আতা ইবনে ইয়াসার বলেন ঃ বনি হারেসার জনৈক ব্যক্তি অহুদের নিকটবর্তী ঘাটিতে একটি উট চরাচ্ছিল। হঠাৎ সে দেখতে পেলো উটটি মরে যাচ্ছে। কিন্তু যবেহ্ করার মতো কোনো অস্ত্র তার কাছে ছিলনা। শেষ পর্যন্ত সে তাবু পোতার একটি খুঁটি নিয়ে উটের গলায় ছিদ্র করে দিলো এবং এতে রক্ত প্রবাহিত হয়ে গেলো। অতপর বিষয়টা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলে তিনি তা খাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন।

ভাংগা পাথরের ধার তো মোটামুটি ধারের সংজ্ঞায় পড়ে। কিন্তু কাঠের সূচালো খুঁটিকে ধারালো অস্ত্রের সংজ্ঞায় কতটা আনা যায় তাতো পরিষ্কার।

উপরোক্ত অকাট্য দলীল প্রমাণসমূহ সম্মুখে রেখে বন্দুকের মাসআলাটি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। বন্দুকের গুলিকে গুলতির ঠাণ্ডা গোল্লার মতো মনে করা ঠিক নয় এবং এর ভিত্তিতে বন্দুক দ্বারা শিকারকৃত মৃত জন্তুকে পাথর বা কাষ্ঠ খণ্ডের পার্শ্বদেশের আঘাতে মৃত জন্তুর মতো মনে করাও ঠিক হবেনা। বন্দুক থেকে গুলি যে শক্তিতে বের হয় এবং যতোটা তীব্র গতিতে (প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ৫০০ গজ) লক্ষ্যস্থলের দিকে ধাবিত হয়, তাতে করে সেটা আর ঠাণ্ডা পাথুরে হয়ে থাকেনা; বরঞ্চ অনেকটা নরম ও প্রায় শাণিত হয়ে দেহ ছিদ্র করে ভিতরে প্রবেশ করে আর এতে করে রক্ত প্রবাহিত হয়ে জন্তুর মৃত্যু ঘটে। এটা শিকারী জন্তুর নখ, দাঁত কিংবা মে'রাদ ও কাঠের খুঁটির অগ্রভাগের ধার

থেকে বেশী কিছু ভিন্নতর নয়। বরঞ্চ রক্ত প্রবাহিত করার ব্যাপারে সেগুলো থেকেও অধিকতর কার্যকর হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

এসব কারণে আমার মতে, আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বন্দুক চালানোর পর তার গুলী বা ছররা দ্বারা কোনো প্রাণীর মৃত্যু ঘটলে তা হালাল না হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এ মতের উপর যদি কেউ নিশ্চিন্ত হতে না পারেন এবং এরূপ জন্তুকে হারামই মনে করেন, তাতেও আমার কোনো আপত্তি নেই। এমনটি আমি কখনো বলবনা যে অবশ্যি তাকে হালাল বলে স্বীকার করতে হবে এবং অবশ্যি খেতে হবে। আমার ইজতিহাদ অনুযায়ী আমি আমল করবো। অন্যাদের ইজতিহাদ অনুযায়ী তা আমল করবেন, কিংবা যে কেউ যে কোনো মুজতাহিদের অনুবর্তণ করতে চাইলে তা করতে পারেন। এ ইজতিহাদী মতপার্থক্য দ্বারা যদিও আমার এবং তাদের মধ্যে হারাম হালালের পার্থক্য পরিলক্ষিত হচ্ছে; কিন্তু তা সত্বেও উভয় পক্ষই একই দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত। এতে কেউ পৃথক পৃথক দ্বীনের অনুসারী হয়ে যায়না। তরজমানুল কুরআন ঃ রবীউল আউয়াল ১৩৬৫, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬।

কুফরী ও ফাসেকী রাষ্ট্রে জীবিকা উপার্জনের সমস্যা

প্রশ্ন ঃ আপনার গ্রন্থাবলী পড়ে আমার বর্তমান জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম সম্পর্কে আমার বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়ে গেছে। কিন্তু কুফরীর উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থায় হালাল উপার্জন প্রায় অকল্পনীয়। চাকুরী, কৃষি ও ব্যবসা বাণিজ্যসহ সকল প্রকার পেশায়ই হারাম ঢুকে পড়েছে। এমতাবস্থায় আমাদের জন্যে জীবিকা উপার্জনের কোনো পথ আছে কি?

জবাব ঃ আপনি যথার্থই বলেছেন। নিঃসন্দেহে কুফরী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে বাস করে বিশুদ্ধ হালাল উপার্জন প্রায় অসম্ভব। কিন্তু আমার রচনাবলীতে উপার্জন মাধ্যমের হালাল হারামের পার্থক্যের উপর গুরুত্বারোপ করার উদ্দেশ্য এ ছিলনা যে, উপার্জনের হালাল মাধ্যম বুঝি কোথাও বর্তমান রয়েছে এবং লোকেরা হারাম মাধ্যম পরিত্যাগ করে তাই গ্রহণ করুক। বরঞ্চ আমার উদ্দেশ্য এ ছিলো যে, মন মগজে হালাল হারামের পার্থক্য সৃষ্টি হওয়ার পর একজন খাঁটি মুসলিম তার সমাজ পরিবেশকে পর্যালোচনা করে দেখবে, তখন সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারবে যে, এই কুফরী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে চতুর্দিক থেকে সে খারাবী ও নোংরামীর মধ্যে কতটা ডুবে গিয়েছে। এতে করে সত্যি যদি তার মনে পবিত্র হবার আকাংখা জাগে, তবে তার মধ্যে এ নোংরা ব্যবস্থা উৎখাত ও পরিবর্তন করার তীব্র জযবা সৃষ্টি হবে। প্রতিটি মুহূর্তে সে এ নোংরা রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থার প্রতি তীব্র অসন্তোষ ও ঘৃণা প্রকাশ করতে থাকবে।

এই নীতিগত কথাটা বুঝে নেয়ার পর বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে যে জিনিসটা আমাদের পক্ষে করা সম্ভব থাকে, তা হলো আমরা বেশী হারামকে পরিত্যাগ করে বাধ্য হয়ে কম হারাম কিংবা আংশিক হারাম মিশ্রিত রিযৃক গ্রহণ করবো। এই সমাজ ব্যবস্থায় পূর্ণ ও নিরেট হালাল দ্বারা জীবনের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব নয়। এখন আপনি কোন্ পেশা অবলম্বনের মাধ্যমে অধিক হারাম ত্যাগ পূর্বক স্বল্পতম হারাম মিশ্রিত উপার্জন পন্থা গ্রহণ করতে পারেন, তা সম্পূর্ণরূপে পরিবেশ পরিস্থিতি এবং আপনার ক্ষমতা ও যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। এরি উপর নির্ভর করবে যে আপনি কোন্ পেশা অবলম্বনের মাধ্যমে এই কুফরী সমাজ ব্যবস্থার মজবুতী ও স্থায়িত্বের জন্যে নুন্যতম সহযোগিতা করতে পারেন। অবশ্য একাজে বাস্তব সাফল্য লাভ করার জন্যে একটি শর্ত হলো এই যে, আপনি আপনার জীবনের মানদণ্ড পরিবর্তন করার জন্যে পুরোপুরি প্রস্তুত হয়ে যাবেন, আমি অনেক লোককে দেখেছি যাদের অন্তরে হালাল হারামের মধ্যে পার্থক্য করার অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে, তারা শর্তারোপ করে বসেন যে, হালাল পন্থাতো অবলম্বন করবো, কিন্তু আমার জীবন যাপনের মান সে রকমই থাকতে হবে, হারাম উপার্জনের সময় যে রকম ছিলো। এ শর্ত তাদেরকে হারাম উপার্জনে নিমজ্জিত রাখতে বাধ্য করে। হালাল উপার্জনের সিদ্ধান্তের উপর মানুষ তখনই টিকে থাকতে পারে, যখন সে এ ফায়সালায় উপনীত হবে যে আমার খানা সর্বাবস্থায়ই হালাল হতে হবে, চাই সেটা পোলাও হোক কিংবা ডাল ভাত। আমার পোশাক সর্বাবস্থায় হালাল হতে হবে, চাই সেটা পাতলা মিহি সূতার কাপড় হোক কিংবা তালিযুক্ত মোটা কাপড়। তরজমানুল কুরআন ঃ রমযান-শাওয়াল ঃ ১৩৬২, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ঃ ১৯৪৩।

ঘুষ ও খিয়ানত

প্রশ্ন ঃ সরকারী কর্মচারীদেরকে লোকেরা তাদের চাওয়া ও জোর জবরদস্তি ছাড়াই সেচ্ছায় যে হাদিয়া ও উপঢৌকন প্রদান করে, তারা সাধারণত এটাকে জায়েয মনে করে। তাদের মতে এটা ঘুষের সংজ্ঞায় পড়েনা। সুতরাং এটা হালাল হওয়া উচিত। এমনি করে সরকারী কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে যে সরকারী সম্পদ থাকে তা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করাকেও তারা জায়েয মনে করে। আমার পরিচিতির সীমায় এ ধরনের যেসব লোক রয়েছে তাদের আমি বুঝানোর চেষ্টা করি। কিন্তু আমার কথায় তারা আশ্বস্ত হয়না।

জবাব ঃ কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিকট কোনো অর্থ সম্পত্তির মালিকানা হস্তান্তরের বৈধ পন্থা মাত্র চারটি ঃ

এক, কারো প্রতি সন্তুষ্টি বা আকৃষ্ট হয়ে তাকে দান বা হেবা করা।

দুই, পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে ক্রয় বিক্রয় করা।

তিন, পারস্পরিক সমঝোতা ও চুক্তির ভিত্তিতে চাকুরী ও খিদমতের বেতন ভাতা প্রদান করা।

চার, উত্তরাধিকার, যা আইনগতভাবে একজনের নিকট থেকে আরেকজন লাভ করে থাকে।

এ চারটি ব্যতীত সম্পদের মালিকানা হস্তান্তরের যাবতীয় পন্থা পদ্ধতি হারাম। এখন দেখা দরকার, কোন অফিসার বা কর্মচারী কার্য সম্পাদনে আগত কোন ব্যক্তির নিকট থেকে যে টাকা বা সম্পদ গ্রহণ করে, কিংবা তার রক্ষণাবেক্ষণাধীন সরকারী তথা জনগণের সম্পদ থেকে সে যে সুবিধা ভোগ করে, তা এ চারটি পর্যায়ের কোন্ পর্যায়ে পড়ে?

এ কথা পরিষ্কার যে, তা ক্রয় বিক্রয় বা উত্তরাধিকারের সংজ্ঞায় পড়েনা। তবে কি তা দান বা হেবা? এ জিজ্ঞাসার ফায়সালা হওয়ার জন্যে একটি জবাবই যথেষ্ট। তা হলো, একজন কর্মচারী তার এই পদে অধিষ্ঠিত না থাকলে কিংবা চাকুরী থেকে অবসর নেয়ার পরও কি এই দান বা হেবা লাভ করতো? এ প্রশ্নের জবাব যদি 'না' হয় তবে এটা হেবা বা দান নয়। ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে ঐ টাকা তার কাছে এসেছে; ব্যক্তিগত সম্পর্ক, ভালবাসা কিংবা সহানুভূতির ভিত্তিতে নয়। আর নাকি চাকুরী বা পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত থেকে তিনি যে খিদমত প্রদান করেন এটা তার বেতন বা ভাতা? একথা পরিষ্কার, এটা তার চাকুরী বা খিদমতের বেতন বা ভাতা নয়। কারণ ভাতা তো সেই পারিশ্রমিক ও এলাউয়েন্স যা একজন কর্মচারী হিসেবে সে কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাভ করে থাকে। এ কয়টি পন্থার বাইরে কর্মচারীরা তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অন্য যে কোন পন্থায় যা কিছু লাভ করে থাকে তা হয়তো সে খিয়ানত করে, নয়তো পাবলিক ফাণ্ড তসরুফ করে, অথবা নাজায়েয কাজের বিনিময় গ্রহণ করে যা চাকারীবিধির বিরোধী কাজ করার কারণে কেউ লাভ করে থাকে। অথবা এটা বৈধ কাজের অবৈধ মজুরী। কারণ চাকুরীবিধি অনুযায়ী কাজ করার বিনিময়ে সে তো বেতনই গ্রহণ করে থাকে। এরপর অতিরিক্ত মজুরী গ্রহণ করা নির্ঘাত হারামখোরী ছাড়া আর কিছুই নয়।

এতো হলো নীতিগত আলোচনা। এখন দেখুন এ সম্পর্কে শরয়ী বিধানে কি রয়েছে ঃ

১. "আবু হুমাইদ সায়েদী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সরকারী কর্মচারীরা যে হাদিয়া আদায় করে তা খিয়ানত।"

২. "এই আবু হুমাইদ রাদিয়াল্লহু আনহু থেকেই বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে লুতবিয়া নামক এক ব্যক্তিকে কর্মচারী নিয়োগ করে 'আযদ গোত্রে পাঠালেন। সে সেখান থেকে সরকারী অর্থ সম্পদ এনে বাইতুল মালে জমা দেয়ার সময় বললোঃ এগুলি হলো সরকারী মাল আর এগুলো আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। তার বক্তব্য শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উঠে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর বললেন ঃ অতপর! আমি তোমাদের কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ্ প্রদত্ত আমার এ সরকারী প্রশাসনের কোনো দায়িত্ব দিয়ে পাঠাই এবং সে ফিরে এসে বলে ঃ এগুলো হলো সরকারী মাল আর এগুলো আমাকে হাদিয়া দেয়া হয়েছে। একথা যদি সত্য হয় যে, লোকেরা এমনিতেই তাকে হাদিয়া প্রদান করে, তবে সে তার মা বাবার ঘরে বসে থাকেনা কেন যাতে করে লোকেরা তাকে হাদিয়া পৌছে দেয়?"

৩. "বুরাইদা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তিকে আমরা কোনো সরকারী কাজে নিয়োগ করে বেতন বা ভাতা প্রদান করি, সে যদি এ বেতন ভাতার বাইরে কিছু আদায় করে তবে তা খিয়ানত।"

৪. "রুয়েফা ইবনে সাবিত থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন এমন কাজ না করে যে, সে মুসলমানদের (অর্থাৎ জনগণের) তহবিল থেকে কোনো জন্তুকে সওয়ারী হিসেবে ব্যবহার করলো এবং নিষ্কর্মা হবার পর সেটাকে সরকারী আস্তাবলে ঢুকিয়ে দিলো। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন এমন কাজ না করে যে, সে মুসলমানদের বাইতুল মাল থেকে কোনো পোশাক পরিধান করে পুরাতন হবার পর তা আবার বাইতুল মালে ফেরত দেয়।"

৫. "আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষ দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।"

৬. "আদী ইবনে আমীরা আলকিন্দী বলেনঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হে লোকেরা! যে ব্যক্তিকে আমাদের কোনো সরকারী কাজে নিযুক্ত করা হলো, তারপর সে এক টুকরা সূতা কিংবা তার চাইতে ক্ষুদ্রতর কোনো জিনিস গোপনে ব্যবহার করলো, তবে তা খিয়ানত। কিয়ামতের দিন এ খিয়ানতের বোঝা মাথায় করে সে হাযির হবে।"

এ বিষয়টি সম্পর্কে এগুলো হলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী। এই বক্তব্যগুলো এতোই স্পষ্ট যে, এগুলোর কোন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। যারা নিজেদের হারামখোরীর পক্ষে নানা রকম অজুহাতের আশ্রয় গ্রহণ করে, কথার ছলচাতুরীর মাধ্যমে তাকে হালাল বানানোর চেষ্টা করে, তাদের বলে দিতে হবে যে, হারাম যদি খাবেই তবে তা অন্তত হারাম মনে করেই খেয়ো। হয়তো আল্লাহ কখনো এ থেকে বাঁচার তওফিক দিতেও পারেন। কিন্তু হারামকে যদি হালাল মনে করে খাওয়া হয় তবে বিবেকের মৃত্যু ঘটবে। অতপর তোমাদের আর কখনো হারাম থেকে বাঁচার ইচ্ছাটুকুও জাগ্রত হবেনা। এ অবস্থায় যখন আল্লাহর দরবারে হিসাব দেয়ার জন্যে দণ্ডায়মান হবে, তখন জানতে পারবে, তোমাদের বদলে দেবার কারণে প্রকৃত সত্য বদলে যায়নি। হারামকে তোমরা যতোই হালাল বানানোর চেষ্টা করনা কেন, হারাম হারামই থেকেছে।

অতপর এ লোকদের বলুন। আল্লাহ্, আখিরাত, হিসাব নিকাশ এবং শাস্তি ও পুরস্কার এসবই যখন তোমাদের মতে অলীক কাহিনী, তখন তো হালাল হারামের আলোচনাটাই বাহুল্য। যে ক্ষেতে ঘাস দেখবে পশুর মত সেক্ষেতেই ঢুকে পড়বে এবং জায়েয না জায়েযের প্রশ্ন না করেই যতো পারো খেয়ে যাবে। কিন্তু যদি আল্লাহ আছেনই বলে তোমাদের বিশ্বাস থাকে আর কোনো দিন তাঁর নিকট গিয়ে হিসাব দিতে হবে বলেও তোমাদের বিশ্বাস থাকে, তবে এ কথাটা একটু ভেবে দেখ যে, এ হারাম শেষ পর্যন্ত কার জন্যে কামাই করছো? নিজের দেহ ও আত্মার প্রতিপালনের জন্যে? কিন্তু এই দেহ আর আত্মা তো এ সেবা দ্বারা তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবেনা। বরঞ্চ এর বিপরীত এগুলি তোমাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে এই বলে ফরিয়াদ করবেঃ হে আল্লাহ তুমি আমাদের এ যালিমের নিকট আমানত রেখেছিলে আর সে হারাম জীবিকা দ্বারা আমাদের লালন করেছে। আর এ হারাম উপার্জন কি বিবি বাচ্চাদের জন্যে করছো? কিন্তু কিয়ামতের দিন এরাও তোমার দুশমন হয়ে যাবে এবং তোমার বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করবে, এ যালিম নিজেও পথভ্রষ্ট হয়েছে আর আমাদেরও পথভ্রষ্ট করেছে। এর পরও কেন নিজেকে আল্লাহ্র আযাবের কঠিন বিপদে নিক্ষেপ করছো? এ অবৈধ কাজে কে তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ হবে? এ অপকর্মের মাধ্যমে কার নিকট থেকে তোমরা সুসম্পর্ক ও সহানুভূতির আশা রাখ? খোদাহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিজেই অপবিত্র, যার একটি অংশ হিসেবে তোমরা কাজ করছো। খোদাহীন রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবস্থা ঠিক শূকরের দেহ কাঠামোর মতো, যার প্রতিটি অংগ প্রত্যংগ এবং শিরা উপশিরায় হারাম পরিব্যাপ্ত। এর কল কবজা হয়ে তোমরা আগেই বিরাট গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে আছ। তদুপরি খিয়ানত, ঘুষ এবং

অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে তোমরা কেন নিজেদের আরো অধিক বিপদে নিক্ষেপ করছো? মৃত্যু কি কখনো আসবেনা? নাকি মৃত্যুর পরের জন্যে এমন কোন নিরাপদ আশ্রয় ঠিক করে রেখেছো, যেখানে অবস্থান করে আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেঁচে যাওয়ার প্রত্যাশায় রয়েছো? তরজমানুল কুরআন ঃ রমযান শাওয়াল ১৩৬২ হিঃ, সেপ্টেম্বর অক্টোবর ১৯৪৩ ইং।

ঘুষ ও খিয়ানত সম্পর্কে আরো দুটি প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ তরজমানুল কুরআনের বিগত কোনো একটি সংখ্যায় 'রাসায়েল ও মাসায়েল' শিরোনামে আপনি ঘুষ ও খিয়ানত সম্পর্কে যেসব মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেগুলো সম্পর্কেই আমার কাছে আরো কিছু প্রশ্ন আছে। আশা করি দলিল প্রমাণ সহ এগুলোর জবাব দিয়ে আমার এবং আমার কোনো কোনো সাথী বন্ধুর সন্দেহ সংশয় দূর করবেন। প্রশ্নগুলো নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. সরকার যেসব অফিসারদের কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিদর্শন ও নিরীক্ষণের জন্যে সাময়িকভাবে নিযুক্ত করেন, তাদেরকে টি পার্টি দেয়াও কি ঘুষ বলে গণ্য হবে? এরাতো সম্ভবত প্রচলিত অর্থে অফিসারের মর্যাদা রাখেনা। সুতরাং এদের খাতির যত্ন করতে দোষ কি?

২. একদল লোকের ধারণা, যেহেতু বর্তমান ইংরেজ সরকারের অর্থ সম্পদ বিশেষ ভাবে জনকল্যাণের কাজে ব্যয় না হয়ে তা ব্যয় হয় তাদের নিজেদেরই কল্যাণ ও নিরাপত্তার কাজে, সুতরাং যে কোনো পন্থায় এ অর্থ সম্পদ ভোগ করা ও লুটে পুটে খাওয়া জায়েয। অর্থাৎ খিয়ানত, ঘুষ ইত্যাদি পন্থায়। এ ধারণার পক্ষে দলিল ও যুক্তি হলো এই যে, অকাট্য ভাবে হারাম হওয়া সত্ত্বেও বড় বড় আলেমদের ফতোয়া অনুযায়ী সরকারী ব্যাংক থেকে সুদ আদায় করে নেয়া শুধু জায়েযই নয় বরঞ্চ জরুরী। কারণ তা যদি না নিয়ে ব্যাংকের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়, তখন খৃষ্টান মিশনারীদের মাধ্যমে তা স্বয়ং ইসলামেরই বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে। সুতরাং বলুন দেখি, যে অর্থ সম্পদ সরকারের নিজের নয়, বরং প্রজাদের নিকট থেকে জোর যুলুম করে আদায় করা হয় এবং যা বাতিল সরকারের মজবুত করার কাজে ব্যয় হয় তা কেন যে কোনো পন্থায় ফেরত নেয়া হবেনা?

জবাব ঃ আপনার প্রশ্নাবলীর জবাব দেয়ার আগে আপনার মন মগজে আমি এ কথাটি বদ্ধমূল করে দিতে চাই যে, আমরা হালাল হারাম এবং জায়েয নাজায়েযের পার্থক্যের ওপর যে গুরুত্বারোপ করছি এবং লোকদের নৈতিক দায়িত্ব উপলব্ধি করা ও সে অনুযায়ী চলার যে তাকিদ করছি, তার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য কখনো এ নয় যে, আমরা বাতিল রাষ্ট্র শক্তিকে এমনসব

পরহেজগার প্রজা সরবরাহ করতে চাই, যারা তাদের জন্য কম পেরেশানীর কারণ হবে। প্রকৃত পক্ষে এই বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার স্বাভাবিক ও অবশ্যম্ভাবী ফল হলো, এখানে মানুষ নৈতিক দায়িত্বের ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং নিজেদের ইচ্ছা, বাসনা ও প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে আইনগত বাধা ছাড়া আর সকল প্রকার বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। কর্মচারীদের ঘুষখোর এবং খিয়ানতকারী হওয়া আর ব্যাপক অর্থে প্রজা সাধারণের চোর হওয়া এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। এই রাষ্ট্র ব্যবস্থা এই মানের বীজই বপন করছে। আর সে যেমন বীজ বপন করছে তেমন ফল লাভেরই উপযুক্ত। একথা পরিষ্কার, খিয়ানতকারী, চোর এবং দুশ্চরিত্র সম্পন্ন লোকদের নেতৃত্বে নৈতিক পবিত্রতার অধিকারী লোকেরা প্রতিপালিত হতে পারেনা। আর নৈতিক চরিত্রের আলোচনা দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য কখনো এ নয় যে, আমরা এসব চরিত্রহীন দুরাচার শাসকদেরকে তাদের নিকৃষ্ট কৃষি কাজের বিষাক্ত ফসল লাভ থেকে বাঁচাবো এবং তাদের জন্য উৎকৃষ্ট ফলাফল সরবরাহ করবো। না, তা কখনো নয়। বরঞ্চ আমাদের যতো চিন্তা তাতো কেবল আমাদেরই নৈতিক চরিত্র ও আচার আচরণ সম্পর্কে। এই খারাপ রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রভাব থেকে আমাদের অধিক অধিক সংখ্যক ভাইদের আমরা বাঁচাতে চাই। তাদের মধ্যে এমন সব নৈতিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করতে চাই, যার ফলে আল্লাহ তাআলার দৃষ্টিতে তারা বর্তমান চরিত্রহীন দুষ্কৃতিকারী শাসক ও কর্মচারীদের তুলনায় অধিকতর সৎ ও সংশোধনকামী বলে পরিগণিত হয় এবং আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার নেতৃত্বের জন্যে ওদের তুলনায় এদেরকে অধিকতর যোগ্য সাব্যস্ত করেন। এতোদুদ্দেশ্যেই আমরা লোকদের সেসব অন্যায় ও খারাবী থেকে আত্মরক্ষার পরামর্শ দিয়ে থাকি যেগুলোতে লিপ্ত থাকা বর্তমান শাসন ব্যবস্থা মোকাবিলায় দোষনীয় তো নয়ই বরঞ্চ কৃতিত্বের সংজ্ঞায় পড়তে পারে। কিন্তু নৈতিকতা ও শরীয়তের দৃষ্টিতে এ কাজগুলো দ্ব্যর্থহীনভাবে নিন্দনীয়।

এখন আমি ধারাবাহিক ভাবে আপনার প্রশ্নাবলীর জবাব পেশ করছি ঃ

১. আমার মনে হয়, সরকারী কর্মচারীদের নিজস্ব বিভাগের স্থায়ী অফিসার হোক কিংবা অন্য কোনো বিভাগের লোক হোক যাদেরকে তাদের কার্যক্রম পরীক্ষা নিরীক্ষা ও তদারক ইত্যাদি কাজে নিয়োগ করা হয় এদের প্রতি হাজারে একজনের সাথেও সম্ভবত তাদের আন্তরিক ভালবাসা ও ব্যক্তিগত ভক্তি শ্রদ্ধাগত সম্পর্ক থাকেনা। তাদের সাথে স্বার্থ জড়িত না থাকলে সম্ভবত কেউই তাদের খাতির যত্ন করতনা। এসব আমন্ত্রণ ও টি পার্টি এ উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে, যাতে করে এর দ্বারা কোনো ফায়দা বা কোনো সুবিধা হাসিল করা যায়; কিম্বা অন্তত পক্ষে নিজের অন্যায় ও দুষ্কৃতি চাপা পড়ে যায়। এজন্যে প্রকৃতপক্ষে এটাও

সাধারণ ও প্রচলিত অর্থে ঘুষের সংজ্ঞায় পড়ে যায়। কিন্তু যেমন আমি উপরে আমার নীতিগত বিশ্লেষণে বলেছি, বর্তমান অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের যা কিছু অভিযোগ, তার মূল কারণ হলো, এ ধরনের পার্টি দেয়া এবং এসব পার্টিতে আমন্ত্রণ গ্রহণ করার ফলে আমাদের ভাইদের মধ্যে অবৈধ পন্থায় কাজ আদায় করা এবং লোকদের থেকে অবৈধ স্বার্থ উদ্ধারের রোগ লালিত হয়ে থাকে। নতুবা এই রাষ্ট্র ব্যবস্থার গোটা কাঠামোই তো হারাম দিয়ে তৈরী। তা হারাম ভক্ষণ করে এবং হারামই বমন করে থাকে।

২. এ প্রশ্নটা আপনি যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তাতে মৌলিক ভ্রান্তি রয়েছে। আপনি বা যেসব লোক এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন, তারা কেবল এক পক্ষের নিকট কি ধরনের অর্থ সম্পদ রয়েছে, সেদিকটাই লক্ষ্য করেছেন, কিন্তু অপর পক্ষ কোন্ ধরনের ন্যায় ও হকের ভিত্তিতে তা হস্তগত করেছে, সে দিকটা লক্ষ্য করছেননা। মনে করুন, এক ব্যক্তি সম্পর্কে আমি জানি, সে চোর এবং তার কাছে যতো মাল আছে সবই চোরাই মাল। কিন্তু এর অর্থ কি এই যে, তার ওখানে চুরি করা এবং তার পকেট কাটা আমার জন্য বৈধ? অবশ্য এটা যদি জানা থাকে যে, আমার চুরি যাওয়া অমুক নির্দিষ্ট জিনিসটি তার কব্জায় রয়েছে তবে শক্তি ও সুযোগ পেলেই তা হস্তগত করাটা জায়েয মনে করার মধ্যে কোনো দোষ নেই। কিন্তু সাধারণভাবে একথা ধরে নেয়া ঠিক নয় যে, চোরের হস্তগত সম্পদ সব লোকের জন্যে সব অবস্থায় লুণ্ঠন করা জায়েয।

আপনি সুদের যে উদাহরণ দিয়েছেন তা এখানে খাপ খায়না। কারণ সুদ তো আমরা ব্যাঙ্কারদের থেকে ছিনিয়ে বা লুণ্ঠন করে নিইনা। বরঞ্চ সুদ তারাই তাদের নিয়ম মাফিক বের করে। আর আমরা বাধ্য হয়ে তা গ্রহণ করি। কারণ তা গ্রহণ না করার অর্থ হলো, ডাকাতদের অস্ত্রাগারে আরো কিছু তরবারী ত্যাগ করা, যাতে করে মযলুমদের জবেহ করার ব্যাপারে তারা আরো সহায়তা লাভ করে। তবে এ সুদ আদায় করে এনে নিজের কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়। বরঞ্চ তা দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া উচিত। কেননা এই সুদ মূলত সেই সব গরীব ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের পকেট থেকেই আসে, যারা অপর কারো প্রতি এ বিপদ নিক্ষেপ করার সামর্থ রাখেনা।

একথাটি আবারো ভালোভাবে বুঝে নেয়া দরকার, আমরা সরকারী অর্থ সম্পদে হস্তক্ষেপ করার বিরোধিতা এ জন্যে করছিনা যে, এ সরকার কোনো বিশ্বস্ত আচরণ লাভের যোগ্য। বরঞ্চ আমাদের মধ্যে অধিকার ছাড়াই সম্পদ লাভের নিকৃষ্ট ব্যাধি লালিত না হওয়ার জন্যেই আমরা এ নীতি অবলম্বন করছি। তরজমানুল কুরআন ঃ রবীউল আওয়াল, রবীউসসানী ঃ ১৩৬৩, মার্চ, এপ্রিল ঃ ১৯৪৪ ইং।

ইসলামের দৃষ্টিতে ওকালতি পেশা

প্রশ্ন ঃ সম্প্রতি আমি ওকালতি পেশা গ্রহণ করেছি। এ পেশায় বিশেষভাবে সাফল্যও অর্জন করেছি। কিন্তু আমি দেখছি একজন উকিলকে প্রতিদিনই খোদায়ী আইনের বিপরীত মানব রচিত আইনের ভিত্তিতে মোকদ্দমা পরিচালনা করতে হয়। সে পূর্ণ শক্তি ও যোগ্যতা কাজে লাগিয়ে এমন জিনিসকে সত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করে যাকে মানব রচিত আইন সত্য বলে ঘোষণা করেছে, খোদায়ী আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে তা সত্য হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায়না। এমনি করে খোদায়ী আইনের দৃষ্টিতে সত্য হলেও যা মানবরচিত আইনের দৃষ্টিতে বাতিল ও অসত্য, তাকেই সে বাতিল ও অসত্য প্রমাণ করে। অত্যন্ত সচেতন বিবেকবান উকিলরাও আদালতের দরজায় পা রাখতেই হক ও বাতিল এবং অধিকার ও দায়িত্বের সেই মানদণ্ডকেই স্বীকার করে নেয়, যা মানুষ তার অপূর্ণ সীমাবদ্ধ জ্ঞান দ্বারা নিজেদেরই ইচ্ছা ও কামনার ভিত্তিতে নির্ধারণ করে রেখেছে। মোটকথা, একজন উকিল কুফরের উত্তম প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করে থাকে। কিন্তু অপর দিকে এমন কোনো পেশাও দেখছিনা যা অবলম্বনের মাধ্যমে মানুষ নাপাকী থেকে রক্ষা পেতে পারে। এ নাস্তিক্যবাদী সমস্যার সমাধান কি? সোয়ারীর জিনে পা রেখে তাকে ধাবিত করার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষাকারী পথিকের মতোই পূর্ণ ভাবে আমল করার নিয়তে আমি এ প্রশ্ন করছি।

জবাব ঃ আপনার পেশা সম্পর্কে আপনি যে মত প্রতিষ্ঠা করেছেন তা শতকরা একশ ভাগ সঠিক। আপনার এ রায় আপনার সুস্থ বিবেক বুদ্ধির প্রমাণবহ। আপনার মতো সুস্থ বিবেকের অধিকারী লোকদের জন্যে এটা বুঝা মোটেই কঠিন ব্যাপার নয় যে, একটি কুফরী ব্যবস্থা যখন কোনো দেশকে পুরোপুরি গ্রাস করে নেয়, তখন সে দেশে বাস করে কোনো ব্যক্তির পক্ষে নির্ভেজাল হালাল জীবিকা উপার্জন করা এবং শরীয়ত মোতাবেক যিন্দেগী যাপন করা প্রায় অসম্ভব। তবে করণীয় কেবল এতোটুকুই থাকে যে, অধিক হারামকে ত্যাগ করে স্বল্প হারাম কিংবা এতোটুকু হারাম বরদাশত করতে হবে, যা থেকে কোনো অবস্থাতেই রেহাই পাওয়ার পথ নেই এবং বিদ্রোহাত্মক মনোভাব থেকে মুক্ত থেকে কেবল বাধ্য হয়ে এমন ধরনের গুনাহ বরদাশত করতে হবে যা থেকে রক্ষা পাওয়া অসম্ভব। আপনি নিজেই ভালোভাবে বুঝতে পেরেছেন, ওকালতি খোদায়ী আইনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য ও স্পষ্ট বিদ্রোহ। পক্ষান্তরে অন্য কোনো পেশায় যদি হারামের মিশ্রণ থাকেও, তাতে অন্তত বিদ্রোহ থেকে তো কম গুনাহ্ হবে। ব্যবসায়, কৃষি, শিল্প, মুজুরী, প্রাইভেট ফারমের চাকুরী এবং এ ধরনের

অন্যান্য পেশা অবলম্বন করা যেতে পারে। বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় এগুলোও গুনাহের কাজ, তবে এ পর্যায়ের গুনাহ থেকে কোনো অবস্থাতেই মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়। এগুলো অন্তত ততোটুকু হারাম তো নয় যতোটুকু হারাম এই ওকালতির বিদ্রোহ।[১] তরজমানুল কুরআন ঃ মুহাররম সফর ঃ ১৩৬৩, জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৪৪, ইং।

আলিমের জাহেলী ধারণা

প্রশ্ন ঃ "একজন আলিমে দ্বীন ও পরহেযগার বুযুর্গ ব্যক্তি খুতবাত (হাকীকত সিরিজ) ও সিয়াসী কাশমকাশ ৩য় খণ্ডের উপর মত প্রকাশ করতে দিয়ে বলেনঃ সরকারী চাকুরী গায়রুল্লাহর আনুগত্যের সংজ্ঞায় পড়েনা। এটাতো নিজের এবং নিজ দেশবাসীর খেদমত। হিন্দু ও শিখেরা দেশের অর্থভাণ্ডারের পরিচালকদের পদে অধিষ্ঠিত থাকবে আর মুসলমানেরা শূদ্রদের মতো কেবল তাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে আর কোনো সরকারী চাকুরী যদি তারা গ্রহণ করেও তবে সে চাকুরীর বিনিমিয়ে প্রাপ্ত বেতনকে হারাম মনে করে খাবে এটা একটা মারাত্মক ভুল কর্মপন্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমি খুবই বিচলিত যে তাকে এর কি জবাব দেবো?"

জবাব ঃ আপনি এখানে যে ব্যক্তির অভিযোগ উল্লেখ করলেন তিনি আলিমে দ্বীন এবং পরহেযগার, একথা যদি আপনি তার সম্পর্কে না লিখতেন তবে তার অভিযোগগুলো পড়ে তার সম্পর্কে আমি ঠিক এর বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হতাম এবং তার এ বক্তব্যের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করতাম। কিন্তু মাশাআল্লাহ তিনি একজন আলিমে দ্বীন এবং পরহেযগারও, আপনার থেকে এটা জানতে পেরে তার এসব ধ্যান ধারণা আমার কাছে চরম বিস্ময়কর ঠেকছে। ইলমের অধিকারী লোকেরা যখন এ ধরনের কথাবার্তা বলে তখন তাদের নিকট থেকে কয়েক ক্রোশ দূরে অবস্থান করা উচিত। গোমরাহ জাহিলদের তো বুঝানো যেতে পারে। কিন্তু গোমরাহ আলিমদের বুঝানোর চেষ্টা করা নিরর্থক। এ ব্যাপারে আমি যা কিছু লিখলাম এর চাইতে অধিক কিছু লেখা আমার সাধ্যাতীত। এ লেখা পড়েও যদি তারা আশ্বস্ত না হয়, তবে তারা যে পথে চলছে চলুক। মৃত্যুর পর প্রকৃত সত্য তাদের কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে এবং আমার কাছেও। তরজমানুল কুরআন ঃ মুহাররম সফর১৩৬৩, জানুয়ারী ফেব্রুয়ারী-১৯৪৪, ইং।

---

১. ওকালতি পেশা সম্পর্কে জানার জন্যে গ্রন্থকারের 'ইসলামী কানুন' (ইসলামী আইন) নামক গ্রন্থ' দ্রষ্টব্য।

হারাম উপার্জনকারীর সাথে অর্থনৈতিক সম্পর্কের সীমা

প্রশ্ন ঃ ১. এমন যৌথ ব্যবসায়ে অংশ নেয়া কি বৈধ যেখানে সৎ ও অসৎ উভয় ধরনের লোকই রয়েছে এবং অসৎ অংশীদারদের মধ্যে মদ বিক্রেতা এবং সুদখোরও রয়েছে?

২. হারাম উপার্জনকারীর নিকট থেকে টাকা কর্জ নিয়ে সে টাকা দিয়ে ব্যবসা করা যায় কি?

৩. হারাম উপার্জনকারীর ঘরে চাকর হিসেবে থাকা কিংবা তার ঘরে পানাহার করা জায়েয কি?

জবাব ঃ ১. হাঁ, ব্যবসাটা যদি হালাল হয় এবং তা যদি হালাল পন্থায় করা হয়, তবে এ ব্যবসায়ের অন্যান্য অংশীদার নিজেদের অর্থ হারাম উপায়ে উপার্জন করে আনার কারণে তাতে কোনো পরহেযগার ব্যক্তির অংশ গ্রহণ নাজায়েয হতে পারেনা। আপনার নিজের পুঁজি যদি হালাল হয় এবং ব্যবসা যদি হালাল পন্থায় করা হয়, সেক্ষেত্রে আপনার পুঁজি দ্বারা আপনার যে মুনাফা হবে তা আপনার জন্যে হালাল।

২. হারাম উপার্জনকারীর নিকট থেকে অর্থ কর্জ নিয়ে ব্যবসা করাতে কোনো দোষ নেই। সে অবৈধ পন্থায় টাকা উপার্জন করে থাকলেও আপনি তো তা বৈধ পন্থায় লাভ করলেন।

৩. হারাম উপার্জনকারী দুই ধরনের হয়ে থাকে। এক ধরনের উপার্জনকারীর উপার্জন অশ্লীল ও নোংরা উপার্জনের সংজ্ঞায় পড়ে। যেমনঃ বেশ্যাবৃত্তির উপার্জন। তার ঘরের চাকর হওয়াতো দূরের কথা, তার নিকটবর্তী হওয়াও জায়েয নয়। দ্বিতীয় ধরণের হারাম উপার্জনকারী হচ্ছে সেইসব লোক যাদের পেশা হারাম বটে কিন্তু তা অশ্লীলতার সংজ্ঞায় পড়েনা। যেমন ঃ ওকালতি বা সুদী কারবারের মাধ্যমে উপার্জনকারী। এসব লোকের কাছে এমন কাজের চাকুরী নেয়া হারাম যাতে চাকুরীজীবী স্বয়ং হারাম কাজের সাথে জড়িত হয়ে পড়ে। যেমন ঃ সুদখোরের সুদী টাকা আদায় করার কাজ কিংবা উকিলের মুহুরীর কাজ। কিন্তু তার ঘরে এমন কাজের চাকুরী বা মজদুরী করা বৈধ যে কাজটি স্বয়ং বৈধ। যেমন ঃ সহিস বা ড্রাইভিং এর কাজ কিংবা ঘর তৈরির কাজ। বাকী থাকলো তার ঘরে পানাহারের কথা। এটা বর্জন করাই উত্তম। তরজমানুল কুরআন ঃ মুহাররম-সফর ১৩৬৩, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪, ইং।

পিতা মাতার সন্দেহজনক ধন সম্পদ ও আয় থেকে উপকৃত হওয়া

প্রশ্ন ঃ দীর্ঘদিন থেকে জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হওয়ার জন্যে নিজেকে তৈরী করে আসছি। কিন্তু নিজেকে হারাম জিনিস থেকে মুক্ত করা এবং হালাল

ও পবিত্র পন্থায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী লাভে সফল হতে পারছিনে। আমার পিতৃপুরুষদের জীবিকা উপার্জনের মাধ্যম ছিল জমিদারী। আর এ ব্যাপারে আমার জানা রয়েছে যে, দীর্ঘকাল থেকে আমাদের জমি-জমা শরীয়ত মোতাবেক ওয়ারিশদের মধ্যে বন্টন হয়ে আসছেনা আর এগুলো থেকে শরয়ী হক প্রদান করা হয়েও আসছেনা। এখন প্রশ্ন হলো, আমি বাধ্য হয়ে নিজ ব্যয় ও খরচ মেটানোর জন্যে পিতার নিকট থেকে টাকা নিয়ে থাকি। তাঁর টাকা নেয়া এবং তা ব্যয় ব্যবহার করা কি জায়েয হবে? আরো প্রশ্ন হলো, ভবিষ্যতে তাঁর থেকে যে উত্তরাধিকার আমার নিকট পৌঁছবে তা গ্রহণ করা কি উচিত হবে?

জবাব ঃ অনৈসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অধীনে জাহেলী যুগে যে ধন-সম্পদ অর্জিত হয় এবং অনৈসলামী পন্থায় একজন থেকে আরেকজনের নিকট হস্থান্তরিত হয় মূলত তা সবই সন্দেহ ও ত্রুটিযুক্ত। কিন্তু মুসলমানদের এ নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এ ধরনের ধন সম্পদ তারা ধ্বংস করে দেবে কিংবা গ্রহণ করবেনা। আর তাদের এ রকম অসুবিধায়ও ফেলা হয়নি যে, কোনো সম্পদ গ্রহণ কালে তারা তাঁর মূল উৎস বিশ্লেষণ করবে। বরঞ্চ তাদের কেবল এ নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, যখন থেকে তোমরা ইসলামকে নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করেছো তখন থেকে যেনো তোমাদের হাতে নাজায়েয পন্থায় কোনো অর্থ সম্পদ না আসে এবং নাজায়েয পথে কোনো অর্থ সম্পদ ব্যয় না হয়। আরো নির্দেশ দেয়া হয়েছে, ভবিষ্যতে তোমরা এ সম্পদের যাবতীয় ব্যবহার শরীয়ত সম্মতভাবে করবে। বাকী থাকলো পূর্ববর্তী হকদারদের কথা। তারা যদি বেঁচে থাকে এবং তাদের অংশও যদি নির্দিষ্ট ভাবে জানা থাকে, তবে তাদের হক তাদের দিয়ে দিতে হবে। আর যদি তারা বেঁচে না থাকে তবে এ রকম সম্পত্তি নিজের কাছেই রাখতে হবে এবং ভবিষ্যতে যতো লোকই এসব সম্পত্তির মধ্যে উত্তরাধিকারী হবে তাদেরকে তাদের অধিকার প্রদান করতে হবে। তরজমানুল কুরআন-মুহাররম-সফর ঃ ১৩৬৪, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ঃ ১৯৪৫, ইং।

চুরি আবার ছেনাজুরী

প্রশ্ন ঃ আমাদের মহল্লায় একজন ভদ্রলোক আছেন। তিনি নামায পড়েন, রোযা রাখেন, যাকাত প্রদান করেন এবং অন্যান্য ইসলামী বিধানও পালন করে থাকেন। কবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকেন। কিন্তু তার মধ্যে কিছু আশ্চর্য ধরনের আচরণ আছে। যেমন ঃ তিনি যথাযথভাবে পিতা মাতার সেবা-যত্ন করেন এবং তাদের কাজ কর্মেও সহযোগিতা করেন, কিন্তু তাদের অর্থ সম্পদ থেকে এক

কপর্দকও গ্রহণ করেননা। এমন কি তাদের খাদ্যও তিনি গ্রহণ করেননা। আর এ আচরণের কারণ কেবল এতোটুকু যে তার পিতা ব্যবসায়ের জন্য মিথ্যা বলেন। এমনি করে তার অন্যান্য আপনজন ও আত্মীয় স্বজনের মধ্যে যাদের আয় উপার্জনে হারামের মিশ্রণ আছে বলে সন্দেহ করেন, তাদের ঘরেও তিনি পানাহার করা থেকে বিরত থাকেন। ঘুষখোর সরকারী কর্মচারী, সুদের লেন দেনকারী এবং দায়িত্ব পালনে ফাঁকিবাজ লোকদের সাথেও তিনি একই আচরণ করে থাকেন। তার এ নীতি এতোই চরম যে, একজন মসজিদের ইমামকে অবৈধ পন্থায় উপার্জনকারী কোনো কোনো লোক ভাতা প্রদান করে থাকে, তিনি সেই ইমামের বাসায়ও খাবারে কিংবা চা পানে শরীক হননা। সফর ব্যাপদেশে বাধ্য হয়ে যদি এ ধরনের কোনো লোকের ঘরে খানা খেতে হয়, তবে তিনি খাবারের মূল্য পরিমাণ কিংবা তার চাইতে অধিক মূল্যের কোনো হাদিয়া ঐ মেজবানের বাড়ী নিয়ে যান। বাধ্য হয়ে যদি কোনো অবৈধ উপার্জনকারীর ঘরে তাঁকে খেতে হয়, তবে তিনি অনুমান করে সেই খাদ্যের মূল্য কোনো দরিদ্র ফাণ্ডে জমা দিয়ে দোয়া করেনঃ হে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে তুমি এর সওয়াব দান করো, যার ঘরে আমি পানাহার করেছি। তাঁর এ আচরণের বিষয়ে উক্ত ব্যক্তি কিছুই জানতে পারেনা।

এই মুসলিম মুত্তাকী লোকটির নিজের আয় উপার্জন একটি নির্ভেজাল হালাল ব্যবসায়ের মাধ্যমে হয়ে থাকে। তাতে তিনি কোনো প্রকার মিথ্যার আশ্রয় নেন না। এ দ্বারা তিনি প্রায়ই আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের খাবার এবং চায়ের দাওয়াত দেন। তার এ পরহেযগারীর কারণে তার পিতামাতা এবং অন্যান্য মুরব্বীরা তার প্রতি খুবই সমালোচনা মুখর। এতে প্রতিবেশীদের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। মহল্লায় তার বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠছে। মেহেরবানী করে আমাদের বলুন, এই মুত্তাকী ভদ্রলোক সঠিক পথে আছে কিঁ? তার আচরণ কুরআন হাদীসের সীমার মধ্যে আছে, না সীমাতিক্রম করেছে? তার এই তাকওয়া কি ইসলামের মূলনীতিগত, না কি শাখা-প্রশাখা ধরনের, না কি মুস্তাহাব? এমনটি হয়নি তো যে, তার নফস তাকে ধোঁকায় ফেলেছে?

জবাব ঃ আপনার প্রশ্ন পড়ে দারুণভাবে বিস্মিত হয়েছি। যেখানে আপনার মহল্লার লোকদের এ জন্যে আল্লাহর শোকর আদায় করা উচিত ছিলো যে, তাদের মধ্যে এমন একজন নেক বান্দাহ আছেন, যিনি নিজে হালাল রুজি খেয়ে থাকেন এবং অন্যদেরকেও নেক ও সততার শিক্ষা দেন আর যারা হারাম কিংবা সন্দেহজনক রিযিক ভক্ষণকারী তিনি নিজেকে তাদের সে নাপাকি থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেন। যেখানে তাঁর যিন্দেগী থেকে লোকদের শিক্ষা গ্রহণ করা

উচিত ছিলো এবং তার পিতা-মাতা ও আত্মীয় স্বজনের এজন্যে শোকর আদায় করা উচিত ছিলো যে, তাদের ঘরে এমন একজন পরহেযগার বীরপুরুষ পয়দা হয়েছে, সেখানে উল্টো মহল্লাবাসীরা এবং তার পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজন তার বিরোধী হয়ে গেছে এবং তার পরহেযগারী সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে? তিনি যদি ন্যায়নীতির ব্যাপারে বাড়াবাড়িও করে থাকেন, তবে তার সে বাড়াবাড়িও নেক কাজের প্রতিই বাড়াবাড়ি, অন্যায় কাজের প্রতি নয়। তার পরহেযগারী সম্পর্কে প্রশ্ন না করে আপনাদের প্রশ্ন করা উচিত ছিলো এটা যে, যারা ব্যবসায়ের মতো সৎ উপার্জন মাধ্যমকে মিথ্যা দ্বারা অপবিত্র করে নেয়, যারা ঘুষ, যুলুম এবং এধরনের অন্যান্য পন্থায় কামাই করে, তাদের এই অ-পরহেযগারীটা কোন্ পর্যায়ের? এক ব্যক্তি নিজে নোংরামী থেকে মুক্ত থাকে এবং অন্যদেরও নোংরামী থেকে রক্ষা করতে চায়, পক্ষান্তরে অপর ব্যক্তি নিজেও নোংরামীতে নিমজ্জিত রয়েছে এবং নোংরামীমুক্ত লোকদেরও তিরস্কার করে বেড়ায় এদের মধ্যে কে বেশী অপরাধী?

আমার বড় দুঃখ হয়, আজ মুসলমানদের নৈতিক অধপতন এতোটা নিচে গিয়ে পৌছেছে যে, তাদের মহল্লাগুলোতে আল্লাহর আইন ভংগকারীরা সদর্পে স্ফূর্তি করে বেড়াচ্ছে, আর রাব্বুল আলামীনের আইনের অনুগত এবং আনুগত্যের শিক্ষাদানকারী লোকেরা উল্টা সমালোচিত হচ্ছে!

কোনো পুঁতিগন্ধময় পরিবেশে সামান্য সৌরভ এলে সুস্থ মন মস্তিস্ক তো তা লুফে নেয়। তারা কামনা করে গোটা পরিবেশটাই এমন সৌরভময় হয়ে যাক। কিন্তু চরম পরিতাপের বিষয়, ঐসব রোগগ্রস্ত মন মগজের অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, তাদের নাকে যখনই সামান্য সুগন্ধি এসে লাগে, তখনই তারা নাক সিটকায় এবং এ সুগন্ধিটুকুও তারা সেখান থেকে দূর করতে তৎপর হয়ে ওঠে। তাদের আচরণ দ্বারা এ লক্ষণই পরিস্ফুট হয় যে, পরিবেশের পুঁতিগন্ধ তাদের মন মগজ এমন ভাবে ছেয়ে ফেলেছে যে, এখন কেবল দুর্গন্ধই তাদের কাছে সহনীয় হয় আর সুগন্ধি হয় অসহনীয়। তরজমানুল কুরআন ঃ জমাদিউল আউয়াল, ১৩৬৫, এপ্রিল ১৯৪৬, ইং।

আমানত, ঋণ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক

প্রশ্ন ঃ ১. যিনি আমানত রাখতে দেন এবং যিনি আমানত রাখেন এদের উভয়কে কি কি নিয়ম নীতি মেনে চলা উচিত?

২. করযে হাসানা প্রদান এবং করযে হাসানা গ্রহণের ব্যাপারে কি কি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত?

৩. আত্মীয়তার সম্পর্ক অর্থ কি? শরীয়তে এর গুরুত্ব কতটুকু?

জবাব ঃ আমানত মূলত দুই ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে রাখা হয়ে থাকে। যে ব্যক্তি কারো নিকট কোনো আমানত রাখে, সে এ আস্থার ভিত্তিতেই রাখে যে তিনি তার সাধ্যানুযায়ী পূর্ণ ঈমানদারীর সাথে এর হিফাযত করবেন। আর যে ব্যক্তি আমানত সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনিও এ আস্থার ভিত্তিতেই তা গ্রহণ করেন যে, এই ব্যক্তি একটি পূর্ণ বৈধ আমানত তার নিকট গচ্ছিত রাখছে, কোনো চুরির মাল বা বিধি বহির্ভুত জিনিস তিনি তার কাছে রাখছেননা এবং এ আমানতের মাধ্যমে কোনো প্রকার ধোঁকা বা প্রতারণায় ফেলে তার ক্ষতি সাধনের ইচ্ছা তার নেই। অতএব উভয়ই পূর্ণভাবে তাদের এই পারস্পরিক আস্থার হক আদায় করবে। এছাড়া পালনীয় অন্য কোনো নিয়ম নীতি তাদের জন্যে নেই।

২. ঋণ দেয়া এবং নেয়ার ব্যাপারে একটা বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। তা হলো, ঋণ লেনদেনের শর্তাবলী উভয় পক্ষের মধ্যে পরিষ্কারভাবে স্থিরীকৃত হতে হবে। সময়সীমা নির্দিষ্ট হতে হবে। শর্তাবলী লিখিত হবে এবং নিয়ম মাফিক সাক্ষী রাখতে হবে। ঋণদানকারী এর বিনিময়ে কোনো প্রকার ফায়দা হাসিলের চেষ্টা করবেননা। ঋণ গ্রহণকারীকে যেনো এই উপকারের বিনিময়ে কোনো প্রকার অপদস্থ করা বা কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করা না হয়। যদি ঋণ পরিশোধের সময়সীমা অতিবাহিত হয়ে যায় এবং ঋণ গ্রহীতা সত্যি সত্যি ঋণ পরিশোধের সামর্থ না রাখে তবে যতোটা সম্ভব তাকে অবকাশ দেয়া উচিত এবং ঋণ আদায়ের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে ঋণ গ্রহীতার দায়িত্ব হচ্ছে এই যে, যখনি তিনি ঋণ পরিশোধের সামর্থ লাভ করবেন তখনি তিনি তা পরিশোধ করে দেবেন এবং বুঝে শুনে ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে কোনো প্রকার ঢিলেমী বা টালবাহানা করবেননা।

৩. 'আত্মীয়তার সম্পর্ক' অর্থ হলো, আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে পারস্পরিক সহানুভূতি, সহযোগিতা, সদাচার, কল্যাণ কামনা এবং বৈধ সীমার ভিতর থেকে সাহায্য করা। এর কোনো নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই এবং এর মধ্যে সীমারেখা চিহ্নিত করাও সম্ভব নয়। আসলে এটা সমাজের একটি প্রচলিত বাস্তবতা। এ সম্পর্কে প্রত্যেকটি লোক নিজেই অবগত। এই আত্মীয়তার সম্পর্ককে সংকুচিত করা কিংবা সম্পর্কচ্ছেদ করা সেইসব বড় বড় গুনাহসমূহের অন্তর্ভুক্ত, কুরআন ও হাদীসে যেগুলোর চরম নিন্দা করা হয়েছে। তরজমানুল কুরআন ঃ জমাদিউল আউয়াল ঃ ১৩৬৫, এপ্রিল ১৯৪৬, ইং।

খনিজ সম্পদের যাকাতের নিসাব

প্রশ্ন ঃ সকল ফিকহার গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে যে, রৌপ্যের যাকাতের নিসাব দু'শত দিরহাম। অর্থাৎ ৫২½ তোলা এবং সোনার নিসাব ২০ দীনার। অর্থাৎ ৭½ তোলা। আলিমগণ বলেছেন, 'যদি কারো নিকট সোনা রূপা দুটোই থাকে এবং তা নিসাবের চাইতে কম পরিমাণ থাকে তবে এমতাবস্থায় সোনার মূল্য রূপার সংগে মিলিয়ে কিংবা রূপার মূল্য সোনার সংগে মিলিয়ে (এ দুটোর মধ্যে যেটা অভাবগ্রস্তদের জন্যে কল্যাণকর হয়) সমন্বিত পরিমাণ দেখতে হবে।' এ পর্যন্তকার কথা তো পরিষ্কার। কিন্তু তারা আবার একথাও বলেন, যদি কেবল রূপা হয়, তবে রূপার নিসাব ধরা হবে আর যদি কেবল সোনা হয়, তবে সোনার নিসাবই হিসাবের ভিত্তি ধরা হবে। এমনটি হলে তো একথা জরুরী হয়ে পড়ে যে, যদি কারো নিকট ষাট টাকা থাকে তবে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। কিন্তু যার নিকট ৬ তোলা সোনা থাকে সে যাকাত প্রদান থেকে মুক্ত। অথচ সম্পদশালী হবার দিক থেকে বিচার করলেতো বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী সে ৫০০ টাকার মালিক। কিন্তু আলিমদের ফতোয়া প্রথম ব্যক্তির উপর যাকাত ধার্য করে আর দ্বিতীয় ব্যক্তিকে যাকাত থেকে মুক্ত রাখে। অথচ কম সম্পদের মালিক থেকে যাকাত আদায় করা আর অধিক সম্পদের মালিককে রেহাই দেয়া বড় বিস্ময়কর ব্যাপার।

আমি আমার নিজের চিন্তাভাবনায় এটাই বুঝি যে, আজকাল সোনা রূপার মূল্যের মধ্যে যে তারতম্য বিরাজ করছে, পূর্বকালে সেটা ছিলনা। আজকাল তো ৭৫ঃ১ কিংবা ৮০ঃ১ এর তারতম্য। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সম্ভবত ৭১ এর তারতম্য ছিলো। মূল্যের ভিত্তিতে যাকাত ফরয করা হয়েছে এবং ১৪০ মিসকাল রৌপ্য হচ্ছে নিসাবের ভিত্তি। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাতের নিসাব নির্ধারণ প্রসংগে এ পরিমাণ রৌপ্যের কথাই উল্লেখ করেছেন। সে যুগে যেহেতু ১৪০ মিসকাল রৌপ্যের মূল্য ২০ মিসকাল (৭½ তোলা) সোনার মূল্যেরই সমান ছিলো, তাই এ পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

কিন্তু এর অর্থ কখনো এটা হতে পারেনা যে, কিয়ামত পর্যন্ত সোনার যাকাতের নিসাব ৭½ তোলাই নির্দিষ্ট থাকবে। বরঞ্চ ৫২½ তোলা রৌপ্যের মূল্য পরিমাণ সোনা হলেই তা যাকাতের নিসাব হবে। অর্থাৎ যার নিকট সোনা আছে সে তার মূল্য যাচাই করে দেখবে। তা যদি ৫২½ তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমান হয়ে যায় কিংবা তার চাইতে বেশী মূল্যের হয় তবে তাকে যাকাত প্রদান করতে হবে।

কোনো ফিকহার কিতাবে আমার এ ধারণার সমর্থন নেই। আর বর্তমান যুগের আলিমগণও এ মত মেনে নিতে রাজী নন। এ জন্যে আমার মতের উপর

আমার নিজেরই আস্থা নেই। এ দুটো মতের যেটিকে আপনি অগ্রাধিকার দেবেন সেটাই আমার সান্ত্বনার কারণ হবে।

জবাব : এ পর্যন্ত তো আপনার ধারণা যথার্থ যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সোনা-রূপার মূল্যগত পার্থক্য কেবল ততোটাই ছিলো যতোটা নিসাব এর পরিমাণ থেকে জানা যায়। অর্থাৎ ৫২$\frac{১}{২}$ তোলা রৌপ্যের মূল্য ছিলো ৭$\frac{১}{২}$ তোলা সোনার সমান। কিন্তু আপনার এ ধারণার সাথে আমি একমত হতে পারছিনে যে, বর্তমানে সোনা-রূপার মূল্যগত যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, সে জন্যে সোনার নিসাব পরিবর্তন করে কেবল রৌপ্যের মূল্যের ভিত্তিতেই নিসাব ধার্য করতে হবে। এ মতের সাথে একমত না হতে পারার কারণসমূহ হলো :

১. এ ফায়সালা করা বড়ই কঠিন যে, মানদণ্ড সোনাকে ধরা হবে, না রূপাকে? সোনার নিসাব রূপার মূল্যের ভিত্তিতে কম বেশী করা হবে, না রূপার নিসাব সোনার মূল্যের ভিত্তিতে কম বেশী করা হবে? এর মধ্য থেকে যে কোনোটিকেই ভিত্তি বা মানদণ্ড ধরা হোকনা কেন তা হবে শরীয়ত বিরোধী কাজ। কেননা শরীয়ত প্রণেতা তো দুটো জিনিসের বিধান পৃথক পৃথক বর্ণনা করেছেন। তিনি আকারে ইংগিতেও এমন কোনো কথা বলেননি যার থেকে এ অর্থ বের করা যেতে পারে যে, সোনা রূপার মধ্যে কোনো একটিকে অপরটির জন্য মানদণ্ড বা ভিত্তি নির্ধারণ করা যেতে পারে।

২. কেবল মাত্র দরিদ্রের কল্যাণ হওয়াটা এমন কোনো অকাট্য ও প্রামাণ্য মানদণ্ড নয় যার উপর আস্থা স্থাপন করে শরীয়ত প্রণেতার এক সুস্পষ্ট নির্দেশকে সংশোধন করার দুঃসাহস করা যেতে পারে।

৩. ভবিষ্যতে সোনা রূপার মূল্যগত আরো পার্থক্য ও তারতম্য হতে থাকবে। যদি এগুলোর যাকাতের নিসাব পৃথক পৃথক ভাবে নির্ধারিত না থাকে এবং একটার নেসাবকে আরেকটার ভবিষ্যতে পরিবর্তনশীল মূল্যের উপর নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়, তবে এই স্থায়ী পরিবর্তনশীলতার কারণে শরীয়তের একটি সুনির্দিষ্ট বিধান কার্যকর থাকবেনা। এতে করে সাধারণ মানুষকে শরীয়তের বিধান পালনে বাস্তব ক্ষেত্রে দারুণ ঝঞ্ঝাট পোহাতে থাকতে হবে।

৪. সোনা রূপার নিসাব নির্ধারণে আপনি যে সমস্যা পেশ করছেন, সেই একই সমস্যা বিরাজ করছে ছাগল, উট, গরু, মহিষ এবং ঘোড়ার নিসাব নির্ধারণে। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে এগুলোর মধ্যে বিরাট তারতম্য সৃষ্টি হয়ে আসছে। এগুলোর ব্যাপারেও এ ফায়সালা করা কষ্টকর যে, এর কোনোটিকে মূল ও মানদণ্ড ধরে অন্যসবগুলোর নিসাব সেই মোতাবেক পরিবর্তন করতে থাকতে হবে।

এসব কারণে যাকাত প্রদানের ব্যাপারে স্বয়ং শরীয়ত প্রণেতা যে নিসাব নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং যে পরিমাণ এবং সংখ্যার ভিত্তিতে যাকাত ধার্য করেছেন সেটাকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে হুবহু ঠিক রাখাই উচিত। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব ১৩৬৫, জুন ১৯৪৬, ইং।

কুফরী রাষ্ট্রে সুদ খাওয়া

প্রশ্ন ঃ একজন দ্বীনদার বুযুর্গ, যিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বীনিয়াত বিষয়ে অধ্যাপনাও করেন, তিনি তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

"যে ব্যবসায়ী বা জমিদার সরকারকে কর বা রাজস্ব প্রদান করে থাকে, সে যদি ডাকঘর কিংবা ইম্পেরিয়াল ব্যাংকে সঞ্চয়ী হিসাবে টাকা জমা করে সরকার থেকে সুদ উসুল করে তবে সে যে পরিমাণ কর ও রাজস্ব সরকারকে দিয়ে থাকে সে পরিমাণ সুদ গ্রহণ তার জন্যে জায়েয।"

অপর একজন প্রসিদ্ধ আলিমেদ্বীন এর চাইতেও অগ্রসর হয়ে বলেন ঃ

"কুরআন হাদীস, ইজমা, কিয়াস মোট কথা, যে কোনো শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে যদি কেউ কুফরী রাষ্ট্রে সম্পদ বৈধ না হওয়ার প্রমাণ পেশ করতে পারে, তবে পেশ করুক.......... । বড়ই আফসোসের বিষয় ইসলামের আলিমগণ এই গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিকোণটির ব্যাপারে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখেননি। তা না হলে বিগত দেড় শ' বছর মুসলিম জাতি যে অর্থনৈতিক দুরবস্থায় নিমজ্জিত হয়েছে, সম্ভবত সে অবস্থা তাদের হতনা। দেশবাসীর মধ্যে এক স্তরের লোকেরা সুদ গ্রহণ করছে আর অপর স্তরের লোকেরা সুদ প্রদান করছে, এর পরিণতিতে দেশে যে অর্থনৈতিক অসাম্য সৃষ্টি হয়েছে সে জন্যে দায়ী ইসলাম নয়, বরঞ্চ আলিম সমাজ সে জন্যে অধিকতর দায়ী। কারণ তাদের অর্থনৈতিক বিধি ব্যবস্থায় এ অবস্থা নিরসনের দাওয়াই মওজুদ থাকা সত্ত্বেও তারা এর এক অংশের উপর আমল করেছে আর অপর অংশ পরিত্যাগ করেছে।"

উলামায়ে কিরামের এই বিতর্ক আমাদের দ্বিধাদ্বন্দ্বে নিক্ষেপ করেছে। তাদের বিতর্ক আমাদের এই সন্দেহে নিমজ্জিত করেছে যে, সুদ থেকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে এতো দিন আমরা যে নীতির উপর কায়েম থেকে এসেছি তা ভ্রান্ত নয়তো! এমনটি হলে তো খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার হবে। একদিকে আমরা পরকালের পুরস্কারের আশায় পার্থিব ক্ষতি করছি, অপরদিকে পরকালে গিয়েও আমরা জবাব পাবো যে, তোমাদের সুদ থেকে বিরত থাকাটা শরীয়তের বিধান মাফিক ছিল না; সুতরাং তোমরা কোনো প্রকার পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য নও।

***জবাব** ঃ সুদ হারাম হওয়াটা কুরআন হাদীসের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। ফিক্‌হের কোনো প্রচলিত তর্ক বহছ দ্বারা এসব অকাট্য দলীল*

প্রমাণকে রদ ও খণ্ডন করা যেতে পারেনা। সুতরাং আপনি নিশ্চিত থাকুন, আলিমদের এসব বক্তব্য সত্ত্বেও আখিরাতে আপনার পুরস্কার সংরক্ষিত আছে।

আইনের সূক্ষ্ম আলোচনা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে বিষয়টা যদি আমরা একজন সরলপ্রাণ মুসলমানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি, তবে একথা পরিষ্কার ভাবে আমাদের বুঝে আসে যে, মুসলমান হিসেবে আমাদের কাজ হলো, দ্বীন ও নৈতিক চরিত্র এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতির সেইসব মূলনীতির ঝাণ্ডা উঁচু করা, যেগুলোকে আল্লাহ্র কিতাব এবং রসূলের সুন্নায় সত্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আমাদের কাজ হলো, দুনিয়া থেকে সেই সব ধ্যান ধারণা ও পন্থা পদ্ধতিকে নির্মূল করার চেষ্টা করা, যেগুলোকে কুরআন ও সুন্নায় বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যে ভূ খণ্ডে বাতিল বিজয়ী থাকে এবং কুফরী বিধি ব্যবস্থা চালু হতে থাকে সেখানে বাতিল পন্থা অবলম্বন করা আমাদের কাজ নয়। বরঞ্চ আমাদের প্রকৃত দায়িত্ব হলো, আমরা সেখানে থেকে কুরআনী জীবন ব্যবস্থার প্রচার করবো এবং কুফরী জীবন ব্যবস্থার স্থলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যাবো। এখন চিন্তা করে দেখুন, আমরা নিজেরাই যদি সুদ খাই, তবে কাফিরদের সুদখোরীর বিরুদ্ধে কোন্ মুখে কথা বলবো? কাফিররা যদি নাজায়েয পন্থায় আমাদের ধন সম্পদ লুট করে কিংবা কুফরী সরকার যদি বিনা অধিকারে অর্থাৎ খোদায় নির্ধারিত অধিকার ছাড়াই আমাদের সম্পদের কোনো অংশ ছিনিয়ে নেয়, তবে আমাদের জন্যে এটা কি করে বৈধ হতে পারে যে, সে সম্পদ ফিরিয়ে আনার জন্যে আমরাও ঠিক তাদেরই মতো অবৈধ কর্মপন্থা অবলম্বন করবো এবং হারাম উপার্জনকে আমাদের অধিকার আদায়ের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবো? এভাবে সুদ খাওয়ার সংগে সংগে তো মদ বিক্রি, বাদ্যযন্ত্র বাজানো, অশ্লীল ফিল্ম তৈরী, সতীত্ব বিক্রি, মূর্তি তৈরী, উলংগ নাচ প্রদর্শনী, জুয়া খেলা এবং অন্যান্য সকল হারাম কাজের দরজা খুলে যায়। বলুন দেখি, এরপর আমাদের ও কাফিরদের মধ্যে কোন্ নৈতিক পার্থক্যটা আর বাকী থাকে, যার ভিত্তিতে আমরা কুফরী রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার চেষ্টা সংগ্রাম করতে পারি?

আসলে সমস্যাটার ধরন হলো এই যে, কাফির সরকারের আইনের দৃষ্টিতে এসব কিছুই আপনার জন্যে হারাম। আপনি যদি ইসলামী শরীয়তের অনুসারী হন, তবে কুফরী আইনের দুর্বলতার ফাঁক দিয়ে আপনি কোনো প্রকার ফায়দা লুটবার অধিকার রাখেননা। আর আপনি যদি একদিকে দুনিয়াবাসীকে ইসলামী শরীয়তের দাওয়াত দিয়ে থাকেন আর অন্যদিকে পার্থিব ফায়দা লাভের জন্যে কিংবা পার্থিব ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে, হারামখোরীর সেইসব সুযোগ সুবিধা থেকে ফায়দা লুটতে থাকেন যেসব সুযোগ সুবিধা কুফরী আইন প্রদান করেছে,

এবং ইসলামী শরীয়ত যেগুলোর চরম নিন্দা করছে, তবে শহরের ফকীহ্‌রা আপনার এই কর্মনীতিকে যতোই জায়েয বলে ফতোয়া দিক না কেন, সাধারণ মানুষ এতোটা নির্বোধ বুদ্ধি বিবেকহীন নয় যে, তারপরও তারা আপনার দাওয়াত ও তাবলীগের কোনো নৈতিক প্রভাব কবুল করবে।

প্রকৃতপক্ষে ইসলামী ফিক্‌হে এরূপ চিন্তা পদ্ধতির প্রয়োগই এক বিরাট ভ্রান্তি যে, কুফরী সরকারের অধীনে থাকার কারণে মুসলমানদের যে অমুক অসুবিধা এবং অমুক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে তা প্রতিরোধ কল্পে কুফরী রাষ্ট্রের মধ্যেই কিছু শরয়ী সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। এরূপ চিন্তা পদ্ধতি মুসলমানদের পরিবর্তন করার পরিবর্তে ইসলামকেই পরিবর্তন করে দেয়। অর্থাৎ দ্বীনের সংস্কারের পরিবর্তে দ্বীনকে বিকৃত করার পথই খুলে দেবে। আর দ্বীন ইসলামের জন্যে এটা হবে সীমাহীন ক্ষতিকর। আফসোস, কুফরী শক্তির বিজয়কালেও ফতোয়াবাজীর এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। এসব কার্যক্রম মুসলমানদেরকে বাতিল সমাজ ব্যবস্থার অধীনে নিশ্চিন্তে ও সন্তুষ্টচিত্তে জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত করে তুলেছে। অথচ এটা দ্বীনে হকের দ্ব্যর্থহীন দাবীর সম্পূর্ণ বিরোধী। এ ধরনের চিন্তা পদ্ধতি আমরা কখনো মেনে নিতে পারিনা, যতো বড় বড় আলিমই এর সমর্থক হোকনা কেন। বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার অধীনে মুসলমানরা কষ্ট ও ক্ষতি ছাড়া আর কি পেতে পারে? এ কষ্ট ও ক্ষতির দাবী হলো, মুসলমানরা এই বাতিল রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থাকে পরিবর্তন করার সংগ্রাম করবে। কুফরের অধীনে কোনো রকম সহজ ও আরামে বেঁচে থাকার জন্যে শরীয়তকে সেই মাফিক ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করা মুসলমানদের কাজ নয়।[১] তরজমানুল কুরআন ঃ রমযান ১৩৬৫, আগষ্ট ১৯৪৬।

গায়রে মাহ্‌রাম নিকটাত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের থেকে পর্দা করার নিয়ম

প্রশ্ন ঃ স্বামী কি স্ত্রীকে কোনো গায়রে মাহ্‌রাম আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধবের সম্মুখে পর্দাহীন অবস্থায় আসতে বাধ্য করতে পারেন? শ্বশুরালয় এবং পিত্রালয়ের এমনসব গায়রে মাহ্‌রাম নিকটাত্মীয়ের থেকে পর্দা করা উচিত কিনা, আমাদের আজকালকার সামাজিক ব্যবস্থায় যাদের থেকে মহিলারা সাধারণত পর্দা করেননা। এদের থেকে যদি পর্দা করতে হয়, তবে তার সীমা কি?

জবাব ঃ আল্লাহ ও রসূলের বিধানের বিপরীত কোনো নির্দেশ দেয়ার অধিকার স্বামীর নেই। স্বামী যদি এরূপ নির্দেশ দেয়, তবে একজন মুসলমান নারীর

১. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে গ্রন্থকারের 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

কর্তব্য হলো, তার সে হুকুম মানতে অস্বীকার করা। সূরা নূরের চতুর্থ রুকূতে যেসব আত্মীয়ের সামনে একজন মুসলমান নারী তার সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারে তাদের তালিকা দেয়া হয়েছে। এদের ছাড়া অন্য কারো সামনে সৌন্দর্য প্রকাশের নির্দেশ দেয়া কোনো মুসলমানের ক্ষমতার বাইরে।

শ্বশুরালয় ও পিত্রালয়ে নারীদেরকে সাধারণত যেসব গায়রে মাহরাম নিকটাত্মীয়দের সাথে সামাজিক জীবন যাপন করতে হয় তাদের থেকে পর্দা করার ধরন ঠিক সেরকম নয় যেরকম পর্দা করতে হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন পুরুষদের থেকে। সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, সাদা মাটা পোষাকে পূর্ণ সতরের সাথে নারীরা তাদের গায়রে মাহরাম আত্মীয়দের সামনে আসতে পারে। কিন্তু সামাজিক প্রয়োজনে যতোক্ষণ না থাকলেই নয় তার চাইতে অধিক সময় তাদের সামনে থাকা যাবে না।

আজকাল আমাদের সমাজে বেপরোয়া মেলামেশা, একত্রে বসে হাস্যরসিকতা এবং একান্তে বসে আলাপ আলোচনার যে কুপ্রথা চালু হয়েছে তা শরয়ী বিধানের সম্পূর্ণ খেলাপ। কোনো কোনো আত্মীয় যেমন দেবরদের সাথে এ ধরনের মেলামেশার ব্যাপারে হাদীসের কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

বাস্তব ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে আমাদের সমাজে সাংঘাতিক বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছে। এ সম্পর্কে শরীয়তের বিধান আমি বলে দিয়েছি। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে প্রথাগতভাবে যে শরীয়ত বিরোধী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করার জন্যে বিরাট সাহস এবং দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন। একদিকে অনেক মুসলমান ভিন্ন পুরুষদের সাথে পর্দা করার ব্যাপারে শরীয়তের দাবীর চাইতেও এগিয়ে যায়। অপর দিকে এরাই আত্মীয়দের সাথে মেলা মেশার ব্যাপারে শরীয়তের যাবতীয় সীমা লংঘন করে। এ ব্যাপারে কেউ যদি শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যথাযথ আমল করার উদ্যোগ নেন, তবে হয়তো বহু বংশীয় ও পারিবারিক সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়া তিনি তা পারবেননা। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শাবান ১৩৬৪, জুলাই-আগষ্ট ১৯৪৬।

পর্দা সম্পর্কে কতিপয় বাস্তব প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ আপনার পর্দা (পর্দা ও ইসলাম) গ্রন্থটি অধ্যয়নের পর বিগত কয়েক সপ্তাহ থেকে আমি এবং আমার স্ত্রী আমাদের পারিবারিক জীবনকে ইসলামী আইন ও বিধানের ছাঁচে ঢেলে সাজাবার চেষ্টা শুরু করেছি। আমাদের এই নতুন দৃষ্টিভংগির কারণে আমাদের গোটা খান্দান বিশেষ করে আমাদের আব্বা আম্মা আমাদের উপর খুবই অসন্তুষ্ট। শরীয়তের পূর্ণ নিয়ম নীতি অনুযায়ী পর্দা ব্যবস্থা

অবলম্বনের ব্যাপারে তারা খুবই বিতৃষ্ণ। কখনো প্রশ্ন জাগে আমরাই কোনো ব্যাপারে ভ্রান্তিতে আছি কিনা? তাই সান্ত্বনার জন্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে আরো স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে চাই ঃ

১. "নারীদের জন্যে তাদের পিতা এবং পুত্রদের সামনে পর্দা না করলে কোনো দোষ নেই....." সূরা আহযাবের এ আয়াত দ্বারা একথা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, এখানে যেসব নিকটাত্মীয়ের কথা উল্লেখ হয়েছে, তাদের ছাড়া নারীদের যে কোনো ভাবে অন্য যে কোনো পুরুষের সামনে আসা (চরম বাধ্য হওয়া ছাড়া) প্রত্যক্ষভাবে গুনাহের কাজ। এ ব্যাপারে গায়রে মাহ্‌রাম আত্মীয় এবং গায়রে মাহ্‌রাম ভিন পুরুষ সম্পূর্ণ সমান। আমার ধারণা কি সঠিক?

২. কোনো নারীর জন্যে গায়রে মাহ্‌রাম নিকটাত্মীয়ের সম্মুখে আসা কি বৈধ? (যেমন চাচা, ভাই বা খালা জীবিত থাকা অবস্থায় খালু)। এটা যদি জায়েয হয় তবে তা কোন্ অবস্থায় এবং কোন্ পন্থায় জায়েয?

৩. কোনো গায়রে মাহ্‌রাম আত্মীয়ের সাথে যদি বাধ্য হয়ে একই বাড়ীতে বসবাস করতে হয় কিংবা কোনো গায়রে মাহ্‌রাম আত্মীয় বা বন্ধু বান্ধব যদি মেহমান হয়ে আসে এমতাবস্থায় পর্দা করার নিয়ম নীতি কি? এমনি করে কোনো নিকটাত্মীয় বা বন্ধু বান্ধবের বাসায় গেলে যদি নারীরা সামনে আসে তবে কি করতে হবে?

৪. যদি যুবক কর্মচারী কাজে কর্মে বাসায় যাতায়াত করে তবে এমতাবস্থায় মহিলাদের জন্যে যে অবকাশ রয়েছে তা আমার জানা আছে। কিন্তু যুবতী মহিলারা কি কেবল আমাদের নিয়্যত পাক আছে, একথা বলে তাদের সম্মুখীন হতে পারে?

৫. আল্লাহ ও রসূলের বিধান মুতাবেক পর্দা অবলম্বনের ব্যাপারে যদি কারো মা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন, তবে কি তাঁর নির্দেশ অমান্য করা যাবে? অথচ জান্নাত তাঁরই পদতলে?

৬. নারী পুরুষের সম্মিলিত সভা সমিতিতে নারীদের জন্যে কি নিকাব পরে বক্তৃতা করা বৈধ? হাদীসের দৃষ্টিতে তো গায়রে মাহ্‌রাম পুরুষদের কানে নারীদের কণ্ঠস্বর পৌছা পছন্দনীয় বলে মনে হয়না।

৭. নারীরা কি ডাক্তার, নার্স বা শিক্ষিকা হতে পারে? যেমন আমাদের দেশের নেতারা দেশবাসীর নিকট আপীল করতে গিয়ে বলে থাকেন, আমাদের নারী সমাজকে সকল কাজে অংশ নিয়ে অতীতের যাবতীয় অবহেলা ও ক্ষতি পুষিয়ে নিতে হবে। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীরা কি এসব পেশা অবলম্বন করতে পারে? এসব পেশা অবলম্বন করলে তাদেরকে পর্দার মধ্য থেকে দায়িত্ব পালন করতে হবে, নাকি প্রয়োজনে পর্দার বাইরে আসতে পারবে?

৮. নারীরা কি মুখমণ্ডল উম্মুক্ত করে বা নিকাব পরে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে?

জবাব ঃ ১. আপনি কুরআন মজীদের মূল বাক্য ভালভাবে চিন্তা করে দেখেননি। আপনি যে আয়াতের বরাত দিয়েছেন, তা সূরায়ে আহযাবে নয়, বরং সূরা নূরে আয়াতটি রয়েছে। আয়াতটি এরকম ঃ

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا.......

অর্থাৎ-এ লোকদের ছাড়া আর কারো সামনে তারা নিজেদের সাজ সজ্জা প্রদর্শন করবেনা। অন্য কথায় সেজেগুজে তারা গায়রে মাহরাম পুরুষদের সামনে আসবেনা। অপরদিকে ঘর থেকে বের হবার ক্ষেত্রে এরূপ নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ

يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ.......

অর্থাৎ -"তারা নিজেদের উপর ঘোমটার মতো করে নিজেদের চাদর ঝুলিয়ে দেবে।" এ আয়াতটি নিয়ে চিন্তা করলে জানা যায় যে, পুরুষদের তিনভাগে বিভক্ত করা হয়েছে এবং প্রত্যেক শ্রেণীর পুরুষের জন্যে পৃথক পৃথক বিধান রয়েছে। এক প্রকার পুরুষ হলো সেইসব মাহরাম আত্মীয় স্বজন যাদের কথা সূরা নূরে উল্লেখ করা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার পুরুষ হলো সম্পূর্ণ ভিন পুরুষ, যাদের সম্পর্কে বিধান বর্ণনা করা হয়েছে সূরা আহযাবে। তৃতীয় হলো, এদুয়ের মধ্যবর্তী ঐসব লোক, যারা না মাহরাম আর না ভিন পুরুষ। প্রথম প্রকার পুরুষদের সামনে নারীরা সাজ সৌন্দর্য প্রকাশের সাথে আসতে পারে। দ্বিতীয় প্রকার পুরুষদের মুখমণ্ডল পর্যন্ত দেখানো যেতে পারেনা। আর তৃতীয় প্রকার লোকদের থেকে পর্দা করার ধরন হবে উপরোক্ত দুধরনের লোকদের মাঝামাঝি। অর্থাৎ তাদের থেকে পর্দা করার ধরন সম্পূর্ণ ভিন পুরুষদের মতোও হবেনা আর তাদের সামনে সাজ সৌন্দর্যও প্রকাশ করা যাবেনা।

২. সম্মুখে আসার দুটি অর্থ হয়। একটি অর্থ তো এই যে, এমন স্বাধীন ও সাজ সৌন্দর্য প্রকাশ করে তাদের সামনে যাওয়া, (যেভাবে কেবল বাপ ভাই প্রমুখ মাহরাম আত্মীয়দের সামনেই যাওয়া যায়) বল্গাহীন ভাবে বসে তাদের সাথে কথা-বার্তা বলা, হাসি-ঠাট্টা করা এমনকি নির্জনে এবং একাকী তাদের সাথে মেলা মেশা ও চলা ফেরা করা। কোনো ধরনের গায়রে মাহরাম পুরুষের সাথেই এমনটি করা জায়েয নয়, চাই সে আত্মীয় হোক কিংবা অনাত্মীয়। এর আরেকটি অর্থ হলো, নারীদের তাদের সাজ সৌন্দর্য চাদর ইত্যাদি দ্বারা লুকিয়ে, মাথা ঢেকে কেবলমাত্র মুখমণ্ডল ও হাত খোলা রেখে কারো সম্মুখে আসা। তাও

নিজেকে প্রদর্শন করার উদ্দেশ্যে নয়, বরঞ্চ সেসব অত্যাবশ্যকীয় সামাজিক প্রয়োজনের খাতিরে যা যৌথ পারিবারিক জীবনে দেখা দিয়ে থাকে। কিন্তু স্বাধীন ও মুক্তভাবে মেলা মেশা করা যাবেনা। তার কাছে একাকীও থাকা যাবেনা। তার সামনাসামনি কেবল এভাবেই হবে, যেমন তার সামনে দিয়ে পথ অতিক্রম করবে কিংবা একান্ত জরুরী কোনো কথা থাকলে তা বলে দেবে বা জিজ্ঞাসা করে নেবে। এ সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করে গায়রে মাহরাম আত্মীয় স্বজনের সামনে যাওয়ার শরয়ী অনুমতি আছে বা অন্তত নিষেধাজ্ঞা নেই। আজকের মুসলিম সমাজে চাচাতো ভাই, খালাতো ভাই প্রভৃতির সাথে যেভাবে হাস্য রসিকতা ও চরম বল্গাহীন মেলামেশার প্রচলন দেখা দিয়েছে এবং মুসলিম মেয়েরা এ ধরনের আত্মীয় স্বজনের সামনে যেভাবে সাজ সজ্জা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে, ইসলামী শরীয়তে এরূপ সীমালংঘনকে জায়েয করার কোনো কারণ নেই।

৩. এসব অবস্থায় যদি উভয় পক্ষ থেকে শরীয়তের বিধি বিধান মেনে চলার ইচ্ছা থাকে, তবে তাদের জন্যে সঠিক কর্মপন্থা হলো, যখন কোনো গায়রে মাহরাম নিকটাত্মীয় বা আপনজন ঘরে প্রবেশ করতে যাবেন, তখন তিনি শরয়ী বিধান মুতাবেক অনুমতি প্রার্থনা করবেন।[১] অতপর আওয়ায শুনামাত্র মহিলাদের কর্তব্য হচ্ছে, তারা কোনো কিছু দিয়ে নিজেদের সাজ সৌন্দর্য ঢেকে নেবে, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে। আর একান্ত অপরিহার্যতার কারণে গায়রে মাহরাম নিকটাত্মীয়দের সামনে মুখমণ্ডল ও হাত খোলা থাকার মধ্যে কোনো দোষ নেই। এমনি করে একান্ত জরুরতে তাদের সাথে সাদামাটা ও নিরসভাবে কথা বলার মধ্যেও কোনো দোষ নেই। অবশ্য খোলা ও স্বাধীন ভাবে মেলামেশা ও হাস্য রসিকতা করা সম্পূর্ণ নাজায়েয।

৪. চাকর ও কর্মচারীদের ব্যাপারে আমার গবেষণা হলো, গৃহকর্তার দৃষ্টিতে যেসব ভৃত্য ও চাকর غـيـر اولى الاربـة এর সংজ্ঞায় পড়বে (অর্থাৎ মনিবের ঘরের মহিলাদের সম্পর্কে যাদের অন্তরে কোনো প্রকার কুচিন্তা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা নেই) তাদেরকে ঘরে যাতায়াত ও কাজ করার অনুমতি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু যেসব কর্মচারী ও চাকরের ব্যাপারে গৃহকর্তার ধারণা

---

১. বড়ই পরিতাপের বিষয়, অনুমতি প্রার্থনা করার এই কুরআন সুন্নার নির্দেশকে মুসলমানরা বর্তমানে তাদের সমাজ থেকে নির্বাসন দিয়েছে। বিনা অনুমতিতে ঘরে প্রবেশ করাকে স্বাধীনতার নিদর্শন মনে করা হয়। অথচ শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বয়ং ঘরের লোকদেরকে এমন কি পিতা, পুত্র এবং ভাইদের উপরও এ কর্তব্য রয়েছে, তারা যখন ঘরে প্রবেশ করবেন তখন অন্তত গলা খাকারি বা কোনো আওয়ায দেবেন, যাতে করে ঘরের মহিলারা বুঝতে পারে কোনো পুরুষ আসছে।

এরূপ হবেনা, তাদের জন্যে ঘরে আসা জায়েয নয়। এ ব্যাপারে কর্তার ইজতিহাদ নির্ভরযোগ্য। অবশ্য শর্ত হলো, শরীয়তের বিধান অনুসরণের ইচ্ছা তার থাকতে হবে এবং বেপরোয়াভাবে তিনি শরীয়তের বিধান লংঘন করবেননা।

৫. অবশ্যি মায়ের পদতলে জান্নাত। কিন্তু নির্দেশ কেবল সেই মায়েরই মানা যাবে, যিনি জান্নাতীদের মতো কাজ করেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ ও রসূলের বিধান যিনি মেনে চলেন এবং নিজের নফস এবং বংশীয় প্রথার জন্যে শরীয়তকে কোরবানী দেননা। আর যে মা এর বিপরীত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন, তাঁর খিদমত অবশ্যি করতে হবে, কিন্তু শরীয়ত বিরোধী কাজে তাঁর আনুগত্য করা যেতে পারেনা। খোদায়ী শরীয়তের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে স্বীয় নফস ও প্রথার শরীয়তকে তার উপর প্রাধান্য দিয়ে তো তিনি নিজের পা-ই জাহান্নামে নিক্ষেপ করেছেন। অতপর তার পদতলে জান্নাত কিভাবে হতে পারে?

৬. পূর্ণাংগ শরয়ী পর্দার সাথে কোনো কোনো অবস্থায় পুরুষদের উদ্দেশ্যে নারীদের বক্তৃতা করা জায়েয। কিন্তু সাধারণভাবে এটা জায়েয নয়। কোন্ লোকদের মধ্যে কি অবস্থায় এটা জায়েয, তা ফায়সালা করা কেবল ঐসব লোকদেরই কাজ যারা একদিকে পরিবেশ পরিস্থিতিকে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝার ও মূল্যায়ন করার যোগ্যতাও রাখেন, অপর দিকে যাদের মধ্যে শরীয়ত মুতাবিক জীবন যাপন করার নিয়্যতও বর্তমান।

৭. আপনি নেতাদের কথা উল্লেখ করে যে প্রশ্ন করেছেন, তার সংক্ষিপ্ত জবাব এই যে, এই সব নেতৃবৃন্দ এবং তাদের অনুসারী মুসলমানরা আজকাল যে জিনিসের অনুসরণ অনুবর্তন করছে, যদি সেটার নামই ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি হয়ে থাকে, তবে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির মধ্যে তো আর কোনো পার্থক্যই থাকেনা। এমতাবস্থায় মুসলমানদেরকেও সেইসব কিছুই করতে হবে যা কিছু আজকাল পাশ্চাত্যবাসী করছে। আর ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতি যদি সেই সভ্যতা সংস্কৃতির নাম হয়ে থাকে যা শিখিয়েছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তবে আজকালকার মেডিক্যাল কলেজ, সেবিকা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং হাসপাতালসমূহে মুসলমান মেয়েদের পাঠানোর চাইতে তাদের কবরে নিয়ে দাফন করে দেয়া লাখো গুণ বেহতের। বর্তমানের মহিলা কলেজগুলোতে গিয়ে শিক্ষা লাভ করে শিক্ষিকা হবার ব্যাপারটাও তার চাইতে কিছুমাত্র ভিন্নতর নয়। অবশ্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা যদি আমাদের হাতে আসে এবং আমরা আমাদের পন্থায় মেয়েদের শিক্ষাদান করে তাদের দ্বারা সমাজের প্রয়োজনীয় খিদমত নেয়ার সুযোগ পাই তবে অবশ্যি আমরা তার ব্যবস্থা করবো। আমরা ইসলামের বিধান মোতাবেক মেয়েদেরকে ডাক্তারী, সার্জারী, ধাত্রীবিদ্যা, নার্সিং এবং সন্তান লালন পালনের

শিক্ষা প্রদান করবো। অন্যান্য বিষয়ে তাদের উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে আমরা তাদের শিক্ষয়িত্রী হিসেবে তৈরী করবো এবং ইসলামের বিধান মোতাবেক তাদের দ্বারা সমাজের অন্যান্য খিদমতও নেবো। এ প্রসংগে একথাও স্পষ্টভাবে বলে দেয়া দরকার, আমরা মুসলমানরা পাশ্চাত্যের এই দৃষ্টিভংগিরও সমর্থক নই যে, নার্সিং পেশা কেবল নারীদের জন্যেই নির্দিষ্ট থাকবে এবং পুরুষ ও মহিলাদের উভয় ধরনের হাসপাতালে কেবল মেয়েদেরই নার্স হতে হবে। আমাদের নিকট এ মতের কোনো বিবেক ও বিজ্ঞান সম্মত ভিত্তি নেই। মহিলা সেবিকাদের জন্যে পুরুষ রোগীর সেসব সেবা করা নৈতিক দৃষ্টিতে চরম লজ্জাকর যা করতে পুরুষ নার্সরাও লজ্জা অনুভব করে। এই নীতির ভিত্তিতে আমরা মুসলমানরা যদি মেয়েদের চিকিৎসা কাজের জন্য তৈরী করি, তবে তাদের দ্বারা কেবল নারীদের চিকিৎসা ও সেবার কাজই নেয়া হবে। সাধারণভাবে নারী পুরুষ সকলের চিকিৎসা ও সেবা তাদের দ্বারা করানো হবেনা। আমাদের মতে পুরুষদের হাসপাতালসমূহের জন্যে কেবল পুরুষরাই নার্স হওয়া উচিত।

৮. যুদ্ধকালে নার্সিং, আহতদের সেবা, মুজাহিদদের খানা তৈরী করা, অস্ত্র এবং রসদ সরবরাহ, সংবাদ আদান প্রদান ইত্যাদি খিদমত আঞ্জাম দেয়া নারীদের জন্যে জায়েয। পর্দার বিধান নাযিল হবার পূর্বে নারীরা এসব খিদমত আঞ্জাম দিতেন, পরেও দিয়ে এসেছেন এবং বর্তমানেও দিতে পারেন। তবে শর্ত হলো, সেনাবাহিনীকে ইসলামী সেনাবাহিনী হতে হবে, খোদার বিধানের অনুসারী হতে হবে এবং সেইসব দুষ্কর্ম থেকে পবিত্র থাকতে হবে যেসব ব্যাপারে আজকের সেনাবাহিনী কুখ্যাতি অর্জন করেছে। W.A.C.I ধরনের নিষ্পাপ নামের ছত্রছায়ায় মেয়েদের ভর্তি করে নিয়ে দুশ্চরিত্রের সিপাহী ও অফিসারদের অশ্লীল কাজের খিদমতে নিয়োগ করা এক চরম শয়তানী কর্ম, যার সামান্যতম অবকাশও ইসলামে নেই।[১] তরজমানুল কুরআন : রমযান ১৩৬৫, আগষ্ট ১৯৪৬।

---

১. বর্তমান যুগের সেনাবাহিনীর চরম অধঃপতিত নৈতিক অবস্থা এ ঘটনা থেকেই অনুমান করা যেতে পারে যে, বিগত বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে আমেরিকান সেনাবাহিনী জাপানে এক লক্ষ, ইংল্যান্ডে ৭০ হাজার এবং জার্মানীতে ৫০ হাজার জারজ সন্তান জন্ম দিয়েছে। সোভিয়েত বাহিনী কেবল মাত্র পূর্ব বার্লিনেই ২৯ হাজার জারজ সন্তান জন্ম দিয়েছে। এ হচ্ছে শুধুমাত্র সেইসব জারজ সন্তানদের হিসাব, ১৯৫২ সালের শেষ নাগাদ যাদের গণনা করা হয়েছে। অনুমান করা যেতে পারে, এই জন্ম নিয়ন্ত্রণের যুগে কতো ব্যাপক বদকর্ম করার পর এ পরিণতি দাঁড়িয়েছে।

রসম রেওয়াজের শরীয়ত

প্রশ্ন ঃ কতিপয় সমস্যা দেখা দিয়েছে। এগুলোর শরীয়ত সম্মত সমাধান আপনার নিকট থেকে জানতে চাচ্ছি। আশা করি আমার নিশ্চিত হবার জন্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর আলোকপাত করবেন ঃ

ক. একজন দুস্থ মুসলমান তার পুত্র বা কন্যা বিয়ে দিতে চায়। দুস্থ হওয়া সত্ত্বেও সে দুনিয়াদারদের মতোই বিয়েতে কিছুটা জাঁক জমকের ব্যবস্থা করে সাময়িক আনন্দ লাভ করতে চায়। এমতাবস্থায় তাকে কিভাবে পথ প্রদর্শন করা যায়?

খ. একজন ঋণগ্রস্ত মুসলমান, যিনি তার সমস্ত সহায় সম্পদ বিক্রি করেও ঋণ পরিশোধের সামর্থ রাখেননা, তিনি তার পুত্র কন্যাদের বিয়ে দিতে চাইলে দ্বিতীয় পক্ষ থেকে এমনসব শর্ত আরোপিত হয়, যা মিটাতে গেলে অধিক ব্যয় করার প্রশ্ন আসে। এমতাবস্থায় তার কর্তব্য কি?

গ. সাধারণত মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে বর পক্ষের প্রস্তাবের অপেক্ষা করা হয়। কখনো কখনো অপেক্ষায় থাকতে থাকতে মেয়েরা কুমারী অবস্থায় যৌবনকাল অতিবাহিত করে প্রৌঢ়ত্বের সীমানায় পা রাখে। এ ব্যাপারে ইসলামের বক্তব্য কি?

ঘ. বর্তমান মুসলিম সমাজের বিয়ে শাদী এবং জন্ম মৃত্যুর অনুষ্ঠানে ছটি, চিল্লা, বাদ্য বাজনা, বাগদান, যৌতুক, কুলখানি, মৃত্যুর পর চল্লিশ দিনে লোক খাওয়ানো ইত্যাদি যেসব প্রথা পালন করা হয়, এগুলোর শরয়ী মর্যাদা কি?

জবাব ঃ ক. যে ব্যক্তি নিজেই জানে যে, তার এতোটা খরচ করার সামর্থ নেই, তারপরও সে কেবল লোক দেখানো এবং নিজের ভ্রান্ত খাহেশ মেটানোর উদ্দেশ্যে নিজের সামর্থের বাইরে পা ফেলতে চায়, সে তো জেনে বুঝে নিজেই নিজেকে পাপের গর্তে নিক্ষেপ করতে অগ্রসর হচ্ছে। নিজের ভ্রান্ত খাহেশ মেটানোর জন্যে সে হয়তো সুদের ভিত্তিতে ঋণ নেবে, কিংবা বন্ধু বান্ধবের পকেট লুট করবে। আর যদি করযে হাসানা পেয়ে যায়, যার আশা নেই, তবে তা আর ফেরত দেবেনা। তা ছাড়া এ ব্যাপারে তার দ্বারা যে কতো মিথ্যা ও বেঈমানী সংঘটিত হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন। যে ব্যক্তি নফসের ভ্রান্ত খাহেশ মেটানোর জন্যে জেনে বুঝে এতো বড় গুনাহর বোঝা মাথায় নিতে উদ্যত হয়, তাকে আর কী-ই বা বুঝানো যেতে পারে।

খ. এ ব্যক্তির উচিত তার ছেলে মেয়েদেরকে এমন লোকদের সাথে বিয়ে দেয়া, যারা ধন সম্পদের দিক দিয়ে তার সমপর্যায়ের এবং যারা তার সংগে তার

অবস্থা ও মর্যাদা অনুযায়ী সম্বন্ধ করতে প্রস্তুত। সামর্থের বাইরে পা ফেলা তার নিজের জন্যে উচিত নয় এবং অপরকেও এতে বাধ্য করা উচিত নয়। নিজের অবস্থার চাইতে অধিক সম্পদশালী লোকদের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করা নিজেই নিজেকে অযথা সমস্যায় জড়িয়ে ফেলা ছাড়া আর কিছু নয়।

গ. মেয়েদের বিয়ে দেয়ার ব্যাপারে বর পক্ষের প্রস্তাবের অপেক্ষা করা অনেকটা স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু অপেক্ষার সীমা অতিক্রম করা কিছুতেই সংগত নয়। কোনো ব্যক্তির কন্যা যদি বয়স্ক ও বিবাহযোগ্য হয় এবং কোনো উপযুক্ত পাত্র তার নযরে পড়ে, তবে নিজের পক্ষ থেকে প্রথমে পয়গাম পাঠানোর মধ্যে কোনো দোষ নেই। এর উদাহরণ স্বয়ং সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে পাওয়া যায়। এটা যদি সত্যি কোনো অপমানকর ব্যাপার হতো তবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করতে নিষেধ করতেন।

ঘ. এগুলো হলো সেইসব ফাঁদ যা লোকেরা নিজেরাই নিজেদের গলায় পরিয়ে নিয়েছে। এগুলোর মধ্যে ফাঁস লেগে এখন তাদের জীবন সংকীর্ণ হয়ে এসেছে। কিন্তু নিজেদের অজ্ঞতা ও মুর্খতার কারণে লোকেরা এগুলো পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত নয়। সরাসরি এসব রসম রেওয়াজের বিরোধিতা করলে এগুলোর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবেনা। বরঞ্চ এগুলো দূর করার পথ হলো, লোকদের অনবরত কুরআন ও সুন্নাহর দিকে দাওয়াত দিয়ে যেতে হবে। লোকেরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের তরীকা মতো চলতে শুরু করে, তবে সমাজ থেকে বড় বড় দুষ্কৃতিসমূহ দূর হবে এবং তখন এসব ছোট ছোট খারাবীও আর থাকবেনা।

প্রশ্ন ঃ দীর্ঘদিন থেকে আমি কুমার জীবন অতিবাহিত করছি। আর এর জন্যে দায়ী হলো আমার ইজতিহাদ। আমাদের এ অঞ্চলে এমন সব নিয়ম নীতি ও রসম রেওয়াজ প্রচলিত আছে, ফিকহের চুলচেরা বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে যেগুলোকে 'নাজায়েয' বা 'শরীয়ত বিরোধী' প্রথা বলে আখ্যায়িত করা মুশকিল। যেমন ধরুন, বাগদত্তা বা কনের জন্যে অলংকার বা পোশাক আশাকের দাবী করা; কিছু পারস্পরিক লেন দেন; এক পক্ষ অপর পক্ষের চাকর ও সেবকদের দান ও বখশীশ হিসেবে দেয়া ও দেয়ানোর ব্যবস্থা করা; আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের ডাকা ও তাদের মেহমানদারী করা ইত্যাদি। এরকম আরো অনেক জিনিস আছে যেগুলোকে স্বতন্ত্রভাবে দেখা হলে সম্ভবত কোনো একটিকেও নাজায়েয বলা যাবেনা। কিন্তু যদি এসব রসম রেওয়াজের এ দিকটার প্রতি নযর দেয়া হয় যে, এগুলো অবশ্যি মেনে চলতে হবে, এগুলো ছাড়া বিয়ে সফলই হতে পারেনা, যে কোনো পর্যায়ের লোকই হোকনা কেন এগুলো ছাড়া দাম্পত্য জীবনের সূচনাই হতে পারেনা। তবে একথা পরিষ্কারভাবে বুঝে আসে যে, এসব জিনিস এখন

শুধুমাত্র 'মুবাহ্‌র' পর্যায়ে নেই, বরঞ্চ আত্মীয়তার ক্ষেত্রে এগুলো এখন আইনের রূপ নিয়েছে। তাও আবার সাধারণ আইন নয়, বরঞ্চ এমন আইন যে, এর বিরোধিতাকারীকে যেনো অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। অতপর আমরা যখন বলি প্রতিটি বাতিল আইনকে ভেংগে দিতে হবে তার শিকড় যেখানেই বিস্তৃত থাকুক না কেন, তখন প্রশ্ন দেখা দেয় এসব জিনিস প্রকৃতই উৎপাটনযোগ্য কিনা? যদি এগুলো উৎপাটনযোগ্যই হয়ে থাকে, যেমন আমি নিজেও এমতই পোষণ করি, তবে এই সত্য কি আপনার নিকট গোপন যে, গোটা ভারতবর্ষের এমন কোনো এলাকা নেই যেখানে এ ধরনের রসম রেওয়াজের শরীয়ত কার্যকর নেই, সেগুলোর খুঁটিনাটি রূপ যাই হোকনা কেন? যেসব উৎসব অনুষ্ঠানকে আজকাল শরয়ী উৎসব অনুষ্ঠান বলা হয়, সেগুলোও কেবল এতোটুকুই শরয়ী আছে যে, সেগুলোতে নাচ গান, বাদ্য, গাঁজা ইত্যাদি অশ্লীলতা হয়না বটে, কিন্তু উপরোক্ত রসম রেওয়াজসমূহ সেগুলোতেও পূর্ণমাত্রায় শিকড় গেড়ে আছে এবং এগুলোকে মুবাহ বলে চালিয়ে দেয়া হয়। এমতাবস্থায় জামায়াতে ইসলামীর কি উচিত নয় যে, সে তার সদস্যদেরকে শরীয়ত বিরোধী রসম রেওয়াজের কথা এমন স্পষ্টভাবে বলে দেবে যাতে করে এগুলোর তথাকথিত 'মুবাহ' হবার গোমর ফাঁক হয়ে যায় এবং তারা নিজেরা সম্পূর্ণ সুন্নাত পন্থায় নিজেদের অনুষ্ঠানাদি পালন করবে?

এসব প্রথা প্রচলনের বিরুদ্ধে আমার যে অনুভূতি ও মানসিকতা প্রকাশ করলাম তা যদি সঠিক না হয়ে থাকে, তবে মেহেরবানী করে কিছুটা বিস্তারিতভাবে প্রথা প্রচলনের পালনীয় দিকগুলোকে বর্জনীয় দিকগুলো থেকে পৃথক করার কারণ লিখে জানাবেন। এতে যদি আমি আশস্ত হই তবে হয়তো এই কুমার জীবন যাপন থেকে মুক্তি পেতে পারবো। আর আপনি যদি আমার মতকে সঠিক বলে আখ্যায়িত করেন, তবে বাহ্যত কামিয়াবীর কোনো সুযোগ কোথাও আমার জন্য নেই। অবশ্য এটা আমার জন্যে পরম আনন্দের বিষয় হবে। কেননা এতে করে আমার সকল দুঃখ কষ্ট আল্লাহর পথে বরণ করছি বলে প্রমাণিত হবে।

জবাব ঃ 'আগের কাজ আগে' নীতির ভিত্তিতে আমরা কাজ করছি। প্রথমে অন্তরে দ্বীনের শিকড় গেড়ে নেয়া আবশ্যক। অতপর জীবনের বিভিন্ন বিভাগ ও অধ্যায়ে এর যাবতীয় শাখা প্রশাখাকে গুরুত্বানুযায়ী ক্রমানুসারে পরিশুদ্ধ করার সুযোগ আসবে। আমরা যদি বিয়ে শাদী, লেনদেন ও অন্যান্য বিষয়ের প্রাসংগিক ও খুঁটিনাটি দিকের আলোচনায় জড়িয়ে পড়ি, তবে আমাদের মৌলিক দাওয়াতের কাজ বিশৃংখল হয়ে পড়বে। এজন্যে আমরা কেবল দ্বীনের মৌলিক বিষয়গুলোর

ব্যাখ্যা বিশ্লেষণই করে থাকি। আর যাবতীয় প্রাসংগিক বিষয়ে আমরা সামগ্রিকভাবে বক্তব্য রেখে থাকি।

বিয়ে শাদীর এসব উৎসব অনুষ্ঠান ততোক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণাংগভাবে সংশোধন হতেই পারেনা, যতোক্ষণ না লোকদের দ্বীনি যিন্দেগী সঠিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে সে পর্যায়ে গিয়ে পৌছে, যে পর্যায়ে এসব জিনিসের সংশোধন সম্ভব। সে সময় আসা পর্যন্ত আমাদের রুকনদের (সদস্যদের) কেবল সেই সব জিনিস থেকে অধিকতর আত্মরক্ষার ব্যাপারে জোর দেয়া উচিত, যেগুলোকে সুস্পষ্টভাবে শরীয়ত বিরোধী বলা যেতে পারে। বাকী থাকলো সেসব রসম রেওয়াজের কথা, যেগুলো ইসলামী সমাজের মূল প্রাণসত্তার খেলাপ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমান মুসলিম সমাজে আইন ও শরীয়তের রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য হলো, আমাদের ইসলামী চেতনায় এগুলো যতোই অসহনীয় হোক না কেন এখন আমাদেরকে এ আশায় এগুলোকে বরদাশ্‌ত করে নিতে হবে যে, ক্রমান্বয়ে এগুলো সংশোধন হয়ে যাবে। কিন্তু এ বরদাশ্‌ত স্বেচ্ছায় ও সন্তুষ্টচিত্তে নয়, বরঞ্চ বিরোধিতা, প্রতিবাদ ও উপদেশ নসীহতের সাথে করতে হবে। অর্থাৎ এসব উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে একথা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, ইসলামী শরীয়ত তো সে ধরনের বিয়ের অনুষ্ঠান চায়, যেরূপ অনুষ্ঠান হয়েছিল উম্মাহাতুল মুমিনীন ও অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের বিয়েতে। কিন্তু তোমরা যদি বিবাহ অনুষ্ঠানের এসব বাহুল্য প্রদর্শনী বর্জন করতে রাজী না হও, তবে আমরা কেবল বাধ্য হয়েই তা বরদাশ্‌ত করবো এবং আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করবো যেনো সে সময়টির আগমন ঘটে যখন তোমরা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামের মতো সহজ সরল বিয়েকে তোমাদের জন্যে অমর্যাদাকর মনে করবেনা।

আমাদের এই দৃষ্টিভংগি তো সাধারণ লোকদের ক্ষেত্রে, যাদের সংগে আমরা বিভিন্ন প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করতে এবং বিভিন্নভাবে দুনিয়াবী কাজ কর্ম ও লেনদেন করতে বাধ্য হই। কিন্তু জামায়াত সদস্যদের নিজেদের মধ্যে এরকম যতো সম্পর্ক, আচার অনুষ্ঠান ও কাজ কর্ম অনুষ্ঠিত হবে, তা সবই তথাকথিত এইসব রসম রেওয়াজের সংমিশ্রণ থেকে পবিত্র রেখে সহজ সরলতার সেই পাটাতনে নিয়ে আসতে হবে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরাম এগুলোকে যেখানে পৌছিয়েছিলেন। আমাদের আচরণে মুবাহ জিনিসগুলোকে মুবাহ্‌র সীমা পর্যন্তই মর্যাদা দিতে হবে। এসবের কোনো একটি জিনিসকেও আইন ও শরীয়তের মর্যাদায় স্থান দেয়া যাবেনা। রসম রেওয়াজের স্রোতে ভাসমান এমন অনেক লোকই আছেন যারা এগুলোর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ইচ্ছা পোষণ করেন। কিন্তু সবার আগে নিজে আওয়ায তোলার

সৎসাহস রাখেননা। প্রথা প্রচলনের শৃংখল থেকে অনেকেই মুক্তি লাভ করতে চান, কিন্তু অন্যদের পূর্বে নিজে এতে আঘাত হানার সাহস রাখেননা। নিজেদের পিঠে চাপানো রসম রেওয়াজের বোঝা তাদের কোমর ভেংগে দিচ্ছে, কিন্তু তারা সবার আগে সেগুলোকে পদতলে নিক্ষেপ করতে পারছেননা। এই অগ্রণী ভূমিকা এখন আমাদেরকেই পালন করতে হবে। আমাদের কাফেলার প্রত্যেক সাথীর জন্যে এটা অবশ্য কর্তব্য যে, তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের যাবতীয় কাজকর্ম, আচার আচরণ ও উৎসব অনুষ্ঠানকে এসব রকমারি শৃংখল থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে নির্ভীকচিত্তে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। লোকদের মান বাচানোর জন্যে নিজেরা অপদস্থ ও অপমানিত হয়ে সমাজ জীবনে বিপ্লব সৃষ্টি করত হবে! সঠিক ইসলামী নিয়মে যদি বিভিন্ন স্থানে উৎসবাদি ও আচার অনুষ্ঠান একবার কায়েম করে দেয়া যায়, তবে সমাজের কিছু না কিছু লোক তার অনুসরণ অনুবর্তনে এগিয়ে আসবে এবং ধীরে ধীরে এভাবে আমরা সমাজে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হবো।

প্রশ্ন ঃ আমাদের এলাকায় সাধারণত বিয়ের মোহরানা নয়শত টাকা ধার্য করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে তিনশ টাকা নগদ আদায় হয়ে যায় এবং ছয়শ টাকা বাকী থাকে (যা স্ত্রী যে কোনো সময় দাবী করতে পারবে)। কিন্তু সাধারণত পুরুষের পক্ষ থেকে ঐ ছয়শ টাকা পরিশোধের কখনো সুযোগ হয়না।

আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে আমাদের এক আত্মীয়ের কন্যার বিয়ে হয়েছিল। তার মোহরানা ধার্য হয় দশ হাজার টাকা। প্রথম দিকে ছেলের পক্ষ থেকে এই বিরাট অংকের মোহরানা মেনে নিতে কিছুটা আপত্তি তোলা হয়। কিন্তু পরে কেবল এই কারণে আপত্তি পরিহার করা হয় যে, এসব কিছু তো একটা লোক দেখানো প্রথা ছাড়া আর কিছু নয়।

এখন এই আত্মীয়ের অপর কন্যার সম্বন্ধ আমার ছোট ভাইয়ের সাথে ঠিকঠাক হয়েছে। খুব শীঘ্রই বিয়ে হয়ে যাবে । পাত্রীর অভিভাবকদের পক্ষ থেকে আগেই এ নোটিশ দিয়ে দেয়া হয়েছে যে, মোহরানা আগের কন্যার মতোই নয় দশ হাজার টাকা ধার্য হবে। এ পরিমাণ থেকে কোনো রকম কমতি করা হলে তার আগের জামাই বেঁকে বসবে। কারণ তার বিয়েতে যখন দশ হাজার টাকা মোহর ধার্য করা হয়েছে, এখন দ্বিতীয় জামাইর জন্যে কেন তার কম ধার্য করা হবে?

এই সমস্যার সমাধান কল্পে উভয় পক্ষ একটা পন্থা স্থির করেছে। তা হলো, বিয়ের মজলিসে যখন আমাদের সেই আত্মীয়ের প্রথম জামাই উপস্থিত থাকবে, তখন মোহরানা আগের কন্যার মতোই নয় দশ হাজার টাকা লেখা হবে। কিন্তু পরে চুপিসারে এই লেখাকে পরিবর্তন করে নয় হাজারের স্থানে নয়শ লিখে দেয়া

হবে। এভাবে না তার প্রথম জামাই অসন্তুষ্ট হবে আর না আমাদের ছোট ভাইয়ের উপর বোঝা চাপবে।

এই প্রস্তাবিত পন্থার ব্যাপারে আমাদের মধ্যে খটকা সৃষ্টি হয়েছে। আমি আমার এ মনোভাব আব্বার সামনে পেশ করে বলেছি, বিষয়টা সঠিক ও বৈধ কিনা তা উলামায়ে শরীয়তের কাছ থেকে জেনে নিন। এর জবাবে তিনি বললেন যে, স্থানীয় একজন মুফতীর নিকট এ বিষয়ে ফতোয়া চাওয়া হলে তিনি রায় দিয়েছেন, পারস্পরিক কোনো বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাতে আর কোনো আপত্তি থাকেনা। এ ফতোয়ার ব্যাপারে আমি আব্বাকে আমার অনাস্থার কথা জানিয়ে দিয়েছি।

এ বিষয়ে আমি জামায়াতে ইসলামীর একজন রোকনের মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেছেনঃ 'এ পন্থায় একদিকে প্রথম জামাইকে ধোঁকা দেয়া হবে। অপরদিকে দশ হাজার টাকা মোহরানা ধার্যের আরেকটি উদাহরণ লোকদের সামনে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং রসম রেওয়াজের শিকলে আরেকটি গ্রন্থী হবে। এ কারণে আমি এটাকে সঠিক পন্থা মনে করিনা।'

এখন সমস্যা হলো, পাত্রের ভাই হবার কারণে বিয়ের মজলিসে আমাকে শরীক হতে হবে। হয়তো আমাকে উকিল বা সাক্ষী হবার অবস্থাও সৃষ্টি হতে পারে। অথচ, আমার অন্তর এটাকে জায়েয বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেনা। যদি উকিল কিংবা সাক্ষী হিসেবে আমি মজলিসে শরীক হই, তবে এই ভ্রান্ত কাজে আমিও অংশীদার হয়ে বসবো, যা আমার আত্মীয় স্বজন বুঝে শুনে করতে যাচ্ছেন। আর যদি আমি বিয়ের অনুষ্ঠানে শরীক না হই, তবে মনে করা হবে আমি ভাইয়ের বিয়েতে সন্তুষ্ট নই। তাছাড়া শরীক না হওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে আমি চুপ থাকতে বাধ্য হবো। কেননা, প্রকৃত সত্য ব্যাপার বলতে গেলে গোটা ব্যাপারটাই লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

এখন মেহেরবানী করে আপনি আমাকে সঠিক ইসলামী দৃষ্টিভংগির কথা বলে দিন। ইনশাআল্লাহ তা পালন করতে পার্থিব স্বার্থ এবং সম্পর্ক আমার জন্যে প্রতিবন্ধক হতে দেবনা। এ ব্যাপারে আমি কেবল শরীয়তের হুকুম জানতে চাই। তা মেনে চলতে আমি সম্পূর্ণ প্রস্তুত। পলায়ন ও গা বাঁচানোর জন্যে কোনো ব্যাখ্যা চাচ্ছিনে।

জবাব ঃ মুসলমান সমাজ শরীয়ত ও নৈতিক দিক থেকে দূরে সরে গিয়ে যেসব ভ্রান্ত কর্মকাণ্ডে নিমজ্জিত হয়েছে আপনার লিখিত ঘটনাটি তারই একটি নমুনা মাত্র। শরীয়ত মোহরকে নারীর অধিকার নির্ধারণ করেছিল এবং তার জন্যে এ পন্থা ঠিক করেছিল যে, পাত্রী এবং পাত্র সমঝোতার ভিত্তিতে যে

পরিমাণ নির্ধারণ করবে তাই পরিশোধ করা বরের জন্যে ওয়াজিব হবে। কিন্তু মুসলমানরা শরীয়তের এ পন্থাকে পরিবর্তন করে মোহরকে একটি রসম এবং প্রদর্শনীর বস্তুতে পরিণত করেছে। লোক দেখানোর জন্যে তারা বিরাট বিরাট অংকের মোহর ধার্য করা আরম্ভ করেছে, প্রথম থেকেই যা পরিশোধ করার নিয়্যত থাকেনা এবং যা পরবর্তীতে বংশীয় ঝগড়া ঝাটির সময় স্বামী স্ত্রী উভয়েরই জন্যে জীবন সমস্যা আকারে দেখা দেয়। এসব ভ্রান্ত কর্মকাণ্ড থেকে বাঁচার জন্যে এখন একটিই মাত্র সহজ সরল ও পরিষ্কার পথ রয়েছে। আর তা হলো, মোহর এমন পরিমাণ ধার্য করতে হবে যা পরিশোধ করার নিয়্যত থাকবে এবং যা পরিশোধ করার সামর্থ স্বামীর থাকবে। পূর্ণ মোহর বিয়ের সময় পরিশোধ করে দিতে পারলেই ভাল। তা না হলে পরিশোধের জন্যে একটা মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে এবং সহজ কিস্তিতে তা পরিশোধ করে দিতে হবে। এই সত্য সঠিক পথ ত্যাগ করে যদি কোনো প্রকার হিলা বাহানার পথ বের করার চেষ্টা করা হয় তবে পরিণতিতে একটা গলদ থেকে বাঁচার জন্যে বিভিন্ন প্রকার আরো দশটা গলদ করা হবে যা শরীয়তের দৃষ্টিতে খুবই দুষণীয় এবং নৈতিকতার দৃষ্টিতে চরম দৃষ্টিকটু। আর এমনটি না হয়ে পারেনা। এ ধরনের বিয়েতে আপনি উকিল বা সাক্ষী হতে যাবেননা। বরঞ্চ আপনি উভয় পক্ষকে বুঝানোর চেষ্টা করুন। আপনার কথা না শুনলে তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন। বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু মিথ্যা ও ধোঁকাবাজীর সাক্ষী হওয়া মুসলমানদের জন্যে বৈধ নয়। তরজমানুল কুরআন ঃ যুল ক'দাহ১৩৬৫, অক্টোবর ১৯৪৬।

লেবাস ও চেহারার শরয়ী রূপ-আকৃতি

প্রশ্ন ঃ "দাবী করা হয়ে থাকে যে, সঠিক অর্থে মুসলমান হতে হলে অবশ্যি লেবাস ও চেহারায় ইসলামী আকৃতি অবলম্বন করতে হবে। মেহেরবানী করে এ সম্পর্কে ইসলামের বিধান বলে দেবেন।"

জবাব ঃ লেবাস এবং চেহারার রূপ আকৃতি সম্পর্কে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তার জবাব আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু তার আগে আপনি একথা ভালভাবে বুঝে নিন যে, বাইরের সংশোধনকে ভিতরের সংশোধনের উপর প্রাধান্য ও অগ্রাধিকার দেয়া উচিত নয়। সর্বাগ্রে নিজেকে নিজে কুরআনের মানদণ্ডে প্রকৃত মুসলমান বানাবার চেষ্টা করুন। এরপর বাহ্যিক পরিবর্তন ততোটুকু পরিমাণে করতে থাকুন, সত্যিকার অর্থে অন্তরে যতোটুকু পরিবর্তন হতে থাকবে। অন্যথায় আইন ও বিধিমালা (Rules and Regulation) অনুযায়ী আপনি যদি

কেবলমাত্র আপনার বাহ্যিক আকৃতিকে হাদীস ও ফিকহার কিতাবে বর্ণিত একজন মুত্তাকীর বাহ্যিক আকৃতির ছাঁচে ঢেলে সাজান আর আপনার হৃদয় মনে তাকওয়া সৃষ্টি না হয়ে থাকে, তবে আপনার উদাহরণ হবে সেই তাম্র মুদ্রার মতোন যার উপর স্বর্ণমুদ্রার মোহর লাগানো হয়েছে। স্বর্ণমুদ্রার সীল লাগানো কোনো কঠিন কাজ নয়। যে কোনো সস্তা ধাতুর উপর অতি সহজেই তা লাগানো যেতে পারে। কিন্তু খাঁটি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার। দীর্ঘ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কাজ করার মাধ্যমে তা লাভ করা যায়। দুর্ভাগ্যবশত দীর্ঘদিন থেকে আমাদের দেশে কেবল বাহ্যিক রূপ আকৃতির উপরই অস্বাভাবিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। এর পরিণতিতে স্বর্ণমুদ্রার ট্রেড মার্কে তাম্র, লোহা, সীসা এবং সর্বপ্রকার সস্তা ধাতুর মুদ্রায় বাজার ছেয়ে গেছে। বাস্তব দুনিয়া এতোটা বোকা ও অসচেতন নয় যে, দীর্ঘকাল যাবত সে এ কৃত্রিম মুদ্রা দ্বারা প্রতারিত হতে পারে। কিছুকাল তো আমাদের এ জাল স্বর্ণমুদ্রা বাজারে চলেছে। কিন্তু এখন আর বাজারে এর কানাকড়ি মূল্যও নেই। অতএব ইসলামী জামায়াতে আমাদের যে মানের দ্বীনদারী পয়দা করা দরকার তার দাবী হলো, স্বর্ণমুদ্রার লেবেল লাগানোর পূর্বে আমরা নিজেরা স্বর্ণমুদ্রা হওয়ার চেষ্টা করবো।

পোষাক ও চেহারা সূরতের রূপ আকৃতি এবং এ ধরনের অন্যান্য বাহ্যিক জিনিস সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতো হিদায়াত প্রদান করেছেন তা সবই মদীনা তাইয়েবার শেষ পাঁচ ছয় বছরে প্রদত্ত হিদায়াত। এর আগে তিনি কুরআন ও হাদীসে চিত্রিত নকশা অনুযায়ী তাঁর অনুসারীদের মধ্যে ব্যাপক তাকওয়া ও ইহসানের গুণাবলী পয়দা করার চেষ্টা করতে থাকেন। এই পরম্পরার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে মহান ব্যক্তিকে মানবাত্মার পরিশুদ্ধির কাজে নিযুক্ত করেছিলেন, তিনিও প্রথমে মরচে ধরা ধাতুকে শান দিয়ে নিখাদ ধাতব পদার্থে পরিণত করার কাজেই পূর্ণ মনোনিবেশ করেছিলেন। অতপর তা খাঁটি ধাতুতে পরিণত হওয়ার পরই তার উপর স্বর্ণমুদ্রার মোহরাংকন করেন।

অবশ্য এই পূর্বাপরের অর্থ এই নয় যে, এটাকে শরয়ী বিধান পালনে অবহেলা করার অজুহাত বানিয়ে নেয়া হবে। বরঞ্চ তার অর্থ হচ্ছে এই যে, এমন ধরনের মুত্তাকীয়ানা রূপ আকৃতি অবলম্বন থেকে বিরত থাকতে হবে, যার ভিতরে বাস্তবে তাকওয়া ও খোদাভীতি বর্তমান থাকবেনা এবং ইসলামী নৈতিকতার প্রাণস্পন্দন থাকবে যেখানে অনুপস্থিত।

লেবাসের ব্যাপারে ইসলাম যে পলিসি নির্ধারণ করে দিয়েছে তা হলো, আপনি এমন ধরনের পোষাক পরিধান করবেন যাতে করে আপনাকে দেখে যে কোনো লোক মনে করতে পারে, আপনি একজন মুসলমান। সামগ্রিকভাবে

আপনার বেশভূষা যেনো কাফিরদের অনুরূপ না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ির কোনো পরিমাণ নির্ধারণ করে যাননি। তিনি কেবলমাত্র দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। দাড়ি রাখার ব্যাপারে আপনি যদি ফাসিকদের অনুকরণ না করেন এবং এতোটা পরিমাণ দাড়ি রেখে দেন যা দেখে সাধারণভাবে লোকেরা বুঝতে পারবে যে, আপনি দাড়ি রেখেছেন, তবে শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যাবে। এতে ফকীহদের গবেষণার শর্তাবলী পূর্ণ হোক কিংবা না হোক, তাতে কিছু যায় আসেনা। অবশ্য এমনভাবে দাড়ি রাখা যাবে না, যা দেখে কেউ এ সন্দেহ করে বসে যে লোকটা কিছুদিন যাবত দাড়ি কামায়নি।

মাথার চুলের ব্যাপারে যে হিদায়াত পাওয়া যায়, তা হলো, কিছু কামানো এবং কিছু রাখা নিষিদ্ধ। বর্তমান যুগে যে ধরনের চুলকে পাঞ্জাবে 'বুদে' এবং উত্তর প্রদেশে (ভারতের অন্তর্গত) 'ইংলিশ চুল' বলা হয় তা নাজায়েয হবার ব্যাপারে আমি কোনো প্রমাণ পাইনি। কিন্তু একটি অমুসলিম জাতি উদ্ভাবিত চুল রাখার এ পদ্ধতি কোনো অবস্থাতেই মাকরূহ না হয়ে পারেনা। আর এ জন্যেই আমি চুল রাখার এ পদ্ধতি পরিবর্তন করে দিয়েছি। তরজমানুল কুরআন ঃ রমযান-শাওয়াল ১৩৬২, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৩।

দাড়ি সম্পর্কিত একটি প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ আমি দাড়ি রেখে দিয়েছি। দ্বীন সম্পর্কে যথেষ্ট ইলম রাখেন আমার এ রকম কিছু আত্মীয় এর বিরোধিতা করে বলেন, "দাড়ি রাখা ফরয নয়। এ সম্পর্কে কুরআনে কোনো নির্দেশ নেই। না রাখলে কোন্ কবীরা গুনাহ্ হবে? এ হচ্ছে রসূলের সস্তা মহব্বত।" মেহেরবানী করে বলুন এদের কি জবাব দেবো?

জবাব ঃ দাড়ি সম্পর্কিত আপনার এ প্রশ্ন থেকে একজন ইংরেজ নও মুসলিমের কথা মনে পড়লো। ভালভাবে পড়ালেখা করে বুঝে শুনে তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পরই তিনি দাড়ি কামানো পরিত্যাগ করেন। আপনার এ আত্মীয়ের মতোই 'ইসলাম সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞানী' কোনো কোনো ভদ্রলোক তাকে বলেছিলোঃ দাড়ি রাখা ইসলামে তেমন কোনো জরুরী বিষয় নয়। তারপরও আপনি কেন অনর্থক দাড়ি কামানো পরিত্যাগ করতে গেলেন? জবাবে তিনি বলেছিলেনঃ আমি জরুরী এবং অজরুরীর পার্থক্য বুঝিনা। আমি কেবল এতোটুকুই বুঝি যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশ দিয়েছেন। আমি যখন তার আনুগত্য কবুল করে নিয়েছি, তখন তার নির্দেশ

পালন করা আমার জন্যে অবশ্য কর্তব্য। উর্ধ্বতন অফিসারের (Higher Authority) নির্দেশাবলীর কোনোটিকে জরুরী এবং কোনোটিকে অজরুরী ঘোষণা দেয়া অধস্তন কর্মচারীর কাজ নয়। বাস, আপনি আপনার আত্মীয়দের এ ঘটনাটি শুনিয়ে দিন। তাদের জিজ্ঞেস করুন, বুঝলাম এটা 'রসূলের সস্তা মহব্বত', কিন্তু বলুন দেখি আপনি কোন্ দামী মহব্বতের প্রমাণ দিয়েছেন? কোনো ভৃত্য যদি মনিবের সহজ নির্দেশগুলোই পালন না করে, তবে কঠিন ও শক্ত নির্দেশগুলো তার দ্বারা কেমন করে পালিত হতে পারে? আমরা সস্তা এবং দামী মহব্বতের পার্থক্য বুঝিনা। আমরা পূর্ণভাবে কেবল সে পথেই চলতে চাই যে পথে চলে গেছেন রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তাঁর সকল হুকুম বিধান আমাদের পালন করতে হবে যা তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন।

এ প্রসংগে আরেকটি কথা বুঝে নিন। তা হলো, আজকের দিনে ঐ ব্যক্তির জন্যে দাড়ি রাখা কেবল মাত্র নবীর একটি নির্দেশ পালনই নয়, বরঞ্চ এ এক বিরাট জিহাদ, যে ব্যক্তি ফিরিংগী প্রভাবিত লোকদের সমাজে বাস করে। আশ্চর্য নয় যে, সে হয়তো এ জন্যে কিছু না কিছু হিজরতের পুরস্কার এবং সওয়াব পেয়ে যাবে। দীর্ঘ দিনের শিক্ষা ও পরিবেশের প্রভাবে তার মধ্যে যে অভ্যাস, মেজাজ ও স্বভাব চরিত্র শিকড় গেড়ে বসেছে, প্রথমে তো অনেক দিন পর্যন্ত এগুলোর বিরুদ্ধেই তাকে সংগ্রাম করে যেতে হবে। অতপর সে যখন পুরনো অভ্যাস ও মেজাজকে পদদলিত করে তদস্থলে ইসলামী আচার ও মেজাজের বিকাশ সাধনে এতোদূর সফল হয়ে ওঠে যে, তার মুখে দাড়ি গজায় তখন বাইরের সাথে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়। তার পরিবেশ এ বলে তার বিরোধিতায় মুখর হয়ে ওঠে যে, তোমার মধ্যে এ কি বিপ্লব শুরু হলো? তার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব ও চিনা পরিচিত মহল তাকে উত্যক্ত ও তিরস্কৃত করতে শুরু করে। তারা তাকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ ও উপহাস করতে থাকে। তার নিন্দা ও সমালোচনা করে বেড়ায়। বিয়ের বাজারে তার দর কমে যায়। চতুর্দিক থেকে দাবী উঠতে শুরু করে, এ দেয়ালকে ভেংগে দাও, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝখানে আড়াল সৃষ্টি করছে। এসব উপর্যুপরি হামলার মোকাবিলায় এমন ব্যক্তি টিকে থাকতে পারেনা, যার মধ্যে পর্বতসম অটল মজবুতি সৃষ্টি না হবে। ঐ ব্যক্তিও এসব হামলার মোকাবিলায় টিকে থাকতে পারেনা, যার মধ্যে পূর্ণাংগ আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন সাধিত হবার পূর্বেই কোনো সাময়িক উত্তেজনার প্রভাবে কিংবা বাইরের কোনো চাপের মুখে বাহ্যিক পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। এ ধরনের লোকেরা কিছু সময় মোকাবিলা করার পরই নিজ পরিবেশের কাছে পরাজয় বরণ করে। অতপর তারা বহুরূপীদের মতো পুনরায় সেই বেশ ধারন করে যা

পরিত্যাগ করার প্রদর্শনী করেছিল। কিন্তু যার মধ্যে পাহাড়ের মতো মজবুতি সৃষ্টি হবে আর যার আভ্যন্তরীণ বিপ্লব সৃষ্টি হবে মজবুত ভিত্তির উপর, সে অটল অবিচলভাবে এগুলোর মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। এ দৃঢ়তার ফলে অনিবার্যভাবে তার দুটি বিরাট ফায়দা লাভ হয়ে থাকে। একটি ফায়দা হলো এই যে, তার মধ্যে কুফরী পরিবেশের বিরুদ্ধে অন্যান্য ময়দানেও সফলভাবে সংগ্রাম করে যাওয়ার শক্তি ও যোগ্যতা সৃষ্টি হয়। আর দ্বিতীয় হলো, মজবুত সুদৃঢ় নৈতিক চরিত্রের সে প্রমাণ দেয়, এর এক বিরাট প্রভাব তার পরিবেশের উপর পড়ে থাকে যার ফলে তার তাবলীগ-ও শিক্ষা এতোটা প্রভাবশালী হয়ে যায় যে, নিজস্ব সমাজ পরিবেশের অন্যান্য সংশোধনকামী লোকদের উপরও সে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়।

অধিকাংশ লোক এই হাকীকত সম্পর্কেই বেখবর যে, বর্তমান যুগে দাড়ি কামানো কেবল একটি শারীরিক বিন্যাসই নয় বরঞ্চ এটা একটি কালচার এবং একটি ধর্মীয় জীবনের উজ্জ্বলতম নিদর্শন। এই নিদর্শন ত্যাগ করা সেই কালচার ও ধর্মীয় জীবনকে ত্যাগ করারই ঘোষণা, যে ধর্মের এটা নিদর্শন। এজন্যেই দাড়ি রাখাও বর্তমান পরিবেশে অন্তত ইসলামকে বাস্তবে একটি কালচার ও একটি ধর্মীয় জীবন হিসেবে গ্রহণ করার নামান্তর। এই গ্রহণ বর্জনও ততোক্ষণ পর্যন্ত খাঁটি এবং স্থায়ী হতে পারেনা, যতোক্ষণ না ব্যক্তির মন মগজ থেকে বাস্তবে পশ্চিমা কালচার ও জীবন যাপন পদ্ধতি নির্মূল হয়ে যাবে এবং তদস্থলে ইসলামী কালচার ও ধর্মীয় চেতনা মজবুতভাবে শিকড় গেড়ে নেবে। সুতরাং যারা কেবল সাময়িকভাবে নৈতিক প্রভাব প্রয়োগ করে আধুনিককালের যুবকদের দাড়ি রাখানোর কোশেশ করেন এবং তাদের মন মগজের পরিবর্তনের কোনো তোয়াক্কা না করে তড়িঘড়ি কেবল বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটাতে চান, তারা প্রকৃত ব্যাপার সম্পর্কে যে কিছুই জানেননা, সে কথা নিজেরাই প্রমাণ করেন। কিন্তু যে ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন সূচিত হয় প্রকৃতপক্ষে এক গভীর আভ্যন্তরীণ বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে এবং এরি ফলে তার মধ্যে প্রকাশ পায় যাবতীয় তাকওয়ামূলক চরিত্র আর সাথে সাথে তিনি চারপাশের ইসলাম বিরোধী শক্তি নিচয়ের সাথে লড়ে যান দৃঢ়তার সাথে, এমন ব্যক্তির পরিবর্তনকে একটা মামুলী জিনিস বলে আখ্যায়িত করা এবং এটাকে রসূলের সস্তা মহব্বত বলে ব্যাখ্যা করা কেবল ঐসব বেচারাদেরই কাজ হতে পারে যারা চোয়াল ও থুতনীর চুল ছাড়া আর কিছুই দেখার যোগ্যতা রাখেনা। তরজমানুল কুরআন ঃ রময়ান-শাওয়াল ১৩৬২ হিঃ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৩ ইং।

দাড়ির পরিমাণ প্রসংগ

প্রশ্ন ঃ *'দাড়ির পরিমাণ' নির্ধারিত নেই বলে তরজমানুল কুরআনে যা কিছু লেখা হয়েছে, সে সম্পর্কে আমার সংশয় রয়েছে। কারণ বড় বড় আলিমদের এ ব্যাপারে সর্বসম্মত ফতোয়া রয়েছে যে, দাড়ি এক মুষ্ঠি লম্বা হতে হবে। যার দাড়ির দৈর্ঘ এর চাইতে কম হবে সে ফাসিক। আপনি কোন্ দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে এই সম্মিলিত এবং সর্বসম্মত ফতোয়া প্রত্যাখ্যান করছেন?*

জবাব ঃ *এ প্রশ্ন তো ফতোয়াদানকারী আলিমদেরকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত যে, দাড়ির পরিমাণ নির্ধারণের পক্ষে তাদের কাছে কি দলিল প্রমাণ রয়েছে? এবং বিশেষভাবে তারা 'ফিসক' শব্দের কি অর্থ করেন যার ভিত্তিতে তাদের নির্ধারিত পরিমাণের কম দাড়ি যারা রাখেন তাদেরকে 'ফাসিক' বলা যেতে পারে? এসব 'বড় বড় আলিমদের' জন্যে আমার নিদারুণ আফসোস হয়, যারা নিজেরাই শরীয়তের সীমা বুঝেননা এবং এমনসব ফতোয়া দিয়ে বসেন যাতে সরাসরি শরীয়তের সীমা লংঘিত হয়।*

শরীয়ত প্রণেতা দাড়ির ব্যাপারে কোনো সীমারেখা নির্ধারণ করে দেননি। আলিমগণ যে সীমা নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন, তা একটি গবেষণালব্ধ জিনিস মাত্র। আর কোনো গবেষণালব্ধ বিধান কখনো এমন মর্যাদা লাভ করেনা, যে মর্যাদা রয়েছে কুরআন হাদীস প্রদত্ত বিধানের। কাউকে ফাসিক বলতে হলে কেবল কুরআন সুন্নার বিধানের বিরোধী কাজের জন্যেই বলা যেতে পারে। গবেষণালব্ধ বিধানের (চাই সেটা যতো বড় আলিমের গবেষণাই হোক না কেন) খেলাফ কাজ করা কখনো ফাসিকীর সংজ্ঞায় পড়েনা। অন্যথায় এটাকে 'ফাসিকী' বলে আখ্যায়িত করার অর্থ কেবল এ-ই হতে পারে যে, শরীয়তে গবেষক ও মুজতাহিদদের মর্যাদাও তাই, যে মর্যাদা স্বয়ং শরীয়ত প্রণেতার।

প্রশ্ন ঃ *বলতে পারেন, কোনো সাহাবীর দাড়ি এক মুষ্টির কম ছিলো কি?*

জবাব ঃ *'আসমাউর রিজাল' এবং জীবন চরিত (সিয়ার) গ্রন্থাবলী অনুসন্ধানের পর দু'তিনজন বাদে অন্য সাহাবীদের দাড়ির পরিমাণ জানা সম্ভব হয়নি। সাহাবায়ে কিরামের জীবন চরিত সম্পর্কে অসংখ্য পৃষ্ঠা রচনা করা হয়েছে। কিন্তু তাঁদের দাড়ি কতোটা লম্বা ছিলো সে সম্পর্কে কিছুই লেখা হয়নি। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, সালফে সালেহীনের মধ্যে দাড়ির পরিমাণ সংক্রান্ত মাসআলা কতোটা গুরুত্বহীন ও নগণ্য ছিলো। অথচ*

পরবর্তীকালের লোকদের মধ্যে যতোটা কড়াকড়িভাবে এ বিষয়ের প্রতি জোর দেয়া হয়ে আসছে তাতো মনে হচ্ছে যে, মুমিনের চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে জিনিসটি অনুসন্ধান করতে হবে তা হচ্ছে, তার দাড়ি কতোটা লম্বা।

প্রশ্ন ঃ দাড়ির পরিমাণ নির্ধারিত না থাকায় যে মাসআলাটি জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে, তার ভিত্তিতে কোনো কোনো সাথী ভাই নিজ নিজ দাড়ি ছোট করে নিয়েছেন। এখন তাদের খোঁচাখোঁচা দাড়ি সম্পর্কে এ আশংকা দেখা দিয়েছে যে, না জানি 'কাদিয়ানী দাড়ি'-র মতো তাদের দাড়িরও আবার কোনো দলীয় নাম চালু হয়ে যায় এবং এটা জনগণের জন্যে একটা 'ফিতনা' প্রমাণিত হয়? যেহেতু সর্বকালের উলামায়ে কিরাম মুষ্টিভরা দাড়ি রাখার ওপর আমল করে আসছেন, সেহেতু আমি মনে করি আমাদেরও সে রীতিরই অনুসরণ করা উচিত।

জবাব ঃ আপনার মন যে মতের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে আপনার নিজের তারই উপর আমল করা উচিত। আমার মতে, কারো দাড়ি ছোট কিংবা বড় হবার মধ্যে বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই। সেই মূল জিনিস এটা নয় যা মানুষের ঈমান বেশী বা কম হবার প্রমাণবহ। আমার আশংকা হয়, ঈমানের কমতিকে এখনো যেভাবে কোনো কোনো বাহ্যিক জিনিসের আধিক্য দ্বারা পূর্ণ করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে, জামায়াতে ইসলামীর কিছু লোকও সেই রোগে আক্রান্ত হয়ে না পড়ে। কোনো ব্যক্তির আনুগত্য ও প্রাণান্তকর সংগ্রাম যদি আল্লাহর পথে হয় 'দীর্ঘ', তবে তেমন কোনো ক্ষতি হয়ে যাবেনা, যদি তার দাড়ি হয় হ্রস্ব। কিন্তু যদি তার আনুগত্য ও প্রাণান্তকর সংগ্রামই হয় হ্রস্ব, তবে দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে, দীর্ঘ দাড়ি তার কোনো কল্যাণেই আসবেনা। বরঞ্চ এটাও অসম্ভব নয় যে, খোদার দরবারে তার বিরুদ্ধে ধোঁকাবাজীর মোকাদ্দমা দায়ের হয়ে যাবে।

আমাদের জামায়াত সদস্যদের সম্পর্কে লোকেরা কি রায় স্থির করবে এবং তাদের বেশ ভূষা থেকে লোকদের মধ্যে কি ধরণের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে, সে বিষয়ে আপনি মোটেও চিন্তা করবেননা। আপনার এবং আমাদের সকল সাথীদের নিজেদের বাইরের চাইতে ভিতরের চিন্তা বেশী করা উচিত। সেই সব আমলের চিন্তাই বেশী করা উচিত, খোদার মীযানে যেগুলো মানুষের জন্যে হালকা বা ভারী হবার মানদণ্ড। কেননা যদি এসব আমলই হালকা হয়ে যায়, তবে চুল পরিমাণ ওজনওয়ালা জিনিসের বেশী কমি দ্বারা খোদার মীযানে বিশেষ কোনো পার্থক্য হবার আশা করা যায়না।[১] তরজমানুল কুরআন ঃ রবীউল আউয়াল-জমাদিউস সানী ১৩৬৪ হিঃ, মার্চ-জুন ১৯৪৫ ইং।

---

১. সামনে মতবিরোধ অধ্যায়ে এ বিষয়ে আরো অধিক আলোচনা করা হয়েছে।

ছবি প্রসংগ

প্রশ্ন ঃ আমার এক ফটোগ্রাফার বন্ধুর ধারণা, ইসলামে 'তসবীর' (চিত্র) সংক্রান্ত যে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, তা ফটোর ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়, বিশেষ করে অশ্লীল দৃশ্যের ফটো যদি তোলা না হয়। এ সীমারেখার প্রতি দৃষ্টি রেখে ফটোগ্রাফীকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারেকি? জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং সভা সমিতির ফটো তোলাতে কোনো দোষ আছে কি?

জবাব ঃ ফটো সম্পর্কে এই নীতিগত কথাটা বুঝে নেয়া দরকার যে, সাধারণভাবে ইসলাম প্রাণসম্পন্ন জীবের ছবি চিত্র সংরক্ষণকে প্রতিরোধ করতে চায়। কেননা মানব ইতিহাসের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, এই ছবি চিত্রই অধিকাংশ ফিতনা ও বিপর্যয়ের কারণ হয়েছে। যেহেতু ছবি চিত্র সংরক্ষণ করাটাই ফিতনার মূল কারণ, সেহেতু সেটা কোন্ পন্থায় সংরক্ষণ করা হবে সে বিষয়ে আলোচনার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। পদ্ধতি যেটাই হোক, চাই তা পাথর খোদাই বা ভাস্কর্য হোক, চাই রং তুলির মাধ্যমে হোক, কিংবা নেগেটিভ গ্রহণের মাধ্যমে হোক, অথবা নতুন কোনো পন্থা আবিস্কৃত হোক, সর্বাবস্থায় তা নাজায়েযই থাকবে। কেননা সবগুলো পন্থাই মূল ফিতনা সৃষ্টির ক্ষেত্রে সমভাবে কার্যকর। এ ব্যাপারে ফটোগ্রাফী এবং চিত্রাংকনের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যেতে পারেনা। আর নিষেধাজ্ঞা যেহেতু প্রাণীর ছবি চিত্রের ক্ষেত্রে, এ জন্যে সর্বপ্রকার ছবি চিত্রই হারাম, চাই তা অশ্লীল হোক কিংবা না হোক। অবশ্য অশ্লীল ছবি চিত্র হারাম হওয়ার একটি অতিরিক্ত কারণ রয়েছে।

এই সাধারণ বিধানের মধ্যে ব্যতিক্রম কেবল এতোটুকই আছে যে, যেক্ষেত্রে ছবি চিত্রের দ্বারা সত্যিই তমদ্দুনিক কোনো কল্যাণ হয়, কিংবা কোনো রাষ্ট্রীয় কাজে একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে এগুলো করা যেতে পারে। যেমন পাসপোর্টের কাজে এবং অপরাধীকে সেনাখ্তের কাজে পুলিশ কর্তৃক ছবি সংরক্ষণ করা। ডাক্তারদের চিকিৎসার কাজে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষাদানের কাজে রোগীদের ছবি চিত্র গ্রহণ করা এবং সামরিক প্রয়োজনে ছবি সংরক্ষণ করা ইত্যাদি।[১]

এরূপ ক্ষেত্রে ছবির ব্যবহার সাধারণ নিষেধাজ্ঞার ব্যতিক্রম হবে। তবে শর্ত হলো, যে উদ্দেশ্যের জন্যে 'ব্যতিক্রম' দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করা হবে, সেই

---

১ এই ব্যতিক্রম সেই নীতির ভিত্তিতে ধরা হয়েছে, যার ভিত্তিতে অতীতের আলিমগণ বালিকাদের সাংসারিক কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন ও খেলাধুলার জন্যে কাপড়ের পুতুল ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। এর সমর্থনে হাদীসে রয়েছে।

উদ্দেশ্যটি অবশ্যি বৈধ হবে। কিন্তু নেতৃবৃন্দ ও সভা মিছিলের ছবি চিত্র কোনো অবস্থাতেই 'বৈধ' এবং 'প্রকৃত প্রয়োজনের' সংজ্ঞায় পড়েনা। বিশেষ করে নেতৃবৃন্দের ছবি তো খোদার বান্দাদের সেই মহাবিপদের নিকটবর্তী করে দেয়, যে কারণে ছবি চিত্রকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এই যে কংগ্রেসের সভায় গান্ধীজির বায়ান্ন ফুট লম্বা ছবি স্থাপন, রাশিয়া কর্তৃক পোল্যাণ্ড দখল করার পর পোল্যাণ্ডের প্রতিটি জনপথে ষ্টালিনের চিত্র স্থাপন, রাশিয়ার প্রতিটি স্থানে লোকদের মাথার উপর ষ্টালিন এবং পলিট ব্যুরোর সদস্যদের ছবি স্থাপন, জার্মান সৈনিকদের বুকে হিটলারের ছবি লাগিয়ে রাখা এবং হাসপাতালে মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত সেই ছবি চোখে লাগিয়ে জীবন উৎসর্গ করা, সিনেমা হলে বৃটিশ রাজ্যের ছবি উদিত হওয়া এবং সাথে সাথে লোকদের দাঁড়িয়ে যাওয়া, শাসন কর্তৃত্বের নিদর্শন স্বরূপ মুদ্রার গায়ে সম্রাটের চিত্র অংকন করা, এসবই কি মূর্তি পূজার উৎসমূল নয়? ইসলাম এ জন্যেই ছবি চিত্র হারাম করেছে, যাতে করে লোকদের মন মগজে আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো শ্রেষ্ঠত্বের চিত্র অংকিত না হতে পারে। আমি তো এ জন্যে ছোট বাচ্চাদের ছবি তোলাও অবৈধ মনে করি যে, ভবিষ্যতে হয়তো এদের কাউকে খোদা বানিয়ে নেয়া হবে এবং এসব ছবিই ফিতনার কারণ হয়ে বসবে। আজ পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচিত্রের পূজা চলছে।

সুতরাং আপনি আপনার বন্ধুকে জানিয়ে দিন যে, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তার পেশা বৈধ নয়। তিনি যদি খোদাকে ভয় করেন তবে যেনো ক্রমান্বয়ে এ পেশা ত্যাগ করে অন্য কোনো উপার্জন মাধ্যম গ্রহণ করেন। আর তিনি যদি এ কাজই করতে চান, তবে যেনো এটাকে হালাল আখ্যায়িত করার চেষ্টা না করেন। নৈতিক অধঃপতনের নিকৃষ্ট পর্যায় হলো, মানুষ যে গুনাহের কাজে লিপ্ত থাকে, মিথ্যা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দ্বারা সেটাকে সঠিক ও বৈধ আখ্যায়িত করে। এই গর্তে নিমজ্জিত হবার পর কোনো ব্যক্তির সেখান থেকে উঠে আসার সম্ভাবনা থাকেনা।

***প্রশ্ন ঃ** অনিয়মিত ছাত্র হিসেবে প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্যে দরখাস্তের সংগে অবশ্যি ছবি পাঠাতে হয়। এরূপ অবস্থায় ছবি তোলা কি জায়েয? জমীয়তে উলামায়ে হিন্দের সাবেক সভাপতি মাওলানা মুফতি কেফায়াত উল্লাহ সাহেব এরূপ অবস্থায় ছবি তোলাকে জায়েয বলেছেন। আমার বুঝে আসেনা একাজ কেমন করে জায়েয হতে পারে?*

***জবাব ঃ** এমতাবস্থায় আমি মাওলানা কেফায়াত উল্লাহ সাহেবের সংগে একমত। ছবি তোলা যদিও নাজায়েয, কিন্তু যেখানে সত্যিই তমদ্দুনিক কোনো*

ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্যে কিংবা সত্যিকারে কোনো তমদ্দুনিক প্রয়োজনে ছবি ব্যবহার করা একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে, সেক্ষেত্রে কেবল প্রয়োজন মেটানো পর্যন্ত তা করা জায়েয। পরীক্ষার ব্যাপারে যেহেতু এ অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছে যে, বহু লোক ধোঁকাবাজী করে নিজস্থলে অপর কাউকেও পরীক্ষা দেয়ার জন্যে পাঠিয়ে দেয়, সেহেতু পরীক্ষার দরখাস্তের সংগে ছবি লাগানো সত্যি প্রয়োজন। ছবি ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় এ প্রয়োজন পূরণ করা কঠিন। আর ধোঁকা প্রতারণার পথ বন্ধ করাও একান্ত জরুরী কাজ। সুতরাং এ উদ্দেশ্যে ছবি তোলাতে কোনো দোষ নেই। এমনি করে আমার মতে পাসপোর্ট, অপরাধীদের খুঁজে বের করা, চিকিৎসা গবেষণা ও চিকিৎসার কাজে, যুদ্ধ জিহাদ ও শিক্ষা ক্ষেত্রের প্রয়োজনীয় কাজে ছবির ব্যবহার জায়েয। উসূলে ফিকাহ্‌র একটি সর্বসম্মত মূলনীতি হলো ঃ

اَلضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ۔

"মানুষের প্রকৃত প্রয়োজনে সেসব জিনিস জায়েয হয়ে যায়, যেগুলো মূলত নাজায়েয।" তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শাবান ১৩৬২, জুলাই-আগাষ্ট ১৯৪৩।

অযু ভংগের কারণসমূহ

প্রশ্ন ঃ *ইসলাম দেহ ও পোষাকের পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার ওপর যে গুরুত্বারোপ করেছে মানব বিবেক তার মর্যাদা ও যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারেনা। কিন্তু এ সংক্রান্ত ছোট খাটো কিছু বিষয় সম্পূর্ণ অবোধগম্য মনে হয়। যেমনঃ বায়ু নির্গমণ দ্বারা অযু ভংগ হওয়া। অথচ বাহ্যিক দৃষ্টিতে দেহের কোনো অংশ থেকে বায়ু বের হওয়াতে অযু ভংগ হবার মতো অপবিত্রতা পরিলক্ষিত হয়না। এ বায়ুতে কি অপবিত্রতা সৃষ্টি হয়? এমনি করে পেশাব করলে অযু ভংগ হওয়ার ব্যাপারটাও অবোধগম্য। কারণ সতর্কভাবে পেশাব করে ভালভাবে ধুয়ে মুছে নিলে শরীরের কোথাও তো অপবিত্রতা লেগে থাকেনা। অযু ভংগের অন্যান্য করণসমূহও অবোধগম্য থেকে যায়, যেগুলোর কারণে অযু নবায়ণ করা জরুরী হয়ে পড়ে। মেহেরবানী করে এমন ভাবে প্রশ্নগুলোর জবাব দেবেন যাতে করে আমি মানসিকভাবে নিশ্চিন্ত ও আশ্বস্ত হতে পারি।*

জবাব ঃ *অযু ভংগের মাসআলায় আপনার মধ্যে যেসব সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে আপনি যদি সেগুলো নিরসন করতে চান তবে তার সঠিক পন্থা হলো, শরীয়ত যেসব জিনিসকে অযু ভংগের কারণ এবং যেগুলোর প্রেক্ষিতে অযু নবায়ণ করার নির্দেশ দিয়েছে প্রথমত সেগুলোকে আপনার মন মগজ থেকে বের করে*

রাখুন। অতপর মনে করুন, আপনার নিজেকেই সর্ব সাধারণ মানুষের জন্যে (যাদের মধ্যে জ্ঞানী, মূর্খ, বুদ্ধিমান, কমবুদ্ধির লোক, পবিত্রতার অনুভূতিসম্পন্ন এবং পবিত্রতার অনুভূতিবিহীন বিভিন্ন স্তর ও পরিবেশের লোকই রয়েছে) এমন একটি রুটীন তৈরী করতে হবে যার বৈশিষ্ট্য হবে নিম্নরূপ ঃ

১. লোকদের বার বার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে বাধ্য করা হবে এবং তাদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতার এতোটা অনুভূতি জাগ্রত করে দিতে হবে যে, তারা নিজেরাই নাপাকী ও নোংরামী থেকে মুক্ত পবিত্র থাকতে শুরু করবে।

২. খোদার সম্মুখে হাযির হবার এবং সেখানকার বিশেষ অবস্থা মন মগজে বসিয়ে দিতে হবে, যাতে করে অবচেতন অবস্থায়ও মানুষ নিজে থেকে অনুভব করতে থাকে যে, নামাযের যোগ্য হওয়ার অবস্থা দুনিয়ার অন্যান্য কর্মকাণ্ডের যোগ্য হওয়ার অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

৩. নিজ নফস এবং তার অবস্থা সম্পর্কে দৃষ্টি রাখার অভ্যাস লোকদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিতে হবে। যাতে করে, তারা নিজের পাক বা নাপাক হওয়ার এবং তাদের মধ্যে এ ধরনের আরো যেসব অবস্থার সৃষ্টি হয় সে সম্পর্কে তারা বেখবর না থাকে এবং নিজের অবস্থা সম্পর্কে নিজে সচেতন থাকে এবং নিজের অবস্থার পর্যালোচনা করতে থাকে।

৪. রুটীনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করার এখতিয়ার প্রত্যেকের নিজ মতের উপর ছেড়ে দেয়া যাবেনা। বরঞ্চ এমন একটি কর্মনীতি ঠিক করে দিতে হবে যাতে করে লোকেরা পবিত্রতার ক্ষেত্রে কম বেশী করার সুযোগ না পায়।

৫. রুটীন এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে, যেনো পবিত্রতার উদ্দেশ্য তাতে ভারসাম্যপূর্ণভাবে প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ এতোটা কঠোরতা অবলম্বন করা যাবেনা যাতে লোকদের জীবন সংকীর্ণ হয়ে আসে আর এতোটা শিথিলও করা যাবে না যাতে পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হবে।

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আপনি নিজেই একটা রুটীন প্রণয়ন করুন এবং একথার প্রতি লক্ষ্য রাখুন তাতে যেন, এমন ধরনের কোনো বিষয় সংযুক্ত না হয়, যে কারণে আপনার মতো কারো অভিযোগ সৃষ্টি হতে পারে।

এ ধরনের একটি রুটীন তৈরীর প্রচেষ্টায় আপনি যদি একটি সপ্তাহ ব্যয় করেন, তবে স্বাভাবিকভাবেই একথা আপনার বুঝে আসবে যে, এসব বৈশিষ্ট্য সম্বলিত পবিত্রতা পরিচ্ছন্নতার এমন কোনো রুটীন তৈরী করা সম্ভব নয়, যে সম্পর্কে ঐ ধরনের প্রশ্ন সৃষ্টি হবেনা, যে ধরনের প্রশ্ন আপনার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। আপনাকে অবশ্যি এমন কিছু জিনিস নির্ধারণ করতে হবে যেগুলো সংঘটিত হলে একটি পবিত্রতার পরিসমাপ্তি এবং আরেকটি পবিত্রতা অনিবার্য ঘোষণা করতে হবে। আপনাকে এটাও নির্ধারণ করতে হবে যে, একটি

পবিত্রতার স্থায়িত্ব (Duration) কোন্ সীমারেখা পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে এবং কোন্ কোন্ সীমারেখা এসে তার পরিসমাপ্তি ঘটাবে। এ উদ্দেশ্যে আপনি যেসব সীমারেখাই নির্ধারিত করবেন তাতে নাপাকি স্পষ্ট এবং অনুভবযোগ্য হবেনা বরঞ্চ তা হবে আনুমানিক ও কাল্পনিক। এ উদ্দেশ্যে কিছু প্রাকৃতিক ব্যাপারকে সীমারেখার নিদর্শন নির্ধারণ করতে হবে। অতপর আপনি নিজেই ভেবে দেখবেন যে, আপনার নির্ধারিত সীমারেখা কিভাবে ঐসব প্রশ্ন থেকে মুক্ত থাকতে পারে যেগুলো আপনি লিখেছেন।

এরূপ দৃষ্টিভংগি নিয়ে আপনি যখন এ মাসআলাটি চিন্তা ভাবনা করবেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই আপনি এ সিদ্ধান্তে পৌছুবেন যে, শরীয়ত প্রণেতা যেসব নিয়ম নীতি নির্ধারণ করে দিয়েছেন এসব উদ্দেশ্য সাধনে সেগুলোই সর্বোত্তম ও সুষম পন্থা। এর একেকটি অংশকে পৃথকভাবে দেখে সেটার কারণ ও সমাধান খুঁজে বেড়ানো বিবেকসংগত পন্থা নয়। বরঞ্চ এটাই দেখতে হবে যে, উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য সাধনে সামগ্রিকভাবে এ জিনিসগুলো থেকে উত্তম ও কার্যকর কোনো নিয়মপন্থা নির্ধারণ করা যেতে পারে কি? অযুর বিধান সম্পর্কে লোকদের মধ্যে যে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হয় তার মূল কারণ হলো, তারা সেইসব মৌলিক হিকমতকেই বুঝতে চেষ্টা করেনা, অযুর বিধান প্রণয়নে সামগ্রিকভাবে যেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। বরঞ্চ গোটা বিধান থেকে পৃথক করে কোনো একটি হুকুম সম্পর্কে তারা জানতে চায় যে, এ বিধানটির উদ্দেশ্য কি এবং এর এমনকি প্রভাব আছে যার ফলে অযু ভংগ হয়ে যায়? তরজমানুল কুরআন ঃ মুহাররম-সফর ঃ ১৩৬৩, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪।

মানব সন্তানের কৃত্রিম প্রজণন কি বৈধ?

প্রশ্ন ঃ রাসায়নিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পুরুষদের বীর্য যদি নারীর জরায়ুতে পৌছে দেয়া যায় এবং তাতে সন্তান পয়দা হয়, তবে একাজ অনিষ্টমুক্ত হওয়ার কারণে মুবাহ (বৈধ) হবে কি? একাজ যে করবে সে নারী কি ব্যাভিচারিণী বলে গণ্য হবে এবং তার উপর শরয়ী দণ্ডবিধি কার্যকর হবে? বিবেচ্য বিষয় হলো, আজকের ফ্যাশন বিলাসী মহিলারা পুরুষদের থেকে মুক্ত থাকতে চায়। তারা যদি বৈজ্ঞানিক পন্থায় নিজেদের ভাগের বংশবৃদ্ধির দায়িত্ব পালন করে তবে এর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়া উচিত নয়। এ পন্থায় জন্মলাভকারী সন্তানকে আমেরিকায় আইনগতভাবে বৈধ সন্তান বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে।

জবাব ঃ যন্ত্রের সাহায্যে সন্তান প্রজণন বৈধ হওয়া তো দূরের কথা, নারীকে ঘোটকীর স্তরে নামিয়ে আনার মতো এ কর্মের চিত্র কল্পনা করাটাও আমার

বরদাশ্‌তের বাইরে। আর যা-ই করুন না কেন, মানববংশীয় নারীকুল এবং মাদী পশুর মধ্যে অন্তত কিছুটা পার্থক্য রাখুন। আল্লাহ্ তায়ালা পশুদের জন্য বংশবৃদ্ধির যে পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন সেটাও তো নর এবং মাদী পশুর মিলন। মানুষ তার স্বার্থপরতার কারণে মাদী ঘোড়াকে নর ঘোড়ার সাথে মিলনের এবং স্বাদ আস্বাদনের সুযোগ না দিয়ে তার থেকে কেবল বংশবৃদ্ধির উদ্দেশ্যই হাসিল করে। এখন মানুষও যদি তার নারীকুলের সাথে একই আচরণ করতে শুরু করে, তবে এটা মানবতার চরম অধপতন ও লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আজকের যেসব 'ফ্যাশন বিলাসী' নারী পুরুষদের থেকে নির্ভরতা মুক্ত থাকতে চায়, প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিম চিন্তা ও যৌন পরিবেশ তাদের প্রকৃতিকেই বিকৃত করে দিয়েছে। তা নাহলে তারা যদি সঠিক মানব প্রকৃতির উপরই অবস্থান করতো, তবে এধরনের হীন নিকৃষ্ট বাসনা তাদের অন্তরে স্থান দেয়া তো দূরের কথা, এহেন প্রস্তাবের কথা তারা শুনতেও চাইতোনা। শুধুমাত্র সন্তান জন্ম দেয়াই নারীর কাজ নয়, বরং নারী-পুরুষের সম্পর্ক মানব সভ্যতার প্রাকৃতিক বুনিয়াদ। আল্লাহ্ তায়ালা এজন্যেই নারী ও পুরুষ করে সৃষ্টি করেছেন যাতে করে তাদের মধ্যে পরস্পরিক ভালবাসা, সম্প্রীতি ও সহানুভূতি গড়ে ওঠে, তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপিত হয়, পরস্পর মিলিত হয়ে ঘর বাঁধে এবং ঘর থেকে বংশ ও বংশ থেকে সমাজ গঠিত ও বিকশিত হয়। এ মহান উদ্দেশ্যকে বিনষ্ট করে নারীদেরকে কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র বানানোতো আল্লাহর সৃষ্ট প্রকৃতি পরিবর্তন করে দেয়ারই শামিল, যাকে কুরআনে শয়তানী কর্ম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আল্লাহ তায়ালা নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহের পন্থা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সুতরাং কেবল ঐসব সন্তানই বৈধ সন্তান, যারা বিবাহিত দম্পতির মিলনের মাধ্যমে জন্মলাভ করে। এরাই উত্তরাধিকার লাভকারী এবং বংশধারা সংরক্ষণকারী। যন্ত্রের সাহায্যে সন্তান জন্মদানকে বৈধ বলা যেতে পারেনা। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে হারামই বলা হবে। এরূপ সন্তান হবে পিতৃসূত্রবিহীন। পিতার উত্তরাধিকার থেকে সে হবে বঞ্চিত। আর এ হবে অকাট্যভাবে তার অধিকার বিনষ্টের অন্তর্ভুক্ত।

অতপর একথাটাও চিন্তা করে দেখুন, যে শিশুর পিতৃত্বের দাবীদার কেউ থাকবেনা তার লালন পালন ও শিক্ষা দীক্ষার দায়িত্ব কে নেবে? কেবল মাত্র মা? আল্লাহ তায়ালা মানব শিশুর জন্যে মাতা পিতা, চাচা মামা এবং দাদা নানা প্রভৃতি রূপে যেসব মুরব্বীদের সৃষ্টি করেছেন তাদের অর্ধেককে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে কেবল মাতৃত্বের ধারার উপর তার যিম্মাদারী অর্পণ করাটা কি সুস্পষ্ট যুলুম

নয়? পৃথিবী থেকে পিতার মুহব্বত, যিম্মাদারী এবং নৈতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে নির্মূল করে দেয়ার মধ্যে মানবতার কোন্ সেবা এবং কল্যাণ নিহিত আছে কি? নারী তার মাতৃত্বের যিম্মাদারীর উপর বহাল থাকবে কিন্তু পুরুষ চিরতরে পিতৃত্বের যিম্মাদারী থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, এটাকি কখনো ইনসাফ হতে পারে? এই কার্যধারা যদি চালু হয়ে যায় তাহলে নারীরা একদিন দাবী করে বসবে যে, এমন কোনো পন্থা উদ্ভাবন করা দরকার যাতে করে মানবশিশু আমাদের গর্ভে লালিত হওয়ার পরিবর্তে 'টেষ্ট টিউবে' লালিত হয়। অর্থাৎ মানুষ রাসায়নিক যন্ত্রপাতিতে পয়দা হতে থাকবে। এ অবস্থা সৃষ্টি হবার পূর্ব পর্যন্ত নারীরা চাইবে যে, তাদের কেবল সন্তান জন্ম দেয়ার কষ্টটাই দেয়া হোক, এরপর মাতৃত্বের অন্য কোন দায়িত্ব পালনে তারা প্রস্তুত থাকবেনা।

এ অবস্থা চালু হয়ে গেলে মানবশিশু "গণ উৎপাদন" (Mass Production) নীতির ভিত্তিতে ফ্যাক্টরীর ছাঁচে তৈরী হয়ে বের হবে যেমন করে বর্তমান যুগে জুতা আর মোজা তৈরী হচ্ছে। এটা হবে মানবতার অধপতনের সর্বনিম্ন পর্যায়। মানুষ উৎপাদনের এসব কারখানা থেকে মানুষ নয় বরং দুপায়ী জানোয়ার জন্ম নেবে যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র মানবীয় মর্যাদা এবং মানবীয় পবিত্র অনুভূতি ও চেতনা পর্যন্ত থাকবেনা। তার মধ্যে মানবীয় চরিত্রের সেইসব বহুবিধ গুণ ও বৈশিষ্ট্য পয়দা হবেনা, যা সমাজ ও সভ্যতার বহুবিধ প্রয়োজনের জন্যে অপরিহার্য। এসব কারখানা থেকে কোন এরিষ্টটল, ইবনে সীনা, গাযালী, রাযী, হেগেল এবং ক্যান্ট সৃষ্টি হওয়ার প্রত্যাশা করা যেতে পারেনা। আমার মতে, বস্তুবাদী সমাজ সভ্যতার আওতায় বাস করার ফলে মানুষের মন মস্তিস্কে এসব কুরুচিপূর্ণ ধ্বংসাত্মক ধ্যান ধারণা পয়দা হয়। মানুষের মনমস্তিস্কে এ ধরনের ধ্যান ধারণা পয়দা হওয়াটাই একথা প্রমাণ করে যে, এই সভ্যতা ও সংস্কৃতি মানুষের মন মগজে স্বয়ং মানুষের উচ্চ মর্যাদাকেই হীন ও লাঞ্ছিত করে দিয়েছে।

যান্ত্রিক ইমামতি

প্রশ্ন ঃ রেডিও এমন এক যন্ত্র যা এক ব্যক্তির আওয়াযকে হাজার হাজার মাইল দূরে পৌছে দেয়। এমনি করে, গ্রামোফোনের রেকর্ডে মানুষের শব্দ সংরক্ষণ করা যায় এবং বিশেষ পদ্ধতিতে সেটাকে বার বার বাজানো যায়। এখন প্রশ্ন হলো, হাজার হাজার মাইল দূর থেকে যদি কোনো ইমাম রেডিওর মাধ্যমে ইমামতি করেন কিংবা কোনো ইমামের আওয়ায যদি গ্রামোফোনের রেকর্ডে সংরক্ষণ করা হয় এবং তা পুনঃ পুনঃ বাজানো হয় তবে এসব যান্ত্রিক আওয়াযের নেতৃত্বে নামাযের জামায়াত করা জায়েয হবে কি?

জবাব ঃ রেডিওর মাধ্যমে ইমামতি করে নামায পড়ানো, কিংবা গ্রামোফোনের মাধ্যমে নামাযের রেকর্ড তৈরী করে তার নেতৃত্বে জামায়াতে নামায পড়া নীতিগতভাবেই ঠিক নয়। এর কারণসমূহ চিন্তা করলে আপনি নিজেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন।

কেবল নামায পড়ানোই ইমামের কাজ নয়, বরঞ্চ একদিকে তিনি স্থানীয় জামায়াতের নেতা। নিজ এলাকার লোকদের সংগে ব্যক্তিগতভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা তাঁর দায়িত্ব। তাদের নৈতিক চরিত্র, আচার আচরণ, লেনদেন, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং এলাকার পরিবেশ পরিস্থিতির প্রতি তিনি দৃষ্টি রাখেন। প্রয়োজন মতো খুতবা, বক্তৃতা ও অন্যান্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করে তাদের হিদায়াত ও সংশোধনের দায়িত্ব পালন করবেন। এটা নিতান্তই স্বতন্ত্র কথা যে মুসলমানদের অন্যান্য জিনিসের সাথে এই প্রতিষ্ঠানটিতেও এখন অধপতন দেখা দিয়েছে। কিন্তু মূল প্রতিষ্ঠানটিকে তো তার আসল মর্যাদার উপর টিকিয়ে রাখা আবশ্যক। যদি রেডিওর মাধ্যমে নামায পড়ানো হতে থাকে, কিংবা গ্রামোফোনের মাধ্যমে ইমামতি ও খুতবার কাজ হতে থাকে, তবে ইমামতির আসল প্রাণশক্তি চিরদিনের জন্য খতম হয়ে যাবে।

নামায অন্যান্য ধর্মের উপাসনার মতো কেবলমাত্র 'পূজা' নয়। সুতরাং এর নেতৃত্ব থেকে ব্যক্তির অপসারণ এবং তদস্থলে 'যান্ত্রিকতা' সৃষ্টি করা মূলত নামাযের উচ্চ মর্যাদাকে খর্ব করা ছাড়া আর কিছু নয়।

তাছাড়া স্থানীয় নেতৃত্ব ও ইমামতি খতম করে দিয়ে যদি কোনো কেন্দ্রীয় স্থান থেকে কোনো ব্যক্তি রেডিও কিংবা গ্রামোফোনের মাধ্যমে ইমামতি ও খুতবা দানের দায়িত্ব পালন করেন, তবে তা হবে এমন এক কৃত্রিম ঐক্য যা ইসলামের সত্যিকার গণতান্ত্রিক মেজাজকে সম্পূর্ণ খতম করে দেবে এবং তদস্থলে একনায়কত্বকে বিকশিত করবে। এটা সেই সব রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রকৃতির সাথেই সামঞ্জস্যশীল, যেখানে গোটা দেশের প্রতিটি ইঞ্চি যমীন একটি মাত্র কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত হয় এবং সকল মানুষকে কেবলমাত্র একজন নেতার পূর্ণাংগ আনুগত্যের শৃংখলে আবদ্ধ করা হয়। যেমন, ফ্যাসিবাদ ও সমাজবাদ। কিন্তু ইসলাম একজন কেন্দ্রীয় নেতা বা আমীরের কর্তৃত্বকে এতোটা সর্বব্যাপী করতে চায়না, যার ফলে প্রতিটি অঞ্চলের স্থানীয় লোকদের লাগাম সম্পূর্ণরূপে তার হাতের মুঠোয় এসে যায় এবং তাদের নিজেদের কল্যাণ চিন্তা ও নিজেদের সমস্যা উপলব্ধি করা এবং তা সমাধানের যোগ্যতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারেনা।

ইসলামের সর্বোত্তম যুগ ছিলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ। এ যুগে ইমামগণ পুরোহিতদের মতো কেবল কতিপয় ধর্মীয় রীতি নীতি ও আচার অনুষ্ঠানই পালন করতেননা, বরঞ্চ তাঁরা স্থানীয় নেতৃত্বের আসনে

অধিষ্ঠিত হতেন। তাঁদের কাজ ছিলো এলাকার লোকদের শিক্ষা প্রদান করা, তাদের জীবনকে পরিশুদ্ধ করা এবং সমাজ ও সভ্যতার সংশোধন ও বিকাশ সাধন করা। তাঁরা স্থানীয় জামায়াতের লোকদের এ উদ্দেশ্যে তৈরী করতেন, যাতে করে তারা বৃহত্তর ক্ষেত্রে ও কেন্দ্রীয় জামায়াতের সাফল্য ও বিজয়ে নিজেদের যোগ্যতা অনুযায়ী অংশ নিতে পারে। রেডিও সেট কিংবা গ্রামোফোনের দ্বারা এ মহান উদ্দেশ্য কেমন করে পূর্ণ হতে পারে? যন্ত্র কখনো মানুষের বিকল্প হতে পারেনা। সেটা কেবল মানুষের সহায়কই হতে পারে। এসব কারণে আমি মনে করি 'যান্ত্রিক ইমামতি' ইসলামের মূল প্রাণশক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী। তরজমানুল কুরআন ঃ মুহররম-সফর ১৩৬৩ হিঃ, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৩ ইং।

ইসলাম ও বাদ্যযন্ত্র

প্রশ্ন ঃ ১. *বাদ্যযন্ত্র তৈরী করা এবং সেগুলোর ব্যবসা করা কি বৈধ?*

২. বিয়ে শাদী উপলক্ষে বাদ্য বাজানো কি জায়েয? আনন্দ স্ফূর্তির জন্যে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার কি বৈধ?

৩. উপরোক্ত প্রশ্ন দুটির জবাব যদি নেতিবাচক হয়, তবে এমন লোকদের ব্যাপারে শরয়ী বিধান কি, যারা নিজেরা বাদ্যযন্ত্রের সাথে সম্পর্ক রাখেনা বটে, কিন্তু যারা বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে তাদের অসন্তুষ্টির ভয়ে তাদের সংগে মেলামেশা করে?

৪. যেসব বিয়েতে বাজনা বাজানো হয়, আমাদের জন্যে তাতে শরীক হওয়ার অনুমতি আছে কি?

৫. বাদ্যযন্ত্র অনুরাগীদের ধারণা হলো, যেহেতু নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কেবলমাত্র 'দফ'ই (ঢোল জাতীয় বাদ্যযন্ত্র) একমাত্র বাদ্যযন্ত্র ছিলো, আর তিনি সেটা ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করেছেন, সুতরাং বর্তমান যুগে 'দফ' এর বিভিন্ন উন্নত সংস্করণের ব্যবহারে অসুবিধা কি?

৬. 'দফ' কি বাদ্যযন্ত্ররূপে পরিগণিত?

জবাব ঃ *১. হাদীসে উল্লেখ হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "আমি বাদ্যযন্ত্র ভাংগার জন্যে প্রেরিত হয়েছি।" এখন বলুন, যে নবী বাদ্যযন্ত্র ভাংগার জন্যে প্রেরিত হয়েছেন, তাঁর অনুসারীরাই বাদ্যযন্ত্র তৈরী, ব্যবসা ও ব্যবহারে নিজেদের শক্তি সামর্থ নিয়োজিত করবে একথা কেমন করে সঠিক হতে পারে?*

২. বিয়ে শাদী কিংবা অন্য যে কোনো অবস্থায়ই বাদ্য বাজানো বৈধ নয়। হাদীসে যতোটুকু অনুমতি দেয়া হয়েছে তা কেবল এই যে, বিয়ে এবং ঈদ উপলক্ষে 'দফ' বাজিয়ে কিছু গাওয়া যাবে।

৩. আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবদের অসন্তুষ্টির ভয়ে তাদের সাথে নাজায়েয কাজে অংশ নেয়া ঈমানের দুর্বলতা ছাড়া আর কিছু নয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবায়ে কিরামের সাথে যারা নিজেদের হাশর লাভ করতে চান, তাদের তো এমন লোকদের সাথে মেলামেশা করা উচিত নয়, যারা শরয়ী বিধানের পরোয়া করেনা। নয়তো এসব লোকের সংগে সম্পর্ক রাখা যাদের নিকট অধিকতর প্রিয়, তাদের একথা উপলব্ধি করা উচিত যে, একই সংগে বদকার এবং নেককার উভয় ধরনের লোকদের সংগে সম্পর্ক রাখা যেতে পারেনা। দুনিয়ায় যারা বদকারদের সংগী, আখিরাতেও তারা তাদেরই সংগ লাভ করবে।

৪. এর জবাবের জন্যে ৩ নম্বর জবাব দ্রষ্টব্য। তবে মনে রাখতে হবে, যখন ইজাব ও কবুল অনুষ্ঠিত হয় এবং অশ্লীল ও গর্হিত কিছুর প্রদর্শনী না হয়, তখন বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাতে কোনো দোষ নেই। বরঞ্চ তখন অংশগ্রহণ করাটাই উত্তম। আর যখন গান বাদ্য আরম্ভ হয়ে যাবে, তখন অত্যন্ত ভদ্রতার সাথে আত্মীয় ও বন্ধুদের একথা বলে বিদায় নিয়ে নিতে হবে যে, আমি তোমাদের যাবতীয় বৈধ কাজে আন্তরিক সন্তুষ্টির সাথে তোমাদের সাথে একাত্ম রয়েছি। আর তোমাদের যাবতীয় নাজায়েয কাজে আমি নিজেও অংশগ্রহণ করা অপসন্দ করি এবং তোমরাও এসব খারাপ কাজে নিমগ্ন হও তা পসন্দ করিনা।

৫. সে যুগে দফ ছাড়া আর কোনো বাদ্যযন্ত্র ছিলনা, এটা ভুল কথা। তৎকালীন পারস্য, রোম এবং জাহেলী আরবের সভ্যতা সংস্কৃতির ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ব্যক্তিই এমনটি বলতে পারে। বিভিন্ন প্রকার বাজনার নামতো জাহেলী যুগের কাব্যেও পাওয়া যায়।

৬. দফ যদি বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয় তাতে কি আসে যায়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে শাদী এবং ঈদ উপলক্ষে এর ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। আর ব্যবহারের এটাই চূড়ান্ত সীমা। এর বাইরে কোনো ব্যক্তির জন্যে এটা ব্যবহার করা বৈধ নয়। এই চূড়ান্ত সীমাকে যে ব্যক্তি সূচনা বিন্দু (Starting point) বানাতে চায়, খামোখা ঐ নবীর অনুসারীদের মধ্যে তার নাম লিখাতে কে তাকে বাধ্য করেছে যিনি বাদ্যযন্ত্র ভাংগার জন্যে প্রেরিত হয়েছেন? তরজমানুল কুরআন ঃ মুহররম-সফর ১৩৬৩ হিঃ, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৪ ইং।

বাধ্য হয়ে গায়রুল্লাহ্র আনুগত্য করা

প্রশ্ন ঃ "এক ব্যক্তি আকীদাগতভাবে হক মনে করে গায়রুল্লাহ্র (যেমন কোনো বাদশাহ বা বাতিল সরকারের) আনুগত্য করে। অপর ব্যক্তি আকীদাগতভাবে গায়রুল্লাহ্র আনুগত্য-বন্দেগী করেনা বটে, কিন্তু কার্যত গায়রুল্লাহ্র হুকুম বিধান মেনে চলে এবং এর কারণ স্বরূপ সে বলে, এটা সে বাধ্য হয়ে করে। উপরোক্ত ব্যক্তিদ্বয়ের আমলের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা যেতে পারে কি? আপনার কৃত 'ইলাহ' (الــه) ও 'রব' (رب) এর ব্যাখ্যানুযায়ী এদের অবস্থান তো একই স্তরে পড়ে, অথচ উভয়ের মধ্যে ব্যবধান পূর্ব ও পশ্চিমের মতো।"

জবাব ঃ আমি আমার লেখায় বিভিন্ন স্থানে একথা পরিষ্কার করে বলে দিয়েছি যে, সমগ্র মানবজাতি নিম্নোক্ত চার স্তরে বিভক্ত ঃ

১. مُؤْمِنٌ لِلْغَيْرِ وَ مُسْلِمٌ لِلْغَيْرِ *অর্থাৎ* *যে ব্যক্তি আকীদাগতভাবে গায়রুল্লাহকে নির্দেশদাতা ও অনুসরণযোগ্য মনে করে এবং বাস্তবেও তাকে মেনে চলে। এরা পুরোপুরি কাফির।*

২. مُؤْمِنٌ لِلْغَيْرِ وَمُسْلِمٌ لِلّٰهِ *অর্থাৎ* *যে ঈমান রাখে গায়রুল্লাহ্র প্রতি, কিন্তু আইন কানুন মেনে চলে আল্লাহ্র। এ অবস্থা হয়ে থাকে (ইসলামী রাষ্ট্রভুক্ত) যিম্মীদের এবং বিশেষ সীমা পর্যন্ত মুনাফিকদের।*

৩. مُؤْمِنٌ بِاللّٰهِ وَمُسْلِمٌ لِلْغَيْرِ- *অর্থাৎ* *আকীদাগতভাবে আল্লাহকে মানে, কিন্তু আনুগত্য ও বন্দেগী করে গায়রুল্লাহ্র। এ অবস্থা হয়ে থাকে ঐসব মুসলমানদের যারা কাফিরদের অধীন হয়ে যায়। কোনো মুসলমান এরূপ অবস্থায় নিমজ্জিত হলে এ অবস্থার প্রতি তাকে চরম ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করতে হবে। কোনো অবস্থাতেই এর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া যাবেনা। বরঞ্চ তার জন্যে একাজ অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়ে যে, সে এ অবস্থাকে পরিবর্তন করার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা সংগ্রাম চালাবে, কিংবা সে দেশ ত্যাগ করবে।*

৪. مُؤْمِنٌ بِاللّٰهِ وَمُسْلِمٌ لِلّٰهِ- *অর্থাৎ* *আল্লাহ্র প্রতি ঈমানও রাখে এবং আল্লাহর আনুগত্য বন্দেগীও করে। এটাই মুসলমানের প্রকৃত পজিশন। এই পজিশন অবলম্বনে তৎপর হওয়ার জন্যেই কুরআন মানবজাতিকে আহবান জানায়। কোনো ব্যক্তি যদি কোনো অমুসলিম রাষ্ট্রে নিজ দুর্বলতার কারণে এবং চাপের মুখে কুফরী আইন দ্বারা বন্দী ও শৃংখলিত হয়ে পড়ে, যে অবস্থা হিজরতের পূর্বে মক্কা মুয়াযযমায় মুসলমানদের*

হয়েছিল, কিংবা যেভাবে সাহাবায়ে কিরাম কাফিরদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন, কিংবা যে অবস্থা হয়েছিল কুফরী সমাজব্যবস্থায় জন্ম গ্রহণ করার ফলে অধিকাংশ আম্বিয়ায়ে কিরামের। এরূপ অবস্থায় পতিত হবার কারণে প্রকৃত মুসলিমের পজিশন ক্ষুণ্ন হয়না। এধরনের শৃংখলিত অবস্থা গায়রুল্লাহ্র আনুগত্যের সংজ্ঞায় পড়েনা। কেননা এ আনুগত্য তারা স্বেচ্ছায় কবুল করেনা! বরঞ্চ তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়।

দ্বিতীয়ত, কোনো ব্যক্তি যখন আল্লাহ্র প্রতি ঈমানদার এবং গায়রুল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসকারী হয় এবং এর সাথে সাথে সে নিজ সাধ্যানুযায়ী আল্লাহ্র আনুগত্যকারী হওয়া এবং গায়রুল্লাহ্কে অমান্য ও অস্বীকার করার ব্যাপারে কোনো ক্রুটি না করে, তবে এমন ব্যক্তিকে গায়রুল্লাহ্র আনুগত্যকারী হওয়ার অপবাদ দেয়া যেতে পারেনা।

একথা মনে রাখা আবশ্যক যে, 'গ' শ্রেণীর লোকদের অবস্থা 'ক' 'খ' শ্রেণীর লোকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। আল্লাহ্র প্রতি ঈমানদার ও গায়রুল্লাহ্র আনুগত্যকারী লোকেরা কখনো কাফির এবং মুশরিক নয়। কিন্তু তারা যদি এ অবস্থার উপর সন্তুষ্ট থাকে এবং এ অবস্থাকে পরিবর্তন করার বা তা থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাব্য প্রচেষ্টা না চালায় তবে তারা সাংঘাতিক গুনাহ্গার হবে। তাদের গোটা জীবনটাই পাপের প্রতীক হয়ে থাকবে। তরজমানুল কুরআন ঃ মুহাররম-সফর ১৩৬৪ হিঃ, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ইং।

দোয়ায় হাত উঠানো

প্রশ্ন ঃ নামাযের পর হাত উঠিয়ে দোয়া করার কারণে স্থানীয় লোকদের মধ্যে আমার বিরুদ্ধে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দা এমন এক তরীকার অনুসারী, যাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো তারা মুনাজাতে হাত উঠায়না।

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً -

"তোমাদের প্রভুকে ডাকো ভয়ে বিনীত হয়ে ও গোপনে।" আমার বিরুদ্ধে তারা যে অভিযোগ উত্থাপন করে তার পক্ষে তাদের দলিল হলো এ আয়াত। তারা বলেঃ এই আয়াতের দাবী হলো, দোয়ায় যতোটা সম্ভব গোপনীয়তা অবলম্বন করতে হবে। পক্ষান্তরে হাত উঠানোর মধ্যে তো দোয়া প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ কারণে দোয়ায় হাত উঠানো কুরআনের দাবীর খেলাফ। তাছাড়া নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো দোয়ায় হাত উঠিয়েছেন হাদীস থেকে এমনটি প্রমাণ হয়না। সাধারণ লোকেরা তো দলিল প্রমাণের ধার ধারেনা। তারা তিলকে তাল করে দেখে। অতএব তারা আমাকে পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছে যে, তাদের সংগে নামায আদায় করার কোনো অধিকার আমার নেই।

এ নির্দেশ যারা জারি করেছে তাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত লোকেরাও রয়েছেন। এটা নিঃসন্দেহে জাহেলী আচরণ।

মেহেরবানী করে উপরোক্ত আয়াতটির আলোকে আমাকে মাসআলাটি বুঝিয়ে দিন।

জবাব ঃ اُدْعُوْا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَةً ـ

("তোমাদের রবকে ডাকো বিনয়ের সাথে এবং সংগোপনে")

এই ভদ্রলোকদের বলুন যে, এ আয়াতটির দাবী যদি তা-ই হয়ে থাকে যা তোমরা বুঝেছ, তবে নামাযের জন্যে উচ্চস্বরে আযান দেয়া, মসজিদে লোকদের একত্র হওয়া, জামায়াতের সংগে নামায পড়া, নামাযে উচ্চস্বরে কিরআত পড়া, এসবই তো ঐ আয়াতের খেলাফ বলে ঘোষণা করতে হয়। নামায তো আসলে এক প্রকার দোয়া। আর দোয়ার জন্যে যদি গোপনীয়তা এতোটা আবশ্যকীয় হয়ে থাকে যে, তার প্রকাশ্য কোনো দিকই থাকবেনা, তবে স্পষ্টই জামায়াতে নামায পড়ার পূর্ণ চিত্রটাই এ দাবীর বিপরীত।

তাছাড়া এ ভদ্রলোকেরা যা কিছু বলছেন তা হাদীসেরও খেলাফ। হাদীস থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হিদায়াত আমরা পাই যে, আল্লাহ্‌র নিকট যখন দোয়া করবে হাত উঠিয়ে করবে এবং দোয়া শেষ করে হাত মুখমণ্ডলে মিলিয়ে নেবে। আবু দাউদ, তিরমিযী এবং বায়হাকীতে এ বিষয়ে বিভিন্ন সূত্রে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। হযরত সালমান ফারসী থেকে একটি হাদীস বর্ণিত। তাতে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ رَبَّكُمْ حَيٌّ كَرِيْمٌ يَسْتَحْيِىْ مِنْ عَبْدِهٖ اِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ اَنْ يَّرُدَّهُمَا صِفْرًا ـ

"তোমাদের রব বড়ই লজ্জাশীল, সম্মানিত ও সম্ভ্রমশীল। বান্দাহ যখন তাঁর দরবারে হাত উঠায়, তখন তিনি হাত দুটি খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান।"

অপর একটি বর্ণনায় হযরত উমর বলেন ঃ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন দোয়া করতেন হাত উঠিয়ে দোয়া করতেন। অতপর মুখমণ্ডলে হাত বুলিয়ে নিতেন। ইমাম হাকিম তাঁর মুসতাদরক গ্রন্থে হযরত আলীর নিম্নোক্ত বাণী উদ্ধৃত করেছেন ঃ দোয়ায় হাত উঠানোর মাধ্যমে আল্লাহ্‌র দরবারে বিনয় ও নম্রতাই প্রকাশ পায়।

এতে সন্দেহ নেই, বর্তমানে জামায়াতে নামায আদায় করার পর ইমাম সাহেব ও মুক্তাদীগণ মিলে যে পন্থায় দোয়া করেন, এ পন্থা নবী করীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় প্রচলিত ছিলনা। একারণে কিছু সংখ্যক আলিমও এ পন্থাকে বিদায়াত বলে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু একথা আমার বুঝেই আসেনা যে, এ পন্থাকে যদি আবশ্যকীয় মনে করা না হয়, যারা এরূপ করেনা তাদেরকে তিরস্কার করা না হয়, আর মাঝে মধ্যে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ত্যাগ করা হয়, তবে এটাকে বিদায়াত বলে আখ্যায়িত করার কি কারণ থাকতে পারে? খোদার নিকট দোয়া করা তো কোনো অবস্থাতেই খারাপ কাজ হতে পারেনা। তরজমানুল কুরআন ঃ রবীউল আউয়াল-জুমাদাস সানি ১৩৬৪ হিঃ, মার্চ-জুন ১৯৪৫ ইং।

মৃত্যু দ্বারা কঠিন যন্ত্রণা লাঘব করা

প্রশ্ন ঃ কোনো একজন রোগীর অবস্থা যদি এমন হয় যে, তার বেঁচে থাকার কোনো প্রকার সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়না। কঠিন যন্ত্রণায় চরম সংকটাপন্ন অবস্থায় পৌঁছে সে ছটফট করছে। এমনকি খাদ্য ও ওষুধ পর্যন্ত তার ভিতরে প্রবেশ করানো সম্ভব হচ্ছেনা। এমতাবস্থায় কোনো বিচক্ষণ ডাক্তার তাকে এই চরম যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে বিষপান করিয়ে তার জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারেন কি? শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ মৃত্যু প্রয়োগকারীর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে কি? অথচ তার নিয়ত তো ভালই ছিলো?

জবাব ঃ তার প্রতি অবশ্যি হত্যার অভিযোগ আরোপ করা হবে। এ ব্যাপারে নিয়ত ভাল হবার কোনো প্রশ্নই ওঠেনা। যে জীবনের সে মালিক নয় এবং যাকে হত্যা করার কোনো শরয়ী অধিকার সে পায়নি, তাকে যদি সে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করে তবে অবশ্যি সে ইচ্ছাকৃত হত্যার অপরাধে অপরাধী হবে।

ডাক্তারকে আল্লাহ্ যে জ্ঞান দান করেছেন তার উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবন রক্ষার জন্যে চেষ্টা করা মৃত্যুর জন্যে নয়। যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো ব্যক্তির মধ্যে 'জীবন' থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো এবং তার কষ্ট লাঘব করার সম্ভাব্য চেষ্টা করাই ডাক্তারের কর্তব্য। কিন্তু কোন্ ব্যক্তিকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেয়া উচিত, এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া একজন ডাক্তারের নৈতিক ও শরয়ী কর্মসীমার সম্পূর্ণ বাইরে। এমন কি নিজের জীবনাবসান ঘটানোর ফায়সালা করার অধিকার সেই রোগীরও নেই। তাই রোগী দাবী করলেও এমন কাজ করা কখনো ডাক্তারের জন্যে জায়েয নেই, যা রোগীর মৃত্যু ঘটানোর কারণ হবে।

তাছাড়া কোনো ডাক্তার রোগীর নিশ্চিত মৃত্যু সম্পর্কে অকাট্যভাবে জানবে, এমনি ধরে নেয়া চরম ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। এ ধরনের উদাহরণ দুর্লভ নয় যে, কয়েকজন ডাক্তার রোগীর নিশ্চিত মৃত্যু সম্পর্কে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠার পর

তাদের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত সে রোগী বেঁচে গেছে। এজন্যে যে ডাক্তার কেবল আন্দাজ অনুমানের ভিত্তিতে কোনো রোগী বাঁচবেনা বলে সিদ্ধান্ত নেবে এবং তার কষ্ট দূর করার জন্যে তাকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেবে, সে মূলত নিজ গলদেশে এক বিরাট যুল্‌মের শিকল পরে নেবে। কেবল একজন কাফির ডাক্তারই নিজ জ্ঞানের উপর এরূপ অযথা আস্থা স্থাপন করতে পারে। এটা কোনো মুসলমান ডাক্তারের কাজ নয়। তরজমানুল কুরআন ঃ মুহাররম ১৩৬৫ হিঃ, ডিসেম্বর ১৯৪৫ ইং।

সফরে নামায সংক্ষিপ্ত (কসর) করা

প্রশ্ন ঃ ক. ইংরেজী মাইল অনুসারে কতটা দীর্ঘ সফরে নামায কসর করা ওয়াজিব?

খ. এই দূরত্ব কি কেবল যাওয়ার দূরত্ব? নাকি যাওয়া আসা উভয় দূরত্ব এর মধ্যে গণ্য হবে?

গ. কোনো নির্দিষ্ট স্থানে সফরের সময়ও কি এ সুবিধা ভোগ করা যাবে?

জবাব ঃ ১. এ সম্পর্কে ফকীহগণের মতের বিভিন্নতা রয়েছে। এসব মতানুযায়ী নামায কসর করার জন্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব ৯ মাইল এবং সর্বাধিক দূরত্ব ৪৮ মাইল। এ মতবৈষম্যের কারণ হলো, স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই এ সম্পর্কে কোনো সুস্পষ্ট বক্তব্য পাওয়া যায়না। আর সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণের অবর্তমানে ফকীহগণ যেসব প্রমাণের ভিত্তিতে গবেষণা করে ফতোয়া দিয়েছেন, সে প্রমাণগুলোর ভিত্তিতেই বিভিন্ন মত প্রকাশের অবকাশ রয়েছে।

এ ব্যাপারে সঠিক কথা হলো, নামায কসর করার কোনো নির্দিষ্ট দূরত্ব নির্ধারণ করে দেয়াটা শরীয়ত প্রণেতার উদ্দেশ্য নয়, যা অতিক্রম করার সাথে সাথেই কসরের বিধান কার্যকর হবে। মূলত, সফর বলতে কি বুঝায় তা নির্ধারণ করার দায়িত্ব শরীয়ত প্রণেতা ঐ এলাকার প্রচলিত নিয়মের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি অতি সহজেই এ কথা জানতে পারেন যে, তিনি কখন সফরে রয়েছেন এবং কখন সফরে নয়। একথা আমাদের সকলেরই জানা যে, আমরা যখন শহরে যাই, তখন আমরা নিজেদের মুসাফির বলে অনুভব করিনা। কিন্তু যখন বাস্তবিকই আমরা সফর অবস্থায় থাকি, তখন আমরা সফরের পরিবেশ অনুভব করতে থাকি। এই অনুভবের ভিত্তিতেই নামায কসর কিংবা পূর্ণ আদায় করা যেতে পারে। অবশ্য এ ব্যাপারে একটি কথা ভালভাবে বুঝে রাখতে

হবে, আর তা হচ্ছে এই যে, শরয়ী ব্যাপারে কেবল ঐ ব্যক্তির অন্তরের সাক্ষ্যই ফতোয়ার ভিত্তি হতে পারে যিনি মূলতই শরীয়তের অনুসরণ ও অনুবর্তন করতে চান এবং কোনো প্রকার বাহানা খোঁজা কিংবা ফাঁকিবাজির মনোবৃত্তি রাখেননা।

২. এ প্রশ্নের জবাব প্রথম প্রশ্নের জবারের সংগে এসে গেছে। এমনিভাবে যেসব ফকীহ সফরের দূরত্ব নির্ধারণের চেষ্টা করেছেন তারা একদিকের দূরত্বের প্রতি দৃষ্টি রেখেই তা করেছেন।

৩. হাঁ, নির্দিষ্ট স্থানে সফর করলে নামায কসর করতে হবে, যেমন করতে হয় অনির্দিষ্ট স্থানসমূহে সফরকালে। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শা'বান ১৩৬৪ হিঃ, জুলাই-আগষ্ট ১৯৪৫ ইং।

ভারতে গরু কোরবানীর মাসআলা

প্রশ্ন ঃ *"ভারতের মুসলমানরা গরু কোরবানী বন্ধ করলে ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবেনা। বিশেষ করে কোরবানীতে যখন ফায়দা কম এবং ক্ষতি বেশী তখন প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সংগে ঐক্যের প্রশ্নে আমরা এতোটুকু ত্যাগ কেন করতে পারবনা? সম্রাট আকবর, জাহাংগীর, শাহজাহান এবং হায়দরাবাদের বর্তমান নিযাম তো এ কাজের বাস্তব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।"*

জবাব ঃ *আপনি যেসব বড় বড় ইমামের (!) নাম উল্লেখ করেছেন, তাদের কারো অনুসরণ করার মর্যাদা আমি লাভ করিনি। আমার মতে ভারতবর্ষে মুসলমানরা হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার জন্যে যদি গরু কোরবানী বন্ধ করে থাকে, তবে কুরআনে উল্লেখিত নিখিল বিশ্বময় কিয়ামত সংঘটিত না হয়ে থাকলেও ভারতবর্ষের সীমার মধ্যে অবশ্যি কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে। বড়ই আফসোসের বিষয়, এ ব্যাপারে আপনাদের মতো লোকদের দৃষ্টিভংগী সরাসরি ইসলামী দৃষ্টিকোণের বিপরীত। কোনো প্রকারে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া ও মতবিরোধের কারণসমূহ দূরীভূত হওয়ার গুরুত্বটাই আপনাদের দৃষ্টিতে অধিক। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে তাওহীদী আকীদাহ অবলম্বনকারীদেরকে শিরকের সম্ভাব্য প্রতিটি বিপদ থেকে বাঁচানোই আসল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।*

যে দেশে গরুর পূজা হয়না, গরুকে উপাস্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়না এবং গরুর পবিত্রতার কোনো আকীদাহও যাদের মধ্যে পাওয়া যায়না, সেখানে গরু কোরবানী করাতো একটা বৈধ ব্যাপার মাত্র। সেখানে এ কাজ না করলেও কোনো অসুবিধা নেই। যেখানে গরুকে উপাস্য মানা হয়, গরুকে পূত পবিত্র

চিন্তা করা হয়, সেখানেই তো গরু কোরবানীর নির্দেশ রয়েছে। যেমন নাকি গরু কোরবানীর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল বনী ইসরাইলদের। এরূপ দেশে মুসলমানরা যদি কিছুকাল কোরবানী ও গরুর গোশত খাওয়া বন্ধ রাখে, তবে সেখানে এই বিপদের অবধারিত আশংকা রয়েছে যে, অচিরেই সেখানকার মুসলমানরা প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের গরু পূজার আকীদায় আকৃষ্ট হয়ে পড়বে এবং তাদের হৃদয় মনে গরুর পবিত্রতা জেঁকে বসবে। যেমন নাকি মিসরের গোপূজারী লোকদের পাশাপাশি বসবাস করতে করতে বনী ইসরাঈলের অন্তরে গোপূজার প্রভাব জেঁকে বসেছিলো। এ পরিবেশে কোনো হিন্দু ইসলাম কবুল করলে, সে ইসলামের অন্য সকল আকীদাহ বিশ্বাস গ্রহণ করে নিলেও গরুর পবিত্রতা যে তার অন্তরে পূর্ববৎ মওজুদ থাকবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এজন্যেই ভারতে গরু কোরবানী করা আমি অবশ্য কর্তব্য মনে করি। আমি আরো মনে করি, হিন্দু ধর্ম ত্যাগকারী কোনো নওমুসলিম ততোক্ষণ পর্যন্ত নির্ভরযোগ্য নয়, যতোক্ষণ না সে অন্তত একবার গরুর গোশত খেয়েছে। ঐ হাদীসটিতে একথার প্রতি ইংগিত রয়েছে, যাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ

"যে ব্যক্তি আমাদের মতো নামায পড়লো, আমাদের কেবলাকে কেবলা মানলো এবং আমাদের যবাই করা পশু খেলো, সে আমাদের দলভুক্ত।"

এই যে বলা হলো ঃ "আমাদের যবাই করা পশু খেলো" অন্য কথায় এর অর্থ দাঁড়ায়, মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্যে ঐসব রসম রেওয়াজ ও ধ্যান ধারণার বন্ধনও অবশ্যই ভেংগে চুরমার করতে হবে যেগুলো সে জাহেলী যুগে মেনে চলতো। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শা'বান ১৩৬৪ হিঃ, জুলাই-আগষ্ট ১৯৪৫ ইসায়ী।

আত্মশুদ্ধির মর্মকথা

***প্রশ্ন ঃ** এ এলাকায় ব্যাপক তাসাউফ চর্চা হয়। এর ফলে জটিল জটিল সমস্যা সৃষ্টি হয়ে আসছে। এখন আমি আপনার নিকট দুটি বিষয় জানতে চাচ্ছি ঃ*

১. তাযকিয়ায়ে নফ্সের সঠিক সংজ্ঞা কি? এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা কি ছিল? এ ব্যাপারে তাসাউফপন্থীগণের সহীহ আমল কি ছিলো? জীবনের এ দিকটাতে একজন মুসলমানের কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত?

২. সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমও কি আজকের সুফীদের মতোই আত্মশুদ্ধির পন্থা অবলম্বন করতেন? তাদের কি উর্ধজগত সম্পর্কে 'মুশাহিদা' হতো?

জবাব ঃ প্রশ্নের প্রথমাংশের জবাবে একথা ভালভাবে বুঝে নেয়া প্রয়োজন যে, আরবী ভাষায় 'তাযকিয়া' (تَزْكِيَة) শব্দটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়। এর একটি অর্থ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা। দ্বিতীয় অর্থ বৃদ্ধি করা ও বিকশিত করা। কুরআন মজীদেও শব্দটি এ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং তাযকিয়ায়ে নফসের কার্যকারিতা দুই অংশে বিভক্ত। এক, মানবাত্মাকে ব্যক্তিগতভাবে এবং মানব সমাজকে সামষ্টিকভাবে অপছন্দনীয় দোষ ত্রুটি, খারাপ রসম রেওয়াজ ও বদ অভ্যাস থেকে পবিত্র পরিচ্ছন্ন করা। দ্বিতীয়ত, উত্তম গুণাবলীর পরিচর্যার মাধ্যমে মানবাত্মাকে বিকশিত করা।

আপনি এ দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করুন, আর হাদীসের অন্য কোনো গ্রন্থ না পড়ে কেবল মিশকাত শরীফ পড়লেও আপনি বুঝতে পারবেন যে, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন্ সব দোষত্রুটি দূর করতে চান আর কোন্ সব গুণাবলী বিকশিত ও প্রস্ফুটিত করতে চান? আর কেবল কুরআন হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমেই আপনি এসব গুণাবলী অর্জনের আল্লাহ ও রাসূলের শিখানো পন্থা জানতে পারবেন।

দীর্ঘদিন থেকে তাসাউফপন্থীদের মধ্যে তাযকিয়ায়ে নফসের যে অর্থ ও পন্থা সাধারণভাবে চালু হয়ে আছে, কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষার সাথে তার বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের জবাব হলো, সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম তো রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত সংবাদে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে যাবতীয় গায়েব তত্ত্ব মেনে নিয়েছিলেন, এজন্য মুশাহিদার প্রয়োজন তাদের ছিলনা। তারা এজন্যে কোন চেষ্টা সাধনা করেননি। অদৃশ্য মুশাহিদার পিছে চেষ্টা ও শ্রম ব্যয় না করে তারা নিজেদের সমস্ত শক্তি ও সামর্থ সেই চেষ্টা সংগ্রামে নিয়োজিত করেছিলেন যাতে করে গোটা বিশ্ববাসীকে এক আল্লাহ্র অনুগত বানিয়ে দেয়া যায় এবং বাস্তবে যেনো দুনিয়ায় সেই সত্য জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, যা সমস্ত অন্যায় ও দুষ্কৃতি ধুলিস্মাৎ করে দিয়ে সর্ব প্রকার উত্তম গুণাবলীকে বিকশিত করবে। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শা'বান ১৩৪৬ হিঃ, জুলাই-আগষ্ট ১৯৪৫ ইসায়ী।

অমুসলিম দেশে গরু জবাই

প্রশ্ন ঃ আমাদের স্থানীয় খতীব সাহেব এক ওয়াযে বলেছেন ঃ 'যদি বলপূর্বক গরু যবাই করা বন্ধ করে দেয়া হয়, তবে এ নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করা মুসলমানদের জন্যে অবশ্য কর্তব্য।' এ ফতোয়াটা আমার কাছে বিস্ময়কর ঠেকেছে। শরীয়ত যেসব জিনিস হালাল করেছে, সেগুলোতো হালালের চাইতে

বেশী কিছু নয়। সেগুলো ওয়াজিব কি করে হতে পারে? যেমন ধরুন, উটের গোশত খাওয়া হালাল, কিন্তু কেউ যদি তা না খায় তবে সে গুনাহগার হয়না। এর পরিষ্কার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, হালালের অর্থ ওয়াজিব নয়। তাহলে এই মৌলভী সাহেব হালালকে ফরয হবার ফতোয়া কোথেকে দিলেন? আপনি বলুন এই ফতোয়াটার গুরুত্ব কতটুকু?

জবাব ঃ হাঁ, এটাতো খুবই সঠিক কথা যে, কোনো সরকার কিংবা কোনো শক্তিমান যদি কোনো মুবাহ জিনিসকে বলপূর্বক হারাম ঘোষণা করে, তবে তার ঘোষিত সেই হারামকে মেনে নেয়া গুনাহের কাজ এবং তার সেই নিষেধাজ্ঞা ভংগ করা ওয়াজিব।

কিন্তু আমি একথাটা বুঝতে পারছিনে, যেসব মৌলভী সাহেব এসব ছোট খাটো মুবাহ জিনিসের ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তারা কেন এ জিনিসটা বুঝতে পারছেননা যে, তারা যে রাষ্ট্রে বসবাস করছেন সে রাষ্ট্র হারামকে হালাল ঘোষণা করার পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করেছে এবং নামায রোযা ও বিয়ে তালাকের কতিপয় মাসায়েল ব্যতীত খোদার গোটা শরীয়তকেই রহিত করে দিয়েছে। গরু জবাই নিষেধ করার কারণে তা যদি মুবাহর পরিবর্তে ফরয হয়ে যেতে পারে, তবে গোটা শরীয়ত রহিত হয়ে যাবার পর কোনো ফরয মুসলমানদের উপর বর্তায়না কি? মৌলভী সাহেবকে এ কথাটা জিজ্ঞাসা করুন।

কারো কোনো হস্তক্ষেপ ছাড়া গোটা মানব জিন্দেগীর উপর বিজয়ী থাকাই ইসলামী শরীয়তের স্বাভাবিক দাবী। মানুষের উপর আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়া হলে সে ক্ষেত্রে ইসলাম তার অনুসারীদেরকে সে কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী দেখতে চায়, অনুগত নয়। যে সত্য বিধান গরু কুরবানীর মতো ব্যাপারে পর্যন্ত গায়রুল্লাহর হস্তক্ষেপ বরদাশত করেনা, সে জীবন ব্যবস্থা কী করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে খোদাদ্রোহী শক্তির মর্জি আল্লাহ্র বান্দাদের উপর চাপিয়ে দেয়াকে বরদাশত করতে পারে?

ইসলামী শরীয়তের এই স্পীরিট সর্বদা কুফরী ও জাহিলী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সত্যপন্থীদের সোচ্চার রেখেছে। এই স্পীরিট নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ভবিষ্যত বাণীকেও বাস্তবে রূপায়িত করেছে, যাতে তিনি বলেছেনঃ 'আমার উম্মতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে। কোনো বিচারকের বিচার কিংবা কোনো যালিমের যুলুম তা নিঃশেষ করে দিতে পারবেনা।' এই স্পীরিটই সদাসর্বদা ইসলামী রেঁনেসা আন্দোলনসমূহকে সংগ্রামমুখর করে রেখেছে। আর এ জিনিসই আল্লাহ্র সালেহ বান্দাদেরকে খোদাদ্রোহী সন্ত্রাসীদের সামনে মাথা নত করা থেকে বিরত

রেখেছে। কিন্তু যেখানে মুসলমানদের মধ্যে এই মনোভাব দুর্বল হয়ে পড়েছে, সেখানে তারা ইসলামকে কেটে ছেঁটে তাগুতী জীবন ব্যবস্থা কেবল বরদাশ্‌তই করেনি, বরঞ্চ সেই ব্যবস্থার পরিচালনা, প্রতিষ্ঠা এবং প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালনের ব্যাখ্যা পর্যন্ত করে নিয়েছে।

একথাটা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, তাগুতের নিষেধাজ্ঞার ফলে গরু কোরবানী যদি মুবাহ্‌র পরিবর্তে ওয়াজিব হয়ে যায়, তবে আমর বিল মারূ'ফ ও নেহী আনিল মুনকারের ভিত্তিতে সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার মতো বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ফরয বাতিলের হাতে বাধাগ্রস্ত হলে তা চালু রাখা দ্বীন ইসলামের সবচাইতে বড় ফরয হয়ে যায়। এ কাজের প্রতি লক্ষ্যারোপ না করে মুসলমান হাজারো নফল ইবাদাত করলেও তা অর্থহীন।

প্রকৃত কথা হলো, দ্বীন ইসলামে খোদাদ্রোহী শক্তির সামান্য হস্তক্ষেপও মুসলমানের তাওহীদী আকীদার উপর সরাসরি আঘাত হানে। এ ধরনের হস্তক্ষেপের সুস্পষ্ট অর্থ হলো কোনো ব্যাপারে হস্তক্ষেপকারী কর্তৃক খোদায়ী কর্মকাণ্ডের ঘোষণা দান। আর এখানে একথা খুবই পরিষ্কার, এ ধরনের ঘোষণার পরও মুসলমান নিরাপদে চুপচাপ বসে থাকলে তার ঈমান সন্দেহযুক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং এখানে প্রকৃত সমস্যা গরু কোরবানী নয়। বরঞ্চ প্রকৃত বিষয় হলো, তাওহীদী আকীদার হিফাযত। এর হিফাযতে কুণ্ঠিত হয়ে আমরা কি পরকালীন কল্যাণের আশা পোষণ করতে পারি? তরজমানুল কুরআন ঃ যুলকা'দাহ ১৩৬৫ হি ঃ।

এলকোহল মিশ্রিত ঔষধের ব্যবহার

প্রশ্ন ঃ বর্তমান যুগে এলোপ্যাথিক ঔষধ সাধারণভাবে ব্যবহার করা হয়। এলোপ্যাথ তরল ঔষধসমূহে এলকোহল মিশ্রিত থাকে। এ জন্যে আমি এ জাতীয় ঔষধ পরিহার করে চলি। কিন্তু এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হলো, মদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত কুরআনে যে নির্দেশ রয়েছে তার অর্থ যদি হয় 'নেশাজাত দ্রব্য' তাহলে তো ঔষধে এলকোহল এতোটা কম থাকে যে, তাতে মানুষ নেশাগ্রস্ত হয়না এবং ঔষধ কেউ এ উদ্দেশ্যে পানও করেনা। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে তো পাউরুটির জন্যে ময়দা গুলে রাখার পর তাতেও কিছুটা এলকোহল সৃষ্টি হয় এবং যেসব বোতলে করে শরবত আসে সেগুলোতেও এলকোহল পয়দা হয়। এমনকি বাসি আংগুরেও এলকোহল সৃষ্টি হয়। এসব জিনিস খাওয়া যদি কোনো প্রকার হারাম না হয়ে থাকে, তবে শুধুমাত্র ঔষধে কিছুটা এলকোহল মিশ্রিত থাকায় সেদিকে কেন এতোটা সতর্ক দৃষ্টি দেয়া হয়?

তাছাড়া আভিধানিক অর্থে 'খমর' (خمر) অর্থ যদি আংগুরের তৈরী মদ হয়, তবে এলকোহল তো আংগুরের তৈরী মদ নয়। সুতরাং এলকোহল মিশ্রিত এলোপ্যাথ ঔষধ নাজায়েয না হওয়াই উচিত।

কিন্তু যে যুগে আলিমদের সামনে এ ধরনের ঔষধ বর্তমান ছিলনা সে যুগে তারা এ ব্যাপারে এতো কঠোর ফতোয়া দিয়ে দিয়েছেন যে, আজকের যুগে তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। একথাও সামনে থাকা দরকার যে, বর্তমানে ইউনানী ঔষধ সম্পূর্ণ নির্ভেজাল অবস্থায় পাওয়া দুষ্কর। বড় বড় পরহেযগার ইউনানী ডাক্তারও খামিরা মরওয়ারিদের স্থলে সদফ মিলিয়ে দেন। তাছাড়া মানুষ বাধ্য হয়ে উন্নতিপ্রাপ্ত এলোপ্যাথ শাস্ত্র ও শৈল্য বিশেষজ্ঞদের দারস্থ হয়। মেহেরবানী করে এসবগুলো দিক সামনে রেখে এ ব্যাপারে আপনার মতামত ব্যক্ত করবেন।

জবাব ঃ 'খমর' (خمر)যদিও আংগুরের মদকে বলা হয়, কিন্তু এর অর্থ 'সর্বপ্রকার নেশাজাত দ্রব্য'। তাই 'খমর' এর সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে এভাবে ঃ

اَلْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

অর্থাৎ 'সেইসব জিনিসই হলো, 'খমর' যা বিবেক বুদ্ধিকে আক্রান্ত করে ও দাবিয়ে দেয়।' এ সম্পর্কে শরীয়তের মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে ঃ

مَا اَسْكَرَ كَثِيْرُهٗ فَقَلِيْلُهٗ حَرَامٌ

অর্থাৎ 'যে জিনিসের বেশী মাত্রার ব্যবহার নেশাগ্রস্ত করে তার স্বল্প ব্যবহারও হারাম।'

এই কম মাত্রার হারাম হওয়া নেশার কারণে নয়, বরঞ্চ এই নিষেধাজ্ঞা এজন্যে যে, মানুষের অন্তরে হারামের প্রতি যে একটা বাধা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে, তাতে করে তা দূর হয়ে যাবে, অন্তত হারাম গ্রহণের জন্যে কিছুটা মানসিকতা তৈরী হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনায় একথা জানা যায় যে, সর্ব প্রকার শরাবে যে মূল জিনিস নেশার সৃষ্টি করে, তা হচ্ছে এলকোহল। সুতরাং কোন অবস্থাতেই এ জিনিস বৈধ হতে পারেনা। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব ১৩৬৫ হিঃ, জুন ১৯৪৬ ঈসায়ী।

রাজার গায়েবানা সালামী

প্রশ্ন ঃ স্কুলে ড্রীলের পর ব্যন্ড বাজনার মাধ্যমে মহারাজার প্রতি সালামী বা সম্মান প্রদর্শন করা হয়। এটা গায়েবানা সালামী। আর এটাকে রাজভক্তির

নিদর্শন মনে করা হয়। আমি আমার কথা ও কাজে একজন মানুষকে খোদার খোদায়ীত্বে শরীক করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছি। হেডমাষ্টার সাহেব আমাকে এ ব্যাপারে চিন্তা করার সময় দিয়েছেন। মেহেরবানী করে এ ব্যাপারে আমাকে পথ নির্দেশ দান করুন।

জবাব ঃ *পরিণাম যাই হোকনা কেন আপনি কোনো অবস্থাতেই সালামী দেবেননা। আপনি দৃঢ়তার সাথে উত্তম পন্থায় অগ্রসর হতে চেষ্টা করুন। এমতাবস্থায় ঠাণ্ডা ও সুস্থ মাস্তিষ্কে হেডমাষ্টার সাহেবকে বুঝানোর চেষ্টা করুন, তিনি যেন এ কাজে আরো অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকেন। আপনি সালামীতে অংশ না নিলে হেডমাষ্টার সাহেব যদি তাতে কোনো প্রকার উচ্চবাচ্য না করেন, তাহলে তো ব্যাপারটা সহজেই মিটে যাবে। কিন্তু তিনি যদি আপনাকে এ কাজে বাধ্যই করতে চেষ্টা করেন আর আপনি আপনার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, তাহলে এমনও হতে পারে যে, ব্যাপারটা অনেক দূর গড়াবে। আর তখন কেবল আপনার স্কুলেই নয়, বরঞ্চ দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই এর দ্বারা প্রভাবিত হবে, এ দিকটা আপনি হেডমাষ্টারকে বুঝিয়ে দেবেন। বুদ্ধিমান হলে এতেই তিনি চুপ হয়ে যাবেন। তা না হলে তাকে শেষ পাদে পৌঁছুতে দিন এবং এমতাবস্থায় আপনি একথা মনে করবেন যে, আপনার মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা গোটা দেশবাসীর কাছে এ সত্যবাণী পৌঁছানোর সুযোগ সৃষ্টি করতে চান।*

এ অবস্থার সৃষ্টি হলে আপনি আপনাকে পরীক্ষা করে নেবেন, যেনো এরপর আপনার থেকে সামান্যতম দুর্বলতাও প্রকাশ না পায়। এমনকি আপনার চাকুরীও যদি চলে যায় এবং আপনি যদি দেশান্তরিতও হন।

আল্লাহ পাক যেনো আপনাকে দৃঢ়তা দান করেন, এজন্যে আমিও আল্লাহ তায়ালার দরবারে আপনার জন্যে দোয়া করছি। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শাবান ১৩৬২ হিঃ, জুলাই-আগষ্ট ১৯৪৩ ঈসায়ী।

হিকমত বিহীন তাবলীগ

প্রশ্ন ঃ *জনৈক ব্যক্তিকে কোনো এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাবলীগের কাজ করার জন্যে কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়েছে। এখন ঐ প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকরা নিজেরাই তার তাবলীগী তৎপরতা বন্ধ করে দিতে চায়। তারা কোনো কোনো আয়াত শিশুদেরকে মুখস্ত করাতে নিষেধ করেন। এরূপ কয়েকটি আয়াত নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ*

(۱) يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰى اَوْلِيَاءَ - الاية

১. "হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে নিজেদের বন্ধু পৃষ্ঠপোষক রূপে গ্রহণ করোনা।"

(۲) قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ - الاية

২. "তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো ...... ।"

(۳) وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُوْنَ..... هُمُ الظَّالِمُوْنَ..... هُمُ الْكٰفِرُوْنَ -

৩. "যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফয়সালা করেনা তারা ফাসিক যালিম কাফির।"

এই ব্যক্তির ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কি? এ প্রতিষ্ঠানে তার চাকুরী করা উচিত কি?

জবাব ঃ আপনি যেভাবে প্রশ্ন করছেন, তাতে প্রকৃত ঘটনা অন্য রকম বলে সন্দেহ হয় এবং আপনি সেটাকে নির্দোষভাবে বয়ান করছেন।

বস্তুত তাবলীগের অর্থ এই নয় যে, স্থান কাল পাত্র নির্বিশেষে সকলের সংগে একই রকম কঠোর আচরণ করা হবে এবং সকলের সামনে চূড়ান্ত কথা ছুড়ে মারা হবে, যা হজম করার সামর্থ শ্রোতার নেই। যেখানে লোকেরা তাওহীদ, রিসালাত এবং আখিরাতের প্রাথমিক ধারণাই রাখেনা, সেখানে হঠাৎ করে তাদের সামনে এসব আকীদাহ্ বিশ্বাসের পূর্ণাংগ চিত্র পেশ করে সেগুলো স্বীকার করে নেয়ার এবং মেনে চলার জন্যে তাদের প্রতি বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরক্ত করে তোলা তাবলীগ সংক্রান্ত হিকমতের সম্পূর্ণ খেলাপ।

আপনার কিংবা আপনার কোনো বন্ধুর উপর যদি কোনো উকিল বা জজের সন্তানদের পড়ানোর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়ে থাকে, তবে আপনারা কি ভুল পন্থাইনা অবলম্বন করেছেন যে, বেছে বেছে এই আয়াতগুলোই আপনারা তাদের পড়ানো আরম্ভ করেছেন। এতে করে তো সেই ব্যক্তিকে কুরআনের বিরুদ্ধাচারী হিসেবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন এবং সন্তানদের দৃষ্টিতে পিতাকে কাফির ও ফাসিকের কাতারে শামিল করে দিয়েছেন।

এ পন্থা অবলম্বনের পরিবর্তে যদি আপনি প্রথমে ইসলামের মৌলিক আকীদাহ বিশ্বাস শিক্ষা দিতেন, তারপর আকীদার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন, অতপর এসব ঈমান আকীদার দাবী সম্পর্কে তাদের অবহিত করতেন এবং সাথে সাথে এ বিষয়গুলোর কুরআনী আলোচনা তাদের সামনে রাখতেন, তবে এরূপ বিপদ ঘণ্টা বাজার আশংকা থাকতোনা আর বাচ্চাদের শিক্ষাদানও ভালভাবে হয়ে যেতো এবং তাদের পিতার অবস্থা যাই থাকুকনা কেন, তারা অন্তত পরিশুদ্ধ হয়ে গড়ে উঠতো। এর বিপরীত আপনি অবুঝ বাচ্চাদের এমন সব বিষয় শিক্ষা দিতে শুরু করেছেন, যা দ্বারা তারা যেখানে সেখানে উল্টোসিদা ফতোয়া দিয়ে থাকতে পারে। আর এ জিনিসটাই বিপদ ঘন্টার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সেই পরিবেশ সৃষ্টি করেছে যা আপনার জন্যে এ প্রশ্ন করার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছে।

পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, এখন হয়তো বাচ্চাদের এমন শিক্ষকের হাতে সোপর্দ করা হবে যিনি ধর্মের এমন চিত্র তাদের মন মগজে এঁকে দেবেন যার দৃষ্টিতে খোদা এবং কাইজারের পৃথক পৃথক অধিকার রয়েছে। তরজমানুল কুরআন ঃ মুহাররম-সফর ১৩৬৪ হিঃ, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ ইসায়ী।

মতবিরোধ

তাকলীদের গুরুত্ব কতটুকু

প্রশ্ন ঃ *চার ইমামের তাকলীদ সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভংগি কি? অর্থাৎ আপনি তাকলীদকে কতটা জায়েয মনে করেন কিংবা করেননা? যদি জায়েয মনে করেন, তবে তার সীমা কি? আমার জানা মতে আপনি একজন উদারপন্থী মুকাল্লিদ।*

জবাব ঃ *আমার মতে আলিমে দ্বীন লোকদের সরাসরি কুরআন সুন্নাহ থেকে বিশুদ্ধ জ্ঞান হাসিলের চেষ্টা করা উচিত। এ গবেষণা কাজে অতীতের বড় বড় আলিমদের মতামত থেকেও সাহায্য নেয়া উচিত। তাছাড়া সর্বপ্রকার পক্ষপাতিত্বের উর্ধ্বে উঠে উদার ও মুক্ত মন নিয়ে মতবিরোধপূর্ণ মাসআলাসমূহ বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে অতীতে শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদগণের কার ইজতিহাদ কুরআন ও সুন্নাহর সংগে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। এভাবে যেটা সত্য বলে মনে হবে, সেটারই অনুসরণ করা উচিত।*

আহলে হাদীসের সব মত ও মাসআলাই যে সহীহ তা আমি মনে করিনা। আর হানাফী বা শাফেয়ী কোনো মযহাবেরই পূর্ণাংগ তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) করতে হবে, তাও আমি মনে করিনা। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীর লোকদের যে আমার এ মতই মেনে চলতে হবে, তারও কোনো কারণ নেই। তারা পক্ষপাতমুক্ত হয়ে এবং 'কেবলমাত্র নিজের মযহাবই হক আরগুলো বাতিল' এ ধারণা হতে মুক্ত হয়ে জামায়াতে ইসলামীর অন্তর্ভুক্ত থেকে স্বাধীনভাবে হানাফী, শাফেয়ী, আহলে হাদীস কিংবা যে কোনো ফিকহী মযহাবের উপর আমল করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ *আহলে হাদীস চার ইমামের তাকলীদ করাকে হারাম ও শিরক বলে আখ্যায়িত করছে। তাদের এ বক্তব্য কি সঠিক? আহলে হাদীস কি কারো তাকলীদ করছেনা? মূলত 'তাকলীদ' জিনিসটা কি? তাকলীদ করা কি জরুরী?*

জবাব ঃ *ইসলামে মূলত রসূল ছাড়া আর কারো তাকলীদ করা যায়না। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাকলীদও এ জন্যে করা হয় যে, তিনি যা কিছু বলেছেন এবং করেছেন, তা আল্লাহ তায়ালার হুকুম ও নির্দেশের ভিত্তিতে করেছেন। নতুবা আনুগত্য লাভের প্রকৃত মালিক তো হলেন আল্লাহ।*

ইমামগণের অনুসরণের তাৎপর্য হলো, তাঁরা আল্লাহ ও রসূল প্রদত্ত বিধি বিধানের উপর গবেষণা ইজতিহাদ করেছেন। এ গবেষণা ইজতিহাদ দ্বারা তারা জানতে পেরেছেন ইবাদত ও আচরণের ক্ষেত্রে মুসলমানদের কি পন্থা অবলম্বন করা উচিত। এছাড়াও তাঁরা শরীয়তের মূলনীতির আলোকে প্রাসংগিক বিধান বের করেছেন। সুতরাং তাঁরা নিজেরা কোনো হুকুম বিধান চালু করেননি। আর আনুগত্য লাভেরও তারা দাবীদার নন। বরঞ্চ তাঁরা অজ্ঞ লোকদের জন্যে শরীয়ত সম্পর্কে জানার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম। যে ব্যক্তি নিজে খোদায়ী বিধান ও সুন্নাতে রসূল সম্পর্কে বুৎপত্তি রাখেনা এবং মূলনীতির আলোকে কর্মপন্থা নির্ধারণের যোগ্যতা রাখেনা তার জন্যে ইমামদের অনুসরণ ছাড়া বিকল্প পন্থা নেই। কিন্তু ইমামদের যার প্রতিই তার আস্থা হয় তাঁর প্রদর্শিত পন্থারই সে অনুসরণ করতে পারে। এই প্রকৃত তত্ত্বের ভিত্তিতে যদি কেউ তাঁদের অনুসরণ করে, তবে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করার কোনো অবকাশ নেই। কিন্তু কেউ যদি স্বয়ং তাঁদেরকে হুকুমকর্তা মনে করে, কিংবা তাঁদের প্রতি এমন চরম আনুগত্য প্রদর্শন করে যা কেবল বিধানকর্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য অর্থাৎ কোনো ইমামের প্রদর্শিত তরীকা থেকে দূরে সরে যাওয়াকে যদি সে মূল দ্বীন থেকে দূরে সরে যাওয়ার সমার্থক মনে করে এবং তাঁর উদ্ভাবিত কোনো মাসআলা সহীহ হাদীস এবং আয়াতে কুরআনের খেলাফ পাওয়া সত্ত্বেও যদি তার অনুসরণে অটল থাকে, তবে এটা নিঃসন্দেহে শিরক হবে। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শাওয়াল ১৩৬৩ হিঃ, জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪ ইং।

ওহাবী ও ওহাবী মতবাদ

প্রশ্ন ঃ *ওহাবী মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? তার সেই বিশেষ আকীদাহসমূহ কি ছিলো? ভারতবর্ষে কিভাবে তার শিক্ষা প্রচার হয়? ইসলামের আলিমগণ তার বিরোধিতা করেননি কি? করে থাকলে তা কিভাবে? এ ফেরকার লোকেরা ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে অংশ নিয়েছে, নাকি বিরোধিতার কাজে?*

জবাব ঃ *ওহাবী মূলত কোনো মতবাদের নাম নয়। কেবলমাত্র বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে এ লোকদের এ নাম দেয়া হয়েছে। এরা আহলে হাদীস কিংবা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের অনুসারী। আহলে হাদীস তো খুব পুরানো মসলক। চার ইমামের যুগ থেকেই চলে আসছে। এরা সেইসব লোক, যারা কোনো ইমামের তাকলীদ করার পরিবর্তে নিজেরাই কুরআন ও হাদীসের বিধানসমূহের বিশ্লেষণ করে। বাকী থাকলো মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের অনুসারীদের কথা। এরা মূলত হাম্বলী মযহাবের লোক। এদের ফিকাহ ও*

আকায়েদ তাই, যা ছিলো ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের রাহমাতুল্লাহি আলাইহি। শেষোক্ত এই মাযহাবের লোক সম্ভবত ভারতবর্ষে কোথাও নেই। এখানে যাদেরকে ওহাবী বলা হয় তারা মূলত প্রথমোক্ত দলের (আহলে হাদীসের) লোক। প্রথম প্রথম এদের কাজ ছিলো খুবই সুন্দর। এখনো তাদের মধ্যে অনেক ভালো লোক আছেন। কিন্তু তাদের মধ্যে অনেক জাহেল ও ঝগড়াটে লোক রয়েছে, যারা খামোখা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে তর্ক বহছে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। হানাফী বলে দাবীদার লোকদের মধ্যেও এ রকম অনেক জাহেল লোক রয়েছে। এই দুই ফেরকার বদৌলতেই যাবতীয় ফেরকাবাজী ও তর্কবহছের বাজার উচ্চাংগে উঠেছে।

প্রশ্ন ঃ 'নজদ' থেকে এক ফেতনার উত্থান ঘটবে, এরকম কোনো কথা কি কোনো হাদীসে এরশাদ হয়েছে? উপরোক্ত ফেরকাটির ব্যাপারে কি সে হাদীস প্রযোজ্য?

জবাব ঃ নজ্‌দ বা প্রাচ্য থেকে একটি ফেতনার উদ্ভব হওয়ার কথা হাদীসে এসেছে। কিন্তু সেটাকে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের উপর প্রয়োগ করা নেহাত ফেরকাবাজীর অন্ধ আবেগ ছাড়া আর কিছু নয়। একটি গ্রুপ আরেক গ্রুপের বিরুদ্ধে যখন লড়তে উদ্যত হয়, তখন তার বিরুদ্ধে সবরকম অস্ত্র ব্যবহার করার চেষ্টা করে। এমনকি আল্লাহ এবং তার রসূলকে লড়াইর এক পক্ষ বানাতে তারা কসুর করেনা। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শাওয়াল ১৩৬৩ হিঃ, জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪ ইং।

হানাফী মযহাব ও হাদীস

প্রশ্ন ঃ কোনো কোনো ব্যাপারে ইমাম আযমের বক্তব্য স্পষ্টত সহীহ্ হাদীসের খেলাফ দেখা যায়। যেমনঃ মুক্তাদীদের সূরা ফাতেহা পাঠ, রফে' ইয়াদাইন, উচ্চস্বরে আমীন বলা, জুমার নামাযে শহরের শর্ত ইত্যাদি বিষয়ে ইমাম সাহেবের বক্তব্য কি কুরআন হাদীস থেকে গৃহীত? যদি তাই হয়, তবে সেগুলো কোন্ কোন্ হাদীস? মুহাদ্দিসগণের নিকট সে হাদীসগুলো কি সহীহ্?

জবাব ঃ ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের মযহাবে এমন অনেক মাসআলা রয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে আহলে হাদীসের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে, এগুলো হাদীসের খেলাফ। পক্ষান্তরে ইমামগণের অনুসারীদের পক্ষ থেকে এসব অভিযোগের জবাবও দেয়া হয়েছে। যিনি নিজে ইলম ও ইজতিহাদের যোগ্যতা রাখেন তিনি উভয় পক্ষের মতামত

বিশ্লেষণ করতে পারেন। অতপর তার এ অধিকার রয়েছে, যে তরীকা তিনি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত পাবেন সেটা অবলম্বন করবেন; আর যেটা প্রমাণিত পাবেননা সেটা পরিত্যাগ করবেন। কিন্তু এসব ব্যাপারে তর্ক বহছ করে বেড়ায় এরকম সাধারণ আহলে হাদীসের অবস্থা সাধারণ হানাফীদের চাইতে অধিক উত্তম নয়। এরা নিজেদের ইমাম ও আলিমদের উপর নির্ভরশীল আর হানাফীরা তাদের ইমাম ও আলিমদের উপর। এদের নিজেদের ইজতিহাদ করার যোগ্যতা নেই। হাদীস সম্পর্কে এদের নিজেদের এতোটা জ্ঞান নেই এবং শরীয়তের মূলনীতি সম্পর্কে এতোটা বুৎপত্তি নেই, যার ফলে হুকুম আহকামের বিচার বিশ্লেষণ তারা করতে পারে। মুক্তাদীদের ফাতেহা পাঠ, রফে'ইয়াদাইন, উচ্চস্বরে আমীন বলা ইত্যাদি সম্পর্কে তারা যেসব কথা বলছে, তাও মূলত তাকলীদের ভিত্তিতেই বলছে, নিজেদের ইজতিহাদের ভিত্তিতে নয়। সুতরাং তাদের অভিযোগের জবাবে চুপ থাকাই শ্রেয়। অবশ্য, যারা ইলমের অধিকারী তাঁরা এসব বিষয়ে কথা বলতে পারেন।

আমার গবেষণা অনুযায়ী মুক্তাদীদের ফাতেহা পাঠের ব্যাপারে সঠিক পন্থা হলো ইমাম যখন (কিরআত) উচ্চস্বরে পড়বেন, তখন মুক্তাদীরা চুপ থাকবে,আর ইমাম যখন নিঃশব্দে পড়বেন, তখন মুক্তাদীরা ফাতেহা পড়বে। এভাবে কুরআন হাদীসের কোনো হুকুমের সাথে বিরোধ হওয়ার আশংকা থাকেনা। বিভিন্ন প্রকার দলিল প্রমাণ দেখে এই মধ্যপন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহিও এ পন্থাই অবলম্বন করেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি ইমামের পিছে কোনো অবস্থাতেই ফাতেহা পড়েনা, কিংবা সর্বাবস্থায়ই ফাতেহা পড়ে, তার সম্পর্কে আমরা এটা বলতে পারিনা যে, তার নামায হয়না। কারণ উভয় পন্থা সম্পর্কেই দলিল প্রমাণ মওজুদ রয়েছে। তাছাড়া সে ব্যক্তিতো জেনে বুঝে শরয়ী বিধানের খেলাপ কাজ করছেনা। বরঞ্চ তার দৃষ্টিতে সে ঐ বিধানের উপরই আমল করছে, যা দলিল প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তার প্রতি সেরূপ দোষারোপ করা করা যায়না, যেরূপ করা যায় ঐ ব্যক্তির প্রতি যে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে শরয়ী বিধানের খেলাফ কাজ করে।

বাকী থাকলো 'রফে' ইয়াদাইন' ও উচ্চস্বরে 'আমীন' বলার প্রশ্ন। এগুলো করা বা না করা উভয় পন্থা সম্পর্কেই আমার দৃষ্টিতে সমান দলিল প্রমাণ রয়েছে। এ কারণে যারা এগুলো করেন, তারাও হাদীসের বিপক্ষে কাজ করেননা! আর যারা করেননা, তাদের প্রতিও হাদীস বিরোধিতার দোষারোপ করা যায়না।

আমার তো মনে হয় স্বয়ং রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পন্থার উপর আমল করেছেন। সাহাবায়ে কিরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুমও সেরকমই করেছেন। এখন কোনো ব্যক্তি এর মধ্য থেকে যে তরীকার

উপরই আমল করুকনা কেন, তা শরীয়ত প্রণেতার আনুগত্য করা হবে। তাকে হীন ও ঘৃণ্য দৃষ্টিতে দেখার কোনো কারণই থাকতে পারেনা। নিজের অবলম্বিত পন্থার দিকে তাকে বলপূর্বক নিয়ে আসার চেষ্টা করারও কোনো কারণ থাকতে পারেনা। হাত উঠানো বা না উঠানো এবং 'আমীন' সশব্দে বলা কিংবা নিঃশব্দে বলা এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয় যে, এটা বাধ্যতামূলকভাবে পালন করতে হবে আর অপরটা অবশ্যি পরিত্যাগ করতে হবে।

জুমার নামাযের জন্যে শহরের শর্ত সম্পর্কে হানাফী আলিমগণের সাথে আমার মতানৈক্য আছে। আমার গবেষণা মতে, পরবর্তীকালের লোকেরা এ বিষয়ে স্বয়ং ইমাম আবু হানীফার দলিল ও বক্তব্য সঠিকভাবে বুঝতে পারেনি। ইমাম সাহেবের বক্তব্য শুধু এতোটুকু ছিলো যে, জুমার জামাআতের জন্যে এমন জনবসতি হতে হবে যা উক্ত অঞ্চলের মধ্যে কেন্দ্রীয় মর্যাদা রাখে। আর এ বক্তব্য ছিলো হাদীসেরই মাফিক। কিন্তু পরবর্তীকালে লোকেরা শহরের শর্ত লাগাবার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে এবং কতিপয় এমন শর্তও এর সাথে শামিল করে যার সপক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শাওয়াল ১৩৬৩ হিঃ, জুলাই-আগষ্ট ১৯৪৪ ইং।

নতুন ভাবে হাদীস সংকলন

প্রশ্ন ঃ আমাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কুরআনের পর হাদীসকে দ্বীনের প্রমাণ হিসেবে মানা বা না মানার ব্যাপারে উদারতা ও সংকীর্ণতার মধ্যে নিমজ্জিত। আমার ধারণায় গোটা হাদীস ভান্ডারকে কিংবদন্তীর মর্যাদা দেয়াটা সংকীর্ণতা, আর সিহাহ সিত্তায় قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) বাক্যের মাধ্যমে যা কিছু লেখা হয়েছে তার সবটাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সত্যিকার হাদীস মনে করা এবং তার উপর দ্বীন ও আকীদাহ বিশ্বাসের অট্টালিকা দাঁড় করানোটা উদারতা। আমি আমার জ্ঞানের স্বল্পতা এবং গভীর চিন্তা শক্তির সংকীর্ণতার কারণে এ ব্যাপারে কোনো যথার্থ সুরাহায় পৌঁছতে পারছিনে। মেহেরবানী করে এ ব্যপারে আমাকে সঠিক পথ নির্দেশ দিন এবং নিম্নোক্ত সন্দেহগুলো দূর করুন।

হাদীসের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ এবং রাবীদের জীবন চরিত অনুসন্ধানের কাজ কি অতীতের গবেষকদের পর্যন্তই শেষ হয়ে গেছে? এর উত্তর যদি হাঁ সূচক হয়, তবে এ দাবীর সপক্ষে যুক্তি কি? অতপর এ কথারই বা অর্থ কি যে, সহীহ বুখারীতেও এমন সব হাদীস রয়েছে, যা বিশুদ্ধ বর্ণনা ও সুস্থ বিবেক বুদ্ধির আলোকে নির্ভুল নয়। উদাহরণ স্বরূপ হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম কর্তৃক তিনবার মিথ্যা বলা, মূসা আলাইহিস সালাম কর্তৃক মালাকুল মওতের চোখে খোঁচা মারা ইত্যাদি বর্ণনাগুলোর প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আর এ প্রশ্নের জবাব যদি না সূচক হয়, তবে বলুন তো পরবর্তী আলিমগণ আজ পর্যন্ত শুদ্ধ অশুদ্ধ হাদীসমূহের যাচাই বাছাইর দায়িত্ব কেন পালন করলেননা? তাদের একাজ না করার ফলে সন্দেহযুক্ত হাদীসসমূহের প্রতি প্রশ্ন ও অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। আর এতে করে দ্বীন প্রচারের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে।

জবাব ঃ আমি আমার বহু সংখ্যক লেখায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। আমি বলেছি, প্রথম চার শতাব্দীতে হাদীসের যে সমালোচনা পর্যালোচনা, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও সংকলনের কাজ হয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে এখনো অনেক কিছু করার বাকী রয়েছে।

আর আপনি যে বলেছেন, আলিমরা কেন একাজ করলেননা, তার জবাবে বলতে চাই যে, আলিমরা চতুর্থ শতাব্দীর পর ইজতিহাদকে হারাম ঘোষণা করেছেন। সুতরাং কেন হাদীস যাচাই বাছাইর কাজ অব্যাহত রাখলেননা, এ প্রশ্ন উত্থাপন করা ভুল। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শাওয়াল ১৩৬৩ হিঃ, জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪ ইং।

এক মযহাব ছেড়ে অন্য মযহাব অবলম্বন করা কি গুনাহ?

প্রশ্ন ঃ আগের তুলনায় এ যুগে চার মযহাবের কোনো একটার অনুসরণ অধিক জরুরী হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো কোনো মুহাক্কিক আলিম প্রসিদ্ধ চার মযহাব ত্যাগ করে হাদীসের অনুসরণ করার কিংবা ইজতিহাদ করার অধিকার রাখেন কিনা? যদি অধিকার না রাখেন তবে তার সপক্ষে দলিল কি? আর যদি তিনি এ অধিকার রাখেন, তাহলে 'তাহ্তাবী' গ্রন্থে একজন অতিবড় ফকীহ্ কর্তৃক একথা বলার তাৎপর্য কি?

"নিজের ইজতিহাদ এবং দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে এক মযহাব ত্যাগ করে অন্য মযহাব অবলম্বনকারী গুনাহ্গার এবং শাস্তি পাওয়ার যোগ্য।"

জবাব ঃ আমার মতে দ্বীনি ইলমের ক্ষেত্রে বুৎপত্তি রাখেন এমন ব্যক্তির জন্যে তাকলীদ নাজায়েয এবং গুনাহ, বরঞ্চ তার চাইতেও সাংঘাতিক। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে, বিচার বিশ্লেষণের ভিত্তিতে কোনো ফিকহী মযহাবের অনুসরণ করা এক জিনিস আর তাকলীদ করার কসম খেয়ে বসা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস। এ শেষোক্ত জিনিসটি আমি সহীহ মনে করিনা।

তাহতাবীর যে ফতোয়া আপনি উদ্ধৃত করেছেন, সে সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে, সেটা যতো বড় আলিমেরই লেখা হোকনা কেন তা আমি গ্রহণযোগ্য মনে করিনা। আমার মতে এক মযহাব ত্যাগ করে আরেক মযহাব অবলম্বনে কেবল

তখনই গুনাহ্ হতে পারে, যখন তা করা হয় খেয়াল খুশীর বশবর্তী হয়ে, ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নয়। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শাওয়াল ১৩৬৩ হিঃ, জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪ইং।

কোন্ ধরনের ইজমা প্রামাণ্য দলিল

প্রশ্ন ঃ সহীহ্ হাদীসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইজমা অবশ্যই শরীয়তের প্রামাণ্য দলিল আর এ ধরনের ইজমা অস্বীকারকারী অবশ্যি কাফির। কিন্তু আলিমরা বিশেষ উদ্দেশ্যে যে ইজমা করে নিয়েছেন যা সত্য সংবাদদাতার বাণী দ্বারা সুপ্রমাণিত নয়, কিংবা কোনো তাত্ত্বিক বিষয়ের ইজমা যার ফায়সালা শরীয়ত প্রণেতা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করে যাননি এবং বিশেষ কোনো ফায়দা চিন্তা করে অস্পষ্ট থাকতে দিয়েছেন, সেটাও কি শরীয়তের প্রামাণ্য দলিলের মর্যাদা রাখে এবং সেটা অস্বীকারকারীও কি কাফির হবে?

জবাব ঃ ইজমার মাসআলা খুবই জটিল। এখানে তার সকল দিক সম্পর্কে আলোচনা করা কঠিন। সংক্ষিপ্তভাবে এটা জেনে নিন যে, ইজমা অর্থ উম্মতের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। আর এ সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত কেবলমাত্র দুই ধরনের বিষয় সম্পর্কে হতে পারে। এক ধরনের বিষয় হলো শরীয়তের বিধি বিধান সংক্রান্ত। অন্য প্রকার বিষয় হলো পার্থিব কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত।

প্রথম ধরনের ইজমা হলো কোনো বিষয়ে গোটা উম্মত একমত হয়ে যদি কুরআন সুন্নাহর কোনো ব্যাখ্যা দান করে এবং এ ব্যাখ্যা যদি কোনো সাময়িক প্রয়োজন ও কল্যাণকে সামনে রেখে না করে বরঞ্চ সকলে একমত হয়ে নীতিগতভাবে শরীয়ত প্রণেতার ইচ্ছা ও সুন্নাতের পন্থায় নির্ধারণ করে থাকে, তবে এরকম ইজমা অবশ্যি প্রামাণ্য দলিল حجة এবং স্থায়ী প্রামাণ্য দলিল। আর যদি কোনো সাময়িক কল্যাণকে সামনে রেখে কোনো বিধানের ব্যাখ্যা দেয়া হয়ে থাকে, তবে এরকম ইজমার অনুসরণ উম্মতের জন্যে কেবল ততোদিন পর্যন্তই জরুরী, যতোদিন সেই কল্যাণ বাকী থাকবে। প্রয়োজন ও পরিস্থিতি পরিবর্তিত হয়ে যাবার পর এরকম ইজমার অনুসরণ জরুরী থাকেনা।

আর যে ইজমা কোনো শরয়ী বিধানের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত নয়, বরঞ্চ পার্থিব কোনো কল্যাণের ব্যাপারে উম্মত একমত হয়ে ফায়সালা করেছে তা প্রথমোক্ত ইজমার মত নয়। তবে যদি শরয়ী বিধানের মূলনীতি অনুযায়ী এরূপ কর্মপন্থা অবলম্বনের কোনো অবকাশ থাকে, তবেই এরূপ ইজমা অবশ্য পালনীয় হতে পারে, নতুবা নয়। তাছাড়া এরূপ ইজমা কখনো স্থায়ীভাবে পালনীয় হবার মর্যাদা হাসিল করেনা। এমনটি অবশ্যি হতে পারে যে, কোনো যুগ, দেশ ও জাতির মুসলমানরা কোনো বিষয়ে একমত হলো, কিন্তু পরবর্তী কোনো যুগে সেই দেশ

ও জাতির লোকেরাই সে বিষয়ে ভিন্ন কর্মপন্থায় একমত হলো। এরূপ সাময়িক এবং দেশ ও জাতি ভিত্তিক ইজমা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত কেবল সেই নির্দিষ্ট দেশ ও জাতির মুসলমানদের জন্যেই অবশ্য পালনীয় হতে পারে। পরবর্তী কালের কিংবা অন্য কোন দেশের মুসলমানরা যদি এতে রদবদলের প্রয়োজন অনুভব করে, তবে এরূপ দাবী করা সঠিক হবেনা যে, অমুক বিষয়ে যেহেতু আগেই কিংবা অমুক দেশে ইজমা হয়ে আছে, সেহেতু এখন আর সে বিষয়ে চিন্তা করার ও কথা বলার অবকাশ নেই। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শাওয়াল ১৩৬৩ হিঃ, জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪ ইং।

ফিরকাবন্দীর অর্থ

প্রশ্ন ঃ "আপনি আপনার দলের লোকদেরকে ফিরকাবন্দী হওয়া থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করছেন। এ সম্পর্কে আমার প্রশ্ন হলো, নামায, রোযা, হজ্জ প্রভৃতি ইসলামের রুকনগুলো তো শেষ পর্যন্ত কোনো না কোনো মযহাবের তরীকা মুতাবিকই আদায় করতে হবে। তাহলে বলুন, কোনো মুসলমান ফিরকাবন্দী হওয়া থেকে কিভাবে বাঁচতে পারে? আমার ধারণায় আপনার মতানুযায়ী কুরআন ও হাদীস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত মাসআলাসমূহের উপর আমল করতে হবে। আর যেহেতু খুঁটিনাটি মাসআলাসমূহের ব্যাপারে আহলে হাদীস অন্য ফিরকার চাইতে কুরআন হাদীসের অধিক নিকটতর, তাই মোটামুটি আমি আমার জন্যে আহলে হাদীসের মসলক পছন্দ করেছি। এখন বলুনতো ফিরকাবন্দীর দোষে আমিও কি অভিযুক্ত হবো?

জবাব ঃ ফিকাহ্ শাস্ত্রের বিধি মাফিক নিজের বা অন্যা কোনো আলিমের গবেষণা ও বিশ্লেষণের অনুসরণ করতে গিয়ে যদি এমন কোনো কর্মপন্থা অবলম্বন করতে হয় যার অবকাশ শরীয়তে রয়েছে, তবে তা ফিরকাবন্দী নয়। আর এরূপ কর্মপন্থা অবলম্বনের দ্বারা কোনো দোষও হতে পারেনা। এরূপে বিভিন্ন লোকের গবেষণা ও কর্মপন্থায় যে বিভিন্নতা সৃষ্টি হয়, সেই মতবিরোধ ও বিভিন্নতা সেই নিন্দিত মতবিরোধ নয়, যার উল্লেখ কুরআনে হয়েছে। এরূপ মতবিরোধ স্বয়ং সাহাবী এবং তাবেয়ীগণের মধ্যেও ছিলো।

মূলত ফিরকাবন্দী হচ্ছেঃ খুঁটিনাটি গুরুত্বহীন মতবিরোধকে গুরুত্ব দিয়ে মৌলিক বিরোধে রূপান্তরিত করা এবং তাতে এতোটা গোঁড়ামী ও বাড়াবাড়ি করা যে, এর ভিত্তিতে পৃথক পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে প্রত্যেক দল নিজেদের মত ও পন্থাকে মূল দ্বীন ঘোষণা করে অন্যদেরকে কাফির ও গোমরাহ বলে আখ্যায়িত করবে, নিজেদের নামায ও মসজিদ পৃথক পৃথক করে নেবে। বিয়ে শাদী এবং সামাজিক সম্পর্কের ব্যাপারেও স্বতন্ত্র ভূমিকা অবলম্বন করবে। এসব নগণ্য

বিষয়ই হবে অন্য দলের সংগে সমস্ত ঝগড়ার মূল কারণ। এমনকি মূল দ্বীনের ব্যাপারে পর্যন্ত অন্য দলের সংগে সাহায্য সহযোগিতা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

যদি এরূপ ফিরকাবন্দী সৃষ্টি না হয় এবং গুরুত্বহীন বিষয়কে গুরুত্বহীন থাকতে দেয়া হয় তবে ফিকহী মাসায়েলের দিক থেকে বিভিন্ন মসলকের লোকেরা নিজ নিজ কর্মপন্থার অনুসরণ করেও এক সংগে একই ইসলামী সংগঠনের সাথে সংযুক্ত থাকতে পারে। তরজমানুল কুরআন ঃ যিল কাদাহ-যিল হজ্জহ্ ১৩৬৩ হিঃ, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪৪ ইং।

ফিকহী মতবিরোধের কারণে পৃথক নামায পড়া

প্রশ্ন ঃ ফিকহী মতবিরোধের কারণে কোনো কোনো অবস্থায় হানাফী, আহলে হাদীস ও শাফেয়ী মযহাবের লোকদেরকে পৃথক পৃথক নামায পড়তে বাধ্য হতে হয়। যেমনঃ একদল প্রথম ওয়াক্তে নামায পড়াকে অগ্রাধিকার দেয় আর অন্যদল শেষ ওয়াক্তে পড়াকে উত্তম মনে করে। এখন এরা সবাই মিলে এক জামায়াতে নামায পড়লে তো কেউ না কেউ উত্তম (সময়ের) নামায থেকে বঞ্চিত হবে। যদি উত্তম (সময়ের) নামাযের কোনো গুরুত্ব ইসলামে সত্যি থেকে থাকে, তবে এক জামায়াতে নামায পড়ার নীতির উপর আপনি এতো জোর দিচ্ছেন কেন?

জবাব ঃ আপনার দৃষ্টিতে কোনো বিশেষ সময়ে নামায পড়া যদি নামাযের উত্তম সময় হয়ে থাকে আর অপর কারো দৃষ্টিতে উত্তম সময় যদি হয় অন্যটি, তবে এই মতপার্থক্যের ভিত্তিতে জামায়াত থেকে আলাদা হয়ে নামায পড়া কিংবা একমতের লোকদের নিয়ে আলাদা জামায়াত করা ঠিক নয়। কারণ উত্তম ওয়াক্ত ত্যাগ করাটা জামায়াত ত্যাগ করা কিংবা জামায়াত পৃথক করার চাইতে অধিক ক্ষতিকর নয়।

প্রশ্ন ঃ এক ভদ্রলোক আমার এক প্রশ্নের জবাবে আপনার উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে, অশুদ্ধ আকীদার লোকদের পিছেও সাধারণ মুসলমানদের জামায়াতের সংগে নামায পড়ে নেয়া এবং মুসলমানদের মধ্যে বিভক্তি থেকে বেঁচে থাকা উচিত। আমার মনে আছে, এক পত্রে এ ধরনেরই একটি চিঠির জবাবে আপনি বলেছিলেন, কোনো ব্যক্তির শিরকী আক্বীদাহ্ প্রমাণিত হয়ে যাওয়ার পর তার পিছে নামায পড়া থেকে বিরত থাকা উচিত। কিন্তু যার আক্বীদার হাকীকত জানা যাবেনা তার ইমামতিতে নামায পড়ে নেয়া উচিত। এ দুটি জবাবের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তার কারণে এখানে অনেক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। আরো একটু বিস্তৃতভাবে সঠিক কর্মপন্থার নির্দেশনা প্রদান করবেন।

জবাব ঃ এখান থেকে আপনাকে এই জবাব দেয়া হয়েছিল যে, যার কথা, কাজ বা আক্বীদা বিনা ব্যাখ্যায় সুস্পষ্ট শিরকযুক্ত বলে বুঝা যায় এবং এ কারণে তাকে ইসলাম বহির্ভূত বলে আখ্যায়িত করা ছাড়া উপায় থাকেনা তার পিছে নামায না পড়া উচিত। কিন্তু সাধারণভাবে মুসলমানদের বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে তর্ক বহছ এবং ঝগড়াঝাটির যে পদ্ধতি চালু হয়েছে এবং যার ফলে একদল আরেক দলকে গোমরাহ আখ্যা দিয়ে তাকে ত্যাগ করার দলিল প্রমাণ খুঁজে বেড়াচ্ছে, কথায় কথায় দল উপদল সৃষ্টি করা হচ্ছে, মসজিদ পৃথক করে নেয়া হচ্ছে এবং বিয়ে শাদীর সম্পর্ক ছিন্ন করা হচ্ছে, এটা কোনো অবস্থাতেই ভাল কথা নয়। যারা সমস্ত মানুষের সংশোধনের দায়িত্ব নিয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়েছে তাদের জন্যে সঠিক পন্থা হলো, তারা সকল মুসলমানের সাথেই নামায পড়বে এবং তাদের মধ্যে নৈতিক ও ধ্যান ধারণাগত যেসব দোষত্রুটি লক্ষ্য করবে, অত্যন্ত মহব্বত ও সহানুভূতির সংগে তা দূর করার প্রচেষ্টা চালাবে। এরূপ না করে নামায পৃথক করে নেয়ার মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। তাতে তো আমরা নিজেরাও একটি ফেরকায় পরিণত হবো এবং আমাদের ও সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এক অলংঘনীয় প্রাচীর দাঁড়িয়ে যাবে।

এবার আসুন সেই ব্যক্তির কথায়, যাকে আপনারা শিরক এবং গোমরাহীতে নিমজ্জিত পান। যেহেতু তার নামায আপনাদের আকীদা বিশ্বাস মুতাবেক গ্রহণযোগ্য নয়, সেহেতু আপনারা তার পিছে নামায পড়লে আপনাদের নামায হবেনা, এরূপ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, কার নামায কবুল হবে আর কার নামায কবুল হবেনা সে ফায়সালা করা সম্ভব নয়। এরূপ ফায়সালা করার পরবর্তে আপনারা নিজেদের নামায কবুল হওয়ার জন্যেও দোয়া করুন।

দ্বিতীয়ত, জামায়াতে নামায পড়ার অর্থতো এই নয় যে, গোটা জামায়াতের সকলের নামায ইমামের নামাযের অধীনে একটি সমন্বিত নামায আকারে আল্লাহর কাছে পেশ করা হচ্ছে এবং ইমামের নামায কবুল না হলে মুক্তাদীদের নামাযও কবুল হবেনা। না, আসল অবস্থা তা নয়। বরঞ্চ জামায়াতের সাথে নামায পড়া হয় মুসলমানদেরকে এক উম্মত বানানোর জন্যে। মূলত প্রত্যেক ব্যক্তির নামায সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে আল্লাহ্র দরবারে পেশ হয়ে থাকে এবং তা যদি কবুল হবার যোগ্য হয় তবে তা অবশ্যি আল্লাহ্ কবুল করে নেন, চাই ইমামের নামায কবুল হোক কিংবা না হোক।

প্রশ্ন ঃ যে ফেরকার সংগে আমার সম্পর্ক ছিলো তার কোনো কোনো বিজ্ঞ আলিম আপনার সম্পর্কে অভিযোগ করেন যে, জামায়াতে ইসলামীর রুকনদেরকে যখন আপনি ফিকহী মত অবলম্বনে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন আর বাস্তবেও খুঁটিনাটি ফিকহী বিষয়ে সকলে একই মতাবলম্বী নয়, তখন সকলকে

একই সাথে জামায়াতে নামায পড়ার ব্যাপারে এতোটা গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? নামায সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েলে তো ব্যাপক ইখতিলাফ রয়েছে এবং তার ভিত্তিতে লোকেরা পৃথক পৃথক নামায পড়তে চায়।

জবাব ঃ ফিকহী ইখতিলাফের কারণে অতীতের বুযুর্গদের মধ্যে পৃথক পৃথক নামায পড়ার কোনো প্রমাণ নেই। ফিকহী ইখতিলাফ তো সাহাবায়ে কিরামের মধ্যেও ছিলো। তাবেয়ী এবং তাবয়ে তাবেয়ীদের মধ্যেও ছিলো। কিন্তু তাঁরা সকলে একই জামায়াতে নামায পড়তেন। শ্রেষ্ঠ মুজতাহিদগণের তরীকাও এটাই ছিলো। একথা সুস্পষ্ট যে, নামায দ্বীনের বুনিয়াদী বিষয় আর ফিকহী ইখতিলাফসমূহ হলো প্রাসংগিক বিষয়। এসব খুঁটিনাটি মতপার্থক্যের কারণে নামায পৃথক করাটা দ্বীনকে বিভক্ত করার অন্তর্ভুক্ত। কুরআন মজীদে এটাকে গোমরাহী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। নামায পৃথক করে ফেলার পর মুসলমানরা এক উম্মত থাকতে পারেনা। যে সমস্ত লোক একত্রে এক জামায়াতে নামাযই পড়তে পারেনা, তাদের দ্বারা একত্রে একই দলভুক্ত হয়ে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করার এবং প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা সংগ্রাম করা কিছুতেই সম্ভব নয়। এটা কোনো মতবাদ নয়, বরং বহু শতাব্দীর অভিজ্ঞতা এটাকে বাস্তব সত্য বলে প্রমাণ করেছে। সুতরাং যেসব লোক খুঁটিনাটি ইখতিলাফের কারণে নিজেদের নামায পৃথক করার মতো বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়, তারা আসলে দ্বীন ইসলামের মূলেই কুঠারাঘাত করে। তরজমানুল কুরআন ঃ যুলকদ-যুলহজ্জ ১৩৬৩ হিঃ, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪৪ ইসায়ী।

ফিকহী মতপার্থক্যের কারণে দলাদলি

প্রশ্ন ঃ আমি স্বভাবগতভাবেই মাযহাবী ঝগড়া বিবাদ থেকে দূরে অবস্থান করি। আমার মতে এগুলো সবই খুঁটিনাটি বিষয়। খোদ শরীয়তেই এগুলো সম্পর্কে মতপার্থক্যের অবকাশ রয়েছে। সুতরাং এসব খুঁটিনাটি বিষয়ে ইখতিলাফ জায়েয। ঠিক এমনিভাবে আমি নবী করীম (স) থেকেও কোনো বিষয়ে দু'তিনটি তরীকার প্রমাণ পেলে তার সব ক'টাকেই জায়েয ও সুন্নত তরীকা বলে মনে করি। যেমন নামাযে রফে' ইয়াদাইন করা বা না করা আমার কাছে দুটোই সমান। সুতরাং আমি উভয় পদ্ধতির উপরই আমল করি। কখনো এরূপ করি আবার কখনো সেরূপ করি। আমার এ নীতির উপর আমার পূর্ণ আস্থা রয়েছে। আর আমি বুঝে শুনেই এ পন্থা অবলম্বন করেছি। কিন্তু আমার পিতা জামায়াতে ইসলামীর একজন রুকন। নামাযে নিয়মিত রফে' ইয়াদাইন না করার কারণে তিনি আমাকে নোটীশ দিয়ে দিয়েছেন যে, তুমি যদি তোমার নীতি পরিহার না করো তাহলে আমার ও তোমার মধ্যে সালাম কালামের সম্পর্ক অটুট

থাকতে পারেনা। আমি তাঁকে বুঝাতে চেষ্টা করে সফল হইনি। এখন এ বিষয়টা আমার ও আমার পিতার পরিচিত মহলে আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে এবং উভয়ের পক্ষে বিপক্ষে লোকেরা দলিল প্রমাণ উত্থাপনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

আমার বিরুদ্ধে সাধারণত যেসব অভিযোগ উত্থাপন করা হচ্ছে, সেগুলোর সার কথা হলো, তুমি হানাফী হয়ে গেছো। দুই ধরনের পন্থা অবলম্বন করে তুমি দ্বিমুখী আমল ও মুনাফেকীই প্রকাশ করছো। জামায়াতে ইসলামীর জনশক্তির আধিক্যে তুমি ভীত হয়ে পড়েছ। বিশেষ সম্পর্ক ও মর্যাদা লাভ তোমার বাসনা। হানাফীরা তোমাকে এ নীতি শিক্ষা দিয়েছে। তুমি মওদূদী সাহেবের মুকাল্লিদ (অন্ধ অনুসারী) ইত্যাদি।

এ অভিযোগগুলোর মধ্যে একটি মজার অভিযোগ হলোঃ আগে থেকেই মওদূদী সাহেব সম্পর্কে আমরা এই আশংকা করে আসছি যে, তিনি জামায়াতে ইসলামীর নামে আহলে হাদীসকে হানাফী বানাচ্ছেন। এখন সেই আশংকা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ জামায়াতে আগত লোকদের প্রথম প্রথম তো এই কথাই বলা হতো যে, তোমাদের ফিকহী মসলক অপরিবর্তিত থাকবে। কিন্তু জামায়াতে প্রবেশ করার পর এমন সব তরীকা অবলম্বন করা হয় যার ফলে লোকদের ফিকহী মসলক বদলে যায় অর্থাৎ তারা কিছুই টের পায়না।

আমি সময় সুযোগ অনুযায়ী এসব অভিযোগের জবাব দিয়ে আসছি। কিন্তু তারপরও আমার সান্ত্বনার জন্যে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিষ্কার করে নিতে চাইঃ

১. পিতামাতার অধিকারের সীমা কতটা বিস্তৃত। তারা কি নিজ সন্তানদের বিভিন্ন মাসায়েলের তাহকীক করা এবং নিজেদের তাহকীক অনুযায়ী আমল করার অধিকার হরণ করতে পারেন? পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আহলে হাদীসের (রফে' ইয়াদাইন) নীতির খেলাফ করার কারণে 'পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি' নীতি অনুযায়ী কি আমি শাস্তিযোগ্য হয়ে পড়বো?

২. শরীয়তের দৃষ্টিতে নামাযে 'রফে' ইয়াদাইন' করা বা না করার গুরুত্ব কতটুকু। 'রফে' ইয়াদাইন' না করলে কি কেউ ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়?

৩. জামায়াতে ইসলামীর একজন রুকন আহলে হাদীসের তরীকার খেলাফ কাজ করার কারণে কি আরেক রুকন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে?

জবাব ঃ আপনি যে বিবাদের কথা জানিয়েছেন, তা পড়ে আমি দারুণ মনক্ষুণ্ন হয়েছি। আমি কখনো এমনটি আশা করিনি যে, জামায়াতে ইসলামীতে এমন লোকও থেকে থাকবে যারা ফিকহী মাসায়েলের ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক নীতি অবলম্বন করবে এবং এ ব্যাপারে কঠোরতার চরম সীমায় উপনীত হবে। যদি আপনার মতো বিশ্বস্ত ব্যক্তি এ ঘটনার বর্ণনাকারী না হতেন এবং অন্য একটি সূত্রে আপনার বর্ণনার সমর্থন না পেতাম তবে হয়তো আমি একথা মেনে নিতেই

প্রস্তুত হতামনা যে, আমাদের জামায়াতে এ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এখন যখন এ ধরনের বিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেই পড়েছে, তখন আমি এ সম্পর্কিত শরয়ী মূলনীতি এবং ফিকহী ও সাংগঠনিক নীতির গুরুত্ব সুস্পষ্ট করে জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি।

১. নীতিগত ভাবে একথা ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার যে, শরয়ী মাসআলা মাসায়েলের ব্যাপারে কোনো ব্যক্তি বা দলের বিশেষ কোনো বিশ্লেষণ পদ্ধতি কিংবা কোনো বিশেষ ফিকহী মযহাবের অনুসরণ করা একটা ভিন্ন জিনিস। পক্ষান্তরে বিশেষ তাহকীক বা মযহাবের পক্ষে জিদ ও গোঁড়ামীতে অবতীর্ণ হওয়া, ভিন্ন মযহাবের সাথে তুচ্ছ ও ঘৃণ্য আচরণ করা, ভিন্নমতের লোকদের এমনভাবে তিরস্কার করা যেনো তাদের দ্বীনই ক্রটিপূর্ণ হয়ে গেছে, এটা সম্পূর্ণ তার থেকে আলাদা জিনিস। শরীয়তে প্রথমোক্ত নীতির সম্পূর্ণ অবকাশ রয়েছে। বরঞ্চ সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেয়ীগণের কর্মপন্থা থেকেও এ নীতিরই প্রমাণ পাওয়া যায়। এ নীতি থেকে দ্বীন ইসলামে কোনো খারাবী প্রতিফলিত হয়না। কিন্তু শেষোক্ত নীতি সরাসরি দ্বীনকে বিভক্ত করে দেয়। কুরআনে এ নীতির চরম নিন্দা করা হয়েছে। এ নীতির ফলশ্রুতিতেই লোকেরা ফিকহী বিষয়াদিকে মূল দ্বীন মনে করে বসেছে। এসব প্রাসংগিক বিষয়ে খুঁটিনাটি মতপার্থক্যের কারণে তাদের মধ্যে পৃথক পৃথক উম্মত সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া এসব খুঁটিনাটি বিতর্ক লোকদেরকে এতটা গোঁড়ামীতে নিমজ্জিত করে যে, তারা পরস্পরের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। আর এ ধরনের লোকদের পক্ষে মুসলিম উম্মাহ্‌র যিন্দেগীর মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে চেষ্টা সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

ফিকহী নীতি অনুযায়ী কোনো ব্যক্তির আহলে হাদীস, হানাফী কিংবা শাফেয়ী ইত্যাদি যে কোনো তরীকার অনুসরণ করাতে কোনো দোষ নেই। কিন্তু এ জিনিসটা যদি এর চাইতে বেশী অগ্রসর হয়ে মুসলমানদেরকে এক উম্মত হয়ে থাকতে না দেয়, বরঞ্চ আহলে হাদীস, হানাফী, শাফেয়ী ইত্যাদি নামে পৃথক পৃথক উম্মত বানিয়ে দেয়, তাহলে আমি বলবো, ইসলামে এ ধরনের সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। এ জিনিস বিভিন্ন পন্থার অনুসারীদেরকে তাদের বিশেষ বিশেষ নিদর্শনের ভিত্তিতে তাদেরকে সম্পূর্ণ আলাদা উম্মতে পরিণত করে দেয়। এ জিনিস একদলের বিরুদ্ধে আরেক দলের মধ্যে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য পয়দা করে দেয়। এটা দ্বীনকে টুকরা টুকরা করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

'রফে' ইয়াদাইন' করা বা না করা, 'আমীন' সশব্দে কিংবা নিঃশব্দে বলা এবং এ ধরনের অন্যান্য বিষয় কেবল ততোক্ষণ পর্যন্তই শরয়ী আমল হিসেবে পরিগণিত হয়, যতোক্ষণ কোনো ব্যক্তি এগুলো করা বা না করার নীতি অবলম্বন করেন শরীয়ত প্রণেতা থেকে প্রমাণিত দলিলের ভিত্তিতে, অথবা শরয়ী দলিল

প্রমাণের ভিত্তিতে এমনটি করা উত্তম বলে। কিন্তু যখন এসব আমল কোনো বিশেষ ফিরকার নিদর্শনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং এসব আমল ত্যাগ করা বা না করা এমন বিষয়ে পরিণত হয়, যার ভিত্তিতে ফায়সালা করা হয় যে, আপনি কোনো ফিরকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন আর কোনো ফিরকা থেকে খারিজ হয়েছেন। অতপর এরি ভিত্তিতে এ ফায়সালাও হতে থাকবে যে, কে নিজের লোক আর কে পর।

অবস্থা যখন এরূপ দাঁড়ায়, তখন 'রফে' ইয়াদাইন' করা বা না করা, আমীন সশব্দে কিংবা নিঃশব্দে বলা এবং এ ধরনের অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয় করা বা না করা উভয়টাই সমান বিদআত। কারণ রাসূলের সুন্নাতে এগুলোর সপক্ষে প্রমাণ পাওয়া গেলেও এ কথার তো কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়না যে, এসব বিষয়কে মুসলমানদের মধ্যে দল উপদল সৃষ্টি এবং ফেরকাবাজীর নিদর্শনরূপে ব্যবহার করা যাবে। এরূপ করাটা মূলত হাদীসের নামে সাহেবে হাদীস আলাইহিস সালামের ইচ্ছার বিলকুল বিপরীত কাজ করা ছাড়া আর কিছু নয়। তাছাড়া এটা সেই মূল কাজের প্রতি সাংঘাতিক তাচ্ছিল্যেরও প্রমাণ বটে, যে কাজের উদ্দেশ্যে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়ায় তাশরীফ এনেছিলেন।

২. এবার এ মাসআলার ফিকহী মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য করুন। 'রফে' ইয়াদাইন' সম্পর্কে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে পাঁচটি বিভিন্ন কর্মপন্থার কথা বর্ণিত হয়েছেঃ

ক) আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন সময় রফে ইয়াদাইন করতেন। নামাযের প্রারম্ভে, রুকুতে যাবার কালে এবং রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে।

খ) মালিক ইবনে হুয়াইরেসের বর্ণনায় দুই সময় রফে ইয়াদাইন করার কথা উল্লেখ হয়েছে। নামাযের প্রারম্ভে এবং রুকূ থেকে দাঁড়িয়ে।

গ) ওয়ায়েল ইবনে হুজরের বর্ণনায় চার সময় রফে ইয়াদাইন করার কথা উল্লেখ হয়েছে। নামাযের প্রারম্ভে, রুকূতে যাবার সময়, রুকূ থেকে উঠার সময় এবং সিজদার সময়।

ঘ) আবু হুমায়েদ সায়েদীর বর্ণনায়ও চার বারের কথা উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু এখানে চতুর্থবার সিজদার সময়ের পরিবর্তে তৃতীয় রাকায়াতে বসা থেকে উঠার সময় বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ঙ) আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ এবং বারা ইবনে আযেব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় শুধুমাত্র একবার রফে ইয়াদাইন এর কথা উল্লেখ হয়েছে এবং তাহলো নামাযের প্রারম্ভে।

এসব বর্ণনার মধ্যে ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ইবনে হাম্বল, আবু সওর এবং আহলে হাদীস ও আহলে যাহেরের অধিকাংশ লোক প্রথম বর্ণনাকে অগ্রাধিকার

দিয়েছেন। ইমাম মালিকও এটাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন বলে এক বর্ণনায় জানা যায়।

আহলে হাদীসের একটি গ্রুপ তৃতীয় বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

ইব্রাহীম নখয়ী, শা'বী, সুফিয়ান সওরী, ইমাম আবু হানীফা এবং কূফার সমস্ত ফকীহ পঞ্চম বর্ণনাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

এখানে একথা পরিষ্কারভাবে মনে রাখা দরকার যে, তাঁরা শুধু অগ্রাধিকারই দিয়েছিলেন। কোনোটাকে গ্রহণ করে কোনোটিকে বর্জন করেননি। উপরের হাদীসগুলোতে যে বিভিন্ন পদ্ধতির কথা উল্লেখ হয়েছে অতীতের ইমামগণ এর প্রত্যেকটাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত মনে করতেন। তবে তাদের বক্তব্য ছিলোঃ যে বিশেষ তরীকাকে আমরা অগ্রাধিকার দিয়েছি, সেটাই ছিলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাধারণ নিয়ম আর বাকীগুলো তিনি কখনো কখনো করতেন। প্রকৃত ব্যাপার যখন এই, তখন কেউ উল্লেখিত পন্থাগুলোর যে কোনোটির উপর আমল করলে মূলত তার হাদীসেরই অনুসরণ করা হয়। এর সমালোচনা করা মূলত নবীর অনুসরণের সমালোচনারই নামান্তর।

কোনো ব্যক্তি যদি এর মধ্যে কোনো একটি পন্থার উপর স্থায়ীভাবে আমল না করে সময় সময় হাদীসে বর্ণিত সবগুলো তরীকার উপরই আমল করতে থাকে, তবে এটা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিক সঠিক ও পূর্ণাংগ অনুসরণই হবে। আর মূলত এটাই হাদীসের উপর যথাযথ আমলের পন্থা।

আমি যে মতামত পেশ করলাম, এটা শুধু আমার ব্যক্তিগত মতামত নয়, বরঞ্চ পূর্বোক্ত বিভিন্ন মুহাক্কিক আলিম এরূপ মতামত প্রকাশ করেছেন। সফরে থাকার কারণে এখন আমার নিকট কিতাবপত্র মওজুদ নেই,[১] সেজন্য বিস্তারিত দলিল প্রমাণের উদ্ধৃতি দিতে পারছিনে। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এখানে শাহ অলিউল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহির 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ্' পেয়ে গেলাম। তা থেকেই প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করছিঃ

"নীতিগত কথা হলো, লোকেরা প্রত্যেকটি হাদীসের উপরই আমল করবে। তবে হাদীসের পরস্পর বিরোধী হওয়ার কারণে যদি সবগুলোর উপর আমল না করতে পারে, সেটা ভিন্নকথা।" (বাবুল কাদা ফীল আহাদীসিল মুখতালিফা)

অতপর সম্মুখে অগ্রসর হয়ে "ইদ্দাতু উমূরি মুশ্কিলিহি মিনাত তাকলীদে ওয়া ইখতিলাফিল মাযাহিব" অধ্যায়ে তিনি লেখেনঃ

"সত্যকথা এই যে, ফকীহগণের মধ্যে অধিকাংশ অবস্থায় ঐসব বিষয়েই মতবিরোধ হয়েছে, যেসব বিষয়ে সাহাবায়ে কিরামের বক্তব্য দুই দিকেই পাওয়া

---

১. এ সময় মাওলানা সফর ব্যাপদেশে দিল্লীতে অবস্থান করছিলেন। -অনুবাদক

যায়। যেমনঃ আইয়্যামে তাশরীকের তাকবীর, দুই ঈদের তাকবীর, মাহরামের বিয়ে, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসউদের তাশাহুদ, বিসমিল্লাহ এবং আমীন নিঃশব্দে বলা, ইকামতের তাকবীরে প্রত্যেকটি বাক্য একবার একবার কিংবা দুইবার দুইবার বলা প্রভৃতি। এসব বিষয়ে মতবিরোধের কারণ হলোঃ দুই রকম বক্তব্যের কোন্‌টিকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে? মূল বিষয়ে অতীতের আলিমগণের কোনো মতবিরোধ ছিলনা। তাদের মতবিরোধ তো ছিলো কেবল এই বিষয়ে যে, দুই পন্থার কোন্‌টি উত্তম? এ মতবিরোধ ঠিক সেরকম, যেরকম মতবিরোধ রয়েছে বিভিন্ন প্রকার কিরআতের ব্যাপারে। অতীতের আলিমগণ এসব মতবিরোধের অধিকাংশের কারণ সম্পর্কে বলেছেন যে, সাহাবায়ে কিরাম নিজেরাই এসব বিষয়ে মতপার্থক্য রাখতেন এবং এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তারা সকলেই হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।"

এরপর "আযকারুস্ সালাতঃ হাইয়াতেহা মানদুব ইলাইহা" অধ্যায়ে তিনি বলেনঃ

"এবং রফে ইয়াদাইন" নামাযের সেইসব অংগের অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো করেছেন এবং কখনো করেননি। আর এ উভয় পন্থাই সুন্নাত। সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন এবং তাঁদের পরবর্তী লোকদের একেক দল এর একেক পন্থা অবলম্বন করেন। আর এগুলো সাধারণত সেইসব ব্যাপার, যেগুলো নিয়ে মদীনার এবং কুফার আলিমদের মধ্যে মতবিরোধ হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা প্রত্যেকে একই শরীয়তের অনুসারী এবং এসব বিষয়ে যেসব মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল তার প্রত্যেকটিই সুন্নাত তরীকা।"

শাহ সাহেবের বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করার পর 'আমীন' বলার মাসআলা সম্পর্কে আমি আর পৃথক কিছু বলতে চাইনা। তাসত্ত্বেও এ বিষয়ে আমি 'আল জাওয়াহেরুন নকী' গ্রন্থ প্রণেতার নিম্নোক্ত বক্তব্য উদ্ধৃত করে দিচ্ছিঃ

"আমীন সশব্দে কিংবা নিঃশব্দে বলার ব্যাপারে সত্য কথা এই যে, এই উভয় পন্থাই সহীহ এবং এর প্রত্যেকটি পন্থার ওপর আমল করেছেন একটি বিরাট আলিম গোষ্ঠী।"

৩. এসব মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর নীতি আমি অতীতে বহুবার সুস্পষ্ট করে বলেছি, পুনরায় এখন আবার তা পরিষ্কার ভাষায় বলে দিচ্ছিঃ এই সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত থেকে আহলে হাদীস, হানাফী, শাফেয়ী এবং এ ধরনের অন্যান্য ফিকহী মযহাবের অনুসারীদের নিজ নিজ মসলকের উপর আমল করার পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তবে শর্ত হলো, কেউ নিজের মসলককে একমাত্র সত্যপথ বলে আখ্যায়িত করতে পারবেনা এবং উপরোল্লেখিত খুঁটিনাটি মতবিরোধ সমূহের ব্যাপারে, গোঁড়ামী অবলম্বন করতে পারবেনা। যারাই জামায়াতে ইসলামীতে শামিল হয়েছেন. তাদেরকে ইসলামী নীতির শ্রেষ্ঠত্ব ছাড়া

অন্য সব ধরনের জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক গোড়ামী নিজেদের থেকে বহিষ্কার করতে হবে। চাই সেটা জন্মভূমি, বংশীয় কিংবা শ্রেণীগত জাতীয়তা ও সাম্প্রদায়িকতাই হোক না কেন। ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু মহব্বত এবং বন্ধুতার সম্পর্ক গড়ার কারণ হতে পারবেনা। আর কোনো কিছু ঘৃণা কিংবা পরিত্যাগ করার কারণও হতে হবে ইসলাম। একজন রুকনে জামায়াতের জন্যে তো কোনো ব্যক্তির আহলে হাদীস, হানাফী বা শাফেয়ী মসলকের অনুসারী হওয়াটা মহব্বতেরই কারণ হতে হবে, ঘৃণার কারণ নয়। এই আবশ্যকীয় শর্তটি মেনেই আহলে হাদীস আহলে হাদীস থেকে, হানাফী হানাফী অবস্থায় এবং শাফেয়ী মযহাবের লোক সে মসলকের অনুসরণ করে জামায়াতে ইসলামীর সদস্য হতে পারে। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি নিজের বিশেষ ফিকহী মযহাবকে একমাত্র সঠিক মনে করে কেবল সেই মযহাবের অনুসারীদেরকেই ভালবাসে এবং অন্যান্য মসলকের অনুসারীদের ঘৃণা করে এবং হানাফী, শাফেয়ী বা আহলে হাদীস হওয়াকে অপরাধ মনে করে, তবে আমাদের এ জামায়াতে তার কোনো স্থান নেই।

৪. 'আমি আহলে হাদীসের লোকদেরকে হানাফী বানানোর চক্রান্ত করছি', যারা আমার সম্পর্কে না জেনে বিশ্লেষণ না করে লোকদের মধ্যে এরূপ কুধারণা ছড়াচ্ছে, সেজন্য আমি সবর করছি এবং তাদের কর্মের বিচার আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দিচ্ছি। এসব লোকেরা খুঁটিনাটি ফিকহী বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণের প্রতি যেরূপ গুরুত্বারোপ করছে, তারা যদি নৈতিক আচরণের ক্ষেত্রেও কুরআন সুন্নাহর কিছু অনুসরণ করতো তবে কতইনা ভাল হতো।

৫. এ বিষয়ে আপনার পিতা আপনার সংগে যে আচরণ করেছেন, তার দুটি কারণ থাকতে পারে। এক, জামায়াতে ইসলামীর রুকন হওয়ার কারণে। দুই, আপনার পিতা হবার কারণে। প্রথমোক্ত বিষয় সম্পর্কে আমি আমার এ জবাবের তৃতীয় নম্বরে আলোকপাত করেছি। তার ভিত্তিতে তিনি যেন নিজের সম্পর্কে ফায়সালা করে নেন যে, তিনি কি নিজের আচরণ পরিবর্তন করবেন নাকি জামায়াত ত্যাগ করবেন। আর দ্বিতীয় কারণ সম্পর্কে আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলতে চাই যে, পিতামাতার এটা শুধু অধিকারই নয়, বরঞ্চ তাদের জন্যে এটা ফরয যে, তারা নিজ সন্তানদেরকে ভ্রান্ত আকীদা বিশ্বাস এবং নৈতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করবেন। কিন্তু ফিকহী বিষয়ে নিজেদের মসলকের অনুসরণ করতে বাধ্য করার অধিকার তাদের নেই। বিশেষ করে সন্তান যদি আলিমে দ্বীন হয়ে থাকে এবং তাহকীকের ভিত্তিতে পিতামাতা থেকে ভিন্ন কোনো ফিকহী মসলক অনুসরণ করতে চায়, তখন নিজ তাহকীকের বিপরীত আমল করার দাবী তার কাছে করা পিতামাতার জন্যে সঠিক নয়। এ ব্যাপারে অতীত আলিমগণের যথার্থ অনুসরণ এটাই যে, পিতামাতা ও সন্তান উভয়ের বিশ্লেষণের

স্বাধীনতা এবং নিজ নিজ বিশ্লেষণের ভিত্তিতে আমল করার অধিকার থাকতে হবে। এই অধিকার হরণ করার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম এই হবে যে, কোনো ব্যক্তি যদি আহলে হাদীস, হানাফী কিংবা শাফেয়ী হয়ে থাকে, তবে সে নিজের ভবিষ্যত বংশধরদেরকে আহলে হাদীস, হানাফী বা শাফেয়ী বানাতে বাড়াবাড়ি করবে। অতপর যখন কয়েক পুরুষ অতিক্রান্ত হবে, তখন এটা আর ফিকহী মসলক বা মযহাব থাকবেনা, বরঞ্চ এটা হয়ে যাবে বংশীয় সম্প্রদায়। তারা এটাকেই একমাত্র নির্ভুল ধর্ম মনে করবে এবং কেউ পুর্বপুরুষদের এ মসলক ত্যাগ করলে তাকে তারা ধর্মত্যাগী বলে আখ্যায়িত করবে। আপনি আপনার পিতাকে জিজ্ঞাসা করে দেখুন, তিনি কি ভবিষ্যত বংশধরদের এই চেতনায় নিমজ্জিত করতে চান? তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শাবান ১৩৬৪ হিঃ, জুলাই-আগষ্ট ১৯৪৫ ইং।

দু'টি সন্দেহ

প্রশ্ন ঃ আমি খুবই আন্তরিকতা ও বিশ্বস্ততার সংগে আপনার দাওয়াত অধ্যয়ন করেছি। এর ফলশ্রুতিতে আমি স্বীকার করছি, নীতিগতভাবে জামায়াতে ইসলামী সঠিক পথের অনুসারী। আপনার দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করা এবং তা অন্যদের মধ্যে প্রচার করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরয। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ যুগে ঈমানের নিরাপত্তার জন্যে সকলকেই সে পথ অবলম্বন করা উচিত, যে পথ অবলম্বন করেছে জামায়াতে ইসলামী। সুতরাং আমি নিজেকে জামায়াতে ইসলামীর দায়িত্বে সোপর্দ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কিন্তু তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় এমন দুয়েকটি জিনিস নযরে পড়েছে, যা আমাকে আরো একটু ভাবতে বাধ্য করেছে। আমি কোনো প্রকার দোষ খোঁজা কিংবা অভিযোগ করার জন্যে নয়, বরঞ্চ যে মুসাফিরকে মনযিলে মাকসূদে পৌঁছার তীব্র বাসনা সম্মুখে অগ্রসর করে নেয়, তারই মতো মনযিলে মাকসূদে পৌঁছার সঠিক নির্দেশনার সন্ধানে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছিঃ

১. আপনি লিখেছেন ঃ

"শুধুমাত্র হাদীসের উপর এমন কোনো বিষয়ের ভিত্তি স্থাপন করা যায়না, যার ভিত্তিতে ঈমান ও কুফরের ফায়সালা হয়ে থাকে। হাদীস তো কিছু সংখ্যক লোকের মাধ্যমে কিছু সংখ্যক লোকের নিকট পৌঁছেছে। এ থেকে খুব বেশী যদি কিছু লাভ করা যায়, তবে তা হচ্ছে 'সঠিক ধারণা' 'নির্ভুল জ্ঞান' নয়।"

আমার যতটা ধারণা, এ আকীদাহ মুহাদ্দিসগণের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। উসূলের কিতাবসমূহে সুস্পষ্টভাবে এ বক্তব্য রয়েছে, যেমনি কুরআন মুসলমানদের আইন ও বিধানের কিতাব, তেমনি হাদীসও।যেমনি কুরআনের

মৌলিক এবং খুঁটিনাটি বিধি বিধান আমাদের জন্যে প্রামাণ্য দলিল, তেমনি হাদীসও প্রামাণ্য দলিল। আপনার লেখার ভংগি থেকে হাদীসের প্রতি কিছুটা অবহেলা লক্ষ্য করা যায়।

২. দাড়ির ব্যাপারে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহীহ হাদীসসমূহ বর্তমান রয়েছে। এসব হাদীসে তিনি দাড়ি বৃদ্ধি করার নির্দেশ দিয়েছেন। দাড়িকে স্বাভাবিকভাবে বাড়তে দেয়াই এর অর্থ। আপনি যদি দাড়ি খাটো করার অবকাশ বের করতে চান, তবে খুব বেশী হলে ইবনে উমরের (রা) রেওয়ায়েতের ভিত্তিতে এক মুষ্টির বেশীটা খাটো করার কথা বলতে পারেন। এর চাইতে বেশী খাটো করার অবকাশ অমার নযরে পড়েনা। আপনি যে লিখেছেন, সাহাবী এবং তাবেয়ীগণের জীবন চরিতে দাড়ির সম্পর্কে তেমন কোনো আলোচনা পাওয়া যায়না এবং এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাদের মধ্যে এ বিষয়টা কোনো প্রকার গুরুত্বপূর্ণ ছিলনা, অথচ আজকাল এর প্রতি অধিক গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। আপনার এ বক্তব সম্পর্কে আমার আরয হলো, ইসলামের প্রাথমিক যুগের লোকেরা দাড়ি রাখার ব্যাপারে শরয়ী বিধানের এতোটা অনুসারী ছিলেন যে, এ বিষয়ে কিছু বলারই প্রয়োজন ছিলনা। আজকাল দাড়ির প্রতি মুসলমানদের চরম অবহেলার কথা নিশ্চয়ই আপনার জানা আছে। সুতরাং লোকদের অন্তর থেকে দাড়ির মর্যাদা না কমিয়ে তা অক্ষুণ্ন রাখুন।

এ দুটি সংশয়ের ব্যাপারে আপনার মতামত জানাবেন।

জবাব ঃ খুব সংক্ষিপ্তভাবে আপনার সংশয়ের জবাব দিচ্ছি। আশা করি সংক্ষিপ্ত জবাবই আপনার নিশ্চিন্ত হবার জন্যে যথেষ্ট হবে।

১. নবীপাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ও কাজকে আমিও কুরআনের মতো প্রামাণ্য দলিলরূপে মানি। আমার মতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত আকীদা এবং নির্দেশাবলী তেমনি ঈমান ও আনুগত্যের হকদার, যেমনি ঈমান আনুগত্যের হকদার কুরআনে বর্ণিত আকীদা ও নির্দেশ। কিন্তু নবীপাকের বাণী এবং হাদীস গ্রন্থাবলীর যাবতীয় বর্ণনা অবশ্যি এক জিনিস নয়। আর সূত্রগত বিশুদ্ধতার দিক থেকেও এসব বর্ণনাকে কুরআনের সমপর্যায়ের বলা যেতে পারেনা। কুরআনের আয়াতসমূহ আল্লাহর নিকট থেকে নাযিল হবার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নেই। অথচ হাদীস গ্রন্থাবলীতে উদ্ধৃত এবং নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণিত প্রতিটি কথা ও কাজই নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। যেসব সুন্নাত অবিচ্ছিন্ন আমলের মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌছেছে কিংবা যেসব বর্ণনা মহাদ্দিসগণের আরোপিত

সর্বসম্মত শর্তাবলীর ভিত্তিতে সর্বযুগে বিপুল সংখ্যক লোকের মাধ্যমে বর্ণিত হয়ে আসছে, অর্থাৎ মুতাওয়াতির বর্ণনা সেগুলো অবশ্যই অনস্বীকার্য প্রামাণ্য দলিল। কিন্তু যেসব বর্ণনা মুতাওয়াতির নয়, সেগুলোর মাধ্যমে নির্ভুল জ্ঞান লাভ করা যায়না, বরঞ্চ 'সম্ভাবনা' পর্যায়ের জ্ঞান লাভ করা যায়। এ কারণে উসূলের আলিমগণের এটা সর্বসম্মত রায় হলো, যেসব বর্ণনা মুতাওয়াতির নয়, সেগুলো থেকে শরীয়তের বিধি বিধান গ্রহণ করা যেতে পারে বটে, কিন্তু ঈমান আকীদাগত বিষয় গ্রহণ করা যেতে পারেনা।

২. দাড়ি সম্পর্কে আপনি যা কিছু লিখেছেন, সে বিষয়ে আমি পূর্বেই বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[১] এখন একই কথা চর্বিত চর্বণ করার প্রয়োজন মনে করিনা। পরিষ্কার কথা হলো, যদি কোনো খুঁটিনাটি বিষয়ে আমার গৃহীত দলীল প্রমাণ দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হন তো ভাল। আর যদি তাতে আপনি সন্তুষ্ট না হতে পারেন, তবে তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। ঐ বিষয়ে আপনি আমার রায়কে ভুল মনে করে রদ করতে পারেন। আপনি যা কিছু সঠিক মনে করেন তার উপর আমল করতে পারেন। এ ধরনের খুঁটিনাটি বিষয়ে মত পার্থক্য রেখেও আমরা একই দ্বীনের অনুসারী থাকতে পারি এবং সেই দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে একত্রে কাজ করতে পারি।

আপনি লিখেছেন, আপনি জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু হঠাৎ করে এ দুটি বিষয় আপনার নযরে পড়ায় থেমে গেছেন। এই থেমে যাওয়াকে সম্ভবত আপনি কোনো পরহেযগারীর কাজ মনে করেছেন। কিন্তু ব্যাপার তা নয়। একটু চিন্তা করলে আপনি নিজেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, প্রকৃতপক্ষে আপনি তাকওয়ার ভুল অর্থ বুঝেছেন। আর এ কারণেই একটি অপরহেযগারীর কাজকে পরহেযগারীর কাজ মনে করেছেন। আপনি নিজেই স্বীকৃতি দিয়েছেন, জামায়াতে ইসলামী প্রকৃতপক্ষে দ্বীন ইসলাম কায়েমের জন্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা প্রত্যেক মুমিনেরই ঈমানের দাবী। আপনি নিজেই বলেছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ যুগে ঈমানের নিরাপত্তার জন্যে কেবল জামায়াতে ইসলামীর পথই অবলম্বন করা যেতে পারে।" এবং "এই দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করা এবং প্রচার করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরয।"

এখন প্রশ্ন হলো, একটি ইল্মী মাসআলার ব্যাখ্যা এবং একটি ক্ষুদ্র ফিকহী মাসআলার বিশ্লেষণের ব্যাপারে জামায়াতের এই খাদেমের রায়কে আপনি ভুল পেয়ে ঈমানের সেই দাবী এবং সেই ফরয আদায়ে অগ্রসর হয়েও যে আপনি থেমে গেলেন, সেটা কি রকম পরহেযগারী? ফিকহী এবং ইল্মী মতপার্থক্য তো

---

১. 'ফিকহী মাসায়েল' অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এবং সামনেও এ বিষয়ে আলোচনা আসবে-অনুবাদক।

খুব ছোট জিনিসই। এজন্যে উভয় পক্ষের কাছেই শরয়ী দলিল প্রমাণ বর্তমান থাকে। কিন্তু আমি একেবারে প্রমাণিত সুন্নাত সম্পর্কেই আপনাকে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, সেগুলোর খেলাফ কাজ করতে দেখেও কি আপনি ফরয কাজ থেকে দূরে থাকতে পারেন? দূরে থাকলে সেটা কি পরহেযগারী হবে? উদাহরণ স্বরূপ বলছি, আপনি দেখতে পেলেন ইমাম সাহেব মসজিদে প্রবেশ করার সময় প্রথমে বাম পা রাখলেন এবং তা দেখে আপনি জামায়াত ত্যাগ করে ফিরে এলেন, কিংবা আপনি দেখলেন, ইসলামী সেনাবাহিনীর জেনারেল বাম হাতে পানি পান করেছে কিংবা হাঁচি দিয়ে 'আল হামদুলিল্লাহ' বলেনি, তাই তার "সুন্নাত বিরোধী কার্যক্রমের" প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে আপনি জিহাদের ময়দান ত্যাগ করলেন, বলুনতো আপনার এ ধরনের ভূমিকাকে কি আপনি সত্যি পরহেযগারী মনে করবেন? আপনাকে অবশ্যি তুলনা করে দেখতে হবে, তিনি কি ত্যাগ করলেন আর আপনি কি পরিত্যাগ করলেন। তিনি এক পয়সা নষ্ট করলেন, এটা নিশ্চয়ই একটা গলদ। কিন্তু আপনি যে গোটা ধন ভাণ্ডারই ধ্বংস করে দিলেন। তাহলে বলুন দেখি, বেশী বড় ভুল কে করলেন? আপনার চিন্তাধারা এরূপ নয় বটে, কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে দ্বীনদারীর সাধারণ ঢং এরূপই হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, 'পরনে কাপড় না থাকলেও মাথায় পাগড়ী থাকতে হবে'। তরজমানুল কুরআন ঃ রবিউল আওয়াল ১৩৬৫ হিঃ, ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ ইং।

হাদীস ও ফিক্‌হ

প্রশ্ন ঃ নিম্নে আপনার লিখিত গ্রন্থাবলী থেকে তাকলীদ ও ইজতিহাদ বিষয়ক কতিপয় বক্তব্য পেশ করা হলো। তর্ক বহছের উদ্দেশ্যে নয়, বরঞ্চ এগুলোর আরো একটু বিস্তারিত ব্যাখ্যা জানাই কাম্যঃ

১. "সকল মুসলমান চারটি ফিকহী মযহাবকেই সত্য বলে মানে। তবে একথা স্পষ্ট, যে কোনো একটি বিষয়ে কেবল একটি তরীকাই অনুসরণ করা যেতে পারে। এ জন্যে উলামায়ে কিরাম ফায়সালা করে দিয়েছেন, মুসলমানদেরকে চারটি তরীকার যে কোনো একটিরই অনুসরণ করতে হবে।" ইসলাম পরিচিতি, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃঃ ১২৫

২. "তাহলে আপনি মুহাদ্দিসগণের সহীহ আখ্যায়িত সকল হাদীসকেই কি করে প্রকৃত সহীহ বলতে পারেন? প্রকৃত সহীহ হবার পূর্ণ একীন তো তাঁদেরও ছিলনা। তারাও কোনো হাদীস সম্পর্কে বেশীর পক্ষে এতটুকুই মন্তব্য করতেন যে, হাদীসটি সহীহ হবার সম্ভাবনা অধিক। আর তাদের এ ধারণা লাভের ভিত্তি ছিল 'রেওয়ায়েত', দেরায়াত' নয়। তাদের দৃষ্টিভংগি ছিল অধিকতর সংবাদ ভিত্তিক। তাদের মূল বিষয় ফিক্‌হ ছিলনা। সে কারণে হাদীস সম্পর্কে ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে রায় কায়েমের ব্যাপারে তারা ফকীহ মুজতাহিদগণের তুলনায়

দুর্বল ছিলেন। সুতরাং তাঁদের বৈধ পূর্ণতার স্বীকৃতি দিয়েই একথা মানতে হবে যে, হাদীস সম্পর্কে তাঁরা যা কিছু বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে দুই প্রকার দুর্বলতা বর্তমান রয়েছে। প্রথমত সনদগত দুর্বলতা। দ্বিতীয়ত, মর্ম উপলব্ধিগত দুর্বলতা।" (তাফহীমাত ঃ 'মসলকে এ'তেদাল')

৩. "বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে ভাল কিংবা মন্দ রায় কায়েম করার ব্যাপারে মুহাদ্দিসগণের নিজেদের আবেগের সংমিশ্রণ ঘটারও খুবই সম্ভাবনা ছিল।" তরজমানুল কুরআন, ভলিউম ১০, সংখ্যা ১১০

৪. "ফকীহসুলভ দৃষ্টিকোণ' তো তাদের বিশেষ বিষয়বস্তুর সাথে অনেকটা সম্পর্কহীনই ছিল। এ জন্যে এ জিনিসটা অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টির বাইরে থেকে যেতো।" "এ কারণে বহু ক্ষেত্রে এরকম হয়েছে যে, কোনো রেওয়ায়াতকে হয়তো তারা সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন, অথচ অর্থ ও তাৎপর্যের দিক থেকে তা নির্ভরযোগ্য নয়। আবার অন্য কোনো রেওয়ায়াতকে তাঁরা কম নির্ভরযোগ্য বলেছেন, অথচ অর্থ ও তাৎপর্যের দিক থেকে তা বিশুদ্ধ।" .... "কিন্তু শরীয়ত সম্পর্কে পারদর্শী লোকদের কাছে এটা মোটেও গোপন নেই যে, মুহাদ্দিসসুলভ দৃষ্টিকোণ বহুবার ফকীহসুলভ দৃষ্টিভংগির সাথে সাংঘর্ষিক হয়েছে। তাছাড়া সম্মানিত মুহাদ্দিসগণ হাদীস থেকে হুকুম আহকাম ও মাসআলা মাসায়েল উদ্ভাবন করার ব্যাপারে সমতা ও যথার্থতা রক্ষা করতে পারেননি, যেটা পেরেছিলেন ফকীহ মুজতাহিদগণ। রেওয়ায়াতকে সম্পূর্ণ বর্জন করাও ভুল, আবার কেবল রেওয়ায়াতসমূহের উপরই নির্ভর করাও ভুল। বরঞ্চ এ দুয়ের মাঝখানেই রয়েছে সঠিক পথ। আর এ সঠিক পথই অবলম্বন করেছিলেন মুজতাহিদ ইমামগণ। ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ফিকায় আপনি এমন বহু মাসআলা দেখবেন, যার ভিত্তি মুরসাল, কিংবা মু'দাল কিংবা মুনকাতি হাদীসের উপর প্রতিষ্ঠিত। অথবা কোনো মজবুত সনদের হাদীসকে বাদ দিয়ে দুর্বল সনদের হাদীস গ্রহণ করা হয়েছে। কিংবা হাদীসের বক্তব্য এক রকম আর ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সাথীদের বক্তব্য অন্য রকম।"

এবার উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলো সামনে রেখে মেহেরবানী করে আমার নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর জবাব দিনঃ

১. মুসলমানদেরকে চারটি ফিকহী মযহাবই মানতে হবে, একথার দলিল কি?

২. হাদীসের সনদ এবং মুজতাহিদগণের জ্ঞানপারদর্শিতা, এ দুটোর মধ্যে কোনটার মর্যাদা বেশী?

৩. মুজতাহিদদের জ্ঞানপারদর্শিতা এবং হাদীসের সনদ, এ দুটোর কোনটার মধ্যে ধারণা অনুমান অধিক?

৪. মুহাদ্দিস ও ফকীহ কি একই ব্যক্তি হতে পারেন? যদি হতে পারেন, তবে

তিনি শুধু মুহাদ্দিস কিংবা শুধু ফকীহর চাইতে শ্রেষ্ঠ নয়কি?

৫. ইমাম আবু হানীফা 'মতনের' ভিত্তিতে মজবুত সনদের হাদীস ত্যাগ করে দুর্বল সনদের হাদীস গ্রহণ করেছেন, এ বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণ পেশ করবেন।

৬. ইমামগণের একথা কি সহীহ যে, তাঁদের ফায়সালার মুকাবিলায় মজবুত সনদের হাদীসই গ্রহণযোগ্য?

৭. 'দেরায়াত এর মানদণ্ড কি, যার জন্যে সহীহ সনদের হাদীসও বর্জনীয়? তাছাড়া কুরআন সুন্নাহর কোন্ বক্তব্য দ্বারা দেরায়াতের এই শর্ত ও তার মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত?

৮. আল্লাহ ও রসূলের কোনো হুকুম প্রবল বিশ্বাসযোগ্য ধারণার মাধ্যমে কারো নিকট পৌঁছার পর তাতে দেরায়াতের হস্তক্ষেপ দ্বারা সেই নির্দেশ থেকে বিরত থাকার কি কোনো মুসলমানের অধিকার আছে? অথচ বুদ্ধি জ্ঞানের ভুল হওয়ার আশংকা আছে?

জবাব ঃ ১. চারটি ফিকহী মযহাবকে সত্য বলে মান্য করার ধারণাটা কুরআন হাদীসের কোনো দলিলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। বরঞ্চ এ চারটি মযহাবের ইমামগণই কুরআন হাদীসের ভিত্তিতে এবং কুরআন সমর্থিত নীতিমালার ভিত্তিতে হুকুম আহকাম বের করেছেন। খুঁটিনাটি বিষয়ে মযহাবগুলোর মধ্যে যতোই মতপার্থক্য থাকুকনা কেন এবং মতবিরোধের জন্যে যার কাছে যতো দলিল প্রমাণই থাকনা কেন, তাতে কিছুই যায় আসেনা। কিন্তু নীতিগতভাবে প্রত্যেক মযহাবেই হুকুম আহকাম উদ্ভাবন করার জন্যে সেইসব পন্থাই অবলম্বন করা হয়েছে যা কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত এবং যেসব পন্থা স্বয়ং সাহাবায়ে কিরাম মাসআলা মাসায়েল উদ্ভাবনের ব্যাপারে কাজে লাগিয়েছেন।

২. হাদীসের সনদ বর্ণনা এবং মুজতাহিদের জ্ঞান বুদ্ধি, এ দুটির কোনোটির চাইতে কোনোটিকে আসলে শ্রেষ্ঠত্ব দেয়া যেতে পারেনা। নবী করীম (স) থেকে যে হাদীস আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা কতোটা নির্ভরযোগ্য তার সাক্ষ্য আমরা সনদ বর্ণনা দ্বারা পাই। পক্ষান্তরে মুজতাহিদের জ্ঞান বুদ্ধি এমন এক ব্যক্তির বিচার বিবেক প্রসূত রায় (JUDGMENT), যিনি কিতাব ও সুন্নাহ সম্পর্কে গভীর পান্ডিত্যের অধিকারী হয়ে কোনো রিপোর্ট সম্পর্কে চিন্তা বিবেচনা করে দেখেন যে, তা কতোটা গ্রহণযোগ্য এবং কতোটা গ্রহণযোগ্য নয়, কিংবা এই রিপোর্টের যে অর্থ দাঁড়ায় তা শরয়ী বিধি ব্যবস্থার মধ্যে কতোটা খাপ খেতে পারে আর কতোটা খাপ খেতে পারেনা।

এ উভয় জিনিসই নিজ নিজ স্থানে গুরুত্বপূর্ণ। যেমন করে আদালতে

সাক্ষীদের সাক্ষ্য এবং জজের ফায়সালা দুটোর পৃথক পৃথক গুরুত্ব রয়েছে। অর্থাৎ একথা যেমন জোর দিয়ে বলা যায়না যে, সাক্ষীদের সাক্ষ্যের উপর জজের ফায়সালার স্থান, তেমনি একথাও জোর দিয়ে বলা যায়না যে, জজের ফায়সালার উপর সাক্ষীদের সাক্ষ্যের স্থান। ঠিক এমনিভাবে মুহাদ্দিসের সাক্ষ্য এবং ফকীহ্র ইজতিহাদী বিশ্লেষণ কোনটাকেই প্রকৃতপক্ষে অপরটার উপর অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারেনা।

৩. মুজতাহিদের জ্ঞান বুদ্ধিতে যেমন ভুলের আশংকা আছে তেমনি রয়েছে মুহাদ্দিসের সনদ বর্ণনার ক্ষেত্রে। তাই আমার মতে ইল্‌মে দ্বীনের ক্ষেত্রে বুৎপত্তি রাখেন এমন লোকদের উচিত মুজতাহিদদের ইজতিহাদ এবং হাদীসে বর্ণনাসূত্র উভয়টাই ভালভাবে যাচাই করে শরয়ী হুকুম আহকামের বিশ্লেষণ করা। এখন প্রশ্ন থাকে যারা শরয়ী হুকুম আহকামের ব্যাপারে নিজেরা কোনো প্রকার তাহকীক করতে সক্ষম নয়, তারা কি করবে? এর জবাব হলো, তারা কোনো আলিমে দ্বীনের উপর নির্ভর করবে, এটাই তাদের জন্যে সঠিক পন্থা। তাছাড়া তারা নির্ভরযোগ্য হাদীসের উপরও আমল করতে পারে।

৪. একই ব্যক্তি একাধারে মুহাদ্দিস এবং ফকীহ হতে পারেন এবং এমন ব্যক্তি নীতিগতভাবে শুধু মুহাদ্দিস এবং শধু ফকীহ্র তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমার এ জবাব নিতান্তই নীতিগত। কোনো ব্যক্তির প্রতি এই শ্রেষ্ঠত্ব প্রয়োগ করলে অবশ্যি দেখতে হবে, হাদীস আয়ত্বের দিক থেকে তার যে পজিশন রয়েছে ফিকাহ্র ক্ষেত্রে তা রয়েছে কিনা?

৫. এখন আমার সামনে সেরূপ নযীর বর্তমান নেই। তাছাড়া নযীর পেশ করতে গেলে তর্ক বাহাছের ধারা দীর্ঘ হয়ে থাকে।

৬. মুজতাহিদ ইমামগণ যা কিছু বলেছেন, তা সম্পূর্ণ সঠিক। আমিও তা সমর্থন করি। কিন্তু আমি যা কিছু লিখেছি, তার তাৎপর্য হলো, অনেক সময় সহী সনদের হাদীস মতনের দিক থেকে দুর্বল হয়ে থাকে এবং একই বিষয়ে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে অন্যান্য যা কিছু জানা যায় এ হাদীসের বক্তব্য তার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয়না। এমতাবস্থায় উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করা কিংবা তাকে বর্জন করা ছাড়া উপায় থাকেনা।'

৭. 'দেরায়াত' দ্বীন সংক্রান্ত সেই গভীর জ্ঞান, পারদর্শিতা, পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞাকে বলা হয়, যাকে কুরআন মজীদে 'হিকমাহ' বলা হয়েছে। শরীয়তের যথার্থ অনুবর্তনের জন্যে হিকমতের গুরুত্ব ততোখানি, চিকিৎসা শাস্ত্রে যতোটা গুরুত্বপূর্ণ বুদ্ধিমত্তা বা 'হাযাকাত'। যাদের মধ্যে এই দেরায়াত বা হিকমাতের অংশ কম রয়েছে, কিংবা যারা এর মূল্য ও গুরুত্বের অনুভূতিই রাখেনা, তাদের জন্যে লিখিত জিনিসের উপর আমল করাই যথোপযুক্ত। কিন্তু যাদেরকে আল্লাহ তায়ালা এ জিনিস দান করেছেন, তারা যদি নিজেদের কিতাব ও সুন্নাহ সংক্রান্ত

পারদর্শিতা কাজে না লাগান, তবে আমার মতে তারা গুনাহ্গার হবে।

আপনাকে হিকমাহ, ফিক্হ ও দ্বীনের বিজ্ঞতার সেই মাপকাঠি বলে দিতে পারি যার মাধ্যমে আপনি মেপেজুকে দেখতে পারেন কে তাতে কতটা অংশ লাভ করেছে এবং কে করেনি, এমন কোনো মাধ্যম ও উপায় আমার নিকট নেই। ব্যাপারটা ঠিক এরকম, যেমন ডাক্তারের নৈপূণ্য, জহুরীর দক্ষতা এবং কোনো বিশেষজ্ঞের বিশেষ বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দিষ্ট মাপকাঠি নির্ণয় করা যায়না। কিন্তু এর নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করতে না পারার অর্থ এই নয় যে, এর কোনো মূল্য নেই এবং শরীয়তে এর কোনো গুরুত্ব নেই।

৮. এ প্রশ্নের জবাব ওপরের উত্তরমালাতে মিলে মিশে আছে। তবে তার বেশী এতোটুকু বলতে পারি যে, নিঃসন্দেহে দেরায়াতের ব্যবহারেও ভুলের আশংকা আছে। কিন্তু এরূপ আশংকা কোনো হাদীসকে সহীহ্, কোনোটিকে জয়ীফ এবং কোনোটিকে মওজু' আখ্যায়িত করার মধ্যেও রয়েছে। কোনো মুসলমান যদি দেরায়াত প্রয়োগ করে ভ্রান্তির অপরাধে অপরাধী হতে পারে, তবে হাদীসের শুদ্ধ অশুদ্ধ নির্ণয়ে ভুল করেও অনুরূপ অপরাধী হতে পারে। অথচ শরীয়ত মানুষের উপর ততোটা দায়িত্বই চাপায়, যতোটা তার সাধ্য সামর্থের ভিতরে রয়েছে এবং এ সীমার মধ্যকার দায়িত্বের জন্যেই কেবল তাকে জবাবদিহি করতে হয়। তরজমানুল কুরআন ঃ জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪ ইসায়ী।

ইসলামী সংগঠনে চিন্তা গবেষণার স্বাধীনতা

প্রশ্ন ঃ আপনার 'তাফহীমাত' গ্রন্থের "মসলকে এ'তেদাল" (মধ্যম পন্থা) প্রবন্ধে সাহাবায়ে কিরাম এবং মুহাদ্দিসগণের তুলনামূলক দোষক্রটি উল্লেখ করা হয়েছে। মুজতাহিদের ইজতিহাদ এবং মুহাদ্দিসের রেওয়ায়েতকে সমপর্যায়ের বলে আখ্যায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ প্রবন্ধ দ্বারা হাদীসের গুরুত্ব কমেছে এবং হাদীস অস্বীকারকারীদের ধ্যান ধারণা মজবুত হয়েছে।

এ ধরনের প্রশ্ন যদি আপনার দৃষ্টিতে মৌলিক গুরুত্বের অধিকারী না হয়ে থাকে, তবে তো জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলনের এই প্রাথমিক পর্যায়ে মুহাদ্দিস ও ফকীহ্গণ সম্পর্কে এবং রেওয়ায়েত ও দেরায়াত সম্পর্কে কোনো কিছু না লেখাই সমীচীন ছিল। এ বিষয়ে কলম ধরার ফলে ভুল দূরীভূত করে দেয়া উচিত। কারণ যেসব সাহিত্যে হাদীসের গুরুত্ব খাটো করে দেখানো হয়েছে সেগুলো প্রচার করার কাজে আমরা কি করে শরীক হতে পারি। অথচ সংগঠন এটাকে জরুরী কাজ বলে ঘোষণা করেছে।

আমি মনে করি এ সমস্যা নিরসনকল্পে আপনার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত যাবতীয় লেখা সমালোচনা সহ পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করে দেয়া হোক।

জবাব ঃ ফিকহী মাসায়েলের ক্ষেত্রে ইজতিহাদ ও উদ্ভাবনী মূলনীতি ও নিয়ম পদ্ধতি সম্পর্কে সম্ভবত এর পূর্বেও কখনো কোনো ব্যক্তি এমন কোনো কথা বলতে পারেননি, যে সম্পর্কে সকলেই ঐক্যমত পোষণ করেছে এবং কারো পক্ষে কোনো মতবিরোধের অবকাশ ছিলনা। একটু চিন্তা করলে আপনি সহজেই জানতে পারবেন, এ ধরণের বিষয়ে মতপার্থক্যের অবকাশ স্বয়ং আল্লাহর কিতাব এবং হাদীস ভাণ্ডারেও রয়েছে। এ কারণে প্রত্যেক যুগেই এসব বিষয়ে সলফে সালেহীনের মধ্যে মতপার্থক্য হয়েছে। তবে কি তাঁদের সেই মত পার্থক্যের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, মূল দ্বীনের দাওয়াত এবং দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজেও মুসলমানরা এক জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবেনা? যদি এ ধরনের কোনো জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে কি ফিকহী ইখতেলাফ পূর্বেই মিটিয়ে নিতে হবে?

আপনার দৃষ্টিভংগী যদি এই হয়ে থাকে, তবে আফসোস করা এবং এটাকে দুর্ভাগ্যের বিষয় বলা ছাড়া আর কি করতে পারি। আর যদি আপনার দৃষ্টিভংগী এ না হয়ে থাকে, তবে মেহেরবানী করে এ কথাটা বুঝার চেষ্টা করুন যে, জামায়াতে ইসলামী মূল দ্বীনের দাওয়াত দান এবং তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে কায়েম হয়েছে। তাই এ কাজে সেই সকল ফিকহী মাযহাবের লোকদেরই একত্র হওয়া উচিত যাদের নীতি ও তরীকা কুরআন সুন্নাহর বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এই সংঘবদ্ধতা তখনই সম্ভব যখন এখানকার প্রত্যেক ব্যক্তির ফিকহী মাসায়েলের ব্যাপারে মূলনীতির দিক থেকে যতটা অবকাশ আছে সেই পরিমাণ চিন্তা গবেষণা ও তাহকীক করার স্বাধীনতা থাকবে। আর এটাও দেখতে হবে যে, চিন্তা গবেষণার এই স্বাধীনতা যেনো বিভিন্ন মযহাবের লোকদের মধ্যে এমন বিবাদ বিসম্বাদের কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, যা ইকামতে দ্বীনের জন্যে সংঘবদ্ধ হওয়ার ক্ষেত্রে বিপত্তি ঘটাবে। এ কারণে আমি সব সময়ই সে ধরনের তর্ক বাহাছ এড়িয়ে চলি যা আপনারা উস্কিয়ে দিতে চান বার বার। আমার খুবই আফসোস হয়, ফিকহী মাসয়ালা মাসায়েলকে মূল দ্বীন মনে করার যে মানসিকতার কারণে সুদীর্ঘকাল থেকে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে আসছে এবং যে কারণে তাদের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মূল দ্বীনের কাজ করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, সেই মানসিকতাই বার বার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। অবস্থা দেখে মনে হয়, আপনারা যে বিষয়গুলো নিয়ে বাহাছে অবতীর্ণ হয়েছেন, এগুলোই যেনো দ্বীনের মূল ভিত্তি। আমি আগেও বলেছি, এসব বিষয়ে বাহাছ করার মতো অতো সময় আমার হাতে নেই, যতোটা আপনাদের হাতে আছে। তাই বিভিন্ন সময়ে চিঠিপত্রের মাধ্যমে এসব বিষয়ে সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে আসছি। কিন্তু আপনাদের উদ্দেশ্য যদি এমন হয়ে থাকে যে, অন্য সব কাজ ত্যাগ করে আমি এসব তর্কবাহাছের কাজে লেগে পড়ি তবে আল্লাহর নাম নিয়ে ইজতিহাদের ব্যাখ্যা সম্বলিত আরো বিস্তারিত এক প্রবন্ধ লিখবো। কিন্তু আমার

দৃঢ় বিশ্বাস, তাতেও আপনারা আশ্বস্ত হবেননা। বরঞ্চ এর ফল হবে এই যে,জামায়াতের ভিতর ও বাইরের সমস্ত আহলে হাদীস ভাইয়েরা এ বিষয়ে আমার সংগে তর্কবাহাছে লিপ্ত হয়ে পড়বেন। তখন আর আমাদের জন্য একই উদ্দেশ্যে একই সংগঠনে থেকে কাজ করা সম্ভব হবেনা। তারপর এ ফ্যাসাদ এখানেই শেষ হয়ে যাবেনা। বরঞ্চ তর্কবাহাছের দরজা যখন খুলে দেয়া হবে, তখন আমার সে প্রবন্ধগুলো নিয়েও বাহাছ শুরু হয়ে যাবে, যেগুলো সম্পর্কে হানাফী মযহাবের কিছু লোকও একমত নন। অন্যান্য বিষয় নিয়েও এরূপ যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। সুতরাং আপনি আবার চিন্তা করে আমাকে লিখে জানান, সত্যি কি আপনার উদ্দেশ্য এরূপ?

আপনি লিখেছেন, এগুলো যদি বুনিয়াদী বিষয় না হয়ে থাকে, তবে জামায়াতে ইসলামীর যাত্রালগ্নেই এসব বিষয়ে কলম ধরা ঠিক হয়নি। আমি আপনাকে দৃঢ়তার সাথে বলছি, আজ পর্যন্ত আমি এমন কোনো লেখা লিখিনি যার দ্বারা কোনো ফিরকার লোকদের আঘাত লাগেনি। আমি যদি এরূপ সিদ্ধান্ত নিই যে, এমন কিছু আমি লিখবোনা যা মুসলমানদের কোনো না কোনো ফেরকার অসহ্যের কারণ হবে, তবে হয়তো কিছুই লিখতে পারবোনা। তবে বিশ্বাস করুন, এ ব্যাপারে আমি যতোটা ব্যর্থ হয়েছি, তার চাইতে সম্ভবত অনেক গুণ বেশী আপনারা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছেন। আপনারা যদি সত্যি এ দাওয়াতের জন্যে কাজ করার উদ্দেশ্যে ময়দানে নেমে থাকেন তবে সম্ভবত এরূপ কয়েকটি পৃষ্ঠাও লিখতে পারবেননা যা আহলে হাদীস ছাড়া অন্যদের কাছে অপছন্দনীয় না হয়ে থাকবেনা। মূলত এসব আলোচনা থেকে দূরে থাকা আসল জিনিস নয়। বরঞ্চ আসল প্রয়োজন হলো যিনি কিছু লিখবেন বা বলবেন, তার অবশ্যি বিবেক বুদ্ধি কাজে লাগানো উচিত। বাঞ্ছনীয় সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করা কর্তব্য। তাহকীক ও বিশ্লেষণ করে লেখা উচিত। পক্ষান্তরে যারা সেই বক্তব্য পড়বেন বা শুনবেন, তাদের মধ্যে সহনশীলতা ও উদারতা থাকা উচিত। বুদ্ধি বিবেচনা এবং মূল ও শাখা প্রশাখা সংক্রান্ত জ্ঞান থাকা জরুরী।

বইতে কিছু মতবিরোধ আছে এজন্যে তা প্রচার ও বিলি করা যাবেনা, আপনার এ ধারণা খুবই বিস্ময়কর ও অবাস্তব। এরকম কোনো বই আমাকে দেখাতে পারেন যে বইর প্রতিটি কথাই সমস্ত মানুষের মনপূত? এ যুগের কথা বাদই দিলাম। অতীত উলামায়ে কিরামের লেখা কোনো কিতাবও কি এ রকম আছে?

এই তর্কবাহাছের সমাপ্তি যদি এভাবেও শেষ হয় যে, আপনি বা আপনার সমমতের কোনো ব্যক্তি আমার লেখাসমূহের উপর একটি সমালোচনা লিখে প্রকাশ করে দিলেন। তাতেও আমি খুশি হবো এবং তার জবাবে একটি শব্দও

লিখবোনা। তবু এ অনাকাংখিত তর্কবাহাছের পরিসমাপ্তি ঘটুক। তরজমানুল কুরআন ঃ জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪ ইং।

হাদীস বিশ্লেষণ সমস্যা

প্রশ্ন ঃ এ যাবত কয়েক দফা চিঠিপত্র আদান প্রদান হলো। কিন্তু এখনো আমি আশ্বস্ত হতে পারিনি। তা সত্ত্বেও একটিমাত্র প্রশ্নের সমাধানের বিষয়ে এ পত্র সীমিত রাখবো। এটা চিন্তা করে দেখার বিষয় যে, হাদীস এবং ফিকাহ সমপর্যায়ের হওয়া, হাদীসের সনদ বর্ণনার ক্রটি প্রভৃতি বিষয় আপনার দৃষ্টিতে মৌলিক না খুঁটিনাটি? যদি মৌলিক ও বুনিয়াদীই হয়ে থাকে, যেমন, জামায়াতের স্বতন্ত্র সাহিত্য হিসেবে এর প্রকাশনা থেকে বুঝা যায়, তাহলে কোনো প্রকার বিরোধিতার আশংকা না করেই আহলে হাদীস জামায়াত হাদীস সম্পর্কে যে গোঁড়ামী পোষণ করে তার সংশোধন ও সমালোচনার কাজে মজবুত ভাবে কলম ধরুন। যেমন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের সমালোচনায় আপনি কলম ধরেছিলেন। আপনি জামায়াতের ভিতরে বাইরে তর্কবাহাছের দরজা খুলে যাওয়ার আশংকা করেছেন। আসলে এটাতো কোনো নতুন ব্যাপার নয়। কারণ এর আগেই অমৃতসরের "আখবারে আহলে হাদীস" পত্রিকায় 'আহলে হাদীসের সত্যতা প্রমাণ' শিরোনামে এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া জনৈক মৌলভী সাহেব আপনার তাফহীমাত গ্রন্থের 'মধ্যম পন্থা' প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে দিয়ে এখনো জামায়াতে ইসলামীর সমমনা আহলে হাদীসের লোকদের মধ্যে বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। এতে করে অত্র এলাকায় জামায়াত বিরোধী ফেতনা শুরু হয়েছে, যা জামায়াতের অগ্রগতির ক্ষেত্রে সাংঘাতিক প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু আপনার এই নিবন্ধগুলো মৌলিক ও বুনিয়াদী না হয়ে যদি খুঁটিনাটি ও সম্পূরকের পর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকে, যেমন আপনার চিঠি পত্র থেকে বুঝা যায় তবে তাফহীমাতের মতো মৌলিক, গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী ধরনের গ্রন্থে এ বিষয়ের অবতারণার প্রয়োজন ছিলনা। এজন্যে তরজমানুল কুরআন পত্রিকার পৃষ্ঠাই যথেষ্ট ছিলো। আমার আফসোস হয়, আপনি যে জিনিসকে খুঁটিনাটি লেখা বলছেন, সে জিনিসই জামায়াতের সম্প্রসারণ কাজে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি নিজেই জামায়াতের গঠনতন্ত্রের ৪র্থ ধারার ৪র্থ উপধারায় লিখেছেন যে, জামায়াতে ইসলামীর রুকনদের সেইসব তর্কবাহাছ থেকে দূরে থাকা উচিত, মূল দ্বীনে যেগুলোর গুরুত্ব নেই। তবে কি কারণে গুরুত্বহীন বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে তাফহীমাত গ্রন্থের পৃষ্ঠাকে কালো করা হয়েছে? এগুলো ছাড়া মৌলিক সংস্কার সংশোধনের কাজের কি অভাব ছিলো?

এখানে দুটো পৃথক পৃথক জিনিসের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। ফিকহী খুঁটিনাটি বিষয়ের আমল কিতাব ও সুন্নাহর অধীনে বিভিন্নরূপ হওয়া একটা ভিন্ন জিনিস যা বরদাশত করা যেতে পারে। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে খুঁটিনাটি বিষয়ের সংগে মৌলিক বিষয়ের সংমিশ্রণ গ্রহণযোগ্য হতে পারে। কিন্তু নবীর হাদীস এবং মুজতাহিদের পারদর্শিতাকে সমপর্যায়ের চিন্তা করা নীতিগতভাবেই অগ্রহণযোগ্য। বরঞ্চ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বিষয়টাকে তো হাদীস অস্বীকারের সমার্থকই বলা যেতে পারে। হানাফী মযহাবের বড় বড় আলিমগণও এমনটি সমর্থন করেননা। স্বয়ং ইমাম আবু হানীফাও এ ধরনের আকীদা এবং ধ্যান ধারণার প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন। (বিস্তারিত জানার জন্যে দেখুন হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ও শামী।)

এখন এ দ্বন্দ্ব নিরসনের পথ একটাই আছে। তা হলো, পরবর্তী মুদ্রণে তাফহীমাত গ্রন্থ থেকে 'মধ্যম পন্থা' (মসলকে এ'তেদাল) নামক প্রবন্ধটি বাদ দিতে হবে এবং তরজমানুল কুরআন পত্রিকায় আদব ও ভদ্রতা রক্ষা করে এর উপর সমালোচনা করে লেখা একটা প্রবন্ধ প্রকাশের সুযোগ দিতে হবে। এ সমালোচনা হবে খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নমূলক। বিরোধিতা এবং শত্রুতামূলক নয়। আমরা যা বলছি, সে বিষয়ে আল্লাহ সাক্ষ্য রয়েছে (وَاللّٰهُ عَلٰى مَا نَقُوْلُ شَهِيْدٌ)। তরজমানুল কুরআনের ঐতিহ্যবাহী উদারতা এবং বলিষ্ঠ সাহসিকতার কাছে এমনটি আশা করা নিরর্থক হবেনা।

জবাব ঃ আমি ধারণা করেছিলাম আমার শেষ চিঠি পেয়ে আপনি আশ্বস্ত হয়ে গেছেন। কিন্তু আপনার বর্তমান চিঠি পড়ে জানতে পারলাম, আমি আপনাকে আশ্বস্ত করতে পারিনি। এ চিঠিতে আপনি যে প্রশ্ন তুলেছেন, সে সম্পর্কে আমারও একটি প্রশ্ন আছে। তা হলো, আমার রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে যেগুলোকে আপনি স্থায়ী ও মজবুত গ্রন্থ বলেছেন, তাতে খুঁটিনাটি বিষয়ে 'মসলকে এ'তেদাল' নামক এই একটি মাত্র প্রবন্ধই কি আপনার নযরে পড়েছে? এছাড়া খুঁটিনাটি বিষয়ে আর কোনো আলোচনা আমি সেসব গ্রন্থে করিনি? যদি অন্যান্য স্থানেও এরূপ আলোচনা আমি করেই থাকি, অবশ্যি তা করেছি, তবে খুঁটিনাটি বিষয়ে অভিযোগ না করার এবং মৌলিক ও বুনিয়াদী বিষয়ে আলোচনা সীমিত রাখার জন্যে এই একটি মাত্র প্রবন্ধের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার প্রয়োজন কেন অনুভব করলেন?

আপনি বলেছেন, আমার গ্রন্থাবলীতে খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা না হওয়া উচিত। আপনার এ পরামর্শ সহীহ নয়। কারণ কোনো মানুষই কেবল মৌলিক বিষয়ে নিজের বক্তব্য সীমতি রাখতে সক্ষম নয়। কখনো মৌলিক ও বুনিয়াদী

বিষয়ের ব্যাখ্যায় তাকে খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করতে হয়, কখনো মানুষের সন্দেহ সংশয় ও প্রশ্নের জবাবে খুঁটিনাটি বিষয়ে আলোচনা করা জরুরী হয়ে পড়ে। আবার কখনো কোনো বিষয়ে চিন্তা গবেষণা ও তাহকীক করতে গেলে খুঁটিনাটি বিষয়কে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হয়। এর যে কোনো প্রকারেই সেগুলো আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হোকনা কেন, তখন আলোচনায় অবশ্যি এমন কথাও আসবে, যাতে কোনো না কোনো মসলকের সাথে মতানৈক্য সৃষ্টি না হয়ে থাকতে পারেনা। এ কারণে আপনার এ দাবী কিছুতেই সহীহ নয়।

দুঃখের বিষয়, আমার পূর্বের চিঠিটা আপনি মনোযোগের সাথে পড়ে দেখেননি। সেখানে আমি একথা বলেছিলাম যে, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিভিন্ন মসলকের লোকদের একত্র করার জন্যে এটা কোনো শর্ত নয় যে, সব লোকদের ফিকহী বিষয়ে চিন্তা গবেষণার স্বাধীনতা হরণ করে নিতে হবে, কিংবা আগে থেকেই মগজ ধোলাই করে সকলকে একটি মাত্র মসলকের অধীনে একত্র করার চেষ্টা করতে হবে। এটা ঠিক নয়, বরঞ্চ সঠিক পন্থা হলো, ফিকহী বিষয়ে চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্রে সকলেরই আযাদী থাকবে। শুধু চিন্তা গবেষণার ক্ষেত্রেই নয়, বরঞ্চ তা প্রকাশ ও বয়ান করার ক্ষেত্রেও সকলের স্বাধীনতা থাকবে এবং কারো মসলক কারো উপর চাপিয়ে দেয়া যাবেনা। এ সম্পর্কে আপনি গঠনতন্ত্রের যে ধারার উদ্ধৃতি দিয়েছেন তার উদ্দেশ্য তা নয়, যা আপনি বুঝেছেন। বরঞ্চ তার উদ্দেশ্য হলো তর্কবাহাছ এবং ঝগড়া বিবাদের পথ বন্ধ করা।

আমি দুঃখিত যে আপনি আমার পূর্বের জবাবগুলো থেকে বিস্ময়কর অর্থ খুঁজে বের করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার আপনি অপরের মসলক সম্পর্কে বুঝার চেষ্টা না করে নিজের ধারণা সন্দেহের ভিত্তিতে একটি কথা তৈরী করে তার নামে রটাচ্ছেন। "নবীর হাদীস ও মুজতাহিদের পারদর্শিতাকে সমপর্যায়ের চিন্তা করা নীতিগতভাবেই অগ্রহণযোগ্য। বরঞ্চ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এ বিষয়টাকে তো হাদীস অস্বীকারের সমার্থকই বলা যেতে পারে।" আপনার এ বক্তব্য কোনো অবস্থাতেই আমার নীতির প্রতিনিধিত্ব করেনা। আপনি নিজেই ইনসাফের সাথে চিন্তা করে দেখুন, আমি হাদীস সম্পর্কে তাফহীমাত গ্রন্থে যেসব প্রবন্ধ লিখেছি এবং আমার অন্যান্য গ্রন্থে যেভাবে হাদীস থেকে দলিল প্রমাণ গ্রহণ করেছি, এসবগুলো দেখার পর আমার সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ করার সামান্যতম অবকাশও কি থাকতে পারে যে, হাদীস অস্বীকারকারীদের নীতির প্রতি আমার ক্ষীণতম দুর্বলতাও রয়েছে? অতপর আপনি যদি আমাকে মুমিন বা মুসলমান মনে করেন, তবে আমার সম্পর্কে কিভাবে এ সন্দেহ করতে পারলেন যে, আমি কোনো রেওয়ায়েতকে রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বলে স্বীকার করে নেয়ার পর তার উপর কারোর ফিকহী বিশ্লেষণ কিংবা নিজের

ইজতিহাদ অথবা কোনো ইমামের বক্তব্যকে অগ্রাধিকার দিতে পারি। অগ্রাধিকার দেয়া তো দূরের কথা, এ উভয়টাকে যদি সমপর্যায়েরও মনে করি কিংবা মনে মনে এরূপ চিন্তা করে থাকি, তবে আমি কিভাবে মুমিন থাকবো?

প্রকৃতপক্ষে আপনারা যে ভুল বুঝাবুঝিতে নিমজ্জিত রয়েছেন, তা হলো, আপনারা মনে করেছেন, আমি ইজতিহাদ ও দ্বীন সংক্রান্ত বুৎপত্তিকে হাদীসে রসূলের উপর অগ্রাধিকার দিই কিংবা এ উভয়টাকে সমপর্যায়ের মনে করি। অথচ প্রকৃতপক্ষে, ঘটনা তা নয়। প্রকৃত ঘটনা হলো, কোনো রেওয়ায়েতকে রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত করার পর তার বিশুদ্ধতা ও নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে বিতর্ক হয়ে থাকে। আপনাদের মতে মুহাদ্দিসগণ যেসব রেওয়ায়েতকে সনদের দিক থেকে সহীহ্ বলেছেন, তার প্রতিটি রেওয়ায়েতকেই হাদীসে রসূল হিসেবে স্বীকার করে নেয়া জরুরী। কিন্তু আমাদের মতে এটা জরুরী নয়। সনদের বিশুদ্ধতাকে হাদীসের বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে আমরা অত্যাবশ্যক দলিল মনে করিনা। আমাদের মতে কোনো হাদীসের বিশুদ্ধতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সনদই একমাত্র মাধ্যম নয়; বরঞ্চ তা সেইসব মাধ্যমের একটি যেগুলো দ্বারা কোনো রেওয়ায়েতকে হাদীসে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে সঠিক ধারণা লাভ করা যায়। আমাদের মতে হাদীসের বক্তব্য বিষয় (মতন) সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করে দেখতে হবে। কুরআন সুন্নাহর সামগ্রিক ইলমের মাধ্যমে আমরা দ্বীন সম্পর্কে যে ধারণা লাভ করেছি, তার সাথেও এ বক্তব্যটা মিলিয়ে দেখতে হবে। যে বিশেষ বিষয়ের সাথে রেওয়ায়েতটি সম্পর্কিত, সে বিষয়ে এর চাইতে অধিকতর মজবুত দলিল দ্বারা যে সুন্নত প্রমাণিত তার সাথেও রেওয়ায়েতটি মিলিয়ে দেখতে হবে এবং এ ছাড়াও এমন আরো কতিপয় জিনিস আছে যেগুলোকে উপেক্ষা করে কোনো হাদীসকে আমরা রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংগে সম্পৃক্ত করাকে সঠিক মনে করিনা।

সুতরাং আমাদের ও আপনাদের মধ্যকার মতপার্থক্যের কারণ এটা নয় যে, হাদীসে রসূল এবং মুজতাহিদের ইজতিহাদ সমপর্যায়ের কিনা? বরঞ্চ রেওয়ায়েতসমূহের গ্রহণ বর্জন এবং সেগুলো থেকে শরয়ী হুকুম আহকাম বের করার ক্ষেত্রে একজন মুহাদ্দিসের সনদ ভিত্তিক রায় এবং একজন মুজতাহিদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণগত রায়ের গুরুত্ব সমপর্যায়ের কিনা? আসল মতপার্থক্য সে বিষয়ে। কিংবা এতদুভয়ের মধ্যে কার রায়ের ওজন বেশী, মতপার্থক্য সে বিষয়ে। আলোচনার এ অধ্যায়ে কেউ যদি উভয়কে সমপর্যায়ের বলে আখ্যায়িত করে, তবে সে গুনাহ বা অপরাধ করেনা। কিংবা কেউ যদি উভয়ের কোনো একজনকে অপরজনের উপর অগ্রাধিকার দেয়, তবে সেও গুনাহ বা অপরাধের

কাজ করেনা। কিন্তু আপনারা তাকে গুনাহগার বা অপরাধী বানানোর জন্যে বিনা কারণে কেবল এজন্যেই দোষারোপ করেন যে, সে হাদীসকে হাদীসে রসূল স্বীকার করে নেয়ার পর কোনো মুজতাহিদের রায়কে সমপর্যায়ের মনে করে কিংবা তার উপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। অথচ কোনো মুমিন এমন কাজ করার চিন্তাও করতে পারেনা।

মুহাদ্দিসগণ যেসব প্রমাণের উপর ভিত্তি করে হাদীসসমূহকে সহীহ, জয়ীফ কিংবা ভ্রান্ত হবার ফায়সালা করেন, সেগুলোর মধ্যকার দুর্বলতার বিভিন্ন দিক নিয়ে আমি 'মসলকে এ'তেদাল' প্রবন্ধে আলোচনা করেছি। সেখানে আমি নযীর হিসাবে যেসব বিষয় উল্লেখ করেছি তার অধিকাংশ আল্লামা ইবনে আবদুল বার এর 'জামেউ বায়ানিল ইলম' গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছি। আপনি মেহেরবানী করে বলুন, সেই দুর্বলতাগুলো কি সত্যি হাদীস শাস্ত্রে বর্তমান নেই? যদি থেকে থাকে, তবে আপনারা মুহাদ্দিসগণের মতের উপর ঈমান আনার জন্যে আমাদের কাছে এরূপ শক্ত দাবী কেন করছেন? মুহাদ্দিসগণের রায় মোটেও গ্রহণযোগ্য নয় সে কথা তো আমরা বলিনি। আমরা এরূপ ধারণা অন্তরেও স্থান দিতে পারিনা। বরঞ্চ এর বিপরীত আমরা হাদীস বিশ্লেষণের সময় সর্বপ্রথম এটাই দেখা জরুরী মনে করি যে, সনদের দিক থেকে হাদীসটি কোন্ পর্যায়ের? এ ক্ষেত্রে যে পর্যায়ের মুহাদ্দিস হাদীসটিকে নিজ গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন তাঁর মর্যাদানুযায়ী রায়ের প্রতি আমরা পুরোপুরি দৃষ্টি দিয়ে থাকি। কিন্তু হাদীস শাস্ত্রের যেসব দুর্বলতার কথা আমি আলোচনা করেছি, সেগুলোর ভিত্তিতে কেবল রেওয়ায়েতগত বিশুদ্ধতার ভিত্তিতে প্রতিটি হাদীসকে হাদীসে রাসূল (স) বলে স্বীকার করে নেয়া যেতে পারেনা। আপনি আমার রায়ের সংগে একমত না হতে পারেন, যেমন আমি আপনার এ সংক্রান্ত রায়ের সাথে একমত নই। কিন্তু এ মতানৈক্যের ফলে আপনি আমার উপর এমন অপরাধ আরোপ করবেন, যা প্রকৃতপক্ষে আমি করিনি, এটাতো ঠিক নয়।

আপনি যদি 'মসলকে এ'তেদাল' প্রবন্ধের সমালোচনা লেখেন, তবে এটা আমার শুকরিয়ার কারণ হবে। আমার ভুল যদি আমার কাছে ধরা পড়ে, তবে তা থেকে প্রত্যাবর্তন করতে আমি কখনোও দ্বিধাবোধ করবোনা। তরজমানুল কুরআন ঃ নভেম্বর - ডিসেম্বর ১৯৪৪ ইং।

শরীয়তের খুঁটিনাটি বিষয় ও দ্বীনের দাবী

প্রশ্ন ঃ সম্মেলনে[১] অংশ গ্রহণ এবং জামায়াতের বিভিন্ন শাখার রিপোর্ট শুনার পর আমি এবং আমার সাথীরা একথা ভালভাবে অনুধাবন করতে পেরেছি যে,

---

১. এটা ছিলো জামায়াতে ইসলামীর সেই সাধারণ সম্মেলন, যা ১৯৪৫ সালে দারুল ইসলাম পাঠানকোটে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

জামায়াতের সাহিত্য প্রচার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে আমরা খুবই নগণ্য পর্যায়ের কাজ করেছি। এ সফরে অতীত দুর্বলতাসমূহের জন্যে আমরা লজ্জিত হয়েছি এবং ভবিষ্যতে পূর্ণ আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সাথে কাজ করার অনুপ্রেরণা লাভ করেছি। পূর্ণ দায়িত্ব অনুভূতি ও সাহসের সাথে যেনো সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতে পারি সেজন্যে দোয়া করবেন।

এই আশাপ্রদ এবং আনন্দদায়ক পরিবেশের সাথে সাথে সমাপ্তি ভাষণের[২] দুয়েকটি বাক্য আমার কোনো কোনো সহানুভূতিশীল সাথীর জন্যে পেরেশানীর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য স্থানের রুকন ও শুভাকাংখীদের মধ্যে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। কথা হলো, নাস্তিকরা চরম হঠকারিতা ও গালিগালাজ করা সত্ত্বেও যখন ধৈর্য, সহনশীলতা ও উত্তম উপদেশমূলক আচরণ লাভের অধিকারী, সেক্ষেত্রে সংকীর্ণমনা কূপমণ্ডুক এই দ্বীনদার লোকেরা কি অনুরূপ আচরণ পাওয়ার যোগ্য নয়? তাদের অভিযোগ ও সন্দেহ সংশয়গুলো কি হিকমাহ, উত্তম উপদেশ এবং ধৈর্য ও সহনশীলতার মাধ্যমে নিরসন করা যায়না? সমাপ্তি ভাষণের শেষ বাক্য ক'টি কিছুটা আবেগ প্রভাবিত বলে মনে হচ্ছিল। আমাদের মতপার্থক্যটা বক্তৃতার বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নয়; বরঞ্চ বিশ্লেষণ ও বাচনভংগি সম্পর্কে।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ـ

"এটা আল্লাহ্‌র রহমত যে তুমি তাদের প্রতি কোমল। অন্যথায় তুমি যদি কঠোর হৃদয়ের অধিকারী হতে, তবে তারা তোমার চারপাশ থেকে সরে পড়তো।"

দ্বীন প্রচারের মূলনীতি কুরআনের এ আয়াতটি থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে। এর উপর আমল করলে যাবতীয় সমস্যার সমাধান হতে পারে। দ্বীন প্রচার ও দ্বীন বুঝানোর ক্ষেত্রে আপনার সাধারণ অভ্যাস যে খুবই বিজ্ঞতাপূর্ণ, তা আমি মোটেও অস্বীকার করছিনা। একারণেই এবার অভ্যাসের বিপরীত বক্তব্য আপনার মুখ দিয়ে বের হওয়ায় আশ্চর্যান্বিত হয়েছি।

দ্বিতীয় আরয হলো, হিকমাহ ও শরয়ী যুক্তিসিদ্ধতার দাবী অনুযায়ী প্রাসংগিক মসলা মাসায়েল এবং যাহেরী সুন্নাতের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রাথমিক অবস্থায়

---

২. ভাষণটি জামায়াতে ইসলামীর কার্যবিবরণী তৃতীয় খন্ডে সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া "ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি" নামে ভাষণটি পুস্তিকাকারেও প্রকাশ হয়েছে।

বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয় এবং নিজেদেরও বাস্তবে এমন কোনো কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত নয় যার ফলে মুসলমানদের মধ্যে ঘৃণা ও বিদ্বেষভাব পয়দা হতে পারে। এজন্যেই তো রসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনাফিক হত্যা ও কা'বার ভিত পরিবর্তনের কাজ থেকে বিরত থাকেন। আমি স্বীকার করি, দাড়ি ছেড়ে দেয়া এবং খাটো করার বিষয়ে অতীত আলিমগণের মধ্যে মতভেদ ছিল। আর এ বিষয়ে যে পন্থা আপনি অবলম্বন করেছেন তার অবকাশও শরীয়তে রয়েছে। তাছাড়া এক মুঠি পরিমাণ দাড়ি লম্বা করার বিষযটা আপনিও অস্বীকার করবেননা। সুতরাং সর্বসাধারণকে বিভ্রান্তি থেকে রক্ষা করার জন্যে এ বৈধ কাজটির উপর আপনি আমল করলে তা কি বিজ্ঞতাপূর্ণ কাজ হতোনা? কেননা মানুষের বাহ্যিক দিকে যে বাড়াবাড়ি থাকে, তাতো বুনিয়াদী বিষয়গুলো তার মন মগজে বসিয়ে দেয়ার পরেও সংশোধন করা যেতে পারে। জামায়াতে ইসলামীর সাথে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সম্পর্কের কারণেই এ লাইন ক'টি লিখলাম। আশা করি ভেবে দেখবেন।

জবাব ঃ *আমি জেনে বিস্মিত হলাম যে, আপনি চাচ্ছেন দ্বীনের অনুসারী লোকদের সাথেও সে আচরণ করা হোক, যা হওয়া উচিত দ্বীন অস্বীকারকারীদের সাথে। তাছাড়া আপনি কেবল কোমল আচরণকেই হিকমতের দাবী বলে মনে করেছেন। অথচ কুরআন সুন্নাহর অধ্যয়ন থেকে জানা যায়, সত্যকে যারা স্বীকার করে নিয়েছে, তাদের থেকে যদি সত্যের বিপরীত কথা প্রকাশ হয় তবে তাদের সাথে সত্য অস্বীকারকারীদের অনুরূপ নয় ; বরঞ্চ ভিন্নতর আচরণই করা হয়। তাছাড়া আল্লাহ এবং তাঁর রসূল যেখানে কোনো কোনো অবস্থায় হিকমতের দাবী অনুযায়ী একেবারে কোমল হয়েছেন, সেখানে অন্যত্র আবার চরম কঠোর হয়েছেন এবং সেটাও হিকমতের দাবী। আমি শুধু এটুকু জানতে চাই যে, সমাপ্তি ভাষণে আমি যে কথাগুলো বলেছিলাম, তন্মধ্যে আমার কোনো কথা সত্য ও ন্যায়ের খেলাফ ছিল কি? তাছাড়া সে বক্তৃতায় যে কথাগুলো বলা হয়েছে, তখনকার বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে সেকথাগুলো কি বলার প্রয়োজন ছিলনা? এ দুটোর কোনো একটিও যদি অবান্তর হয়ে থাকে তা অবশ্যি আমাকে লিখে জানাবেন। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে, সেখানে যে কথাগুলো বলা হয়েছে সেগুলো সঠিক ছিলো এবং মূল দ্বীনের দাবীর প্রতি লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে একথাগুলো পরিষ্কার করা প্রয়োজন ছিলো, তবে বাচনভংগির অভিযোগ অবান্তর। আমি একীনের সাথে আপনাকে বলতে চাই যে, আবেগতাড়িত ব্যক্তি আমি নয়। কঠোরতা কিংবা কোমলতা যেটাই অবলম্বন করিনা কেন, তা আবেগের বশবর্তী হয়ে নয়, বরঞ্চ ঠাণ্ডা দিলে পরিবেশকে সামনে রেখে কোনো রায় কায়েম করার পরই তা অবলম্বন করি।*

আপনার সামনে তো শুধু আপনার আশপাশের পরিবেশ রয়েছে। কিন্তু আমার উপর যে দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছে, তার প্রেক্ষিতে গোটা সংগঠন ও আন্দোলনের উপর আমাকে দৃষ্টি রাখতে হয়। খুব ভালোভাবেই এটা আমার উপলব্ধি হয়ে গিয়েছিল যে, দ্বীনের মূল দাবী যদি এ সময় পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে বলে না দিই এবং সেই লোকদের ভ্রান্তি যদি বিলকুল উন্মুক্ত করে না দিই, যারা এখনো খুঁটিনাটি বিষয়কেই মূল দ্বীন বানিয়ে বসে আছে এবং দ্বীনের মূল দাবীর ব্যাপারে গাফিল হয়ে আছে, তবে তা হবে আমাদের আন্দোলনের জন্যে ধ্বংসকর। কেননা এ ধরনের বেশ কিছু লোক ভাসাভাসাভাবে প্রভাবিত হয়ে আমাদের আন্দোলনের দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু তারা নিজেদের অতীত রেষারেষি এবং ভ্রান্তিসমূহের সামান্যতম সংশোধনেও প্রস্তুত নয়। বরঞ্চ উল্টো তারা আমাদের কাছে দাবী করে বসে, আমরাও যেনো তাদের সেসব ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে সেসব খারাবী ছড়িয়ে দিই যা নাকি সংশোধনের নামে তারা নিজেরা করছে। সুতরাং সেই সুযোগে যদি তাদের সাবধান করে না দিতাম, তবে আমার আশংকা ছিল এরা জামায়াতে প্রবেশ করে কিংবা জামায়াতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এমনসব সমস্যা সৃষ্টি করতো যা গড়ার কাজের চাইতে ভাংগনের কাজকে ত্বরান্বিত করতো।

মূলত আমার সেই বক্তৃতা শোনার পর ঐ লোকগুলো যেসব কথাবার্তা বলেছে, তা থেকে তো আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, এরা দ্বীনের কাজ করার যোগ্য নয়। তাদের আমাদের কাছে আসাটা আমাদের চাইতে দূরে থাকা এবং বিরোধিতা করার চাইতে বিপজ্জনক। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, যারা আমার বক্তৃতার একটি শব্দকেও কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে অভিযুক্ত করত সক্ষম নয়, বরঞ্চ এটা স্বীকার করতে বাধ্য যে, আমি যে জিনিসকে দ্বীনের মূল দাবী বলে উল্লেখ করেছি, কুরআন সুন্নাহর আলোকে সত্যি তা দ্বীনের মূল দাবী এবং যেসব জিনিসকে আমি গুরুত্বানুযায়ী আগের পরের বলেছি সত্যি সেগুলো তাই; কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা আমার সেই বক্তৃতার উপর অভিযোগ করতে এবং কুধারণা প্রকাশ করতে কোনো দ্বিধা করেনা, তারা কতোটা সম্মানযোগ্য যে, তাদের আবেগ ও ধারণার অনুবর্তী হতে হবে?

এরা আসলে সত্যানুসারী নয়, নফসের অনুগামী। এদের মধ্যে এতোটুকু খোদার ভয় নেই যে, নিজেদের ভ্রান্তি সম্পর্কে অবহিত হবার পর সেগুলি সংশোধন করবে এবং সত্য উদঘাটিত হবার পর তা কবুল করবে। তা না করে উল্টো তারা অভিযোগ এই করছে যে, সত্য কথা কেন সাফ সাফ করে বলে দেয়া হলো। সত্য কথা যিনি বললেন, তিনি কেন সেই সব রেষারেষিতে নিমজ্জিত নেই, যাতে তারা নিজেরা নিমজ্জিত রয়েছে। এরা যদি আল্লাহর দ্বীনের অস্বীকারকারী হতো তবে আমরা তাদের ব্যাপারে কিছুনা কিছু বিবেচনা করতে

পারতাম। কিন্তু এরা তো আত্মপূজারী হওয়া সত্ত্বেও সত্যপূজারীদের প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে আছে এবং দ্বীনদারীর পরিচয় প্রকাশ করে চলেছে। এজন্যে এরা কোনো প্রকার রেয়ায়েত পাওয়ার যোগ্য নয়। এ ধরনের লোকেরা দূরে সরে পড়লে যারা সত্য প্রতিষ্ঠার জন্যে কাজ করতে চায়, তারা আফসোস করতে পারেনা। এরা মযহাবের নামে আজ পর্যন্ত যা কিছু করে আসছে তাতে দ্বীনের কোনো গঠনমূলক কাজ হয়নি, বরঞ্চ দ্বীন বিকৃতই হয়ে আসছে। তাই আমি দ্বীনের গঠনমূলক কাজের পন্থা পদ্ধতি এবং দ্বীন বুঝার ক্ষেত্রে তাদের যেসব ত্রুটি বিচ্যুতি রয়েছে সেগুলি তাদের পরিষ্কার করে বলে দিতে চেয়েছি। এরা যদি বাস্তবিকই দ্বীনের সাথে আন্তরিক সম্পর্ক রাখতো, তবে আমার কথাগুলো শুনেতো তাদের চোখই খুলে যেতো। ভুল পন্থা ত্যাগ করে ফিরে আসতো এবং উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতো কিন্তু তা না করে তারা উল্টা আমার উপর বিরক্ত হয়েছে। এখনো তারা মযহাবী রেষারেষী এবং খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েই ঝগড়া বিবাদে নিমজ্জিত থাকাকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে। তাদের এ আচরণে আমি আনন্দিত এবং আল্লাহ্র শোকর আদায় করছি যে, এসব ফেতনাবাজ লোকেরা কাছে আসার পরিবর্তে দূরে সরে যাচ্ছে।

খোদা না করুন, সেই সম্মেলন উপলক্ষে একথাগুলো সাফ সাফ করে বলার ব্যাপারে আমি যদি কোনো প্রকার ত্রুটি করতাম, তবে এ ধরনের দুর্বলতার জন্যে পরে আমাকে অবশ্যিই আফসোস করতে হতো। আমার তো মনে হয় আল্লাহ তায়ালা এদেরকে তাঁর দ্বীনের কোনো খিদমত করার তৌফিকই দিতে চাননা। সম্ভবত আল্লাহ তায়ালা এদেরকে ফিতনায় নিমজ্জিত থাকার তৌফিকই দিতে থাকবেন।

দাড়ি সম্পর্কে আপনি যা কিছু লিখেছেন, সে ব্যাপারে আমার আরয এই যে, আমি আমার কোনো আমল দ্বারা সেই মানসিকতাকে পরিতোষণ করতে চাইনা, যা বিদআতকে সুন্নাতে পরিণত করার অবকাশ সৃষ্টি করে দেয়। আমার মতে কোনো অপ্রমাণিত বিধানকে প্রমাণিত বিধানের মতো আখ্যায়িত করা এবং কোনো অসুন্নাত জিনিসকে (যা শরীয়তের পরিভাষার দিক থেকে সুন্নাত নয়) সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করা বিদআত। তা এমন বিপজ্জনক বিদআত যা প্রচলিত ও সুপরিচিত বিদআতসমূহের মতোই দ্বীনকে বিকৃত করে ছাড়তে বাধ্য। কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয় এমন একটি পরিমাণকে লোকেরা দাড়ির পরিমাণ নির্ধারণ করে তার উপর এমন বাড়াবাড়ি করছে, যা করার প্রয়োজন ছিল কোনো প্রমাণিত পরিমাণের ব্যাপারে। এসব লোকেরা এর চাইতেও ভয়াবহ এক ভুল করছে। তাহলো, তারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভ্যাসকে হুবহু সেই সুন্নাতের মর্যাদা দিচ্ছে, যে সুন্নাত প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি প্রেরিত

হয়েছিলেন। অথচ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভ্যাসগতভাবে যেসব কাজ করেছেন, সেগুলোকে সুন্নাতের মর্যাদা দিয়ে গোটা দুনিয়ার মানুষের কাছে সেগুলো অবলম্বনের দাবী জানানো কখনো আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের উদ্দেশ্য ছিলনা। দ্বীনকে যে এভাবে বিকৃত করা হচ্ছে আমি যদি এগুলোর সামনে মাথা নুইয়ে দিই এবং লোকেরা আমার বাহ্যিক সজ্জা যেরূপ দেখতে চায় আমি সেরূপই সাজি, তবে তো আমি এমন এক অপরাধে অপরাধী হবো, যে জন্যে আল্লাহর দরবারে আমাকে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে এবং সেই পাকড়াও থেকে আমাকে রক্ষা করতে কেউ এগিয়ে আসবেনা। সুতরাং নিজেকে এই পরকালীন মহাবিপদে নিমজ্জিত করার চাইতে লোকদের দ্বারা সমালোচিত হওয়াকে লক্ষ গুণ ভাল মনে করি।

প্রশ্ন ঃ সম্প্রতি দারুল ইসলামে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের[১] পর আমি মৌখিকভাবে বলেছিলাম, এখন পুনরায় দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজকে সবচাইতে বড় ফরয বরং মূল ফরয এবং এই পথে চেষ্টা সংগ্রাম করাকে তাকওয়ার রূহ মনে করার পর আরয করছি, "তাকওয়া প্রদর্শনের" গুরুত্বকে সমাপ্তি ভাষণে আপনি যেরূপ নিষেধ করেছেন, তা জামায়াতের অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রুকনদের মধ্যে সুন্নাতের প্রতি অমনোযোগী থাকার জযবা সৃষ্টি করেছে এবং আমানতদারীর সাথে বলছি যে, সম্মেলনের পরই আমি তা লক্ষ্য করেছি। এই কঠোরতার ফলে বাইরের লোকেরা আন্দোলনকে প্রথমত সন্দেহের চোখে দেখতে থাকবে। কারণ এর আগেও কোনো কোনো আন্দোলনের আহ্বায়ক এভাবেই সুন্নাতের প্রতি বিদ্রুপাত্মক আচরণের সূচনা করেছিলেন। তারা সোৎসাহে ও সাগ্রহে তাকওয়ার কোনো কোনো চিহ্নকে গুরুত্ব দেবার এবং তা দাবী করার ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করার বিরোধিতা করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, দুষ্ট লোকদের হাতের আকড়া এমন একটা খেলনা পিস্তল তুলে দেবো যা আসলে গুলি করতে না পারলেও তার গুলির নকল আওয়াজ সত্যের দিকে অগ্রসরমান লোকদেরকে সন্ত্রস্ত করে তুলবে। যেসব কাজে সাধারণের ফিতনায় নিমজ্জিত হবার আশংকা ছিল, স্বয়ং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সেগুলো পরিহার করে চলতেন। বাইতুল্লাহর ভিত পূনর্গঠনের কাজ তিনি শুধুমাত্র জাতির অজ্ঞতা এবং নবদীক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়ার আশংকায় মূলতবী রেখেছিলেন।

---

১. এটি পূর্ব পত্রে উল্লেখিত সেই সম্মেলন এবং সেই বক্তৃতা 'ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি'।

তাকওয়া প্রদর্শন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়েও নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ অনুসরণ করাই সঠিক পথ। একথা স্বীকার করার পর নিম্নোক্ত বর্ণনাটি দেখুন ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم كَثَّ اللِّحْيَةِ يَمْلَأُ صَدْرَهُ -

রসূলে খোদার এই আদর্শের অনুসরণ করে যদি আপনি এ বিষয়ের সংকীর্ণতা এবং বাড়াবাড়ির সংশোধন করেন, তবে একদিকে অভিযোগকারীরা ছিদ্রান্বেষণের অবকাশ কম পাবে অপরদিকে সুন্নাতের অনুসরণের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যপন্থীদের উন্নাসিকতাও হ্রাস পাবে। এরি ভিত্তিতে সাক্ষাতকালে আমি আপনাকে বলেছিলাম, আপনার ব্যক্তিগত যিন্দেগীতে দাড়ি লম্বা করাসহ অন্যান্য যাহেরী সুন্নাতসমূহের পরিপূর্ণতা অবশ্যি দ্বীনের জন্যে কল্যাণকর হবে। একদিকে মযহাব বিরোধিতাকারীরা রয়েছে। তাদের সংশোধনের কাজ এভাবে করতে হবে যে বিভিন্ন দ্বীনি বিষয়কে যথাযথভাবে তাদের সামনে তুলে ধরার মাধ্যমে সেগুলোর সঠিক মর্যাদা ও গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের অবহিত করতে হবে। কিন্তু অপরদিকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজ রয়েছে। তাদের কাছে তাকওয়া প্রদর্শনের ব্যাপারে নবীগণের সুন্নাত তথা দাড়ি রাখার সুন্নাত তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, বরঞ্চ ঘৃণা ও বিদ্রুপের বিষয়। এদের সংশোধনের দায়িত্বও তো শেষ পর্যন্ত আমাদেরই উপর ন্যস্ত। এই দায়িত্ব পালনের জন্যে অতীত দ্বীনদার লোকদের অবলম্বিত তাকওয়ার নীতিসমূহের উপর ইতিবাচক কড়াকড়ি জরুরী নয় কি?

আরেকটি কথা হলো, দ্বীনের বুনিয়াদী বিষয়গুলোই এখন পর্যন্ত আমরা সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে পারিনি। আল্লাহর অসংখ্য বান্দার অন্তরে এখনো আমরা দ্বীনের যথার্থ জ্ঞান সঞ্চার করতে পারিনি। এমতাবস্থায় খুঁটিনাটি বিষয়ে সময় নষ্ট না করে আমাদের তো মূল উদ্দেশ্যের প্রতিই ধাবিত হওয়া উচিত। তা না হলে আমার আশংকা হয় যে, এসব গুরুত্বহীন বিষয়ের কারণেই আমরা মূল উদ্দেশ্যে উপনীত হতে পারবোনা। সুতরাং তাকওয়ার চিহ্ন প্রভৃতি গুরুত্বহীন ধরনের বিতর্কে নিজেদের লেখা ও বক্তৃতায় নিয়োজিত না করাই ভাল।

জবাব ঃ আপনি যেসব বিষয় লিখে পাঠিয়েছেন, এর মধ্যে অনেকগুলো জবাবই আপনাকে মৌখিকভাবে দিয়েছি। সেই মৌখিক জবাবের সাথে আরো কিছু সংযোজন করার প্রয়োজন এখনো অনুভব করিনা। তা সত্ত্বেও এমন দুয়েকটি বিষয় আছে যে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি।

আপনি বারবার একই কথার পুনরাবৃত্তি করছেন যে, আমি তাকওয়া প্রদর্শনের বিরুদ্ধে কঠোরতা অবলম্বন করেছি, যা সুন্নাতকে বিদ্রুপ করার এবং সুন্নাতের

প্রতি অসতর্ক হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেহেরবানী করে বলতে পারেন কি আমার সে শব্দগুলো কি ছিলো, যাকে আপনি কঠোরতা আখ্যা দিচ্ছেন? শব্দগুলো যদি আপনার মনে না থেকে থাকে তাবে একটু ধৈর্য ধরুন। ইনশাআল্লাহ অচিরেই আমার সেই বক্তৃতাটি প্রকাশের ব্যবস্থা করবো, তখন আপনি পড়ে দেখবেন এবং সেই কঠোর বাক্যগুলো দাগ দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন যেগুলোর মধ্যে কঠোরতার গন্ধ পাওয়া যায়। এমনি করে জামায়াতের যেসব রুকনের সাথে আপনার মতবিনিময় হয়েছিল এবং আপনি অনুভব করেছেন যে, আমার এ বক্তৃতার কারণে তাদের মধ্যে সুন্নাত সম্পর্কে অসতর্কতা সৃষ্টি হয়েছে, মনে থাকলে তাদের নামও আমার নিকট পাঠিয়ে দেবেন। তাদের নাম মনে না থাকলে তারা কোন্ এলাকার রুকন অন্তত তা জানাবেন, যাতে করে আমি যাচাই করে দেখতে পারি যে, তাদের সম্পর্কে আপনার অনুমান ভুল না কি আমার সম্পর্কে তাদের অনুমান?

জামায়াতে ইসলামীতে প্রবেশ করার পর যাদের মুখে দাড়ি গজিয়েছে, এদের মুখে যারা সুন্নাতের পায়রুবী করার তাবলীগ করছেন বলে দাবী করে বেড়াচ্ছেন তাদের কারোর প্রচারণার ফলে কোনো দিন দাড়ি গজাতে পারতো বলে কি আপনি মনে করেন? এ কথাটি কি আপনি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন কি? জামায়াতে আসার পর আমরা তো ইংগিতেও তাদেরকে দাড়ি কিংবা অন্য কোনো তাকওয়া প্রদর্শনী করার কথা বলে দেইনি যে অমুক অমুক জিনিসের উপর আমল করবেন। বরঞ্চ তারা নিজেরাই দাড়ি রেখে দিয়েছেন এবং ফ্যাশন পরিবর্তন করতে শুরু করেছেন। এর কারণ হলো, আমরা সেই মূল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণদানের কাজে আমাদের সমস্ত চেষ্টা নিয়োজিত রেখেছি, যা পরহেযগারী যিন্দেগীর মূল ভিত। আর তা হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পরিপূর্ণ আনুগত্য করার শিক্ষা। এ কাজের পর পৃথক পৃথকভাবে কোনো আমলের তালকীন দেয়ার প্রয়োজন থাকেনি। যে যে বিষয়ে তারা জানতে পেরেছে যে, এই বিষয়ে আল্লাহ ও রসূলের হুকুম হচ্ছে এই কিংবা আল্লাহ ও রসূলের ইচ্ছা ও পছন্দ এরূপ, সেগুলো অবলম্বনের ব্যাপারে তারা নিজেদের নফসকে বাধ্য করেছে। যেসব বিষয়ে তারা জানতে পেরেছে যে এগুলো আল্লাহ ও তার রসূলের কাছে অপছন্দনীয়, সেগুলো তারা নিজেরাই পরিত্যাগ করেছে। তাদের মধ্যে কেবল সুন্নাতের অনুবর্তন করা পর্যন্তই পরিবর্তন আসেনি, বরঞ্চ দ্বীনের সেই সব দাবীও তারা পূর্ণ করে চলেছে যেগুলো দ্বীনের দাবী হবার ব্যাপারে শেষ যুগের আলিমদেরও পর্যন্ত ধারণা নেই।

এসব কিছু দেখার পর আপনি যখন আমাকে বলেন যে, তোমার কথায় লোকদের মধ্যে সুন্নাত সম্পর্কে অমনোযোগীতা সৃষ্টি হয়েছে, তখন আমি উদ্বিগ্নও

হই এবং দুঃখিতও হই। আমি যে ভংগিতে তখন কথা বলেছিলাম তা বাধ্য হয়েই বলেছিলাম। কারণ একদল লোক তাদের কর্মপন্থা দ্বারা একথা প্রমাণ করছিল যে, একদিকে তারা আমাদের দাওয়াত কবুল করে সংগঠনের দিকে অগ্রসর হয়ে আসছিল, কিন্তু অপর দিকে খুঁটিনাটি বিষয়কে মূল দ্বীনের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে নিজেদের সমস্ত বক্তৃতা ,লেখনী ও তর্ক বাহাছ এইসব খুঁটিনাটি বিষয়ের উপর কেন্দ্রীভুত করে রাখার রোগ তাদের মধ্যে লেগেই ছিলো। এতে করে আমার পূর্ণ আশংকা হয়েছিলো যে, এরা যদি জামায়াতে প্রবেশ করে, তবে সেই মযহাবী ঝগড়ার বীজ জামায়াতের মধ্যেও ছড়াবে। এজন্যে আমাকে বাধ্য হয়ে বলে দিতে হয়েছিল, এ ধরনের লোকেরা আমাদের কোনো কাজে আসবেনা এবং আমাদের দাওয়াতের প্রাণসত্তা তাদের মেযাজের সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা যদি তাদের মস্তিষ্ক পরিশুদ্ধ করে এবং নিজেদের দ্বীনি বুঝ দুরস্ত করে আমাদের সাথে আসতে চায়, তবে তা খুবই উত্তম। কিন্তু তারা যদি জামায়াতে এসে কিংবা জামায়াতের অন্তর্ভুক্ত থেকে সেইসব কাজই করতে থাকে যা গড়ার পরিবর্তে ভাংগাকে ত্বরান্বিত করবে, তবে জামায়াতে এসে জামায়াতকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চাইতে তাদের বাইরে থাকাই উত্তম।

এজন্যে আমি যা কিছু করেছি এবং বলেছি, খুব ভালভাবে বুঝে শুনে করেছি এবং বলেছি। আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে আবেগের বশবর্তী হয়ে আমি কোনো কাজ করিনি এবং কোনো কথা বলিনি। আমার বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ আমি মেপেজুকে বলেছি এবং একথা মনে রেখেই বলেছি যে, এজন্যে আল্লাহ্‌র কাছেই আমাকে হিসেব দিতে হবে, বান্দাহ্‌র কাছে নয়। আমি যে, সত্যের বিপরীত কোনো কথা বলিনি সে বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। আমি এ বিষয়েও নিশ্চিন্ত যে, খিদমতে দ্বীনের সে অধ্যায়ে এ কথাগুলো অতি জরুরী ছিলো। এ কথাগুলো বলার কারণে নয়, বরং না বললে আল্লাহ্‌র পাকড়াওর আশংকা আমার ছিলো। এখন আপনি যা কিছু লিখেছেন, তাতে এমন কোনো জিনিস নেই যে সম্পর্কে আমার মতের কোনো সংশোধন করার প্রয়োজন আছে।

আমি সাক্ষাতেও আপনাকে বলেছি, এখন লিখেও জানাচ্ছি, আমি দ্বীন সম্পর্কে যতটুকু বুঝেছি এবং শরীয়ত সম্পর্কে আমার যেটুকু ইলম আছে, তার ভিত্তিতে আমার জন্যে এটা ফরয মনে করি যে, শুধু আমার কথায় নয় বরং আমার কাজেও সেইসব ভ্রান্তির সংশোধন আমাকে করতে হবে, শরীয়ত সম্পর্কে লোকদের মধ্যে যেসব ভ্রান্তি ছড়িয়ে আছে। লোকদের বিদ্রুপের ভয়ে নিজেকে লোকদের ইচ্ছা মতো সাজানো এবং তারা যেটাকে শরীয়তের আসল দাবী মনে করছে, সেটাই শরীয়তের মূল দাবী, তাদেরকে এই ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত করা আমার দৃষ্টিতে গুনাহ। উসওয়া, সুন্নাত এবং বিদআত প্রভৃতি পরিভাষার যেসব

অর্থ আপনাদের সেদিকে সাধারণভাবে প্রচলিত রয়েছে সেগুলোকে আমি ভ্রান্ত, বরং দ্বীনের বিকৃতিকারী মনে করি। 'রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতো লম্বা দাড়ি রেখেছেন তত লম্বা দাড়ি রাখাই হলো সুন্নাতে রসূল বা উসওয়ায়ে রসূল', আপনার এ ধারণার অর্থ এই দাঁড়ায় যে আপনি রসূলের অভ্যাসকে হুবহু রসূলের সেই সুন্নাতের সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করেছেন, যা জারি ও প্রতিষ্ঠা করার জন্যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামএবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম প্রেরিত হয়েছিলেন। আমার মতে এটা যে সুন্নাতের সঠিক সংজ্ঞা নয় শুধু তাই নয়, বরঞ্চ এ সম্পর্কে আমার আকীদাই হলো, এ ধরনের জিনিসকে সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করা এবং তার অনুসরণের জন্যে বাড়াবাড়ি করা একটা মারাত্মক ধরনের বিদআত এবং এটা দ্বীনের একটা বিপজ্জনক বিকৃতি যার মন্দ পরিণতি পূর্বেও প্রকাশিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতেও প্রকাশ হওয়ার আশংকা রয়েছে।

আমার এ মতের সাথে একমত না হওয়ার এখতিয়ার আপনার রয়েছে। যেহেতু আমি কুরআন সুন্নাহর অধ্যয়নের ভিত্তিতে আমার রায় প্রতিষ্ঠিত করেছি, সেহেতু আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানের বিপরীত আপনাদের ধারণাগত সুন্নাত অবলম্বনের দাবী আমার কাছে করা ঠিক নয়। আপনাদের এ দাবী মেনে না নেয়ার কারণে আপনারা যখন আমাকে এ আশংকার কথা বলেন যে, এতে করে লোকেরা আমার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবে এবং আমাদের দাওয়াত কবুল করার ক্ষেত্রে এটা তাদের জন্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে, তখন আমার মনে হয় যেনো আপনারা আমার 'দাওয়াত ইলাল্লাহর' জবাবে উল্টা আমাকে 'দাওয়াত ইলান নাস' দিতে চাচ্ছেন। যাদের সত্য এবং অসত্যের মধ্যে পার্থক্য করার মতো বিবেক নেই, যারা একথাটা বুঝতে পারেছনা যে, আমি তাদেরকে যে জিনিসের প্রতি ডাকছি, দ্বীন ইসলামে তার গুরুত্ব কি আর যেসব কারণে তারা আমার দাওয়াত কবুল করতে দ্বিধা সংকোচ কিংবা অস্বীকার করছে দ্বীন ইসলামে সেগুলোর গুরুত্ব কতটুকু? এ ধরনের সত্যবিমুখ আত্মপূজারী লোকদের ইসলামে কতটুকু গুরুত্ব রয়েছে যে, তাদের আবেগ ও খেয়াল খুশীর তোয়াক্কা করতে হবে? তরজমানুল কুরআন ঃ মার্চ-জুন ১৯৪৫ ইং।

সুন্নাত এবং অভ্যাসের নীতিগত পার্থক্য

প্রশ্ন ঃ তাকওয়ার বাহ্যিক প্রদর্শন সম্পর্কে আপনি আপনার মতের উপর অটল থেকে সুন্নাত ও বিদআত সম্পর্কে বলেছেন ঃ

"সুন্নাত, বিদআত প্রভৃতি পরিভাষার যেসব অর্থ আপনাদের সেদিকে প্রচলিত রয়েছে, সেগুলোকে আমি ভ্রান্ত বরং দ্বীনের বিকৃতি মনে করি।" বিষয়টা আসলে মৌলিক। যদি বিষয়টার সন্তোষজনক ফায়সালা হয়ে যায় তবে অনেক খুঁটিনাটি

বিষয়ের বরঞ্চ অধিকাংশ ঝগড়া বিবাদের এবং মানসিক উদ্বিগ্নতার অবসান ঘটবে। সুতরাং সুন্নাত ও অভ্যাসের সংজ্ঞা এবং বিদআত সম্পর্কে আপনার বিশ্লেষণ জানিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

আপনার নিম্নোক্ত বক্তব্য আরো স্পষ্ট করে বললে ভাল হয় ঃ

"রসূল যতোবড় দাড়ি রেখেছেন, ততো লম্বা দাড়ি রাখাই হলো সুন্নাতে রসূল বা উসওয়ায়ে রসূল, আপনার এ ধারণার অর্থ দাঁড়ায় যে আপনি রসূলের অভ্যাসকে হুবহু রসূলের সেই সুন্নাতের মর্যাদাসম্পন্ন মনে করেছেন যা জারি ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম প্রেরিত হয়েছিলেন।" আমার প্রকৃত অবস্থা আপনার এ বক্তব্যের অনুরূপ নয়। যদিও আমি সাধারণভাবে দাড়ি নিচের দিকে ছেড়ে দেয়াকে সুন্নাতে রসূল বলে মনে করি, কিন্তু এটাকে দশ বছর আগেও রসূল আগমনের উদ্দেশ্য বলে মনে করতামনা এবং এখনো এই ভ্রান্ত ধারণায় নিমজ্জিত নই। আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমনের উদ্দেশ্য কেবল একটিই মাত্র। আর তা হলো, ইকামতে দ্বীন বা দ্বীনের প্রতিষ্ঠা কিংবা খোদার আনুগত্যের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা। এছাড়া দ্বীনের অন্যান্য বিষয় মর্যাদা অনুযায়ী গুরুত্বপূর্ণ। দ্বীন প্রতিষ্ঠার যে সুন্নাত, শরয়ীতের অন্য কোনো ফরযই তার চাইতে গুরুত্বপূর্ণ নয়, এমনকি কা'বা ঘরের নির্মাণ কাজ এবং হাজীদের পানি পান করানোর কাজও নয়। আমার মতে এটাই হলো সেই সুন্নাত যার পুনরুজ্জীবন কাজকে একশত শহীদের সমান পুরস্কার লাভের যোগ্য বলে অভিহিত করা হয়েছে। হাঁ দাড়ি লম্বা করাসহ রসূলে খোদার অন্যান্য ব্যক্তিগত আদর্শসমূহকে আমি শরয়ী দায়িত্ব ও কর্তব্যের চাইতে কম গুরুত্বপূর্ণই মনে করি। আর এই কম গুরুত্বপূর্ণ (দাড়ির) জিনিসটাই সীনার উপর পর্যন্ত রাখার বিষয়ে আপনার মতামত জানাবেন।

জবাব ঃ *লোকেরা সাধারণত মনে করে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে যা কিছু করেছেন, তা সবই সুন্নাত। কিন্তু এ ধারণা অনেকটা সঠিক হওয়া সত্ত্বেও কিছুটা ভ্রান্ত। প্রকৃতপক্ষে সুন্নাত হলো সেইসব কর্মপন্থা ও কর্মনীতি যা শিখাতে এবং চালু করতে আল্লাহ তায়ালা তাঁর নবীকে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু ঐসব জিনিস সুন্নাত নয়, যা তিনি একজন মানুষ হবার কারণে এবং ইতিহাসের বিশেষ অধ্যায়ে জন্মগ্রহণ করার কারণে অবলম্বন করেছিলেন। এই উভয় জিনিস কখনো একই আমলে সংমিশ্রিত হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সেই আমলের কোন্ অংশ সুন্নাত আর কোন্ অংশ অভ্যাস বা আদত*

তা পার্থক্য করতে পারার উপরই নির্ভর করে কোনো ব্যক্তি সঠিকভাবে দ্বীনের মেযাজ বুঝতে পারল কিনা।

নীতিগতভাবে বুঝে নিন যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম মানুষকে উত্তম চরিত্র এবং জীবন যাপনের সেই নিয়ম পন্থা শিক্ষাদানের জন্যে আগমন করেছিলেন, যা ছিলো - فطرة الله التى فطر الناس عليها - এর উদ্দেশ্য মোতাবেক। এ সৎ চরিত্র ও প্রাকৃতিক নিয়মের একটি তো হলো মূল বা রূহ আর দ্বিতীয়টির মর্যাদা হলো, দেহ বা আবরণের। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রূহ এবং আবরণ উভয়টা একই রকম গুরুত্বের দাবী রাখে, যা নাকি নবী তাঁর কথা ও কাজ দ্বারা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেন। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্বভাব ও নৈতিকতার প্রাণসত্তার জন্যে নবী তাঁর বিশেষ তমদ্দুনিক পরিবেশ এবং বিশেষ স্বভাব প্রকৃতির ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধরনের বাহ্যিক আচরণ অবলম্বন করেন। এ অবস্থায় আমাদের থেকে শরীয়তের দাবী শুধু এতোটুকুই হয়ে থাকে যে, আমরা কেবল স্বভাব ও নৈতিকতার প্রাণসত্তাকেই গ্রহণ করবো। এমতাবস্থায় নবী যে বাহ্যিক আবরণ অবলম্বন করেছেন, আমাদের তা অবলম্বন করা বা না করার ক্ষেত্রে শরয়ী আযাদী রয়েছে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে সুন্নাত হলো প্রাণসত্তা এবং বাহ্যিক আবরণ উভয়টার সমষ্টির নাম এবং এক্ষেত্রে উভয়টাই সমান গুরুত্বের অধিকারী হয়ে থাকে। আর শেষোক্ত ক্ষেত্রে সুন্নাত কেবল স্বভাব ও নৈতিকতার প্রাণসত্তাটাই হয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রাণসত্তাই শরীয়তের দাবী হয়ে থাকে, সেই বাহ্যিক আবরণ নয় যা শরীয়ত প্রণেতা প্রাণসত্তা প্রকাশের জন্যে অবলম্বন করেছিলেন।

যেমন ধরুন, দ্বীনের দাবী হচ্ছে আমরা আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর যিকর করবো। এ উদ্দেশ্যে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন আমল অবলম্বন করেছেন, যার প্রাণসত্তা এবং বাহ্যিক আবরণ উভয়টাই সুন্নাত এবং উভয়ের অনুসরণ অনুবর্তনই আমাদের জন্যে অবশ্য কর্তব্য। যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত প্রভৃতি। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন পন্থা অবলম্বন করেছেন, যার প্রাণসত্তার উপর আমল করা আমাদের জন্যে আবশ্যক বটে, কিন্তু বাহ্যিক আবরণের হুবহু অনুকরণ করা জরুরী নয়, বরঞ্চ প্রাণসত্তার প্রকাশের জন্যে আমরা যেরূপ আবরণ উপযুক্ত মনে করি অবলম্বন করতে পারি। যেমন দোয়া এবং সেসব সাধারণ যিকর যা নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্ন সময় করতেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করে দোয়া করতেন হুবহু সেগুলো ব্যবহার করে দোয়া করা আমাদের জন্যে জরুরী নয়। তবে সুন্নাতের অনুবর্তনের দাবী হলো, আমরা আমাদের

দোয়ার ক্ষেত্রে নবীপাকের দোয়ার পন্থা এবং অর্থগত বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখবো এবং সেই সব শব্দ প্রয়োগ করেও দোয়া করবো যেগুলোতে নবীপাকের দোয়ার রূহ বর্তমান। তেমনি করে যিকরের দাবী হলো, মানুষ জীবনের সার্বিক অবস্থা ও কাজে আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করবে। তাঁর নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করবে, তাঁর সাহায্য কামনা করবে এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। এ সুন্নাত নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর আমলী যিন্দেগীতে বিভিন্ন ধরনের যিকরের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন যা হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। এখন কোনো ব্যক্তি যদি সেগুলো হুবহু মুখস্ত করে এবং হাদীসে উল্লেখিত পন্থানুযায়ী সেগুলো আমল করে তবে তা উত্তম এবং মুস্তাহাব হতে পারে। কিন্তু সেটাকে সুন্নাতের অনুবর্তনের আবশ্যিক দাবী বলা যেতে পারেনা। কোনো ব্যক্তি যদি এই সুন্নাতকে ভালভাবে মুখস্ত করে নিয়ে অন্য কোনো পন্থায় তার উপর আমল করে এবং ভিন্ন শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করে, তবুও তা সুন্নাতেরই অনুবর্তন ও অনুসরণ বলে গণ্য হবে। এ জন্যে তার উপর সুন্নাতের খেলাফ কাজ করার দোষারোপ করা যেতে পারেনা।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও অনুরূপ পার্থক্য রয়েছে। যেমন, পোষাকের ক্ষেত্রে যেসব নৈতিক ও প্রাকৃতিক সীমা সংরক্ষণ নবী প্রেরণের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিলো তা হলো, পোষাক সতর হিফাযতকারী হবে, অপব্যয়কারী হবেনা, অহংকার প্রকাশক হবেনা, কাফিরদের অনুকরণে হবেনা প্রভৃতি। নৈতিকতার এ প্রাণসত্তা ও প্রকৃতির প্রকাশ নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে পোষাক দ্বারা করেছিলেন, তন্মধ্যে কোনো কোনো জিনিস তো এমন রয়েছে যা হুবহু অনুবর্তন করতে হবে। যেমন সতর সংরক্ষণ, পরিধেয় বস্ত্র টাখনু গিরার নিচে ঝুলিয়ে না দেয়া এবং রেশমী পোষাক ব্যবহার না করা প্রভৃতি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে কোনো কোনো জিনিস এমন রয়েছে, যা নাকি নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিগত মেযাজ এবং সমকালীন সমাজ ও তমদ্দুনের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোকে সুন্নাত বানানো রিসালাতের উদ্দেশ্য ছিলনা। বস্তুত কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত রুচি বা কোনো বিশেষ কওমের সংস্কৃতি কিংবা কোনো বিশেষ যুগের রসম রেওয়াজকে সারা দুনিয়ার মানুষের জন্যে চিরদিনের তরে সুন্নাত বানিয়ে দেবার জন্যে খোদায়ী শরীয়ত আগমন করেনি।

সুন্নাতের এ ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করলে খুব সহজেই বুঝে আসতে পারে যে, যেসব জিনিস শরীয়তের পরিভাষায় সুন্নাত নয় সেগুলোকে শুধু শুধু সুন্নাত আখ্যা দেয়া সেইসব বিদআতের অন্তর্ভুক্ত যেগুলো দ্বারা দ্বীনের কাঠামোর মধ্যে বিকৃতি আসে।

আসুন, এবার বিশেষভাবে সেই দাড়ি নিয়ে আলোচনা করা যাক, যেজন্যে এ আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাদের আমলী যিন্দেগীতে আখলাক ও ফিতরতের যে রূহ দেখতে চান, তা কেবল এই যে, মোচ ছোট করতে হবে এবং দাড়ি বড় করতে হবে। নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ নির্দেশই আমাদের দিয়েছেন আর এটাই হচ্ছে সুন্নাত। এখন প্রশ্ন থাকে, দাড়ি কতটুকু লম্বা রাখতে হবে? এ সম্পর্কে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু বলে যাননি। অথচ তিনি দাড়ি লম্বা করার পরিমাণ এবং মোচ ছোট করার পরিমাণ বলে যেতে পারতেন। কিংবা অন্তত একথা বলে যেতে পারতেন যে, আমার দাড়ি ও মোচ যে পরিমাণের তোমরাও ঠিক সে পরিমাণ রাখবে। যেমন তিনি নামায সম্পর্কে বলে গেছেন যে, 'ঠিক আমার মতো করে নামায পড়ো'। এখন তিনি এ ব্যাপারে কোনো সীমা নির্ধারণ করে দেননি এবং শুধুমাত্র একটা সাধারণ নির্দেশই দিয়ে গেছেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই একথা বুঝা যায় যে, এ ব্যাপারে প্রকৃতি ও নৈতিকতার মূল দাবী পূরণের জন্যে এতোটুকুই যথেষ্ট ও জরুরী যে, দাড়ি রাখতে হবে এবং মোচ ছোট করতে হবে। এ সাথে এগুলোর পরিমাণ নির্ধারণের যদি কোনো প্রয়োজন থাকতো এবং তা যদি নবীপাকের মিশনের কোনো অংশ হতো, তবে তা নির্ধারণের ব্যাপারে তিনি কখনো কার্পণ্য করতেননা। সাধারণ নির্দেশকে যথেষ্ট মনে করা এবং পরিমাণ নির্ধারণ থেকে বিরত থাকা দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই একথার প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এ সম্পর্কে শরীয়ত লোকদের আযাদী দিতে চায়, তারা নিজেদের রুচি ও আকৃতি অনুযায়ী দাড়ি লম্বা করা ও মোচ খাটো করার ব্যাপারে যে কোনো পরিমাণ অবলম্বন করতে পারে।

এখন যদি কোনো ব্যক্তি গোঁফ কামিয়ে ফেলে এবং অপর ব্যক্তি কেবল এতোটা পরিমাণ মোচ ছেঁটে ফেলে, যাতে করে পানাহারে মোচের স্পর্শ না লাগে, তবে এ উভয় ব্যক্তির জন্যেই নিজ নিজ আমল করে যাওয়ার স্বাধীনতা রয়েছে। এরা উভয়ই নিজের সম্পর্কে বলতে পারে যে, আমার অবলম্বিত পন্থায় শরীয়তের উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে। কিন্তু নিজের মতকে সকল মানুষের জন্যে শরীয়ত বানাবার চেষ্টা করার এবং তাদের মতের খিলাফ আমল করার জন্যে অন্য লোকদের তিরস্কার করবার অধিকার তাদের কারোই নেই। তারা যদি নিজ মতকে শরীয়ত বানাবার চেষ্টা করে এবং ভিন্নরকম আমল করার কারণে অন্য লোকদের তিরস্কার করে, তবে এটা হবে 'বিদআত'। কেননা যা মূলত সুন্নাত নয়, সে জোর জবরদস্তি সেটাকে সুন্নাত বানাবার চেষ্টা করছে। মোচ খাটো করা হচ্ছে সুন্নাত। এ ক্ষেত্রে এমন কোনো বিশেষ পরিমাণ সুন্নাত নয়, যা কোনো ব্যক্তি নিজের গবেষণা ইজতেহাদ কিংবা রুচি মাফিক অবলম্বন করে।

তেমনি করে দাড়ি সম্পর্কেও একই কথা। কোনো ব্যক্তি ইচ্ছা করলে দাড়ি লম্বা করে নিচের দিকে ছেড়ে দিতে পারে এবং সে নিজের এ মতের উপর নিজে আমল করে যেতে পারে। আবার অন্য ব্যক্তি অন্তত এক মুষ্টি লম্বা করাকে শরীয়তের উদ্দেশ্য পুরণের জন্যে জরুরী মনে করতে পারে এবং সে নিজের এ মতের উপর আমল করতে পারে। আবার কোনো ব্যক্তি পরিমাণ নির্ধারণ না করে কেবল দাড়ি রাখাকে শরীয়তের উদ্দেশ্য পূরণের জন্যে যথেষ্ট মনে করে তার উপর আমল করতে পারে। এই তিন প্রকার লোকের কারোই একথা বলার অধিকার নেই যে, গবেষণা ইজতেহাদ দ্বারা আমি যে মত কায়েম করেছি সেটাই শরীয়ত এবং সকলের জন্যে সে মতের অনুসরণ করা জরুরী। এমনটি করার অর্থ হলো, সেই জিনিসকে সুন্নাত বলে আখ্যায়িত করা, যা সুন্নাত হবার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ নেই। এ জিনিসকেই বলা হয় বিদআত।

এবার সেই দলিল সম্পর্কে কথা বলা যাক, যাতে বলা হয়েছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়ে নিজেই একটা বিশেষ পদ্ধতিতে দাড়ি রেখে তার বাস্তব নমুনা দেখিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাড়ির যে পরিমাণ বর্ণিত হয়েছে, অনুরূপ দাড়ি রাখাই সুন্নাত। এই দলিল ঠিক সে রকম যেমন কোনো ব্যক্তি দাবী করলো যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোপন অংশ ঢাকার (সতর) নির্দেশ দিয়েছেন এবং এক বিশেষ পদ্ধতির লেবাস পরিধান করে তার বাস্তব নমুনা দেখিয়ে দিয়েছেন, সুতরাং ঠিক সেই ধরনের পোষাক পরিধান করাটাই সুন্নাত।

এই দলিল যদি সঠিক হয়ে থাকে, তবে আমার দৃষ্টিতে বর্তমান যুগের সুন্নাত অনুসারীদের কেউই উক্ত সুন্নাতের অনুসরণ করছেনা। আমি আগেই বলেছি এবং পুনরায় বলছি যে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটি জিনিস হলো সেই নৈতিক মূলনীতি যা জারি করার জন্যে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরীফ এনেছেন। দ্বিতীয় জিনিসটি হলো বাহ্যিক আমল, যেগুলোকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেসব মূলনীতির অনুবর্তনের জন্যে নিজ যিন্দেগীতে কর্মকৌশল হিসেবে অবলম্বন করেছিলেন। এ বাহ্যিক আমলের কিছু অংশ ছিলো নবীপাকের ব্যক্তিগত রুচি ও স্বভাবগত পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতে। কিছু অংশ ছিলো সেই দেশ ও সমাজের প্রেক্ষাপটে যেখানে তিনি পয়দা হয়েছেন। আর কিছু অংশ ছিলো সেই যুগ পরিবেশের প্রভাবজাত, যে যুগ ও পরিবেশে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন। এর কোনটিকেই সকল ব্যক্তি, সকল জাতি ও গোটা মানবগোষ্ঠীর জন্যে সুন্নাত বানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য ছিলনা। তরজমানুল কুরআন ঃ জানুয়ারী ১৯৪৬ ইং।

সাধারণ বিষয়

যুদ্ধাপরাধীর বিচার

প্রশ্ন ঃ *আজকাল যুদ্ধাপরাধীদের (War Criminals) থেকে তাদের অপরাধের প্রতিশোধ গ্রহণ করার প্রচলন দেখা যায়। এ বিষয়ে ইসলামের বিধান কি?*

জবাব ঃ *এই 'যুদ্ধাপরাধী' পরিভাষাটি এক বিস্ময়কর পরিভাষা। বর্তমান যুগে ইউরোপের কূটনৈতিক চরিত্র পরিভাষাটি আবিষ্কার করেছে। কোনো একটি জাতির সাথে কেবলমাত্র জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্যে যে লড়াই হয়েছে, তাতে বিজয় লাভ করার পর বিজিত জাতির সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ থেকে প্রতিশোধ নেয়ার উন্মাদনা ছাড়া এর মূলে অন্য কোনো যৌক্তিকতা নেই।*

উভয় পক্ষই নেতৃত্ব ও স্বার্থ লাভের জন্যে যুদ্ধ করেছে।[১] *এক পক্ষ আগেই দুনিয়ার উপর জেঁকে বসেছিল। এখন তারা তাদের এই কবজা এবং সেইসব স্বার্থ সংরক্ষণ করতে চায় যা জোর যুলুম করে কবজা করার বদৌলতে লাভ করেছে। দ্বিতীয় পক্ষ পরে এসেছে। তারা প্রথম পক্ষের আধিপত্য ও নেতৃত্বকে নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের পথে প্রতিবন্ধক দেখতে পায় এবং তা দূর করার জন্যে ময়দানে অবতীর্ণ হয়। এ দিক থেকে কোনো পক্ষের যুদ্ধই পবিত্র নৈতিক উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলনা। কিন্তু এখন এক পক্ষ যখন বিজয় লাভ করলো, তখন তারা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিশোধোন্মুখ হয়ে উঠলো শুধুমাত্র এ কারণে যে, প্রতিপক্ষ কেন তাদের নেতৃত্ব ও আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করলো! এখন তারা তাদের এ প্রতিশোধোন্মাদনাকে নৈতিক রং লাগিয়ে বলতে শুরু করলো যে, আমরা নই, বরং আমাদের প্রতিপক্ষরাই ডাকাত বদমাশ। সারা দুনিয়ায় তারা শান্তি ও নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটিয়েছে (যেনো তারা নিজেরা কখনো নিরাপত্তার বিঘ্ন ঘটায়নি)। তারা অসামরিক লোকদের উপর যুলুম করেছে (যেনো তাদের দ্বারা কখনো কোনো যুলুম সংঘটিত হয়নি)। তারা চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভংগ করেছে (যেনো তারা নিজেরা চিরদিন চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে আসছে)। সুতরাং তাদের বড় বড় নেতা ও কমান্ডাররা অপরাধী। তাদেরকে যুদ্ধবন্দী করার পরিবর্তে নৈতিক অপরাধী হিসেবে শাস্তি দিতে হবে। অথচ বাস্তবে এরা নিজেরা যে জাতীয়তাবাদী আবেগের বশবর্তী এবং এদের নেতারা যেরূপ জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছে অপর পক্ষও একই রকম জাতীয়তাবাদী আবেগের বশবর্তী ছিলো এবং একই ভাবে নিজ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছে। এ*

---

১. *এখানে মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথাই আলোচনা হচ্ছে- অনুবাদক*

প্রচেষ্টায় উভয় পক্ষ যেসব পন্থা অবলম্বন করেছে, নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য ছিলনা। এখন বিজয়ী পক্ষের আসল উদ্দেশ্য হলো, প্রতিপক্ষের সেই সব লোকদের শেষ করে দেয়া, যারা নিজ লোকদের জাতীয়তাবাদী আবেগকে উদ্বেলিত করতে, জাতিকে সুসংগঠিত করতে এবং সমস্ত সাজ সরঞ্জামের উন্নতি সাধন করে মুকাবিলার ময়দানে ব্যবহার করতে সক্ষম। এদেরকে তারা এজন্যে শেষ করে দিতে চায় যেনো সে জাতি তাদের নেতৃত্ব মেনে নেয় এবং তাদের আধিপত্যকে চ্যালেঞ্জ করার যোগ্য না হতে পারে। কিন্তু এই নিরেট প্রতিশোধোন্মাদনাকে মূলত তারা নৈতিক বিচারের মনোহরী আবরণে ধামাচাপা দেয়ারই চেষ্টা করে।

এক পক্ষ বিজয়ী হবার পর যেমন এই নৈতিক বিচারের প্রহসন চালানো হয়, অপর পক্ষ বিজয়ী হলে ঠিক তেমনি আচরণ তারাও করে। এটা একটা নিকৃষ্ট ধরনের নৈতিক ধোঁকা ও ষড়যন্ত্র। আমি বিস্মিত যে, বর্তমান সভ্যতা পৃথিবীর বড় বড় সভ্য ও ক্ষমতাবান জাতিগুলোর শাসকদের মধ্যে কতোটা নিকৃষ্ট ধরনের লজ্জাহীনতা সৃষ্টি করে দিয়েছে। তাদের বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকরা নিজেদের নৈতিক অনুভূতিকে কতোটা ভোঁতা করে নিয়েছে যে, তারা প্রকাশ্যে ধোঁকা ও প্রতারণামূলক কথাবার্তা বলে বেড়াচ্ছে; অথচ তাদের মধ্যে কোনো প্রকার লজ্জা শরমের অনুভূতিটা পর্যন্ত নেই। যিনি ইনসাফের সামান্যতম অর্থও বুঝেন, এমন কোনো বুদ্ধি ও বিবেকবান ব্যক্তি কি করে এমনটি ধারণা করতে পারেন যে, যুদ্ধের এক পক্ষ বিচারকের আসনে বসে অপর পক্ষের সাথে বাস্তবেই কোনো প্রকার ইনসাফ করতে সক্ষম? ব্যক্তিগত জীবনে যখন এক পক্ষ অপর পক্ষের বিচারক হতে পারেনা, তখন জাতীয় জীবনে একটি সামরিক পক্ষ অপর সামরিক পক্ষের বিচারক কেমন করে হতে পারে?

আপনি জানতে চেয়েছেন, এ বিষয়ে ইসলামের বিধান কি? আমি বলি, ইসলাম এ ধরনের ধোঁকা প্রতারণাকে ধোঁকা প্রতারণাই মনে করে। ইসলামের দৃষ্টিতে উভয় সামরিক পক্ষের পরস্পরের হাতে পরস্পরের যেসব লোক ধরা পড়ে তারা সকলেই যুদ্ধবন্দী। আর যুদ্ধবন্দীদের সম্পর্কে ইসলামের যাবতীয় বিধান আমি আমার 'আল জিহাদু ফীল ইসলাম' গ্রন্থে পরিষ্কারভাবে আলোচনা করেছি। যুদ্ধের পর বিচারাসনে বসে অপর পক্ষের বন্দীদের অপরাধী ঘোষণা করে নিজেরাই তাদের বিচার ফায়সালা শুরু করা একটা নিকৃষ্ট ধরনের নৈতিক লজ্জাহীনতা। আর ইসলাম হলো সেই জীবন ব্যবস্থা যা লজ্জাশীলতাকে কেবল নৈতিকতার অংগই বলেনি, বরঞ্চ ঈমানের অংগ বলে ঘোষণা করেছে। তরজমানুল কুরআন ঃ জুন ১৯৪৫ ইং।

ইসলামী সেনাবাহিনীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

প্রশ্ন ঃ *আজকাল সৈনিকদেরকে হাজার হাজার মাইল দূরে যুদ্ধক্ষেত্রে[১] যেতে হয় এবং অন্তত দু'বছরের আগে বাড়ীতে ফিরে আসা সম্ভব হয়না। এমতাবস্থায় তাদের দ্বারা জ্বিনা প্রভৃতি সামাজিক নোংরামী ছড়িয়ে পড়া অবধারিত। কেননা মানুষের যুদ্ধোন্মাদনার সাথে সাথে যাবতীয় পাশবিক আবেগও উত্তেজিত হয়ে উঠে। এমতাবস্থায় সৈনিকদের জন্যে রেজিষ্টার্ড বেশ্যা সরবরাহ করা হয় এবং তাদের মনকে উৎফুল্ল রাখার জন্যে WACI দফতরসমূহে বেশ্যাদেরকে চাকরানী হিসেবে রাখা হয়। ইসলামের দৃষ্টিতে এই উভয় পন্থাই ঘৃণ্য। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এই উভয় পদ্ধতিকে বর্জন করার পর এ সমস্যা সমাধানের জন্যে ইসলাম কোন্ পন্থা অবলম্বন করতে বলে? দাসী ব্যবহারের সিষ্টেম এই নোংরামীকে কতোটা দূর করতে সক্ষম? সেটাও কি এক ধরণের বৈধকৃত বেশ্যালয় (Prostitution) নয়।?*

জবাব ঃ *আপনার প্রশ্নে মধ্যে একটা জটিলতা রয়েছে, যা সম্ভবত প্রশ্ন করার সময় আপনি অনুভব করেননি। বর্তমান যুগের সামরিক বাহিনী এবং তাদের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য করে আপনি সমস্যার সমাধান চেয়েছেন ইসলামের আলোকে। অথচ ইসলাম যে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব গ্রহণ করে, তা হলো তার নিজের ফৌজ, এসব ফাসেক, ফাজের ও নির্লজ্জ ফৌজের নয়।*

বর্তমান যুগের সেনাবাহিনীর অবস্থাতো হলো এই যে, তাদেরকে কেবল যুদ্ধ করার জন্যই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যেসব শাসক এই সেনাবাহিনী গঠন করে, তাদের নিজেদের সামনেও কোনো পবিত্র নৈতিক উদ্দেশ্য থাকেনা। তারা যখন নিজেদের জাতীয় ফৌজ গঠন করে, তখন তাদের মধ্যে কেবল সেই চরিত্রই সৃষ্টি করার চেষ্টা করে যা তাদের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে প্রয়োজন। আর একথা পরিষ্কার যে, তাদের নৈতিক চরিত্রে পবিত্রতার কোনো স্থান নেই। তারা যদি নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্যে শাসিত ও পদানত জাতিগুলো থেকে সামরিক বাহিনী গঠন করে তখন তাদেরকে শুধুমাত্র সেই নৈতিক প্রশিক্ষণই দিয়ে থাকে, যা পালিত শিকারী কুকুরের মধ্যে সৃষ্টি করা হয়ে থাকে। অর্থাৎ তাকে মনিবের চরম অনুগত হতে হবে এবং কেবল মনিবেরই জন্যে শিকার করতে হবে, নিজের জন্যে নয়। এছাড়া অন্য কোনো নৈতিক গুরুত্ব এ তথাকথিত সভ্য জাতিগুলো কল্পনাই করতে পারেনা। তাছাড়া ব্যভিচার, মদ, জুয়া প্রভৃতি অনৈতিক কার্যক্রম তো তাদের নিচে থেকে উপর পর্যন্ত সর্বত্রই ছেয়ে

---

১. *প্রশ্নকর্তা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রতি ইংগিত করেছেন- অনুবাদক*

আছে। আর তাদের নৈতিক দৃষ্টিকোণ তো হলো," "হেসে খেলে জীবনটা যদি চলে যায়!" এমতাবস্থায় তাদের সামরিক বাহিনীতে কোনো প্রকার নৈতিক শৃংখলা পাওয়া যাওয়ার কোনো কারণই থাকতে পারেনা।

এ কারণেই তাদের সামরিক বাহিনী যুদ্ধবিদ্যায় উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যায় বটে, কিন্তু নৈতিক পবিত্রতার দৃষ্টিকোণ থেকে তারা অকল্পনীয় নিকৃষ্ট স্তরে নেমে যায়। খাবার জন্যে তাদেরকে অঢেল রেশন দেয়া হয়, পানের জন্যে সব সময় মদের বোতল খোলা রাখা হয়, খরচ করার জন্যে যথেষ্ট পয়সা দেয়া হয়। সর্বোপরি যেখানে যেভাবে সম্ভব কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্যে তাদেরকে ষাঁড়ের মত ছেড়ে দেয়া হয়। শাসকরা স্বয়ং নিজেদের জন্যেই বেশ্যালয় গড়ে তোলে। তারা তরুণী যুবতীদের মধ্যে এ জযবা সৃষ্টি করে যে, তারা জাতির জন্যে যুদ্ধরত সৈনিকদের স্বার্থে স্বেচ্ছায় নিজেদের দেহ দিতে রাজী হলে সেটাকে জাতির জন্যে তাদের ত্যাগ ও কুরবানী বলে গণ্য করা হবে। এ ভাবেও যখন এই নরপশুদের কামনা প্রশমিত হয়না তখন যেখানে যেভাবে পারে নারীদের দেহ ক্রয় করে। এছাড়া তাদেরকে বলপূর্বক ধর্ষণ করার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যে সামরিক বাহিনীকে এভাবে গড়ে তোলা হয়, তারা যখন কোনো বিজিত দেশে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করার সুযোগ পায়, তখন খোদাই জানেন সেখানে তারা নিজেদের পাশবিক লালসা চরিতার্থ করার জন্য কি কিয়ামতের দৃশ্য সৃষ্টি করে।

এখন আপনি নিজেই বলুন, এ ধরনের সামরিক বাহিনীর সমস্যা এবং তাদের প্রয়োজন মেটানোর সমাধান ইসলাম কেমন করে বলতে পারে? এদেরকে তৈরি করেছে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী চরিত্র আর তাদের নির্লজ্জ সমস্যার সমাধানও তারাই দিতে পারে। ইসলাম যে সামরিক বাহিনী তৈরি করে, তাদেরকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভূগোলের পৃষ্ঠা ছেঁড়া এবং জোড়ার জন্যে তৈরি করা হয়না। বরঞ্চ তাদেরকে এ জন্যে তৈরি করা হয় যে, জাতিসমূহ যদি খোদার আনুগত্য বিমুখ হয়ে পড়ে এবং দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে সঠিক পথে না আসে, তবে শক্তি প্রয়োগ করে তাদেরকে এতটা দুর্বল করে দিতে হবে যাতে করে তারা অন্তত অনাচার ও বিপর্যয় সৃষ্টি থেকে বিরত থাকে। এই নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে যে সেনাবাহিনী জিহাদ করে তাদের জিহাদ নফসের পথে নয়, বরঞ্চ আল্লাহর পথে হয়ে থাকে। এরা যুদ্ধের ময়দানে ইবাদতের সেই জযবা নিয়েই হাযির হয়, যে জযবা নিয়ে উপস্থিত হয় তারা মসজিদের আংগিনায়। তাছাড়া এ ময়দানে নামার পূর্বে আত্মশুদ্ধি ও নৈতিক পবিত্রতার একটি পূর্ণ প্রশিক্ষণ কোর্স তাদের পরিসমাপ্ত করতে হয়। খোদা বিমুখ লোকদেরকে খোদার পথে আনার পন্থা শেখানোর সাথে সাথে নিজেদের নফসকে খোদানুগত করার পন্থাও শেখানো হয়। যুদ্ধের ময়দানে প্রতিটি কদম খোদার কথা স্মরণ করে অগ্রসর

হবার প্রশিক্ষণ তাদের দেয়া হয়। তুমুল লড়াইর ময়দানে সময় মতো নামায আদায় এবং দিনের বেলা ঘোড়া বা ট্যাংকের পিঠে আর রাতের বেলা জায়নামাযে কাটানোর ট্রেনিং তাদের দেয়া হয়। একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, এই ধরনের প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যে ফৌজ, যারা একটি পবিত্র নৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে লড়াই করে, নিজেদের আকীদা অনুযায়ী গোটা যুদ্ধকালকে যারা ইবাদতকাল মনে করে, তাদের কামনা বাসনা আধুনিককালের বস্তুবাদী সেনাবাহিনীর কামনা বাসনার মতো কিছুতেই হতে পারেনা।

যদিও কোনো কোনো হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধকালে 'মোতা' বিয়ে জায়েয রেখেছিলেন (যা কিনা জাহেলী যুগে আরবের লোকেরা জায়েয মনে করতো), কিন্তু একথা প্রমাণিত সত্য যে, তিনি অচিরেই এ পন্থাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে দেন।

এটা ঠিক, যুদ্ধে যেসব নারী মুসলমানদের হাতে বন্দী হবে, তাদের সাথে সহবাস করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কিন্তু সেই ব্যক্তি চরম মুর্খ ছাড়া আর কিছু নয়, যে এর অর্থ এটা মনে করে যে, ইসলাম তার ফৌজকে ঐরূপই অনুমতি দিয়েছে, যেমন আধুনিক খোদা বিমুখ ফৌজ বিজিত দেশে প্রবেশ করে যেখানে যে নারীর নাগাল পায় স্বাধীনভাবে তার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। বস্তুত, ইসলাম যে অনুমতি দিয়েছে, তা দিয়েছে কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে ঃ

প্রথমত, নারীদের পাকড়াও করা যুদ্ধের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকবেনা। অর্থাৎ সেনাবাহিনীর পাশবিক কামনা বাসনা পুরণের জন্যে শত্রুপক্ষের নারীদেরকে ভেড়া বকরীর ন্যায় ধরে আনা যাবেনা। বরঞ্চ এ বিষয়ে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের কর্মনীতি থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায় যে, মাত্র দুইটি অবস্থায় নারীরা গ্রেফতার হতো। এর একটি হলো এই যে, তারা যদি শত্রুপক্ষের সেনাবাহিনীর সংগে অবস্থান করে, তবে সেনাবাহিনীর লোকদের গ্রেফতারীর সাথে সাথে তারাও গ্রেফতার হবে। দ্বিতীয়, যে অবস্থায় তাদের বন্দী করা হয় তা হলো, যখন কোনো নগরবাসী ইসলামী ফৌজের মুকাবিলা করে এবং ইসলামী ফৌজ যদি তুমুল লড়াইর মাধ্যমে উক্ত নগর পদানত করে, তখন ইসলামী বাহিনীর কমান্ডার ইচ্ছা করলে গোটা নগরবাসীকে গ্রেফতার করতে পারেন। এমতাবস্থায় যেসব নারী ও শিশুরা অভিভাবকহীন হয়ে পড়বে, ইসলামী ফৌজ তাদেরকে নিজেদের যিম্মায় গ্রহণ করতে পারবে।

উপরোক্ত দুইটি পন্থার যে কোনো পন্থায় নারীরা ইসলামী বাহিনীর হস্তগত হোকনা কেন, তাদের কোনো সদস্য ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো নারীকে স্পর্শ করতে পারবেনা, যতোক্ষণ না ইসলামী সরকার নারীদেরকে দাসী বানানোর সিদ্ধান্ত

নেয় এবং সৈনিকদের মধ্যে নিয়ম মাফিক তাদেরকে বন্টন করে দেয়া হয়। আর তাদেরকে দাসী বানানোর সিদ্ধান্ত কেবল তখনই নেয়া যাবে যখন বিজিত পক্ষের সাথে 'ফিদিয়া' প্রদান কিংবা বন্দী বিনিময়ের কোনো ফায়সালায় উপনীত হওয়া না যায়।

এভাবে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিয়ম মাফিক কোনো নারীকে কোনো ব্যক্তির মালিকানায় দিয়ে দেয়া হলে কেবলমাত্র সেই ব্যক্তিই উক্ত নারীর সাথে সহবাস করতে পারবে। সেই ব্যক্তির জন্যও আইন হলো, তিনি এক হায়েয পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন, যাতে করে মহিলাটি গর্ভবতী কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। যদি গর্ভবতী বলে প্রমাণিত হয়, তবে তাকে ডেলিভারী পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে সেই লোক এ নারীর সাথে সহবাস করার অধিকার রাখেনা।

এ পন্থায় যে নারীকে কোনো ব্যক্তির মালিকানায় দেয়া হবে সে যদি তার সাথে সহবাস করে এবং তার গর্ভ থেকে সন্তান পয়দা হয়, তবে সে সন্তান ঐ ব্যক্তির বৈধ সন্তান বলে বিবেচিত হবে এবং তার উত্তরাধিকারী হবে। মা হয়ে যাবার পর সে মহিলাটিকে আর বিক্রি করতে পারবেনা এবং তার মৃত্যুর পর মহিলাটি স্বাভাবিকভাবে মুক্ত হয়ে যাবে।

যুদ্ধবন্দী নারীদের ব্যাপারে এটাই ইসলামের প্রকৃত আইন। এ আইন জানার পর কোনো ব্যক্তি বলতে পারেনা যে, যুদ্ধাবস্থায় ইসলাম তার ফৌজের পাশবিক কামনা পূরণের জন্যে তাদেরকে সামান্যতম নৈতিক বন্ধন মুক্ত করে দেয়। এর বিপরীত ইসলাম তো তার সেনাবাহিনীর উপর আরো অধিক কড়াকড়ি নিয়ন্ত্রণারোপ করে, যেনো বৈধ সম্পর্ক স্থাপনের সময় আসা পর্যন্ত তারা নিজেদের নফসকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেই সময় আসতে যতোই দেরী হোকনা কেন?

অপরদিকে হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের বাণী অধ্যয়ন থেকে জানা যায় যে, মানসিক দুর্বলতার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্যে ইসলামী রাষ্ট্রের এটাও দায়িত্ব যে, তার সৈনিকরা যেনো দীর্ঘকাল স্ত্রীদের থেকে দূরে অবস্থান করে এবং তাদের স্ত্রীরা দীর্ঘকাল স্বামীদের থেকে পৃথক থেকে অনৈতিক কার্যকলাপে নিমজ্জিত না হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে সকলকে সতর্ক করে দিয়ে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

"যারা যুদ্ধে গমন করেনি, তাদের জন্যে মুজাহিদদের স্ত্রীরা তেমনি হারাম, যেমন হারাম নিজ মাতা।"

তিনি অন্যত্র বলেছেন ঃ

"যারা যুদ্ধে গমন করেনি, এমন লোকদের কোনো ব্যক্তি যদি কোনো মুজাহিদের পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়, অতপর দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে খিয়ানত করে বসে, এমন ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন দাঁড় করানো হবে এবং সেই মুজাহিদকে এই ব্যক্তির আমল থেকে যা ইচ্ছা নিয়ে নেয়ার

অধিকার দেয়া হবে। সে তার সামান্য আমলও বাকী রেখে যাবে বলে তোমরা ধারণা করছ কি?"

এ কারণেই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু মদীনার দুটি সুন্দর যুবককে শহর থেকে স্থানান্তরিত করে দেন। কোনো কোনো নারীর মুখে যুবকদের সৌন্দর্যের প্রশংসা শুনে তিনি আশংকা করেছিলেন, এরা নারীদের জন্যে ফিতনার কারণ না হয়ে বসে, যেহেতু এ নারীদের স্বামীরা জিহাদের ময়দানে রয়েছে। এ কারণেই হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, যে ব্যক্তি কবিতায় কোনো নারীর প্রতি প্রেম প্রকাশ করবে, তাকে দোররা মারা হবে। একই কারণে হযরত উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু এক মুজাহিদের স্ত্রীকে স্বামী বিরহের গান গাইতে শুনে হুকুম জারি করলেন যে, এখন থেকে কোনো সৈনিককে স্ত্রী থেকে এতোটা দীর্ঘ সময় বিচ্ছিন্ন রাখা যাবেনা, যার ফলে তাদের অনৈতিক কাজে নিমজ্জিত হবার আশংকা দেখা দেবে। অন্য কথায়, ইসলামী রাষ্ট্র সেনাবাহিনীর জন্যে এ কারণেই ছুটি ও অবকাশের ব্যবস্থা চালু করেছে যে, সে তার সেনাবাহিনী ও তাদের স্ত্রীদের নৈতিকতার হিফাযত করতে চায়।

আপনি প্রশ্ন করেছেন, দাসীদের ব্যবহার করা কি এক ধরনের জায়েয করে নেয়া Prostitution ছিল না? আপনার এ প্রশ্নের জবাবে বলতে হচ্ছে, আপনি হয়তো Prostitution এর অর্থই জানেননা, অথবা দাসী ব্যবহারের ইসলামী আইন আপনার জানা নেই। কোনো পুরুষ কোনো নারীর দেহ ভাড়া নিয়ে উপভোগ করাকে বেশ্যাগিরি বলা হয়। আজকাল তথাকথিত 'সভ্য সমাজে' এক নতুন ধরনের বেশ্যা প্রথা চালু হয়েছে। এটাকে 'সৌখিন বেশ্যাগিরি' (Amateurish prostitution) বলা হয়। এখনকার বেশ্যাগিরি ভাড়ার মাধ্যমে নয়, বরঞ্চ উপহার উপঢৌকন প্রদানের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এতে করে সমাজে এই তথাকথিত মহিলাদের সম্মান বদস্তুর কায়েম থাকে। এবার আপনি এ Prostitution এবং ইসলামী আইনে দাসী ব্যবহারের নিয়ম যা আমি উপরে আলোচনা করেছি, মিলিয়ে দেখুন। তরজমানুল কুরআন ঃ মার্চ-জুন ঃ ১৯৪৫ ইং

জনৈক হিন্দু ভদ্রলোকের চিঠি ও তার জবাব

প্রশ্ন ঃ দীর্ঘদিন পর চিঠি লিখছি। একটি বিশেষ চিন্তা ছিলো এই দীর্ঘ বিরতির কারণ। তা ছিলো, আপনার সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন করে নেয়া এবং তার উপর আপনার খেদমতে আমার মতামত পেশ করা। এখন আপনার গ্রন্থাবলী একবার পড়ে ফেলেছি। প্রকৃতপক্ষে নিজের মিশন সফল করার জন্যে একজন মানুষের মধ্যে যতোটা আন্তরিকতা থাকা সম্ভব, সে বিষয়ে আমি আপনাকে শ্রী ...... পরে প্রথম ও শেষ নেতা হিসেবে পেয়েছি। 'শেষ' শব্দটি আমি জেনে বুঝেই ব্যবহার করেছি। যে শ্রী ... জীকে আমি বর্তমান যুগে হিন্দুদের শ্রেষ্ঠতম

ব্যক্তিত্ব মনে করি, তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রতি পরম শ্রদ্ধা রাখা সত্ত্বেও আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, তাঁর মিশনের পূর্ণতা হিন্দু সম্প্রদায় পর্যন্ত গিয়েই সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু, হিন্দু জাতীয়তার মধ্যে কোন্ কোন্ মৌলিক জিনিস অন্তর্ভুক্ত রয়েছে? কিংবা হিন্দুতন্ত্র কি জিনিস? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত হয়নি। গোশ্তখোরও হিন্দু, গোশ্ত বর্জনকারীও হিন্দু। পবিত্র বেদ হিন্দুরাই মানে আবার হিন্দুরাই অস্বীকার করে। হিন্দুরাই গরু পূজা করে আবার তারাই গরুর চামড়ার জুতা পরে এবং গরুর চামড়ার সাজ সরঞ্জাম দ্বারা ঘরের সৌন্দর্য বর্ধন করে। মূর্তি পূজা হিন্দুরাই করে, আবার হিন্দুরাই মূর্তি পূজা খণ্ডন করে। হিন্দুরাই আস্তিক আবার নাস্তিকও তারাই। কোটি কোটি দেবদেবী হিন্দুরাই মানে আবার তারাই একেশ্বরবাদী। এগুলো একটা আরেকটার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভাই পরমানন্দজী এজন্যেই হিন্দুর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এভাবে দিয়েছিলেন ঃ 'যে নিজেকে হিন্দু মনে করে সেই হিন্দু।' বীর সাওকর্ণে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে হিন্দুর পরিচয় এভাবে দিয়েছেন ঃ 'যে ব্যক্তি এদেশকে মাতৃভূমি এবং পূণ্যভুমি মনে করবে, সেই হিন্দু।' কিছু জাতীয়তাবাদী মুসলমান এদেশকে মাতৃভূমি তো মানতে প্রস্তুত বটে, কিন্তু পূণ্যভূমি মানতে প্রস্তুত নয়। সুতরাং এ ব্যাপারে মুসলমানদের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত। আর হিন্দুস্থানে এই একটি সমস্যার সমাধানের জন্যে দেশের শ্রেষ্ঠতম বুদ্ধিজীবীরা তো প্রতিনিয়তই চিন্তা ভাবনা করে যাচ্ছে। কিন্তু এর যে সমাধান আপনি প্রস্তাব করেছেন, তা শুধু মুসলমান, হিন্দু বা ভারতবর্ষ নয় বরঞ্চ গোটা বিশ্বমানবতার জন্যে সমানভাবে বাস্তব। এমন কতিপয় মূলনীতি আপনি পেশ করেছেন, যেগুলো সুস্পষ্ট (Clear cut) নীতি। (এ জন্যে আমি আপনার জন্যে 'শেষ' শব্দটি ব্যবহার করেছি)।

হ্যাঁ আমি বলছিলাম, আপনার সমস্ত গ্রন্থের উপর আমি একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়েছি। শিক্ষাংগণে (মসজিদে) আপনি যেসব বক্তৃতা পাঠ করেছেন[১] এবং বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে হত্যাংগণের (Slaughter Houses) সাথে তুলনা করে যে প্রকৃত সত্য আপনি প্রকাশ করেছেন, সত্যকে এমন খোলাখুলি পেশ করাটা আপনার নৈতিক সাহস ও বীরত্বেরই সুস্পষ্ট প্রমাণ। একাজের যতোটা প্রশংসাই করা হোকনা কেন, তা কমই হবে। বিশ্বাস করুন, আপনার এ বক্তৃতামালাকে যখন আমি দেশের বিরাট বিরাট নামজাদা উপাধিধারী ব্যক্তিদের সমাবর্তন (Convocation) অনুষ্ঠানের ভাষণের সাথে তুলনা করি তখন আমার মেযাজটাই খারাপ হয়ে যায়। (অর্থাৎ তাদের বক্তৃতায় মানবতার জন্যে কোনো কল্যাণকর দিক নির্দেশনা থাকেনা।)

---

১. অর্থাৎ দারুল ইসলাম পাঠানকোটের জুমআর খোতবাসমূহ। বাংলা ভাষায় এগুলো হাকীকত সিরিজ এবং ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা নামে প্রকাশিত হয়েছে -অনুবাদক।

আপনি একদিকে কুরআনে করীমের আলোকে মানবতার হিতাকাংখায় ইসলামকে প্রোজ্জ্বলিত করার জন্যে সাধারণ দাওয়াতের কাজ করে যাচ্ছেন এবং শান্তি পথ, একমাত্র ধর্ম, ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ, ইসলামের নৈতিক দৃষ্টিকোণ প্রভৃতি পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে মানসিক বিপ্লব সাধনের কাজও আমার সম্মুখে রয়েছে। অপরদিকে আমার জাতির লীডাররা সত্যপথ থেকে বিচ্যুত হয়ে খুঁটিনাটি উদ্দেশ্যে (Minor causes) নিজেদের এবং গোটা জাতির শক্তিকে ধ্বংস করছে। একদিকে আপনার জুমআর বক্তৃতাসমূহ লিখিত আকারে প্রতিটি মসজিদে প্রচার করে সর্ব সাধারণের নিকট নিজ উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারা পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা, অপরদিকে হিন্দুদের গুরু স্বামী গণেশ দত্ত এবং পণ্ডিত মদনমোহন মালাবী বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ে মন্দির নির্মাণের জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহের ধান্দায় নিমগ্ন রয়েছেন। আর্য সমাজ সম্পর্কে আমার বিশ্বাস হলো, আজ যদি ঋষি দয়ানন্দের আবির্ভাব ঘটতো তবে তিনি প্রথমে আর্য সমাজের সংস্কার সংশোধনের কাজে হাত দিতেন। ইউ.পি, মুসলিম লীগের সাবেক প্রেসিডেন্ট চৌধুরী খালিকুজ্জামান একবার লাহোরের এক জনসভায় কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'আমার কোচওয়ান হিন্দুদের বড় বড় রাজনৈতিক লীডার পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রভৃতির চাইতে অধিক রাজনীতি জানে।' ঠিক একই কথাই বলেছেন ভাই পরমানন্দজী। তিনি বলেছেন ঃ হিন্দুদের দুর্ভাগ্যের কারণে প্রথম থেকেই কংগ্রেস নেতৃত্ব এমন সব হিন্দু নেতার হাতে রাজনীতির বাগডোর তুলে দেয়, যারা রাজনৈতিক ময়দানে মুসলমানদের সামনে মক্তবের শিশুর মতো।' এ অবস্থার উপর যখন আমি চিন্তা করি, তখন অজ্ঞাতসারেই কবির এই চরণগুলোর মতো হতাশার নিঃশ্বাস ছাড়ি ঃ

"হতাশার ঘন কুয়াশায় হাবুডুবু খাই
বিরাণ ভূমের উদাস পথ তিমির আঁধার
লক্ষ্যহীন জীবন এখন অরংগীন নিষ্প্রদীপ
কোথায় মনযিল, এসেছি কোথায় নেই ঠিকানা।"

কোনো প্রকার অতিরঞ্জন ছাড়াই বলছি, আমার মতে আপনার প্রদত্ত প্রোগ্রাম দেশের অন্য সকল আন্দোলনের উপর ছায়া (Shade) বিস্তার করে নিয়েছে। আপনার সমস্ত সাহিত্য পড়ার পর একটি আংশিক বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ই আমার নযরে পড়েনি, যে বিষয়ে সততার সাথে আপনার সংগে মতবিরোধ করতে পারি। আমি স্বীকার করি, আপনার প্রদত্ত প্রোগ্রাম সর্বাংগীনভাবে পরিপূর্ণ (Complete) এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ (Self sufficient) । কিন্তু দুটি বিষয়ে আমার খটকা রয়ে গেছে। আপনার সমীপে নিঃসংকোচে তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছি ঃ

"আপনার 'আল জিহাদু ফিল ইসলাম" গ্রন্থ পড়ার পর আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আপনি সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য রাখেন। কিন্তু সেদিন বৈকালিক ভ্রমণের সময় কথপোকথনের এক পর্যায়ে আপনি প্রকাশ করলেন যে, বেদ পুরান সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য আপনি ইংরেজী গ্রন্থাবলী থেকে সংগ্রহ করেছেন। এই সত্য বাক্যটি শুনে আমার কাছে এমন অনুভব হচ্ছিল, বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হলে কোনো ব্যক্তি যেমনটি অনুভব করে। যেমন এইচ, জি, ওয়েলস্ সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন ঃ তিনি ইসলাম সম্পর্কে সরাসরি কি জানেন যে, অনর্থক ইসলাম ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছেন? একইভাবে সংস্কৃত ভাষার সাথে সরাসরি কোনো সম্পর্ক না থাকার কারণে বেদ ভগবান সংক্রান্ত আপনার ধারণাকে নির্ভরযোগ্য বলা যেতে পারেনা। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় স্বাধীনভাবে অনুবাদ করলেও মূলের ভাষ্য যথাযথভাবে প্রস্ফুটিত হয়না। অনুবাদ থেকে অনুবাদ করার মাধ্যমে তো ব্যবধান আরো অধিকই হয়ে থাকে। ঋষি দয়ানন্দ তো মহিন্দ্র এবং রচাইন আচার্যের বেদ ভাষাকেও আভিধানিক অনুবাদ বলেছেন। সুতরাং ম্যাক্সমুলার এবং অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের অনুবাদ দ্বারা আপনি কেমন করে এ সম্পর্কে মত প্রতিষ্ঠা করেছেন? হিন্দুদের মনমগজ থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর করে তাদের নিকট ইসলামের সঠিক ধারণা পেশ করার যে নেক ও উচ্চাশা আপনি পোষণ করেন, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে আদবের সাথে নিবেদন করছি, আগামীতে যখন আপনার গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করবেন, তখন বিশেষভাবে যেসব গ্রন্থে হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর রেফারেন্স রয়েছে, সেগুলোর ব্যাপারে এমন ব্যক্তির সহযোগিতা গ্রহণ করবেন যিনি হিন্দুদের আধ্যাত্ম চর্চা ও হিন্দুদের সাহিত্যের উপর সরাসরি পাণ্ডিত্য রাখেন। (ব্যক্তিগতভাবে আমি এরকম দু'একজন ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ঠতা লাভের গৌরব অর্জন করেছি)। আশা করি আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য আপনি বুঝতে পেরেছেন।

আপনি আপনার "ইসলাম ও জাহেলিয়াত" পুস্তিকার শেষের দিকে বলেছেন ঃ ইতিহাস সাক্ষ্য, এ মতাদর্শের (ইসলাম) ভিত্তিতে যেসব লোক তৈরী হয়েছিল, তাদের চাইতে উত্তম মানুষ পৃথিবীতে কখনো সৃষ্টি হয়নি। আর মানুষের জন্যে অন্য কোনো রাষ্ট্র সেই রাষ্ট্রটির চাইতে কল্যাণকর প্রমাণিত হয়নি।" যদি স্পষ্ট কথা বললে কিছু মনে না করেন, তবে অত্যন্ত আদব ও বিনয়ের সাথে নিবেদন করবো যে, এখানে আপনি পক্ষপাতিত্ব করেছেন। আপনার এ বক্তব্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পাওয়া যায়। আমি কেবল ভগবান কৃষ্ণের কথাই উল্লেখ করবো, যার নিম্নোক্ত দুটি কথাই মাত্র বীর অর্জুনের মতো যোদ্ধার অন্তরে এক অভাবনীয় ভীতি সৃষ্টি করে দিয়েছিল এবং তার বাহুতে বিদ্যুৎ শক্তি পয়দা করে দিয়েছিল ঃ

"কৃতিত্ব কুড়ানো নয় কর্তব্য করো পূর্ণ
পুরস্কারের আশা ধুলায় করো চুর্ণ।"

এ ঐতিহাসিক কাহিনীর স্মরণেই গীতার মতো প্রসিদ্ধ গ্রন্থ অস্তিত্ব লাভ করে। অতি বড় বিরোধী ব্যক্তি ও কৃষ্ণভগবানের চরিত্রে কোনো নৈতিক ত্রুটি চিহ্নিত করতে পারেনি। 'ভগবান' শব্দটি আমি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করেছি, অবতার অর্থে নয়। এমনসব ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করে আপনি ইসলাম পূর্ব ইতিহাসের ব্যাপারে সংকীর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন। সত্য কথা এই যে, আমার চোখ সর্বদা উন্মুখ ছিলো যে, আপনি কোথাও হয়তো কোনো আদর্শ হিন্দু চরিত্রের নমুনা পেশ করবেন। কিন্তু আমার সে আশা ধুলায় লুণ্ঠিত।

আপনি 'তরজমানুল কুরআনে' আমার পত্রাবলী এবং আপনার প্রদত্ত সেগুলোর জবাব প্রকাশ করে ইসলামী প্রচার মাধ্যমের জন্যে মজার সামগ্রী সরবরাহ করেছেন। দিল্লীর একটি দৈনিক "হুকুমতে এলাহীয়া আওর পাকিস্তান" শিরোনামে এসব পত্রের উল্লেখ করে আপনার তীব্র সমালোচনা করেছে। এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার, স্বচক্ষে দেখার পরও ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছে।

মরহুম মাওলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব একবার বলেছিলেন ঃ "মুসলমানদের ঈমানের কারণে আমি একজন ফাসিক ফাজির মুসলমানকেও গান্ধিজী থেকে উত্তম মনে করি।" কিন্তু প্রকৃত ইসলাম উপস্থাপন করে এবং মুসলমানদের ঈমানী শক্তিকে উন্মুক্ত ও প্রশস্ত করে আপনি কেবল মুসলমানদেরই নয়, বরঞ্চ গোটা মানবতার অতিবড় খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন। আপনার ইসলামী সাহিত্যের বদৌলতে তারা অনুভব করছে যে, তাদের কি হওয়া উচিত ছিলো আর এখন কি হয়ে বসেছে। কিন্তু আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, আপনার উপস্থাপিত "হুকুমতে এলাহিয়া" যেহেতু গোটা মানবতার জন্যে কল্যাণধর্মী এবং ধর্ম সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের নিকট এ রাষ্ট্রের সংবাদ পৌছানো আপনারও উদ্দেশ্য, তবে আপনার গোটা চেষ্টা সংগ্রাম (Sturggle) কেবল মুসলমানদের মধ্যে সীমিত রাখছেন কেন?

জবাব ঃ সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছাড়াই কেবল ইউরোপীয়ানদের অনুবাদের উপর ভিত্তি করে বেদ সম্পর্কে কেন আলোচনায় অবতীর্ণ হলাম? আপনার এ অভিযোগ সত্য। কিন্তু আপনি এ বিষয়টার প্রতি খেয়াল রাখেননি যে, 'আল জিহাদু ফীল ইসলাম' আমার একেবারে প্রাথমিক জীবনের লেখা। তখন বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে আমার দৃষ্টিকোণ এতোটা মজবুত হয়ে সারেনি এবং মেযাজগত অতটা সাবধানতাও সৃষ্টি হয়নি, যা নাকি গবেষণা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন। এখন যদি পুনরায় আমি ঐ

গ্রন্থটি লেখি, তবে যেসব বিষয়ে আমার সরাসরি জ্ঞান লাভের সুযোগ নেই সেগুলো নতুনভাবে বিশ্লেষণ করবো। এ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আপনি যদি সহযোগিতা করতে পারেন, তবে কৃতজ্ঞ থাকবো। এমন কোনো হিন্দু বিদ্যান যিনি শুধু ধর্মানুরাগী নন বরঞ্চ গবেষণা ও বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও পারদর্শী এবং নিরপেক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ গবেষক হবেন, আমার গ্রন্থের যে অংশে হিন্দুদের সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে, সে অংশের সমালোচনা করে যদি আমার ত্রুটি নির্দেশ করে দেন, তবে এতে আমার অনেক সহযোগিতা হবে। এছাড়া যদি আপনি এমন কোনো গ্রন্থের কথা আমাকে বলে দিতে পারেন যাতে হিন্দু ধর্মে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ও নিয়ম কানুন কোনো মনগড়া বর্ণনা ছাড়াই হুবহু বর্ণিত হয়েছে, তবে তা আরো অধিক কৃতজ্ঞতার কারণ হবে। 'মনগড়া' না হওয়ার শর্ত আরোপ করছি এজন্যে যে, আজকাল লোকেরা সাধারণত নিজেদের মূল ধর্মের উপর ঈমান না রেখে একটা ধর্মীয় দৃষ্টিভংগি পোষণ করে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভূতের তাড়নায় তারা সেই ধর্ম এবং নিজ ধর্মীয় দৃষ্টিভংগিকে 'যুক্তিসংগত' বানানোর জন্যে আধুনিক মতবাদসমূহের ভিত্তিতে একটা নতুন ধর্ম গড়ে নেয় এবং নিজের পুরানো ধর্মের নামে তা চালিয়ে দেয়। এ পন্থাকে আমি তীব্রভাবে ঘৃণা করি, চাই তা কোনো মুসলমান করুক, কিংবা কোনো হিন্দু কিংবা অন্য কেউ। যারা মূল ধর্মকে হুবহু থাকতে দেয় এবং হুবহু তা পেশ করে আমি তাদের ভালবাসি এবং আমার নীতিও এটাই। এরপর তা যদি মানার যোগ্য হয় তবে লোকেরা মানবে আর অমান্য করার যোগ্য হলে বর্জন করবে।

আপনি দ্বিতীয় যে অভিযোগটি করেছেন, সে অভিযোগ আমার প্রতি আরোপ না করে খোদ হিন্দুদের প্রতি আরোপ করাই উচিত ছিলো। এ বিষয়ে হিন্দুদের প্রতি আমার অভিযোগ রয়েছে। তারা নিজেরাই নিজেদের মহাপুরুষদের চরিত্রকে নিষ্কলুষ রাখেনি। তারা তাঁদের প্রকৃত যিন্দেগীকে অলীক কাহিনী দ্বারা সম্পূর্ণ বিকৃত করে দিয়েছে। এর চাইতেও দুঃখজনক বিষয় হলো, তারাও ইহুদীদের মতো নিজেদের নৈতিক অধঃপতনকে সঠিক প্রমাণ করার জন্যে নিজেদের মহাপুরুষদের প্রতি নিকৃষ্ট নৈতিক দুর্বলতাসমূহ আরোপ করেছে। এর ফলশ্রুতিতে ভারতবর্ষের যেসব মনীষীকে পবিত্র নৈতিকতা এবং শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের নমুনা হিসেবে বিবেচনা করার সম্ভাবনা ছিলো, তাদের সকলের জীবনের ঘটনাবলী ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সংশয়যুক্ত ও অলীক কাহিনী। যেসব সূত্রে তাদের জীবনের উজ্জ্বল দিকগুলো আমাদের সামনে আসে, সেইসব সূত্রেই তাদের জীবনের এমন সব অন্ধকার অধঃপতিত দিকসমূহ সামনে আসে, যেগুলো কোনো মহাপুরুষের যিন্দেগীর প্রতি আরোপ করা তো দূরের কথা, কোনো চরম নিকৃষ্ট চরিত্রের লোকের প্রতি আরোপ করতেও লজ্জা অনুভব হয়। এ কারণে কোনো প্রকার জাতিগত ও ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছাড়াই আমি বাধ্য হয়ে আরব ইতিহাসের

শুধুমাত্র মানবতার সেই পূর্ণাংগ একটি অধ্যায়কে নমুনা (Model) হিসেবে পেশ করেছি। কেননা ঐতিহাসিক দিক দিয়ে তা খুবই নির্ভরযোগ্য। যদিও তাতেও কাহিনীর রং লাগানোর চেষ্টা করা হয়েছে, তা সত্ত্বেও ঐতিহাসিক সমালোচনার এমন সব প্রক্রিয়া মওজুদ রয়েছে যদ্বারা অতিরঞ্জনকে পূর্ণ সুবিচারের সাথে আলাদা করা যেতে পারে। অতপর নৈতিক নোংরামীর কোনো প্রকার চিহ্ন পর্যন্ত সেখানে পাওয়া যায়না। এ হচ্ছে খোদা প্রদত্ত জীবন ব্যবস্থা। সৌভাগ্যক্রমে কেউ তা লাভ করে। ইতিহাসের এক অধ্যায়ে আরবের একটি জনগোষ্ঠী যদি তা লাভ করে থাকে, তবে তাতে আফসোসের কিছু নাই এবং আফসোস করে লাভও কিছু হবেনা। বরঞ্চ আপনি যদি হিন্দুস্তান কিংবা হিন্দুদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার পরিবর্তে মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন, তবে মানবতার জন্যে যে জিনিস গর্ব করার যোগ্য সে জিনিস নিয়ে ফখর করতে পারে একজন আরব। কেননা, মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে যে 'তাজ' কোনো মানুষ বা কোনো মানবগোষ্ঠীকে পরান হয়েছে, সে তাজ আমাদের গোটা মানবগোষ্ঠীর জন্যে গর্ব, চাই তা কোনো আরবের মাথায় শোভা পাক কিংবা কোনো ভারতবাসীর মাথায়। তরজমানুল কুরআন ঃ রবীউল আওয়াল-জমাদিউস সানি ১৩৬৪ হিঃ, মার্চ-জুন ১৯৪৫ ইসায়ী।

গরু, পুনর্জন্মবাদ ও গ্রন্থ সাহেব

প্রশ্ন ঃ নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে আপনার জ্ঞানের আলোকে প্রকৃত সত্যের পথ নির্দেশ করবেন ঃ

১. হিন্দু ভাইদের মধ্যে গরুকে শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র মনে করার যে প্রথা রয়েছে, তার কারণে ভারতবর্ষে অসংখ্য হিন্দু মুসলিম দাংগা সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে কি যাদুর প্রভাব রয়েছে যে, হিন্দুদের মধ্যে বড় বড় জ্ঞানী ও পন্ডিত ব্যক্তি বর্তমান থাকা সত্ত্বেও কেউ এ সমস্যার কারণ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেনা। এমনকি গান্ধীজীর মতো বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ নেতাও ধর্মের সেই নৌকায়ই আরোহণ করেছেন, যা নাকি সাধারণ মানুষ এমনি কতিপয় বিষয়ের সমন্বয়ে নির্মাণ করেছে। এ গরু পূজা সম্পর্কে আপনি আলোকপাত করুন। আপনি বলে দিন, কখন থেকে গরু পূজা শুরু হয়েছে এবং কিভাবে তার ব্যাপ্তি ঘটেছে। এতে করে আশা করা যায় কিছু সত্যপন্থী হিন্দু আশ্বস্ত হবে এবং নিজ জাতির সংশোধনে এগিয়ে আসবে।

২. পুনর্জন্মবাদের বিশ্বাস হিন্দু জাতির এক বুনিয়াদী গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। হিন্দু ছাড়া অপর কোনো জাতি পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী আছে কিনা আমি বলতে পারিনা। তা সত্ত্বেও এই বিশ্বাস যুক্তিসংগত সমালোচনার যোগ্য।

৩. শিখ সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কিতাব 'গ্রন্থ সাহেব' কতিপয় নীতিগত উপদেশের সমষ্টিমাত্র। আলোচিত বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটাকে গুলিস্তাঁ ও বুস্তাঁ প্রভৃতি গ্রন্থের সারিতে রাখা যেতে পারে। মনে হয়, বিভিন্ন ধর্মের নেক ও সূফী

লোকদের বাণী ও নসীহতসমূহ এ গ্রন্থে একত্রিত করা হয়েছে। এ গ্রন্থের সংকলকের উদ্দেশ্য অন্য কিছু বলে মনে হয়। কিন্তু এখন সে উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত গ্রন্থটি একটি সম্প্রদায়ের ঐশী গ্রন্থে পরিণত হয়েছে। অথচ এ গ্রন্থটি থেকে সভ্যতা সংস্কৃতি, সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্টনীতি সম্পর্কে কোনো প্রকার দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়না। কিন্তু আমার বুদ্ধিতে কুলায়না যে, শিখদের শিক্ষিত ও মেধাবী লোকেরাও কী করে এতেই সন্তুষ্ট?

জবাব ঃ *আপনি যেসব বিষয়ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চেয়েছেন, তার প্রত্যেকটিই সুদীর্ঘ আলোচনার দাবী রাখে। কিন্তু এখন এসব বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা আমার জন্যে কষ্টকর। ক্রমানুসারে তিনটি প্রশ্নের উপর সংক্ষিপ্ত মতামত পেশ করছি ঃ*

১. এ বিষয়ে আমি সামান্য যতোটুকু জানি, তার ভিত্তিতে এতোটুকু বলতে পারি যে, সেই প্রাচীন বৈদিক যুগে 'গরুর পবিত্রতার' বিশ্বাস বর্তমান ছিলনা। আর যদি থেকেও থাকে তবে একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় ছিলো। এতে করে এ কথার প্রমাণ মেলে যে, সে যুগে হিন্দুরা গরু জবাই করতো। সমাজ বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকেও এটা প্রমাণ হয় যে, প্রাচীন আর্য জাতি যাযাবর সভ্যতার সাথে সম্পর্ক রাখতো। আর সে সভ্যতায় গরু পূজার নাম গন্ধও ছিলনা। পরবর্তীকালে সেই মাতৃসভ্যতা থেকে এর প্রচলন শুরু হয়, যে সভ্যতা ভারতের দ্রাবিড় জাতিসমূহ, ইরাক, পশ্চিম এশিয়া এবং মিসরে ছড়িয়েছিলো। এ সভ্যতার ধারক বাহক ছিলো কৃষিজীবী জাতিসমূহ। তাদের মধ্যে গরুর পবিত্রতা প্রচলিত ছিলো। এ বিশ্লেষণ থেকে বুঝা যায় যে, মিসর থেকে বণী ইসরাঈলের মধ্যে যেভাবে গরু পূজার স্পর্শ লেগেছিল, অনুরূপভাবে ভারতবর্ষে আসার ফলে আর্যদের মধ্যে এর স্পর্শ লেগেছিল। গরু পূজা তো হিন্দু সমাজের একটা বিশেষ স্তরের লোকদের মধ্যে পাওয়া যায়, কিন্তু গরুর পবিত্রতার ধারণা গোটা হিন্দু জাতির মধ্যে ব্যাপ্ত। এমনকি হিন্দু থেকে যারা ইসলাম বা খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছে, তাদের একটা বিরাট সংখ্যক লোকের মধ্যেও এর প্রভাব রয়েছে শুধুমাত্র এ কারণে যে, পূর্ণাঙ্গভাবে তাদের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেনি।

শুধুমাত্র গরু পূজার সমালোচকদের কিছু বললে কোনো ফল হবেনা। কারণ, একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস আরো অনেকগুলো ভ্রান্ত বিশ্বাসের সংগে সম্পৃক্ত থাকে। আর একটি ভ্রান্ত বিশ্বাস সবগুলো ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূল কারণ হয়ে থাকে। যতোক্ষণ পর্যন্ত সেই মূল কারণটি থেকে আরম্ভ করে ধারাবাহিকভাবে শাখা প্রশাখার সংশোধন করা না যাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত শুধুমাত্র একটি শাখার সমালোচনা করে কোনো ফল হতে পারেনা। এ ধরনের সমস্ত ভ্রান্ত ধ্যান ধারণার মূল কারণ হলো, মানুষ এ বিশ্ব জাহানের ব্যবস্থাপনা ও তাতে তার মর্যাদা (Position) এবং বিশ্ব জাহানের মালিকের সংগে তার ও অন্যান্য সৃষ্টি জগতের প্রকৃত সম্পর্ক কি, এই মূল জিনিস অনুধাবনেই ভুল করে। এ প্রাথমিক ও বুনিয়াদী ভ্রান্তিবুঝের পরিণতিতে অসংখ্য ভ্রান্ত বুঝ তার মধ্যে পয়দা হবার ধারাবাহিকতা শুরু হয়ে

যায়। এগুলো একটা আরেকটার সাথে মিলে মিশে একটা পূর্ণ ধ্যান ধারণা ও জীবন ব্যবস্থার রূপ ধারণ করে।

কোনো ব্যক্তি যদি সঠিকভাবে একথা বুঝে নেয় যে, এ বিশ্ব জাহানের কেবলমাত্র একজনই স্রষ্টা, মালিক, হুকুমকর্তা ও পরিচালক রয়েছেন; মানুষকে এ দুনিয়ায় তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং দুনিয়ার সব কিছু মানুষের খিদমতের জন্যে পয়দা করা হয়েছে, তবে সে ব্যক্তি সৃষ্ট জীবের পূজা করা এবং খেয়ালী জিনিসসমূহকে পবিত্র মনে করার মতো যাবতীয় সন্দেহ সংশয় থেকে নিজে নিজেই পবিত্র হয়ে যায়। তার অন্তরে এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত উপাসনা ও পবিত্রতার ধারণা স্থান পাওয়ার বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকতে পারেনা। অতপর কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি সঠিক বিবেক বুদ্ধি (True Rationalism) বর্তমান থাকে, তবে সে বংশ, গোত্র, জাতীয় ও ব্যক্তিগত সকল স্বার্থ ও সংকীর্ণতা থেকে নিজে নিজেই মুক্ত হয়ে যাবে এবং নিজের চিন্তা ও আমলকে পূর্ণ নিরপেক্ষতার সাথে যুক্তিসংগত কর্মপন্থার উপর প্রতিষ্ঠিত করবে।

আপনি বিস্মিত হয়েছেন যে, হিন্দুদের মধ্যে বিরাট বিরাট জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক বর্তমান রয়েছেন; কিন্তু তারাও এসব আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণায় নিমজ্জিত, যা সাধারণ দৃষ্টিতে অজ্ঞতাপূর্ণ আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা বলে মনে হয়। সর্বশেষ প্রশ্ন করতে গিয়েও আপনি এ ধরনের বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু দেখুন, এ অবস্থায় কেবল কোনো একটি জাতি নিমজ্জিত নয়; বরঞ্চ পৃথিবীতে এ অবস্থা ব্যাপক বিস্তৃত। বিশ্বে এমন বহু ব্যবস্থা ও মতবাদ রয়েছে, যা ভ্রান্ত চিন্তা ও ধ্যান ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এরকম প্রতিটি ব্যবস্থার অনুসারীদের মধ্যে আপনি এমনসব লোকের সন্ধান পাবেন, যারা উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ও মেধাবী এবং স্বীয় অনুসৃত ভ্রান্ত কর্মনীতিটি ছাড়া দুনিয়ার অন্য সকল বিষয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে থাকেন। এ পর্যায়ের লোক হওয়া সত্ত্বেও তারা এমনসব গুমরাহীতে নিমজ্জিত যা ঐ গুমরাহীর অনুসারীরা ছাড়া আর সকলের দৃষ্টিতে একেবারে ভ্রান্ত ও অযৌক্তিক মনে হয়। বাহ্যিকভাবে এটা একটা পেরেশানী ও উদ্বেগেরই বিষয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে এতে পেরেশানীর কোনো কারণ থাকেনা। এ অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার প্রথম কারণ হলো, এদের মধ্যে অধিকাংশই হচ্ছে এমন লোক যারা নিজেদের জ্ঞান বুদ্ধিকে বেশীর ভাগই পার্থিব ও দৈহিক বিষয়াদির মধ্যেই সীমিত রাখে। কিন্তু যেসব নৈতিক ও ধ্যান ধারণাগত বুনিয়াদের উপর তারা নিজেদের যিন্দেগীকে প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে কিংবা যেসব বুনিয়াদের উপর জীবনকে প্রতিষ্ঠিত পেয়েছে সেগুলো অভ্রান্ত কিনা এবং সেগুলোর চাইতে উত্তম কোনো বুনিয়াদ আর কোথাও পাওয়া যেতে পারে কিনা সে সম্পর্কে বিশ্লেষণ করার প্রতি তাদের কোনো পরোয়া নেই। এর দ্বিতীয় কারণটি হলো, মানবজাতির মধ্যে খুব কম মানুষই এরকম আছে যারা বংশীয়, জাতীয় এবং ব্যক্তিগত সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হয়ে নিষ্ঠার সাথে জ্ঞান ও বুদ্ধিগত বিশ্লেষণের উপর স্বীয় চিন্তা পদ্ধতি ও আমলের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত। অবশ্য এমনটি করার দাবীদার আপনি অনেকই পাবেন।

২. পূনর্জন্মবাদের বিশ্বাস হিন্দুদের ছাড়া অন্যান্য জাতির মধ্যেও পাওয়া গিয়েছে এবং এখনো পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের বাইরেও কোনো কোনো দার্শনিক ব্যবস্থায় এর নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতবর্ষে এর মূল যতোটা গভীরে তার নযীর অন্যত্র পাওয়া যায়না। এ আকীদার মূলে রয়েছে দুটি প্রশ্ন যেগুলো সমাধান করার চেষ্টা মানুষ সব সময় করেছে। প্রশ্নগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ আকৃতিতে মানুষের সামনে উপস্থিত হয়। প্রথম প্রশ্ন এই যে, জগতে বিপদ মুসীবত (যাতে মৃত্যুও রয়েছে) কেন আসে? কেবলমাত্র আরাম, আনন্দ, সুখ, স্বাদ, শান্তি, সুস্থতা এবং চিরন্তন যিন্দেগী কেন নেই? দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো, মানুষের কর্মের স্বাভাবিক ফল তো দুনিয়ায় একটি নির্দিষ্ট নিয়মে প্রকাশ হতে দেখা যায়। কিন্তু নৈতিকতার ফল (মানব স্বভাব যার প্রকাশ দাবী করে) কেন একটি নির্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী প্রকাশিত হয়না? এ সবের কিংবা এর অংশ বিশেষের ফল বা পরিণতির প্রকাশ যদি বন্ধ থাকলো, তবে তা কি পন্থায় প্রকাশ হবে?

বিভিন্ন দার্শনিক ব্যবস্থায় এ উভয় প্রশ্নের বিভিন্ন জবাব পাওয়া যায়। কিন্তু এ সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে সেই সব মতবাদের উপর আলোচনা করা সম্ভব নয়।

ভারতবর্ষের দার্শনিকরা, যাদের ধ্যান ধারণা পরবর্তীতে ধর্মের রূপ পরিগ্রহ করেছে এসব প্রশ্নের সমাধান কর্ম ও পুরর্জন্মবাদের আকারে করেছেন। তারা এ দুনিয়াকে পরীক্ষাগারের পরিবর্তে আযাবখানা ও জেলখানার রূপে দেখেন। দৈহিক বিষয়াদির সাথে মানুষের সম্পর্ককে এর কারণ মনে করেন। তাদের মতে আত্মা দেহের জিঞ্জীর থেকে মুক্ত হয়ে বার বার সেই জিঞ্জীরেই ফিরে আসে। তারা মনে করেন, বিপদ মুসীবত ও দুঃখ কষ্ট এবং অনুরূপভাবে জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সফলতা সেই সব ভালো কিংবা মন্দ আমলের পরিণতি যা সেই সময় আত্মার দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল, বর্তমান জীবনের পূর্বে সে যখন দেহজিঞ্জীরে আবদ্ধ ছিলো। তাদের আরেকটি ধারণা হলো, মানুষের নৈতিক কর্মকাণ্ডের ফলাফল এক জীবনে পূর্ণরূপে বা প্রকৃতরূপে প্রকাশ হয়না। সেগুলো প্রকাশের প্রকৃত পন্থা হলো, এ পৃথিবীতে মানুষ বার বার সেগুলো ভোগ করে।

এ এক ব্যাপক বিস্তৃত দর্শন। আমি এখানে তার সারমর্মটা তুলে ধরলাম। এ দর্শন গোটা যিন্দেগী সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিকোণ এবং জীবনের প্রতিটি দিক সম্পর্কে তার দৃষ্টিভংগীকে প্রভাবিত করে। এ প্রবন্ধে এর পূর্ণাংগ দার্শনিক ও বাস্তব ফলাফল নিয়ে আলোচনা করা মুশকিল। এতটুকু বলে দেয়াই আমি যথেষ্ট মনে করি যে, প্রকৃতপক্ষে এটা কল্পিত দর্শনের (Speculative philosophies) স্বগোত্রীয় জিনিস। এ ধরনের যাবতীয় দার্শনিক ব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, এগুলোর সামনে যে সমস্যাই দেখা দিকনা কেন তা কেবল কল্পনা ও যুক্তির ফাঁদে ফেলে এমন ভাবে সমাধান করার চেষ্টা করে যদ্বারা তাদের নিজ সীমা পর্যন্ত এগুলোর সন্তোষজনক জবাব মিলে বটে; চাই জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং জাগতিক নিদর্শনাবলী দ্বারা সেগুলোর কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ মিলুক কিংবা না মিলুক। কল্পিত দর্শন এরূপ সাক্ষ্য প্রমাণের প্রয়োজনই অনুভব করেনা। তার তো সম্মুখের প্রশ্নাবলীর জন্যে এমন সব জবাবেরই প্রয়োজন যদ্বারা সে নিজে এবং তার পন্থায় যারা চিন্তা করে তারা সন্তুষ্ট হলেই যথেষ্ট। কিন্তু একথা

পরিষ্কার যে, এরূপ কল্পিত দর্শনের জন্যে তাদের চিন্তা বাস্তব ও প্রকৃত ব্যাপারের অনুরূপ হওয়ার প্রয়োজন হয়না। এমনটির আশা খুব কমই করা যেতে পারে। আসলে এটা হলো একটা তীর, যা ধনুকের সাহায্যে অন্ধকারে নিক্ষেপ করা হয়, চাই তা লক্ষ্যে বিদ্ধ হোক কিংবা না হোক, তীর নিক্ষেপকারী নিজেও এর কোনো পরোয়া করেনা, তীর নিক্ষেপ করার পর কোথাও লেগে তা খট করে শব্দ করলো কিনা সে তোয়াক্কাও সে করেনা। আশ্বস্ত হওয়ার জন্যে তার এতোটুকুই যথেষ্ট যে, নিজ কল্পনায় সে যে জিনিসকে নিশানা সাব্যস্ত করেছে ঠিক ঠিক ভাবে সেদিকে সে তীর চালিয়ে দিয়েছে। এরূপ তীরন্দাজের তীর নিশানায় লাগার যতোটুকু সম্ভাবনা থাকতে পারে, কল্পিত দর্শনের মাধ্যমে প্রকৃত সত্যে উপনীত হওয়ার আশা কেবল ততোটুকু করা যেতে পারে।

পুনর্জন্মবাদের বহু সমর্থক নিজেরাই নিজেদের এ আকীদার ত্রুটি অনুভব করেন এবং তা নিরসনের চেষ্টা এতোটুকু করেন যে, কখনো কখনো পত্রিকায় এমন বালক বালিকার আবির্ভাবের সংবাদ প্রকাশ হয়, যারা নিজেদের পূর্ব জন্মের অবস্থা শুনিয়ে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, এরূপ বালক বালিকা কেবল হিন্দুদের ঘরেই জন্ম নেয় আর কেবল হিন্দুদের সংবাদ পত্রেই সেগুলোর সংবাদ পৌঁছে। দ্বিতীয়তঃ এর চাইতেও বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, এসব ভদ্রলোক নিজেদের দর্শনের সমর্থনে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার অভাব মোচনের জন্যে কোথাও এক আধটি এরূপ শিশুর জন্মকে যথেষ্ট মনে করে। অথচ তাদের মতবাদের বিশুদ্ধতার জন্যে সকল শিশুরই অনুরূপ হওয়া জরুরী। মানুষ এক জন্মের কার্যকলাপের ভিত্তিতে অপর জন্মে যে শাস্তি বা পুরস্কার লাভ করে তা প্রাকৃতিক শাস্তি ও পুরস্কার নয় বরঞ্চ নৈতিক শাস্তি ও পুরষ্কার। সুতরাং প্রত্যেক মানুষেরই এটা উপলব্ধিতে আসা উচিত যে, সে কোন্ জিনিসের শাস্তি বা পুরস্কার ভোগ করছে? কেননা সকল নৈতিক কর্মকান্ড অবশ্যি উপলব্ধিগত কর্মকান্ড হয়ে থাকে। সুতরাং তার পরিণতিও অবশ্যি উপলব্ধিতে আসা উচিত।

এ পন্থার বিপরীত একদল লোক বোধি ও তার দাবী, প্রকৃতি ও তার দাবী, বিশ্ব প্রকৃতির নিদর্শনাবলী এবং সেগুলোর ইশারা ইংগিতকে উপেক্ষা করে কেবল দর্শনীয় বস্তু নিয়ে এবং অনেকটা ধর্মীয় চিন্তা পদ্ধতিকে অস্বীকার করে শুধু অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর নিজেদের সিদ্ধান্তের বুনিয়াদ স্থাপন করেছে। তারা প্রথম প্রশ্নের প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করেনি। বরঞ্চ তারা নিজেদের গবেষণা ও সিদ্ধান্তকে 'কেন' প্রশ্নের পরিবর্তন খুব বেশী হলে 'কি' প্রশ্নের মধ্যে সীমিত করে নিয়েছে। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের ব্যাপারেও তারা নিজেদেরকে কোনো না কোনো প্রকারে এ জবাবের উপর সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করেছে যে, নৈতিক কর্মফলও এ দুনিয়ার একই জীবনে প্রকাশ হয়ে থাকে, মৃত্যুর মাধ্যমে যে জীবনের সমাপ্তি ঘটে। আর যদি ধরে নেয়া হয় যে এ জীবনে তার ফলাফল প্রকাশিত হয়না, তবু মৃত্যুর পর কোনো জীবন হতে পারেনা। কেননা তা সরাসরি আমাদের অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতায় পড়েনা। কিন্তু মানুষ যতোই চেষ্টা করুক এ জবাব দ্বারা মানুষের অন্তরকে আশ্বস্ত করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

বাকী থাকলো নবীগণের আনীত দ্বীনের কথা। সে দ্বীনে এ দুটি প্রশ্নের কি জবাব রয়েছে এবং কোন্‌সব যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে তা সর্বাধিক যুক্তিযুক্ত জবাব, সে বিষয়ে আমি আমার ইসলাম পরিচিতি, ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা, পরকাল, ইসলাম ও জাহিলিয়াত প্রভৃতি গ্রন্থাবলী এবং সূরা আরাফের তাফসীরে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সুতরাং তা এখানে পুনরায় আলোচনা করার প্রয়োজন নেই। অবশ্য একথা পরিষ্কার করে দেয়া প্রয়োজন মনে করছি যে, সকল অতি প্রাকৃতিক সমস্যার ব্যাপারে এ নীতি সর্বসম্মত যে, এগুলোর কোনো সমাধান তা পজেটিভ হোক কিংবা নেগেটিভ, অকাট্য প্রমাণিত হতে পারেনা; যেমন দুইয়ে দুইয়ে চার হওয়াটা অকাট্য প্রমাণিত যা স্বীকার করে নেয়া ছাড়া উপায় থাকেনা। এ ধরনের সমস্যার সর্বাধিক যুক্তিসংগত সমাধান সেটাই যা প্রকৃত সত্য হওয়ার ব্যাপারে প্রবল সম্ভাবনা থাকে যা বুদ্ধি ও ফিতরাতের সকল দাবী পূরণ করে, যার পক্ষে অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষা নিরীক্ষায় সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় এবং যদ্বারা জীবনের সেই সকল সমস্যার সমধান করা যেতে পারে, যা এ বিশেষ সমস্যার সঙ্গে কাছাকাছি কিংবা দুরবর্তী সম্পর্ক রাখে। যে সমাধানের বিপক্ষে জ্ঞান বুদ্ধির অভিযোগ করার কোনো অবকাশ থাকেনা, যা মেনে নিলে সমাধান অযোগ্য এমন কোনো সমস্যার সৃষ্টি হয়না যা অন্য কোনো পন্থায় দূরীভূত করা অসম্ভব হবে। তাছাড়া এটা এমন সমাধান হবে যার বিপক্ষে কোনো যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করানো যাবেনা।

এসব প্রশ্নের কোনো সমাধান সম্পর্কে বুদ্ধি জ্ঞানের শেষ সীমা হলো 'খুব সম্ভব এরূপ' (Most Probably) বলা পর্যন্ত। আরো অগ্রসর হয়ে দৃঢ় প্রত্যয় লাভ করার জন্যে একটি উপায় আছে। আর তা হলো এই যে, এরূপ সমাধান উপস্থাপনকারীদের যিন্দেগী তাদের উপস্থাপিত চিন্তা ও কর্ম কাঠামোর যৌক্তিকতা এবং তাদের কর্ম ও ফলাফল পর্যালোচনা করে তাদের প্রতি ঈমান বিল গায়েব আনতে হবে।

৩. আমি নিজে 'গ্রন্থ সাহেব' অধ্যয়ন করিনি। তবে অধ্যয়নকারীদের থেকে যতোটা জানতে পেরেছি তার ভিত্তিতে আমি আপনার এ ধারণার সাথে একমত যে, শিখ ধর্ম কেবল একটি ভক্তিবাদী সাধনার ধর্ম এবং তাতে সভ্যতা সংস্কৃতি, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন আদালত এবং সন্ধি ও যুদ্ধ প্রভৃতির মতো মানব জীবনের বড় বড় সমস্যাসমূহ সম্পর্কে এমন কোনো দিক নির্দেশনা নেই যার ভিত্তিতে বিশ্বে একটি সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে কারণে শিখদের শিক্ষিত ও চিন্তাশীল লোকেরা হিদায়াত ও সত্য সন্ধানের কাজ বাদ দিয়ে এ ধর্মের উপর সন্তুষ্ট রয়েছে, প্রথম প্রশ্নের জবাবে আমি তার বিশ্লেষণ পেশ করেছি। তরজমানুল কুরআন ঃ সফর ১৩৬৫ হিঃ, জানুয়ারী ১৯৪৬ ইসায়ী।

ইলমে যাহের ও ইলমে বাতেন

প্রশ্ন ঃ পূর্ববর্তী উলামায়ে কিরামের গ্রন্থাবলী পাঠে জানা যায়, 'বাতেনী ইলম' এমন এক ইলম যা, কুরআন হাদীসের ইলম থেকে পৃথক। শুধু কঠোর সাধনার

মাধ্যমে তা লাভ করা যায়। উম্মতের মধ্যে এমন সব লোকের সন্ধান পাওয়া যায় যারা ক্রমানুসারে জীবনের প্রথম দিকে কুরআন, সুন্নাহ, ফিক্হ, কালাম প্রভৃতি শাস্ত্রের জ্ঞান লাভ করেছেন এবং এসব ইলমের নাম দিয়েছেন 'যাহেরী ইলম'। অতপর তারা 'বাতেনী ইলমের' দিকে মনোনিবেশ করেন এবং এজন্যে কঠোর সাধনা করেন। এরি এক পর্যায়ে গিয়ে তারা 'রুহানী' ইলম লাভ করতেন। এ ইলমকে তাঁরা সব সময় যাহেরী ইলমের উপর অগ্রাধিকার দিয়েছেন। মেহেরবানী করে জানাবেন যে, ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বাতেনী ইলম কাকে বলে? এর প্রকৃত মর্ম কি ছিলো? এখন কি এর মধ্যে বিকৃতি এসেছে? কোনো কঠোর সাধনা ছাড়া কি এ ইলম লাভ করা যেতে পারেনা? যাহেরী ইলম লাভ করা ছাড়াই কি এই ইলম লাভ করা যেতে পারে?

জবাব ঃ *আপনার প্রশ্ন দীর্ঘ জবাবের দাবী রাখে। বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমি আমার বিভিন্ন লেখায় আলোকপাত করেছি। অবশ্য সরাসরি এ বিশেষ বিষয়টির উপর কিছু লিখিনি।*

'যাহেরী ইলম' দ্বারা যদি শরীয়তের হুকুম আহকাম বুঝানো হয়ে থাকে আর 'বাতেনী ইলম' দ্বারা যদি বুঝায় হিকমাতে দ্বীন (দ্বীন বাস্তবায়নের কর্মপন্থা); অথবা যাহেরী ইলম দ্বারা যদি বুঝায় শরয়ী বিধি বিধানের বাস্তবায়ন এবং ইলমে বাতেনের অর্থ যদি হয় মানুষের আকীদা, বিশ্বাস ও নৈতিক চরিত্রের প্রাণসত্তা এবং তা যদি ব্যক্তি চরিত্রে কার্যকর করা হয় যা প্রকৃতপক্ষে শরয়ী বিধান বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আবশ্যক, তবে অবশ্যি ইলমের এ যাহের বাতেন পার্থক্য দুরস্ত আছে। কিন্তু এ বিভক্তিতে অবশ্যি বাতেনের উৎসও তাই হতে হবে যা যাহেরের উৎস। অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত। কুরআন অধ্যয়ন, সীরাত পাকের অধ্যয়ন, রোযা, নামায এবং অন্যান্য শরয়ী বিধিবিধান যেমন যাহেরী সংশোধনের জন্যে যথেষ্ট, তেমনি করে বাতেনের পূর্ণতা লাভের মাধ্যমও এগুলোই। এতোদ্দেশ্যে এসব জিনিস থেকে পৃথক কোনো সাধনার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু বাতেনী ইলমের অর্থ হয় সেই দর্শন, যা গ্রীক, রোম, ইরান ও ভারতবর্ষ থেকে আগমন করেছে এবং মুসলমানদের মধ্যে চালু হয়েছে, তা যে জিনিসের বাতেনই হোক না কেন, ইসলামের বাতেন কোনো অবস্থাতেই নয়। এসব দর্শনের দৃষ্টিতে যে জিনিসকে 'প্রকৃত' জিনিস মনে করা হয়েছে তার মুশাহাদা লাভের উদ্দেশ্যে যে কঠোর সাধনা করা হয় এবং তাতে মানুষ যে কাশফ এবং অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর কাজ করতে সমর্থ হয়, সেগুলোর স্বরূপ যতোই ইসলামী নামায রোযার সাথে সামঞ্জস্যশীল হোকনা কেন এবং সেগুলোতে যতোই ইসলামী পরিভাষা ব্যবহার করা হোক না কেন, কোনো অবস্থাতেই সেগুলো ইসলামী ইবাদতের সংজ্ঞায় পড়েনা। কেননা, সেগুলোর উদ্দেশ্য ইসলামী ইবাদতের উদ্দেশ্য থেকে এবং সেগুলোর নিয়ম পদ্ধতি রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্ধারিত নিয়ম পদ্ধতি থেকে ভিন্নতর। তরজমানুল কুরআন ঃ জমাঃ আউয়াল ১৩৬৫ হিঃ, এপ্রিল ১৯৪৬ ইং।

মুসলমানদের হাবশা আক্রমণ না করার কারণ

প্রশ্ন ঃ খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মিশর বিজয়ের পর হাবশা (বর্তমান ইথিউপিয়া) বিজয়ের পদক্ষেপ নেয়া হয়নি কেন? এর কারণ কি শুধু এই ছিলো যে, এখানকার একজন সাবেক শাসক মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছিলেন এবং একজন সাবেক বাদশাহ মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন।

জবাব ঃ এ প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে আমাদের নিকট যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ মওজুদ নেই। অবশ্য আবু দাউদ এবং মুসনাদে আহমদে একটা বর্ণনা পাওয়া যায়। তা থেকে জানা যায়, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাবশা সম্পর্কে এ পলিসি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে ঃ "হাবশার লোকেরা যতোদিন তোমাদের বিরোধিতা না করবে ততোদিন তোমরাও তাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযান চালাবেনা।" সম্ভবত এ নির্দেশিকার ভিত্তিতেই খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে হাবশার দিকে কোনো অভিযান চালানো হয়নি। রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভবত এ বিবেচনা করে উক্ত নির্দেশ দিয়েছেন যে, যেহেতু মুসলমানদের বিপদকালে তারা মুসলমানদের আশ্রয় দিয়েছিলো, সেজন্যে তারা ইসলামের বিরোধিতা করার পূর্বে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তাদের আক্রমণ করা হবেনা। কারণ, তা না হলে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হতে পারে এবং মুসলমানদেরকে অকৃতজ্ঞ দল মনে করার অবকাশ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু এছাড়া এর আরেকটি কারণও নযরে পড়ে। তা হলো, হাবশার ভৌগলিক অবস্থান এবং পূর্ব ইতিহাস লক্ষ্য করে নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভবত এ ধারণা করেছিলেন যে, ইসলামের ভৌগলিক কেন্দ্রস্থল হেজাযের নিরাপত্তার জন্যে হাবশার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা প্রয়োজন। এদিকে লক্ষ্য করেই সম্ভবত তিনি পলিসি নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন যে, দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে সে দেশে ইসলাম প্রচার করতে হবে এবং যতোটা সম্ভব সামরিক অভিযান থেকে বিরত থাকতে হবে। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শা'বান ১৩৬৩ হিঃ, জুলাই-আগষ্ট ১৯৪৩ ঈসায়ী।

জীবন ও জাগতিক বিবর্তন

প্রশ্ন ঃ তরজমানুল কুরআন পত্রিকা, ভলিউম ঃ ৪, সংখ্যা ঃ ৬, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯৬-৩৯৭তে 'ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা' শিরোনামে বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপনার পরিণতি সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন তা আমি ভালভাবে বুঝতে চাই। আপনি লিখেছেন ঃ "এ বিধি ব্যবস্থার বিবর্তনের গতি উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে। সকল পরিবর্তন ও বিপ্লবের লক্ষ্য হলো, অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণতার দিকে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি"। তবে এ অগ্রগতির স্বরূপ কি? এটা কি পাশবিক জীবনের অগ্রগতি?

নাকি বস্তুগত ও মানবিক জীবনের? আর নাকি সামগ্রিকভাবে গোটা বিশ্ব ব্যবস্থাপনায় এই অগ্রগতি কার্যকর রয়েছে? প্রতিটি বিবর্তন যদি অগ্রগতি হয়ে থাকে, তবে তো এটা সেই জিনিস যা হেগেল তার Thesis and Antithesis এ এবং ডারউইন তার Servival of the fittest মতবাদে উপস্থাপন করেছে। মেহেরবানী পূর্বক বক্তব্যটা পরিষ্কার করবেন।

জবাব : *আমার গ্রন্থে আমি যে বিবর্তন ও অগ্রগতির কথা আলোচনা করেছি তা ডারউইন এবং হেগেল উভয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। হেগেল তো চিন্তা ও কল্পনার ক্ষেত্রে সংঘাতবাদী এবং তিনি মনে করেন যে, এ সংঘাতের কারণেই চিন্তা ও কল্পনার অগ্রগতি সাধিত হয়। আর ডারউইনের মতে জীবনের বিবর্তন সাধিত হয়। তিনি মনে করেন এ বিবর্তন টিকে থাকার সংগ্রাম (Struggle for existance), প্রাকৃতিক বাছাই (Natural selection) এবং যোগ্যতমের স্থায়িত্ব (Servival of the fittest) এ নীতির অধীনে ঘটে থাকে। এর সম্পূর্ণ বিপরীত আপনার উদ্ধৃত বাক্যে আমি যে কথা বলেছি তা হলো আল্লাহ তাঁর কুদরতের দ্বারা নিম্নমানের জিনিস দ্বারা সৃষ্টির সূচনা করে ক্রমান্বয়ে উন্নতমানের জিনিস পয়দা করে আসছেন। যেমন সর্বপ্রথম জড়বস্তু সৃষ্টি করা হয়েছে, অতপর উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয়েছে, অতপর জীবজন্তু এবং এর মধ্যেও নিম্নমানের জীবজন্তু প্রথমে সৃষ্টি করা হয়েছে অতপর ক্রমান্বয়ে উন্নতমানের জন্তু জানোয়ার পয়দা করা হয়, এমনকি সর্বাধিক উন্নত শ্রেণী মানুষকে সৃষ্টি করা হয়। এ কুদরতী নিয়ম সামগ্রিক জগতের পর্যায়েও জারি হওয়া উচিত। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে জগতের বর্তমান ব্যবস্থাপনাও অসম্পূর্ণ। সুতরাং এরপর এমন একটি জগত হওয়া চাই যা হবে সর্বদিক দিয়ে এর চাইতে পূর্ণাংগ। বস্তুত সেই পূর্ণাংগ জগতের নামই আখিরাত। আমার মতে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থার পর আখিরাতের আগমন খোদায়ী অগ্রগতি ও বিবর্তন নীতির এক অপরিহার্য দাবী। তরজমানুল কুরআন : মুহাররম-সফর ১৩৬৪ হিঃ, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ ঈসায়ী।*

অর্থনৈতিক জিজ্ঞাসা

সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কতিপয় প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ সরকার একদল লোককে কম মূল্যে কিছু জিনিস সরবরাহ করে এবং আরেকদল লোককে এ সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখে। এখন প্রশ্ন হলো, শেষোক্ত দলের কোনো লোক প্রথমোক্ত দলের কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে এ সরকারী সুবিধা গ্রহণ করতে পারে কি? উদাহরণ স্বরূপ, মানবিক কারণে বা চাপের মুখে সুবিধাভোগী দলের কোনো ব্যক্তি বঞ্চিতদলের কোনো ব্যক্তিকে নিজ নামে কম মূল্যে কোনো জিনিস কিনে দিতে পারে কি? কিংবা তার কোনো পুরানো জিনিস নতুন জিনিস দ্বারা বদল করার শরয়ী অনুমতি আছে কি?

জবাব ঃ প্রকৃতপক্ষে আপনার প্রশ্নের দুটি ভিন্ন ভিন্ন দিক রয়েছে এবং সেগুলোর শরয়ী বিধানও পৃথক পৃথক।

এর প্রথম দিকটা হলো, কোনো বিশেষ শ্রেণীর লোকদেরকে সস্তা মূল্যের সুবিধা দেয়া হয়েছে। এখন তাদের থেকে অন্য শ্রেণীর লোকেরা সুবিধা ভোগ করতে পারবে কিনা? সরকারী আইনে এটা অবৈধ হলে হোক, কিন্তু এতে নৈতিক দিক থেকে আমি কোনো অন্যায় দেখছিনা। আসলে দ্রব্যমূল্যের এখনকার এ উর্ধ্বগতি কোনো প্রকৃত সংকটের ফল নয়, বরঞ্চ সরকার এবং পুঁজিপতি শ্রেণীর লোকেরা ইচ্ছাকৃতভাবে এ কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছে[১]। এ সংকট সৃষ্টির মাধ্যমে অন্যায়ভাবে সাধারণ নাগরিকদেরকে মুসীবতে নিমজ্জিত করা হয়েছে। বিশেষ শ্রেণীর লোকদেরকে সস্তা মূল্যের যে সুবিধা দেয়া হয়েছে, মূলত দেশের সকল নাগরিকেরই সে অধিকার ছিলো। কিন্তু সরকার দেশে সাধারণ সংকট সৃষ্টি করে নিজের বিশেষ খিদমতগারদেরকে এ উদ্দেশ্যে কিছু সুবিধা দিয়েছে, যাতে করে এ সুবিধার লোভে লোকেরা তার খিদমতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর খাদেমদের এ সুবিধা প্রদান করার কারণ হলো, তারা যেনো সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। এরূপ উদ্দেশ্যই আসলে অবৈধ। তাই কোনো ব্যক্তি সরকারের এরূপ কোনো অন্যায় বিধিনিষেধ ভংগ করলে সে কেন নৈতিক অপরাধী হবে, তা আমার বুঝে আসেনা?

প্রশ্নের দ্বিতীয় দিকটা হলো, পুরানো জিনিস দিয়ে গোপনভাবে কোনো নতুন জিনিস বদলিয়ে নেয়া যাবে কিনা? এটা অবশ্যি একটা নৈতিকতা বিরোধী কাজ। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিকে এ ধরনের কাজ থেকে দূরে থাকা উচিত।

---

১. মনে রাখা দরকার যে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল -অনুবাদক।

প্রশ্ন ঃ এটা কন্ট্রোল রেটের যুগ। কিন্তু দোকানদাররা কন্ট্রোল রেটে কোনো মাল পায়না। তারা কালোবাজারীতে (Black Market) মাল খরিদ করে গ্রাহকদের সরবরাহ করে। এ ধরনের মাল কন্ট্রোল রেটে বিক্রি করলে তার যে লোকসান হবে, তা একেবারে জানা কথা। তাই বাধ্য হয়ে তারা দর বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু কেউ কেউ এরূপ কেনাবেচাকে বেঈমানী বলে আখ্যায়িত করেন এবং পুলিশও তাদের উপর চড়াও হয়। এ বিষয়ে শরীয়তের হুকুম কি?

জবাব ঃ নৈতিক দিক থেকে সরকার ততোক্ষণ পর্যন্ত কোনো মালের মূল্য নিয়ন্ত্রণের (Price control) অধিকার রাখেনা, যতোক্ষণ না সে নিজের নির্ধারিত মূল্যে লোকদের মাল সরবরাহ করতে সক্ষম হবে। মাল সাপ্লাই না করে কেবল মূল্য নির্ধারণ করার ফল এরূপ দাঁড়াতে বাধ্য যে, এতে মজুতদাররা মাল লুকিয়ে রেখে বিক্রি বন্ধ করে দেবে, কিংবা আইনকে ফাঁকি দিয়ে গোপনে বেশী দামে বিক্রি করবে। যে সরকার কেবল পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমেই নয়, বরঞ্চ অভিজ্ঞতার আলোকে এ পরিণতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া সত্ত্বেও শুধুমাত্র মূল্য নির্ধারণের পন্থা অবলম্বন করে, ক্রেতা সাধারণ এবং ব্যবসায়ীদেরকে তার নির্ধারিত মূল্যের অনুসরণ করতে বাধ্য করার কোনো অধিকার নৈতিকভাবে তার নেই।

এরূপ পরিস্থিতিতে এটাই দেখা যায় যে, ক্রেতা সাধারণ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা যদি মওজুতদার ও মহাজনদের নিকট থেকে সরকার নির্ধারিত মূল্যে কোনো জিনিস ক্রয় করতে চায়, তবে তাদেরকে বিমুখ হয়ে ফিরে আসতে হয়। তাদেরকে যদি কালোবাজারীতেই মাল ক্রয় করতে হয়, তবে তাদের পক্ষে খোলাবাজারে সরকার নির্ধারিত মূল্যে মাল বিক্রয় করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে? এমতাবস্থায় নিজের প্রয়োজনীয় রোজগার, কিংবা জরুরত মেটানোর জন্যে কালোবাজারী থেকে মাল ক্রয় করলে সে কখনো নৈতিক অপরাধে অপরাধী হতে পারেনা। সে যদি এ মাল সরকার নির্ধারিত মূল্যের চাইতে অধিক মূল্যে বিক্রি করে, তবু কোনো অবস্থাতে সে নৈতিক অপরাধী হয়না। এরূপ কোনো ব্যক্তিকে বন্দী করে যদি দণ্ড প্রয়োগ করা হয়, তবে এটা হবে সরকারের অতিরিক্ত আরেকটি যুলুম।

জামায়াতে ইসলামীর সদস্যদের মধ্যে যারা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, তাদের কেউ যদি এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হন, তবে তিনি যেনো উকিল ছাড়াই আদালতে হাযির হন। উপরে বর্ণিত গোটা পরিস্থিতি তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে পেশ করবেন। তিনি যেনো নির্দ্বিধায় তাদের বলে দেন, এমতাবস্থায়ও যদি আপনাদের ন্যায়ানুভূতি আমাদের অপরাধী বলে সাব্যস্ত করে, তবে অবশ্যি আমাদের শাস্তি

দেবেন। কিন্তু আমরা আপনাদের এসব আদালতের চাইতেও এক উচ্চতম আদালতের আশা রাখি। সেই আদালত অবশ্যি আমাদের ও আপনাদের মাঝে সুবিচার করবেন।

যেহেতু "মূল্য নিয়ন্ত্রণের" কথা আলোচিত হয়েছে, তাই প্রসংগক্রমে এখানে আমি সংক্ষেপে এ সম্পর্কিত ইসলামের নীতি বলে দিতে চাই।

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় একবার মদীনায় দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। লোকেরা নবী পাকের নিকট আরয করলো; আপনি মূল্য বেঁধে দিন। জবাবে তিনি বললেনঃ

"মূল্য বৃদ্ধি এবং কমতির ব্যাপারটা আল্লাহর হাতে (অর্থাৎ প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন)। আর আমি আল্লাহ্‌র নিকট এমন অবস্থায় উপস্থিত হতে চাই যে, আমার বিরুদ্ধে যুলম এবং না ইনসাফীর কোনো অভিযোগকারী থাকবেনা।"

এরপর তিনি তাঁর খোতবায়, কথাবার্তায় এবং লোকদের সংগে সাক্ষাতকালে ক্রমাগতভাবে একথা বলতে থাকলেন যে ঃ

اَلْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَّالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ

"বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহকারীরা অনুগ্রহ লাভ করে আর মওজুতদাররা লাভ করে অভিশাপ।"

তিনি বলেন ঃ

"মূল্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে চল্লিশ দিন খাদ্য সামগ্রী মওজুত রাখে, আল্লাহ তার সাথে এবং সে আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন।"

"কতইনা নিকৃষ্ট সে ব্যক্তি যে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী বাজারে সরবরাহ বন্ধ করে দেয় এবং দাম কমলে বেজার হয় আর দাম বাড়লে খুশী হয়।"

"কোনো ব্যক্তি চল্লিশ দিন খাদ্যসামগ্রী মওজুত রাখার পর সেগুলো যদি দানও করে দেয় তবু তার এ মওজুতদারীর গুনাহের কাফফারা হবেনা।"

নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে মওজুতদারী ও অবৈধ মুনাফাখোরীর বিরুদ্ধে অবিরাম প্রচার ও প্রশিক্ষণের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। এতে করে ব্যবসায়ীরা নিজেরাই পরিশুদ্ধ হয়ে যায় এবং যেসব দ্রব্যসামগ্রী মওজুত করা হয়েছিলো, তা সব খোলাবাজারে এসে যায়।

সর্বোত্তম নৈতিক গুণাবলীর উপর প্রতিষ্ঠিত সরকারের এ হলো কর্মনীতি। এরূপ সরকারের আসল শক্তি পুলিশ, আদালত, মূল্য নিয়ন্ত্রণ কিংবা অর্ডিন্যান্স নয়; বরঞ্চ সে মানব হৃদয়ের কন্দর থেকে খারাবী বের করে দেয়, মানুষের নিয়্যাত তথা লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে পরিশুদ্ধ করে দেয়, ধ্যান ধারণা ও মানসিকতার পরিবর্তন সাধন করে দেয়, সম্মান ও মর্যাদার মাপকাঠি পরিবর্তন করে দেয়।

মানুষকে সেচ্ছায় সেই সব বিধানের অনুগত বানিয়ে দেয়, যা সঠিক নৈতিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত। এর বিপরীত এসব দুনিয়াদার শাসকগোষ্ঠী, যাদের নিজেদের নিয়্যত ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যই ভ্রান্ত, যারা নিজেরাই নৈতিকভাবে অধঃপতিত, শাসন চালানোর জন্যে যাদের নিকট বল প্রয়োগ ছাড়া দ্বিতীয় কোনো হাতিয়ার নেই, তারা এরূপ অবস্থার সম্মুখীন হলে বল প্রয়োগ করে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার চেষ্টা করে এবং নৈতিক সংশোধনের প্রক্রিয়া অবলম্বনের পরিবর্তে সাধারণ মানুষের নৈতিক অধঃপতনের যেটুকু বাকী আছে সেটুকুও অধঃপতিত করে ছাড়ে। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শাওয়াল ১৩৬৩ হিঃ, জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪ ঈসায়ী।

সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত আরেকটি প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ আড়তদারী করতে গিয়ে আমাদেরকে গম ক্রয় করতে হয়। বর্তমানে গম ক্রয় বিক্রয়ের জন্যে কন্ট্রোল রেট নির্ধারিত আছে। কিন্তু এ নির্ধারিত মূল্যে গম পাওয়া সম্ভব নয়। বাজারের সকল ব্যবসায়ী নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশী মূল্যে কেনাবেচা করে, কিন্তু রেজিষ্টার বইতে লিপিবদ্ধ করে কন্ট্রোল রেট। দোকানদার কন্ট্রোল রেটের চেয়ে বেশী যে দাম দেয় এবং নেয় তার হিসাব খাতায় উঠেনা, বরঞ্চ সেটা তার পকেটের সাথে সম্পর্কিত। এখন মেহেরবানী করে বলুন, নিজের ব্যবহার এবং ব্যবসায়ের জন্যে কি এভাবে গম ক্রয় করা বৈধ? তাছাড়া এটাও বলে দিন যে, এ ধরনের কাজের কারণে যদি আদালতে হাযির হতে হয় প্রতিটি মুহূর্তে যার আশংকা রয়েছে, তবে সেখানে কি খাতায় লিখিত মিথ্যা বক্তব্য পেশ করা যাবে? প্রকাশ থাকে যে, আদালতে সত্য কথা বলা হলে ডিফেন্স অব ইণ্ডিয়া রুলসের অধীনে আদালত নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা হবে।

জবাব ঃ এরূপ অবস্থায় নিজের ব্যবহারের জন্যে তো আপনি অবশ্যি গম ক্রয় করতে পারবেন। কারণ তাতে হিসাব লিপিবদ্ধ করার কোনো প্রশ্ন নেই। তবে দোকানের জন্যে ক্রয় করলে যেহেতু তা খাতায় লিখতে হয়, অথচ যে দামে ক্রয় করা হয় হুবহু সে হিসাব খাতায় লেখাটা বিপজ্জনক। তাই, এ ব্যবসা না করে সারতে পারলে তাই ভালো। আর যদি এটাই আপনার জীবিকার একমাত্র উৎস হয়ে থাকে এবং এছাড়া অন্য কোনো প্রকারে জীবিকা উপার্জন সম্ভব না হয় তবে জায়েযভাবে আপনি যে পন্থা অবলম্বন করতে পারেন তা হলো, আপনি আপনার সত্যিকার ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব রাখবেন। এতে আপনাকে পাকড়াও করা হলে আদালতে বিলকুল সত্যসত্য কথা বলবেন। সেখানে বলিষ্ঠভাবে বলবেন যে,

সরকারের ভ্রান্ত পলিসি গোটা দেশবাসীকে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করেছে। যেহেতু সরকার নিজে দ্রব্যমূল্য কন্ট্রোল করেছে, সেজন্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী কন্ট্রোল রেটে সরবরাহ করার দায়িত্বও সরকারেরই নেয়া উচিত ছিলো। কিন্তু সরকার এ ব্যবস্থা গ্রহণ না করেই মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছে। এখন যদি সেই নির্ধারিত মূল্যেই আমাদেরকে মালামাল কিনতে বাধ্য করা হয়, তবে বাজার থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী সংগ্রহ করা অসম্ভব। কন্ট্রোল রেটের নাম উচ্চারণ করতেই বিক্রেতারা মাল আছে বলেই স্বীকার করেনা। আর কালোবাজারী করতে গেলে আপনারা দণ্ড প্রয়োগ করতে প্রস্তুত হয়ে যান। অবস্থা যাই হোকনা কেন, যে দামে মাল ক্রয় করেছি, তাইতো আমরা খাতায় লিখবো। আপনাদের আইনের পাকড়াও থেকে বাঁচার জন্যে আমরা সেরূপ মিথ্যা বলার নীতি অবলম্বন করতে পারবোনা, যা দেশের লক্ষ কোটি নাগরিক বাধ্য হয়ে অবলম্বন করছে। আপনার সুবিচার যদি আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করে, তবে শাস্তি দিন। কিন্তু সুবিচারের দৃষ্টিতে তো যারা কন্ট্রোল অর্ডিন্যান্স জারি করেছে, সেই সব ভদ্রলোকদের থেকে আরম্ভ করে নীচ পর্যন্ত সেই অর্ডিন্যান্স প্রয়োগকারী সকল আমলাই প্রকৃত অপরাধী। তাদের বল প্রয়োগের কারণে গোটা দেশবাসী মিথ্যা এবং বেঈমানীর পন্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে। তরজমানুল কুরআন ঃ রবীউসসানী ১৩৬৫ হিঃ, মার্চ ১৯৪৬ ঈসায়ী।

বিক্রয় কর

প্রশ্ন ঃ আমি কাপড়ের ব্যবসা করি। ১৯৪৮ সালের পহেলা এপ্রিল থেকে আমাদের উপর বিক্রয় কর আরোপ করা হয়েছে এবং গ্রাহকদের থেকে এ টেক্স উসূল করে নেয়ার ইখতিয়ারও আমাদের দেয়া হয়েছে। কিন্তু সাধারণভাবে ব্যবসায়ীরা এ টেক্স গ্রাহকদের থেকেও উসূল করেনা আর নিজেরাও পরিশোধ করেনা। টেক্স থেকে বাঁচার জন্যে তারা একটা বিশেষ পন্থা অবলম্বন করছে। তা হলো, তারা প্রতিদিনকার প্রকৃত ক্রয় বিক্রয়ের হিসাব নিয়ম মাফিক রেজিষ্টার খাতায় লেখেনা। সরকারী পর্যবেক্ষকদের তারা আলাদা বানোয়াট খাতা দেখায়। এ খাতায় কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয় দেখা দিলে ঘুষের মাধ্যমে সরকারী পর্যবেক্ষকদের মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়। অন্যান্য ব্যবসায়ীদের জন্যে তো বানোয়াট কাজ এবং ঘুষ প্রদান সহজ ব্যাপার। কিন্তু এমতাবস্থায় একজন ঈমানদার ব্যবসায়ী কি করবে? ক্রেতাদের নিকট থেকে টেক্স আদায় করলে তার মাল বিক্রয় হয়না। কেননা, পাশের দোকানদারই বিনা টেক্সে তার কাছে মাল বিক্রি করার জন্যে বসে আছে। অপরদিকে ক্রেতাদের নিকট থেকে টেক্স উসূল না করলে তাকে নিজ লভ্যাংশ থেকে টেক্স পরিশোধ করতে হয়, এমতাবস্থায়

অনেক সময় তার কোনো লাভই থাকেনা। তাছাড়া অনেক মালের লাভ এতো কম যে পুরা লভ্যাংশ দেয়ার পর নিজের পুঁজি থেকেও কিছু টেক্স হিসেবে দিতে হয়। এখন প্রশ্ন হলো, আমরা কি ব্যবসা ছেড়ে দেব, না বানোয়াট হিসাব রাখতে শুরু করবো?

আরো দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, আমরা যারা সঠিক হিসাব রাখি, সরকারী পর্যবেক্ষকরা আমাদের হিসাবকেও বানোয়াট হিসাব মনে করে। কেননা যেখানে ৯৯% জন ব্যবসায়ী বানোয়াট হিসাব রাখে সেখানে ১% জন সঠিক হিসাব সংরক্ষণ করে বলে তাদের বিশ্বাসই হয়না। এজন্যে আমাদের বিক্রিও আরো অনেক বেশী অনুমান করে আমাদের থেকে অধিক টেক্স দাবী করে। এখন এ অধিক টেক্স থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে আমরা কি ঘুষ দেবো? নাকি ঈমানদারীর ক্ষতিপূরণ হিসেবে অতিরিক্ত টেক্স পরিশোধ করবো?

জবাব ঃ এ প্রশ্ন আসলে আমার নিকট না করে সরকারের নিকট করা উচিত ছিল। তার সৃষ্ট সমস্যার সমাধান তারই করা উচিত। এ ধরনের প্রশ্ন যদি তাদের কাছে পাঠানো হয় তবে আশ্চর্যের ব্যাপার নয় যে সরকারী দায়িত্বশীলদের বিবেক তাদেরকে এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতে বাধ্য করবে যে, তাদের কর্মপন্থায় কোথায় ভ্রান্তি রয়েছে যার ফলে গোটা জাতি মিথ্যা, খিয়ানত ও বেঈমানীর প্রশিক্ষণ পাচ্ছে!

তাছাড়া এটাও চিন্তার বিষয় যে, এতোদিন তো বিজাতীয়রা নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্যে আমাদের উপর শাসন চালিয়ে আসছিলো। এজন্যে সে সরকারের উপর মানুষের আস্থা ছিলনা এবং তাদের প্রতি কোনো প্রকার আগ্রহ এবং ভালবাসাও ছিলনা। তাছাড়া জনগণ নিজেদের ওপর তাদের কোনো অধিকারও স্বীকার করতোনা। কিন্তু এখনতো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যে পাকিস্তানের জন্যে জাতি বহু বছর দেওয়ানা হয়েছিলো, আর তার শাসনভারও সেসব লোকই গ্রহণ করেছে যারা ছিলো জাতির প্রিয় নেতা। এখন সেই পাকিস্তানের শাসন ব্যবস্থা চালাতে, এর ভিত্তি মজবুত করতে এবং একে উন্নতির দিকে নিয়ে যেতে যখন টেক্স ধার্য করা হয়েছে, তখন জাতির বিরাট সংখ্যক লোক কেন তা পরিশোধ করতে পিছপা হচ্ছে? জাতির অনুভূতির অভাব এবং অযোগ্যতাই কি এর একমাত্র কারণ? নাকি আমাদের শাসনকর্তাদের দুর্বলতাও এর মধ্যে শামিল রয়েছে? করদাতারা যদি দেখতো যে পাকিস্তানের জন্যে তাদের কাছে যে ত্যাগ ও কুরবানীর দাবী করা হচ্ছে, সেরূপ ত্যাগ আর কুরবানীর নজীর সরকার ও সরকারী কর্মকর্তারাও পেশ করছে এবং তারা যদি এ ব্যাপারে আশ্বস্ত হতো যে তাদের নিকট থেকে যা কিছু নেয়া হচ্ছে, তা গুটিকয়েক লোকের আরাম

আয়েশের জন্যে নয়, বরঞ্চ প্রকৃতপক্ষেই দেশের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য ব্যয় করা হচ্ছে, তারপরও কি তারা নিজ দেশের ব্যয় নির্বাহে অংশগ্রহণ করতে এ ধরনের গড়িমসি করতো?

এ প্রশ্নকর্তা এবং এরূপ সকল ঈমানদার ব্যবসায়ীদের নিকট আমার পরামর্শ হলো, প্রথমত আপনারা সরকারী কর পুরোপুরি পরিশোধ করার চেষ্টা করুন। কিন্তু এ কাজ যদি সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং এভাবে নিজেদের পেট চালানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে, তবে সাধারণ দোকানদারদের অনুসরণ কেবলমাত্র এতোটুকু করতে পারেন যে, বিক্রির কিছু অংশ রেজেষ্ট্রী খাতায় লিখবেন আর কিছু অংশ লিখবেননা। কিন্তু সরকারী পর্যবেক্ষকদের সাথে মিথ্যা বলবেননা এবং তাদেরকে ঘুষও দেবেননা। তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বলে দিতে হবে যে, আমাদের হিসাব অসম্পূর্ণ। এজন্যে আপনারা যদি আমাদের বিরুদ্ধে মুকদ্দমা দায়ের করেন, তবে আমরা সেজন্যও প্রস্তুত আছি। অতপর যদি মুকদ্দমা দায়ের করা হয় তবে আদালতের সামনে দাঁড়িয়ে গোটা বাজারের পূর্ণাঙ্গ চিত্র তাদের সামনে তুলে ধরবেন এবং তাদেরকে একথাও বলে দেবেন যে, এ পরিবেশ একজন ঈমানদার ব্যবসায়ীর জন্যে রুটি রোজগারের পথ কতোটা কঠিন ও দুঃসাধ্য করে দিয়েছে। এ পন্থা অবলম্বন করার মতো কিছু সাহসী লোক পাওয়া গেলে কতইনা ভাল হতো। এ পন্থায় জাতির এ অনুভূতি জাগ্রত করা সহজ হবে যে, বর্তমান ভ্রান্ত রাষ্ট্র ব্যবস্থার কারণে কিভাবে ঈমানদারী অপরাধ এবং বেঈমানী পূণ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। তরজমানুল কুরআন ঃ শাওয়াল ১৩৬৭ হিঃ, আগষ্ট ১৯৪৮ ইং।

বাড়ী ভাড়ায় কালোবাজারী

প্রশ্ন ঃ আমি যে বাড়ীতে ভাড়া থাকি, সে বাড়ীটি আমার পূর্বে একজন ভাড়াটে প্রতিমাসে পঁয়তাল্লিশ টাকা হারে ভাড়া নিয়েছিলেন। শর্ত এই ছিলো যে, দু'মাসের নোটিশে বাড়ী খালী করে দেবেন। সেই ভাড়াটে থেকে আমার ভাই একই শর্তে বাড়িটি ভাড়া নেন এবং আমিও ভাইয়ের ঐ বাড়ীতে থাকতে শুরু করি। আমি বলায় দুই মাস পর বাড়ীর মালিক আমার নামে রসিদ কাটতে থাকেন। আট মাস পর্যন্ত আমরা বরাবর পঁয়তাল্লিশ টাকা ভাড়া দিয়ে আসছি। ভাড়ার অংক বেশী হওয়ায় এ সময়টা আমাদের জন্যে খুব কষ্টে কেটেছে এবং কয়েকবার আমি রেন্ট কন্ট্রোল অফিসে গিয়ে ভাড়া কমানোর দরখাস্ত দেয়ার কথা চিন্তা করেছি। কিন্তু এতে মন স্বস্তি পাচ্ছিলনা। সেপ্টেম্বর মাসে আমরা বাড়ীর মালিককে বাড়ীতে চুনকাম ইত্যাদি করার কথা বলায় তিনি বললেনঃ এটা ভাড়াটেদের দায়িত্ব। আশেপাশের লোকেরাও তাকে বুঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু

তিনি তার নীরবতা ভংগ করে বললেন যে, দু'মাস পর জবাব দেবো। (এ জবাবে সম্ভবত বাড়ী খালি করার হুমকি নিহিত ছিলো)। এ বিষয়ে কিছু গরম কথাবার্তাও হয়। এর ফলে আমি রেন্ট কন্ট্রোলারের অফিসে ভাড়া কমানোর দরখাস্ত দাখিল করে দিই। সেখান থেকে ষোল টাকা এগার আনা মাসিক ভাড়া নির্ধারণ করে দেয়া হয়। কিন্তু এতেও আমি স্বস্তি বোধ করছিলামনা।

যে ভদ্রলোকের মাধ্যমে আমরা এ বাড়ী পেয়েছিলাম তার এবং অন্যান্য বন্ধু বান্ধবদের মধ্যস্থতায় আমরা এ পন্থা মেনে নিই যে, মাসিক ভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকাই দেবো আর আমাদের যতদিন ইচ্ছা এবাড়িতে অবস্থান করবো। আর মালিক যদি কখনো বাড়ী ছাড়তে বাধ্য করেন, তবে শুরু থেকে ষোল টাকা এগার আনা মাসিক ভাড়া হিসেব করা হবে এবং বাড়ীর মালিক অতিরিক্ত টাকা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। ইদানিং বাড়ীর মালিক উক্ত শর্ত আর মানতে রাজী নন। কিন্তু একথা পরিষ্কার যে, তিনি এ শর্ত মানতে বাধ্য।

এখন মেহেরবানী করে জানাবেন যে, ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আমার জন্যে সহী পন্থা কোনটা? তাকে পঁয়তাল্লিশ টাকা হিসেবেই দিতে থাকবো, নাকি ষোল টাকা এগার আনা করে। আর বাড়ীর মালিক যখন বাড়ী খালি করতে বলবেন, তখন বাড়ী খালি করে দেয়া কি আমার জন্যে আবশ্যক? নাকি তার নোটিশ অগ্রাহ্য করে বাড়ী খালি করবোনা? যেহেতু আমি জানি যে, বাড়ীর মালিকের এ বাড়ীতে থাকার প্রয়োজন নেই, বরঞ্চ কেবল ভাড়া বাড়ানোর জন্যেই অপর ভাড়াটেকে দিতে চান। একথাও বলে রাখা ভাল যে, বাড়ীর অস্বাভাবিক স্বল্পতার কারণে মালিক পঁয়তাল্লিশ টাকার পরিবর্তে পঞ্চাশ টাকার ভাড়াটেও পেতে পারেন।

আমাকে স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত জবাব দেবেন। আমি যেনো বাড়ীর মালিককে নসীহত করি কিংবা তার কাছে তার যুলুম স্পষ্ট করে তুলে ধরি, জবাবে এসব কথা লেখার প্রয়োজন নেই। কেননা এগুলো বিফলে যাবে।

আমার দ্বারা যতোটা সম্ভব, আমি প্রকৃত ঘটনা হুবহু পেশ করলাম।

জবাব ঃ বর্তমান অবস্থায় বিভিন্ন শহরে বাড়ীর মালিকরা বাড়ীর স্বল্পতার দরুন চরম অবৈধ ফায়দা লুটতে শুরু করেছে। বিশেষ করে মুহাজিরদের বাড়ীর প্রয়োজনীয়তার কারণে তাদের এ অবৈধ ফায়দা লুটবার কাজ আরো অনেক গুণ বেড়ে গেছে। কেউ এদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হলেও স্বেচ্ছায় এবং খুশী হয়ে হয়না, বরঞ্চ তেমনি বাধ্য হয়ে হয়, যেমন বাধ্য হয় কোনো অভাবী ব্যক্তি সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করতে। এ কারণে এসব চুক্তির কোনো নৈতিক মূল্য বা মর্যাদা নেই। আর প্রকৃতপক্ষে এসব চুক্তি তো এজন্যেই করা হয় যে, সরকারের

পক্ষ থেকে সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার এবং সুবিচারপূর্ণ শর্তাবলীর মাধ্যমে জনগণকে প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেই। এখন সরকার যদি সুবিচারপূর্ণ ভাড়া নির্ধারণের ব্যবস্থা করে থাকে, তবে সে সুযোগ গ্রহণ না করার কোনো কারণ থাকতে পারেনা। সুবিচারের দৃষ্টিতে যে বাড়ীর ভাড়া ষোল টাকা, বাড়ীর মালিক যদি সে বাড়ীর ভাড়া পঁয়তাল্লিশ টাকা আদায় করে, তবে অবশ্যি সে লুটেরা। তার প্রতি আপনি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন, এমন কোনো নৈতিক অধিকার আর তার মধ্যে নেই। দেশে খাদ্যাভাবের কারণে আগামীকাল যে ব্যক্তি কালোবাজারী করতে নামবে এবং দশ টাকা মণ দরে কেনা খাদ্য আশি টাকা মণ দরে বিক্রি করতে শুরু করবে, তাকেও কি মালিকানা অধিকারের জন্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে হবে? আমরা যদি রাষ্ট্রীয় সহযোগিতায় উচিত মূল্যে মাল বিক্রি করতে এদের বাধ্য করতে পারি, তবে কেন তা করবোনা?

ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যাংক পরিচালনার একটি স্কীম

প্রশ্ন : ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে সুদবিহীন ব্যাংক পরিচালনার একটি স্কীম পাঠালাম। স্কীমটি কি শরীয়তের সাথে সামঞ্জস্যশীল, নাকি এর মধ্যে কোনো রদবদলের প্রয়োজন আছে? মেহেরবানী করে পড়ে আমাদের জানাবেন।

স্কীমের সারসংক্ষেপ হলো :

মুসলমান জমিদার, ব্যবসায়ী এবং কৃষক শ্রেণী দীর্ঘকাল থেকে হিন্দু মহাজনদের শোষণের খপ্পরে পড়ে নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। শতকরা পঁচিশ টাকা (২৫%) পর্যন্ত সুদ দিতে দিতে এরা ধ্বংসের গহবরে উপনীত হয়েছে। বড় ব্যবসায়ী এবং জমিদারদের অবস্থাতো মোটামুটি ভালই চলে যাচ্ছে। কিন্তু সুদী ঋণ অসচ্ছল মুসলমানদের অবস্থা একেবারে শোচনীয় করে ছেড়েছে। আমরা চাই সুদবিহীন ঋণ প্রদান এবং যাকাত উসূলের জন্যে মুসলমানদের একটি মুসলিম ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হোক। প্রথমত কোনো এক জেলায় এর পরীক্ষা করা হবে অতপর সারাদেশে তার শাখা প্রতিষ্ঠা করা হবে। নিম্নে প্রস্তাবিত ব্যাংকের কতিপয় মূলনীতি পেশ করা হলো :

১. এ ব্যাংক শরীয়ার পূর্ণ অনুসরণ করবে। একক এবং যুগ্ম সর্বপ্রকার সুদ থেকে পবিত্র থেকে ব্যবসা চালাবে। এ ব্যাংক থেকে অভাবী মুসলমানদের মালসামগ্রী বন্ধকের ভিত্তিতে এবং ব্যবসায়ীদের 'মুদারিবার' এর নীতিমালার ভিত্তিতে ব্যবসায় পুঁজি সরবরাহ করা হবে। ঋণ গ্রহীতাদেরকে চুক্তির ভিত্তিতে এ নিয়ম মেনে চলতে হবে যে, একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তারা নিজেদের মালামাল ও ব্যবসায়িক মূলধনের যাকাত নিয়মিতভাবে ব্যাংকে প্রদান করবে। এ পন্থায় একদিকে মুসলমান ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা বিনা সুদে মূলধন লাভ করে

সুন্দরভাবে নিজেদের ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে এবং সুন্দরভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী অমুসলিম সুদী মহাজনদের মুকাবেলা করতে পারবে। অপরদিকে তারা যাকাত ব্যবস্থা পুনর্জীবিত করার কাজেও অংশীদার হবে, যে যাকাত ব্যবস্থার অবর্তমানে আমাদের গরীব জনসাধারণের বেকারত্ব ও বেরোজগারী সমস্যা সমাধান অযোগ্য হয়ে আছে।

২. যেহেতু এ ব্যাংক খুবই সাদাসিধে এবং পবিত্র পন্থায় জনগণের সাথে চুক্তির ভিত্তিতে লেনদেন করবে, এ কারণে আশা করা যায় যে, খুব সহজেই সরকার থেকে এর আইনগত স্বীকৃতি নেয়া যাবে। প্রয়োজন দেখা দিলে এ জন্যে এ্যাসেম্বলীতে বিল উত্থাপন করা যেতে পারে। প্রথমে মুসলমানদের থেকে বাধ্যতামূলকভাবে যাকাত সংগ্রহের প্রশ্ন সরকারের নিকট উত্থাপন করা হয়েছিলো। কিন্তু এ কারণে তা মঞ্জুর হয়নি যে, এতে মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বী সরকার (Parallul govt.) প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আমাদের বর্তমান প্রস্তাব অনুসারে বাধ্যতামূলক যাকাত কেবল ব্যাংক থেকে চুক্তিবদ্ধ ঋণ গ্রহীতাদের থেকেই আদায় করা হবে। কোনো সরকার চুক্তিবদ্ধ বিষয়ের স্বীকৃতি দানকে অস্বীকার করতে পারেনা।

৩. এ ব্যাংক যাকাত এবং অন্যান্য সাদকা সুশৃংখলভাবে উসূল করার দায়িত্ব নিজ জিম্মায় গ্রহণ করবে। ব্যক্তিগতভাবে যাকাত বন্টন করে দেয়া একটি ত্রুটিপূর্ণ পন্থা। শরীয়ত এর সামাজিক ব্যবস্থাপনা দাবী করে। সুতরাং আমরা মনে করি মুসলমানদের যাবতীয় প্রচার মাধ্যমে এবং প্লাটফরমে আমাদের এ প্রস্তাবের সমর্থন ও সহযোগিতা করা উচিত।

৪. এ ব্যাংকের অনুমোদিত এবং পরিশোধিত মূলধন হবে কমপক্ষে পাঁচ লাখ টাকা। দশ টাকা করে পঞ্চাশ হাজার শেয়ারে এ টাকা পূর্ণ করা হবে। চার লাখ টাকার মূলধন উপযুক্ত শিল্পকারখানায় ইনভেষ্ট করে বৎসরে কমপক্ষে শতকরা ছয় টাকা (৬%) লাভ করা যেতে পারে। বাকী এক লাখ টাকা সাধারণ শ্রেণীর মুসলমান কারিগর ও পেশাজীবী লোকদেরকে ঋণ প্রদানের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেয়া হবে। প্রথমদিকে স্বল্পতার কারণে ঋণ দান করা হবে স্বল্পমেয়াদী।

ব্যবস্থাপনা ব্যয় ব্যবসার লগ্নিকৃত মূলধনের মুনাফার শতকরা পঁচিশ ভাগ অর্থাৎ ছয় হাজার টাকার মধ্যে সমাধা করা হবে। খরচের হিসাব নিম্নরূপ ঃ

	মাসিক বেতন	বাৎসরিক বেতন
একজন ম্যানেজার	টাকা ২০০.০০	টাকা ২,৪০০.০০
একজন একাউন্টেন্ট	টাকা ১০০.০০	টাকা ১,২০০.০০
একজন ষ্টেনো	টাকা ৫০.০০	টাকা ৬০০.০০
দুইজন ক্লার্ক	টাকা ৩০X২	টাকা ৭২০.০০
দুইজন পিয়ন	টাকা ২০X২	টাকা ৪৮০.০০
বিবিধ খরচ		টাকা ৬০০.০০
	সর্বমোট বাৎসরিক খরচ	টাকা ৬,০০০.০০

প্রথম বছর ফার্নিচার, টাইপ মেশিন, স্টীল আলমারী ইদ্যাদি ক্রয় করতেও কয়েক হাজার টাকা ব্যয় হবে। এর জন্যে ব্যবসায় খাতে বিনিয়োগকৃত চার লাখ টাকার শতকরা সম্ভাব্য ছয় টাকা লাভ থেকে শতকরা দুই টাকা পৃথক করে রেখে দিয়েও আমরা অংশীদারদের মধ্যে শতকরা চার টাকা (লাভ) বন্টন করতে পারবো। আর যদি ব্যাংকে জমাকৃত আমানতের লাভও হিসাব করা হয়, তবে অংশীদাররা অবশ্যি আরো অনেক বেশী লাভ পাবে।

উসুলকৃত যাকাতের টাকা কেবলমাত্র শরীয়তের নির্ধারিত খাতেই ব্যয় করা হবে। অন্যান্য সদাকাসমূহও পরিচালকদের 'শূরার' পরামর্শ অনুযায়ী সাধারণ মুসলমানদের উন্নতি ও কল্যাণার্থে ব্যয় করা হবে। পরিচালকদের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে একটি উপযুক্ত লভ্যাংশ জনকল্যাণ ফাণ্ডেও জমা হতে থাকবে। শূরা কেবল এমন সব ব্যক্তিদের নিয়েই গঠন করা হবে যারা হবেন প্রভাবশালী এবং বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সফল প্রতিনিধিত্বে সক্ষম।

৫. ব্যাংকের এ অধিকার থাকবে যে, সে মেয়াদী আমানতসমূহের (Fixed Deposits) টাকা শিল্প, ব্যবসা এবং কৃষিখাতে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করবে। এরূপ মুনাফার একাংশ আমানতদারদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া হবে, যাতে করে লোকেরা আমাদের নিকট আমানত রাখতে উৎসাহী হয়।

আমাদের ব্যাংক নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহের অধিকারী হবে ঃ

ক. এ ব্যাংকের বুনিয়াদ লুটপাটের উদ্দেশ্যে হবেনা। বরঞ্চ এর বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠিত হবে সেবা ও সহযোগিতার মানসিকতার উপর। এজন্যে ব্যাংকটি ঐসব ব্যক্তিদেরই আকর্ষণের বস্তু হবে, যারা মুনাফার পরিবর্তে সেবা করার মানসিকতা পোষণ করে, চাই তারা মুসলিম হোক কিংবা হিন্দু।

খ. এ ব্যাংক সেইসব লোকদের যাকাতও সংগ্রহের চেষ্টা করবে যারা এ ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা নয়।

গ. মেয়াদী আমানতের জন্যে এ ব্যাংক সুদ প্রদান করবেনা। বরঞ্চ আমানতসমূহ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করবে এবং আমানতদারদের সেই মুনাফার অংশ প্রদান করা হবে।

জবাব ঃ সুদবিহীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার এ সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে একটি মুবারক উদ্যোগ এবং আমারও পরামর্শ হলো, আপনারা অবশ্যি এর বাস্তবায়ন প্রচেষ্টায় অবতীর্ণ হোন। তবে আমার মতে ব্যবসাকে যাকাত ও সাদকার সাথে মিলিয়ে মিশিয়ে দেয়া ঠিক নয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অবশ্যি ব্যবসায়িক ধরনের চিন্তা, যোগ্যতা ও তৎপরতা দাবী করে। অপরপক্ষে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান দাবী করে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের চিন্তা, যোগ্যতা ও তৎপরতা। এ উভয় জিনিসকে একাকার করে ফেললে এ আশংকা রয়েছে যে, হয়তো সেবা ও জনকল্যাণের দিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হবে নয়তো ব্যবসায়ের দিক। সুতরাং আপনারা যদি যাকাত এবং সাদাকার সুষ্ঠু আদায় ও বন্টনের ব্যবস্থা করতে চান তবে এজন্যে পৃথক ব্যবস্থাপনার কথা চিন্তা করুন এবং এ উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান কায়েম করুন। এগুলো আদায় বন্টনের নিয়ম কানুন স্বয়ং শরীয়তই আগে থেকে নির্ধারণ করে রেখেছে। যাকাত উসুল ও বন্টন ব্যবস্থার সাথে জড়িত লোকদেরকে শরীয়ত যাকাত থেকেই বেতন ভাতা নেয়ার অধিকার দিয়েছে।

ব্যাংকের কর্মকাণ্ডের সাথে যাকাত সাদাকা উসুল ও বন্টনের কাজকে শামিল করলে এ আশংকাও রয়েছে যে, যাকাত প্রদানকারীরা এ লোভে ব্যাংকে যাকাত প্রদান করবে যাতে করে ব্যাংক থেকে ঋণ লাভ সহজ হয়। অথচ এটা সেই মানসিকতার সম্পূর্ণ খেলাফ, যে মানসিকতার ভিত্তিতে একজন মুসলমানের যাকাত পরিশোধ করা উচিত।

ব্যাংকিং এর জন্যে এটাই উপযুক্ত পন্থা যে, তা সম্পূর্ণরূপে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ও বাণিজ্যিক পন্থায় পরিচালিত হবে। অতি সংক্ষেপে তার মূলনীতি নিম্নরূপ হওয়া উচিত[১] ঃ

১. এ ব্যাংকের মূলধন দু'ভাবে সংগৃহীত হবে। এক, অংশীদারদের শেয়ার (Shares) ; দুই, সেসব লোকদের আমানত (Deposits) যারা সুদ গ্রহণ করতে চায়না।

২. এ ব্যাংক তিন প্রকার কাজ করবে ঃ এক, বিভিন্ন প্রকার শিল্প কারখানা ও ব্যবসায়িক কাজে মূলধন সরবরাহ করা এবং অংশীদারিত্বের নীতির ভিত্তিতে সেগুলোর মুনাফা থেকে ন্যায্য হিস্সা উসুল করে নেয়া। দ্বিতীয়ত, যাবতীয় বৈধ ব্যাংকিং সেবা আঞ্জাম দেয়া যা বর্তমান ব্যাংকগুলো সাধারণভাবে আঞ্জাম দিয়ে থাকে এবং এসব কাজের ফিস্ আদায় করা। তৃতীয়ত, অভাবী লোকদেরকে সন্তোষজনক জামানত কিংবা দ্রব্যসামগ্রী বন্ধক নিয়ে সুদবিহীন ঋণ প্রদান করা এবং এভাবে বিনা সুদে ব্যবসায়ীদের হুণ্ডি ভাংগানো এবং স্বল্পমেয়াদে তাদেরকে সুদবিহীন ঋণ প্রদান করা।

---

১. এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্যে গ্রন্থকারের 'সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

৩. এর মধ্যে প্রথমোক্ত দুটি পন্থায় অর্জিত টাকা থেকে ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা ব্যয় রেখে দিয়ে বাকী অংশ অংশীদার ও আমানতদারদের মধ্যে যথোপযুক্ত পন্থায় বন্টন করে দিতে হবে।

৪. এ ব্যাংকে টাকা জমা রাখা এবং এর শেয়ার ক্রয় করার জন্যে তিনটি মানসিকতাই যথেষ্ট ঃ

ক. সুদ থেকে বাঁচার আকাংখা

খ. হালাল মুনাফা অর্জনের আশা

গ. স্বীয় অর্থ সম্পদ হিফাযতের নিশ্চয়তা। তরজমানুল কুরআন ঃ জুলাই ১৯৪৬ ইং।

ব্যবসায়ে ইসলামী নৈতিকতা

প্রশ্ন ঃ আমি খাদ্যশস্যের একটা দোকান খুলেছি। বর্তমান কন্ট্রোল সিসটেমের অধীনে সকল শহরে 'খাদ্যশস্য ব্যবসায়ী সমিতি' (Foodgrains Association) প্রতিষ্ঠিত আছে। সরকারের পক্ষ থেকে সমিতিগুলোকে Foodgrain sindicate প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেক সিণ্ডিকেটকে সরকার মাল ক্রয়ের পারমিট দেবে। আগামীতে খাদ্যশস্যের যাবতীয় ব্যবসা শুধুমাত্র সিণ্ডিকেটের পরিচিতিতেই চলবে। লাভ লোকসান সবটাই অংশীদারদের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। আমাদের শহরেও এরূপ সিণ্ডিকেট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গোটা শহরের খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের জন্যে কয়েক লক্ষ টাকার প্রয়োজন। আর সব টাকা যেহেতু সিণ্ডিকেট সদস্যরা নিজেরা দিতে পারবেনা, সেজন্যে ব্যাংক থেকে সুদের ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণ করা হবে এবং সকল অংশীদারদের সাথে সাথে এ সুদী ঋণের অপবিত্রতা আমাদের গায়েও জড়াবে। এ থেকে বাঁচার জন্যে আমরা একটা পন্থা চিন্তা করছি। তা হলো, আমরা আমাদের অংশের গোটা পুঁজি নগদ প্রদান করবো এবং ব্যাংকঋণে অংশীদার হবোনা। এছাড়াও আরেকটি পন্থা আছে। তাহলো সিণ্ডিকেট যদি গোটা কারবারের পুঁজি যোগানে অক্ষম হয় তবে সে এমন কতিপয় ব্যবসায়ী নিযুক্ত করুক যাদের এক চতুর্থাংশ পুঁজি সিণ্ডিকেট প্রদান করবে এবং বাকী তিন চতুর্থাংশ পুঁজি তারা নিজেরা বিনিয়োগ করবে। তাদের এখতিয়ার থাকবে যে, প্রয়োজনে তারা ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করবে, তবে এর সুদ পরিশোধ করবে সিণ্ডিকেট। এ পন্থা গৃহীত হলে গোটা পুঁজি আমরা আমাদের পকেট থেকে বিনিয়োগ করার ইচ্ছা রাখি। ব্যাংকঋণ এবং সুদ দ্বারা আমাদের ব্যবসাকে নোংরা হতে দেবোনা। সিণ্ডিকেট আমাদের এ উভয় প্রস্তাবই কবুল করেছে। উভয়টির যে কোনো একটি আমরা অবলম্বন করতে পারবো। এ বিষয়ে যতো লোকের সাথে আমাদের বিস্তারিত আলাপ আলোচনা

হয়েছে এবং যাদের কাছে আমাদের উদ্দেশ্য খুলে বলার সুযোগ আমরা পেয়েছি, তারা সকলে আমাদের নীতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছে। বণিকরা সবই প্রায় হিন্দু। তারা আমাদের কাজে বিস্মিত হয়ে বলছে, এরা কেমন মুসলমান যে, নীতির জন্যে স্বার্থত্যাগ করছে। তাদের ওপর আমাদের এ সিদ্ধান্তের দারুন নৈতিক প্রভাব পড়েছে। এখন সব কাজে তারা আমাদের নিকট পরামর্শ চায়। আমাদের উপর এখন তাদের খুবই আস্থা এবং বিশ্বাস জন্মেছে। একটি তাজা উদাহরণ পেশ করছি ঃ এক স্থান থেকে দশ হাজার মণ গম ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয়। কেনাকাটার জন্যে একজন হিন্দু বণিককে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তার সাথে আমাদের কোনো একজনকে যাওয়ার ব্যাপারে সমিতি খুব বাড়াবাড়ি করছিল। আমরা বার বার বলেছি যে, ব্যবসায়ের অভিজ্ঞতা আমাদের তেমন নেই। কিন্তু সমিতির অটল সিদ্ধান্তের ফলে শেষ পর্যন্ত আমার যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। পরে আমি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাদের একজন আমাকে খোলাখুলি বলেছে যে, আর যেই যাক না কেন, সে অবশ্যি কোনোনা কোনো প্রকার বেঈমানী করবে। আপনারা নিজেরাও বেঈমানী করবেননা এবং অন্যকে বেঈমানী করতে দেবেননা।

এখন এ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে আপনার কাছ থেকে নির্দেশনা প্রয়োজন ঃ

১. অমুসলিম ব্যবসায়ীদের সাথে তো আপাতত বনিবনা হচ্ছে, কিন্তু ভবিষ্যতে গিয়ে যদি বনিবনা না হয় তবে 'Muslim Trading Association' নামে আলাদা সমিতি প্রতিষ্ঠা করা কি সমীচীন হবেনা? এতে করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে আমরা খোদার নাফরমানী থেকে বেঁচে ব্যবসায় চালানোর চেষ্টা করতে পারবো।

২. হিন্দু মুসলিম বিরোধের ফলে এখানকার পরিস্থিতি নিতান্ত খারাপ। আর মার্কেট যেহেতু হিন্দুদের কব্জায় সেজন্যে মুসলমানদের প্রয়োজনীয় জীবন সামগ্রী সংগ্রহ করতে দারুণ বেগ পেতে হয়। এমতাবস্থায় একটা Muslim Trading Association প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ সমিতির উদ্দেশ্য হলো, মুসলমানরা যেনো তাদের অংশের পূর্ণ কোটা বুঝে পায়। এ সমিতিতে শামিল হয়ে যাবার জন্যে অনেকেই আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু আমরা তাতে জাতিপূজার গন্ধ অনুভব করছি। এজন্যে তা থেকে দূরে অবস্থান করছি। আমাদের এ দৃষ্টিভংগি কি যথার্থ?

৩. আমাদের নীতি ও চরিত্রের কদর করে থাকেন এমন কোনো কোনো হিন্দু ভদ্রলোক একান্ত নিষ্ঠার সংগে আমাদের এ পরামর্শ দিচ্ছেন যে, আপনারা যদি ব্যাংকের সাথে লেনদেন না করেন, তবে সিণ্ডিকেটের সাথে আপনাদের কাজ করা কঠিন হবে। আর পৃথক হয়েও আপনারা ব্যবসায় চালাতে সক্ষম হবেননা।

এখন প্রশ্ন হলো, সত্যিই যদি এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তখন আমরা কি করবো? তখন কি 'বাধ্য হয়ে' ব্যাংকের সাথে 'লেনদেন' করবো?

৪. পাঞ্জাবের শিল্প ডিপার্টমেন্ট এর পক্ষ থেকে ফ্যাক্টরী খোলার জন্যে বার্ষিক গ্র্যান্ট পাওয়া যায়। কারণ সরকার ইণ্ডাষ্ট্রির প্রসার ঘটাতে চায়। আমাদের এখানে খুড়ডীর (কাপড় বুনার তাঁত) কারখানাও আছে। এক বন্ধু সরকারী গ্র্যান্ট পাওয়ার জন্যে দরখাস্ত করতে পরামর্শ দিয়েছেন। কিন্তু আমাদের সন্দেহ রয়েছে, জামায়াতে ইসলামীর রুকন হয়ে আমরা এ গ্র্যান্ট গ্রহণ করতে পারবো কি?

জবাব ঃ আপনারা অমুসলিমদের সাথে ব্যবসায় অংশীদার হয়েও সুদ থেকে বাঁচার যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তার উপর দৃঢ় থাকুন। যদিও এ পথে অনেক পার্থিব ক্ষতির আশংকা আছে এবং অনেক লাভ বেহাত হচ্ছে বলে অনুভব হবে; কিন্তু পরিণতিতে এর অনেক ফায়দা রয়েছে। এতে কেবল আপনাদের পরিণামই দুরস্ত হবেনা, বরঞ্চ আল্লাহ চাহেন তো অন্যান্য খোদার বান্দাহরাও হেদায়ত লাভ করবে। কয়েকদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আপনারা নিজেরাই দেখেছেন যে, মুসলমানরা যথাযথভাবে ইসলামী নীতি অনুযায়ী কাজ করলে গোটা পরিবেশের উপর তার বিরাট প্রভাব পড়ে থাকে।

আপনার প্রশ্নাবলীর জবাব নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. আপনাদের অমুসলিম অংশীদারদের সংগে যদি কখনো আপনাদের বনিবনা না হয় এবং আপনাদেরকে আলাদা ব্যবসায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে তার নাম Muslim Trading Association না রেখে Fair Dealers Association কিংবা এ ধরনেরই অন্য কোন উর্দু বা ইংরেজী নাম রাখবেন। সমিতিতে শরীক হবার জন্যে এমন কতিপয় সুবিচার ও সততার মূলনীতি নির্ধারণ করবেন, যা দেখে প্রত্যেকেই যেনো বলে উঠে যে, এটাই সুবিচার এবং এরি নাম ঈমানদারী। যেমন ঃ সুদ নেবোনা, ধোঁকাবাজী করবোনা, শতকরা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বেশী লাভ করবোনা, বানোয়াট হিসাবের খাতা রাখবোনা, মিথ্যা বলবোনা। ক্রেতাদের ঠিকঠিকভাবে মালের দোষগুণ বলে দেবো। মাপে ওজনে কম দেবোনা ইত্যাদি। অতপর এ সমিতির দরজা হিন্দু, মুসলিম, শিখ সকলের জন্যে খোলা রাখবেন এবং ঘোষণা করে দেবেন যে, এসব শর্ত মেনে নিয়ে যে কেউ আমাদের সাথে শরীক হতে পারে।

২. আপনারা অবশ্যি নিজেদেরকে হিন্দু মুসলিম বিরোধ থেকে মুক্ত রাখবেন। অমুসলিমদের থেকে কখনো যদি ব্যবসায়ের অংশীদারিত্ব আলাদা করতেও হয়, তবে তা যেনো জাতিগত ঝগড়া বিবাদের কারণে না হয়। বরঞ্চ সেটা হবে নীতির প্রশ্নে। আর তাদের থেকে পৃথক হয়ে আপনারা যে ব্যবসায় সমিতি

প্রতিষ্ঠা করবেন, সেটা কেবল কোনো একটি জাতির ব্যবসায়ীদের মধ্যে সীমিত রাখবেননা। বরঞ্চ সেটাকে কতিপয় মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠা করে ঘোষণা করে দেবেন যে, যারা এ নীতিমালা গ্রহণ করবে তারা আমাদের সংগে শরীক হতে পারবে। সকল জাতির লোকদের সাথে বেশী বেশী যোগাযোগ, লেনদেনের সম্পর্ক সৃষ্টি হোক এ চেষ্টাই তো অধিক অধিক আপনাদের করা উচিত। তবেই তো আপনারা তাদেরকে নিজেদের আদর্শের প্রতি আহ্বান করার সুযোগ পাবেন এবং তাদের উপর নৈতিক প্রভাব ফেলতে সক্ষম হবেন। অন্য জাতির লোকদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার অর্থ হবে নিজের চারটি দরজার মধ্যে তিনটি নিজেই বন্ধ করে দেয়া।

৩. আপনারা যদি কখনো দেখেন যে, সুদী লেনদেন ছাড়া বড় রকমের ব্যবসা চালাতে পারছেননা, তখন 'বাধ্য হয়ে' সুদী লেনদেন করার পরিবর্তে বড় ধরনের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে কেবল হালালভাবে যতোটা উপার্জন সম্ভব, তার উপর সবর করুন। আপনারা প্রশ্ন করেছেন ঃ "আমরা কি বাধ্য হয়ে ব্যাংক থেকে লেনদেন করবো?" এটা একটা বিস্ময়কর প্রশ্ন। বাস্তবিকই কি অধিক উপার্জনের জন্যে মানুষ বাধ্য হতে পারে? মৃত্যুপথযাত্রী কোনো ক্ষুধার্ত অবশ্যি এমনটি বলতে পারে যে, আমি বাধ্য হয়েছি কয়েক লোকমা হারাম খাদ্য সংগ্রহ করতে। কিন্তু কোনো সচ্ছল মানুষ যদি বলে হাজার হাজার হারাম টাকা উপার্জনে বাধ্য হয়েছি, তবে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বাধ্য হওয়া। এ ধরনের বাহানা করে নিজেদের জন্যে হারামকে হালাল করার কল্পনা পর্যন্ত করা উচিত নয়। একথাটাও একটু চিন্তা করে দেখুন, আপনাদের নীতি নৈতিকতার কথা সর্বমহলে ব্যাপক প্রচার হয়ে যাবার পর কেবল ব্যবসায়ের সামান্য ক্ষতি এড়ানোর জন্যে যদি আপনারা (সুদী) ব্যাংকের দরজায় গিয়ে নিজেদের তওবা ভংগ করেন, তবে আপনাদের বদনামের কি আর সীমা থাকবে? এমনটি করলে তো আপনারা নিজেরাই প্রমাণ করবেন যে, নীতি কেবল থিওরী, বাস্তব নয়। যে হিন্দু ভদ্রলোক আপনাদের এ পরামর্শ দিচ্ছেন, তাকে বলে দিন যে, আপনার সহানুভূতির জন্যে বহুত শোকরিয়া। কিন্তু আমরা আপনার পরামর্শ অনুযায়ী আমাদের নীতির খেলাফ সুদী কারবারে জড়াতে পারবোনা। আমরা আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি, আমাদের সাথে মিলে একবার সুদবিহীন কারবারের অভিজ্ঞতা লাভ করে দেখুন। এ অভিজ্ঞতা দ্বারা আপনি নিজেই জানতে পারবেন, এটা আমাদের, আপনাদের এবং সকল মানুষের জন্যে সুদী কারবারের চেয়ে উত্তম। আপনারা যদি আমাদের সংগে সহযোগিতা করতে রাজী হন, তবে আমরা একটা সুদবিহীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করবো এবং সেটা সাফল্যজনকভাবে পরিচালনা করে বাস্তবে তার সুফল দেখাতে পারবো।

৪. জামায়াতে ইসলামীর রুকন হিসেবে আপনারা রাষ্ট্রীয় গ্র্যান্ট লাভের দরখাস্ত করতে পারেননা। অবশ্য সরকার যদি আপনাদের নিকট তার গ্র্যান্ট কবুল করার আবেদন করে এবং আপনাদেরকে এ ব্যাপারে আশ্বস্ত করতে পারে যে, গ্র্যান্ট কেবল রাষ্ট্রীয় শিল্পখাতের উন্নতির জন্যেই দেয়া হচ্ছে, আপনাদের মতামত ও ঈমান আকীদা ক্রয়ের জন্যে নয়, তবে সহানুভূতির সাথে তার আবেদন বিবেচনা করা যেতে পারে। তরজমানুল কুরআন ঃ শাবান ১৩৬৫ হিঃ, জুলাই ১৯৪৬ ইং।

সরকারী কন্ট্রোল রেটে মাল ক্রয় করে কালোবাজারীতে বিক্রি করা

প্রশ্ন ঃ একজন ব্যবসায়ী তার ব্যবসায়ে পূর্ণমাত্রায় সৎ ও সত্যবাদী। শরয়ী বিধিমালার পূর্ণ অনুসারী। ব্যবসায় পণ্য তিনি কন্ট্রোল রেটে লাভ করেন। কিন্তু কালোবাজারীর ফলে মার্কেটে অনেক দ্রব্যসামগ্রী চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। এমতাবস্থায় তিনি কি বাজারের প্রচলিত দামে নিজের মাল বিক্রি করার অধিকার রাখেন?

জবাব ঃ কন্ট্রোল রেটে ক্রয় করা মাল কন্ট্রোল রেটেই বিক্রি করতে হবে। কন্ট্রোল রেটে মাল ক্রয় করে কালোবাজারীতে বিক্রি করা সেইসব লোকদের কাজ, যাদের মধ্যে অধিক লাভ করার লোভ ছাড়া অন্য কোনো ভদ্র মানসিকতা বাকী নেই। অবশ্য ঐ ছোট ব্যবসায়ীর জন্যে কেবল বাধ্য হয়ে কালোবাজারীতে মাল বিক্রি করার অবকাশ রয়েছে যার জন্যে কালোবাজারী ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় মাল সংগ্রহ করার পথ নেই। আর এ ব্যবসায় ছাড়া উপার্জনের জন্যে অন্য কোনো ব্যবসা বা চাকুরী গ্রহণেও তিনি সক্ষম নন।

নগদের এক দাম বাকীর আরেক দাম

প্রশ্ন ঃ কোনো দোকানদার যদি নগদ ক্রেতা থেকে কম মূল্য নেন আর বাকী ক্রেতা থেকে বেশী, তবে কি তিনি সুদখোরীর অভিযোগে অভিযুক্ত হবেন? অপর একটি পন্থা আছে বিক্রয়ে সামান্য কিছু কমিশন দেয়া হয়। যেমন প্রতি টাকায় এক পয়সা। এ কমিশনের সুযোগ যদি কেবল নগদ ক্রেতাদের দেয়া হয় আর বাকী ক্রেতাদের না দেয়া হয়, তবে তার শরয়ী বিধান কি?

জবাব ঃ প্রথমটি তো নির্ঘাত সুদের পদ্ধতি। আর দ্বিতীয় পদ্ধতি যদিও পরিভাষার দিক থেকে সুদের সংজ্ঞায় পড়েনা, কিন্তু তার মধ্যে সুদের অন্তরাত্মা বর্তমান রয়েছে। ফিকহর পরিভাষায় যদিও এটা 'রেবা' (ربوا) নয়, কিন্তু

'রীবাহ' (ريبة) অবশ্যি। আর এ রীবাহও পরিত্যাগ করার জিনিস। হাদীসে বলা হয়েছে دَعُوْا الرِّبٰوا وَالرِّيْبَةَ "সুদ পরিত্যাগ করো এবং যাতে সুদের সন্দেহ (কিংবা গন্ধ) আছে তাও পরিত্যাগ করো।"

টেক্স থেকে বাঁচার কোশেশ

প্রশ্ন ঃ আমাদের শহরে এবং সারাদেশে বড় বড় ব্যবসায়ীরা বাইরে থেকে আমদানীকৃত মালের শুল্ক প্রদান করা থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করে। প্রথমত চোরাপথে মাল দোকানে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। এভাবে সম্ভব না হলে শুল্ক ধার্যকারী সরকারী কর্মচারীকে কিছু পয়সা দিয়ে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। কখনো এরূপ করা হয় যে, মাল কম দেখানোর জন্যে নকল ক্যাশমেমো তৈয়ার করে নেয় এবং তার ভিত্তিতে শুল্ক প্রদান করে। এ নকল ক্যাশমেমো অনুযায়ী হিসাবের কৃত্রিম খাতা তৈয়ার করা হয়। যে মালের শুল্ক প্রদান করা হয়না, খাতায় সেটা দেখানোই হয়না। এভাবে মালের আমদানী, বিক্রি এবং মুনাফা সবই বাস্তব অপেক্ষা কম দেখানো হয়। এ পন্থা কি জায়েয?

জবাব ঃ ঘটনার এ গোটা চিত্র নাজায়েয হবার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ করা যেতে পারেনা। যদিও বর্তমান সরকারের আরোপিত টেক্সই নাজায়েয এবং অবৈধ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এ অবৈধ শুল্ক থেকে বাঁচার জন্যে মিথ্যা, বানোয়াট ও ঘুষকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ হতে পারেনা। এভাবে নিজের সম্পদ বাঁচানো যেতে পারে বটে, কিন্তু নৈতিক পুঁজি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। এ পথে আশংকা থাকে যে, ধীরে ধীরে লোকদের সেই নৈতিক অনুভূতিই বিলুপ্ত হয়ে যাবে, যা মানুষকে যাবতীয় লেনদেন ও কায়কারবারে সত্য ও সততার ভিত্তিতে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

বাধ্য হয়ে ঘুষ দেয়া

প্রশ্ন ঃ রেলওয়ে ষ্টেশন থেকে মালের পার্সেল ছাড়াতে গেলে রেলওয়ের ক্লার্ক ঘুষ দাবী করে। ঘুষ দিতে অস্বীকার করলে নানা প্রকার ক্ষতিসাধন এবং কষ্ট প্রদান করে। এমতাবস্থায় একজন মুমিন ব্যবসায়ীর করণীয় কি?

জবাব ঃ এ এক তাজ্জবের বিষয়, এসব লোক যখন সরকার থেকে নিজেদের বেতন এবং এলাউন্স বাড়ানোর জন্যে হরতাল করে, তখন তারা জনগণের সহযোগিতা চায়। আর নিজেদের সে কাজ যখন উদ্ধার হয়ে যায় তখন তারা এ জনগণকেই বিভিন্নভাবে হয়রানি করে, তাদের পকেট ডাকাতি করে। প্রকৃতপক্ষে

এদেরকে সাফ সাফ হুশিয়ার করে দেয়া প্রয়োজন যে, তোমরা যদি জনগণের সংগে সৎ ও বিশ্বস্ত আচরণ না করো, তবে, তোমাদের দাবী দাওয়া আদায়ের ব্যাপারে জনগণের সহযোগিতার আশা করোনা।

এবার মূল প্রশ্নে আসা যাক। এ ব্যাপারে আমি আগেও বহুবার বলেছি যে, সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা অবৈধ কাজ করানোর জন্যে তাদের ঘুষ প্রদান অকাট্যভাবে হারাম। কিন্তু আপনি যদি আপনার বৈধ অধিকারও ঘুষ প্রদান করা ছাড়া লাভ করতে সক্ষম না হন এবং এ ক্ষতি যদি আপনি বরদাশত করতে না পারেন তাছাড়া এসব কর্মচারীদের ব্যাপারে তাদের উর্ধতন অফিসারদের নিকট অভিযোগ করারও সুযোগ না হয় কিংবা অভিযোগ করলেও কোনো ফলোদয় না হয়, তবে বাধ্য হয়ে তাদেরকে ঘুষ দিতে পারেন। তবে সব সময় তাদেরকে উপদেশ দিবেন যে, এটা হারামখোরী এবং এ হারামখোরী থেকে বাঁচার মধ্যেই তোমাদের কল্যাণ রয়েছে।

আড়তের কতিপয় অবৈধ কাজ

প্রশ্ন ঃ আড়তদারীর ব্যবসা সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভংগি কি? আড়তদারদের নিকট দুই প্রকারের ব্যবসায়ীরা এসে থাকে। এক ধরনের ব্যবসায়ীরা নিজেদের পুঁজি দিয়ে মাল ক্রয় করে এনে আড়তদারদের মাধ্যমে বিক্রি করে। আরেক ধরনের ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ে নিজেদের যৎসামান্য পুঁজি খাটায় এবং বাকী পুঁজি আড়তদারদের নিকট থেকে এ শর্তে নেয় যে, নিজেদের ক্রয় করা যাবতীয় মাল ঐ আড়তদারের কাছে বিক্রি করবে এবং বিক্রয়ের সময় আড়তদারের টাকাও পরিশোধ করে দেবে। আড়তদার প্রথমোক্ত ব্যবসায়ীদের থেকে যদি টাকা প্রতি এক পয়সা কমিশন নেয় তাহলে শেষোক্ত ব্যবসায়ীদের থেকে নেয় টাকা প্রতি দুই পয়সা কমিশন। এটা কি জায়েয?

জবাব ঃ কমিশনের ক্ষেত্রে আড়তদারদের এ তারতম্যের নীতি গ্রহণ করা জায়েয নয়। ঋণগ্রহীতা থেকে টাকা প্রতি দু'পয়সা এবং যে ঋণ গ্রহণ করেনি তার কাছ থেকে টাকা প্রতি এক পয়সা কমিশন নেয়া সুদের সংজ্ঞায় পড়ে যায়। ঋণ প্রদানকে ব্যবসায়ের সাথে জড়িত করা উচিত নয়। অবশ্য ঋণ প্রদানের সময় এতোটুকু বাধ্যবাধকতা বৈধ হতে পারে যে, ব্যবসায়ীরা মার্কেট রেটে সেই বিশেষ মাল সেই আড়তদারের নিকট বিক্রি করবে, যার থেকে টাকা নিয়ে তারা ব্যবসা চালাচ্ছে।

প্রশ্ন ঃ আড়তদার বিক্রেতা এবং ক্রেতা উভয়ের নিকট থেকে কমিশন তো নেয়ই, তদুপরি কেনা বেচা হয়ে যাবার পর কিছু পরিমাণ 'তোলা' আদায় করে।

যেমন, মাল যদি ফল হয়ে থাকে তবে সেখান থেকে কয়েকটি নিয়ে নেবে। শবজি হলে কিছু পরিমাণ গ্রহণ করবে। এ 'তোলা' সম্পর্কে শরীয়তের দৃষ্টিভংগি কি?

জবাব ঃ এ তোলা আদায় করা আড়তদারদের বাড়াবাড়ি। কমিশন গ্রহণ করার পর আপনাদের থেকে অন্য কিছু গ্রহণ করার অধিকার তার নেই। মূলত এটা অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছু নয়। এ হস্তক্ষেপের একটা নিষ্পাপ নাম হয়েছে 'তোলা'।

জমিদারীর অপকারিতা

প্রশ্ন ঃ জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্য পড়ে আমি যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছি। মানসিকতার পরিবর্তন ঘটেছে। এ পরিবর্তিত মানসিকতা বর্তমান পরিবেশের সাথে কোনো অবস্থাতেই খাপ খাচ্ছেনা। একটা পেরেশানীর উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

আমাদের পৈত্রিক পেশা হলো জমিদারী। আমার পিতা আমাকে এ কাজেই নিযুক্ত করেছেন। জমিদারীর কাজকর্ম আদালত এবং পুলিশের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গেছে। আদালত এবং পুলিশের সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করার সাথে সাথে জমিদারীর পূর্ণ অর্থনৈতিক মৃত্যু ঘটবে। ব্যাপারটা এতো চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আদালত ও পুলিশের পৃষ্ঠপোষকতা মুক্ত হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ং নিজ কর্মচারী ও কৃষকদের উপর পর্যন্ত জমিদারের কোনো প্রভাব থাকেনা। এমনকি পুলিশও যখন দেখতে পায় যে, কোনো জমিদার তার 'উপরি পাওনার' পথে প্রতিবন্ধক হচ্ছে, তখন সে সেই জমিদারের কৃষক ও কর্মচারীদেরকে তার বিরুদ্ধে উস্কিয়ে দেয়। এভাবে যখনই কর্মচারীদের থেকে আদালতের ভয় দূর হয়ে যায়, তখন তাদের আন্তরিক ইচ্ছা ছাড়া অন্য কিছু তাদেরকে দায়িত্ব পালনে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনা। ব্যক্তিগত স্বার্থ ছাড়া তারা আর কিছুই বুঝেনা। ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট করে তুলে ধরার জন্যে একটা উদাহরণই যথেষ্ট মনে করছি ঃ

আমাদের এখানে এ নিয়ম চলে আসছিল যে, কর্মচারীদের কাজে যদি ত্রুটি থাকতো, কিংবা তারা কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন করতো, তবে তাদের নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হতো। আমি এসে এ ক্ষতিপূরণ আদায় করা বন্ধ করে দিলাম। কারণ পুলিশের সহযোগিতা ছাড়া এ নিয়ম চালু রাখা সম্ভব নয়। আমার দৃষ্টিভংগির এ পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষকরাও ক্ষতিসাধন করতে শুরু করলো। অন্যদিকে কর্মচারীরা জরিমানার টাকা থেকে যে অংশ পেত তা থেকে নিরাশ হয়ে তারাও কৃষকদের দোষত্রুটি এবং যাবতীয় অন্যায় এড়িয়ে যেতে

লাগলো। এখন অবস্থা চরম সীমায় পৌছে গেছে। এমনকি জমিদারী খতম করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে আমি বাধ্য হচ্ছি। আপনার মতামতের ভিত্তিতে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবো বলে মনস্থ করেছি।

জবাব ঃ এ কুফরী রাষ্ট্রব্যবস্থায় জমিদারী করতে গিয়ে পুলিশ ও আদালতের সংগে সম্পর্ক রাখার যে জরুরত সৃষ্টি হয়েছে, সে সম্পর্কে আমি অজ্ঞাত নই। সরকারী আইন কানুনের সীমা থেকে মুক্ত থাকতে চাইলে একজন জমিদার কতোটা ক্ষতির সম্মুখীন হয় তাও আমি জানি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার পরামর্শ হলো, যে ব্যক্তি ইসলামের দাওয়াতী কাজ করতে চায়, তার যাবতীয় কর্মকাণ্ডের সম্পর্ক আইনের আশ্রয়ের পরিবর্তে নৈতিক বুনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা করা উচিত। আর এ নৈতিক বুনিয়াদের উপর টিকে থাকতে গিয়ে সে যতো ক্ষতিরই সম্মুখীন হোকনা তা তার বরদাশত করে নেয়া উচিত। আপনি ইসলামী দাওয়াতের কাজ করবেন নাকি আইনের আশ্রয়ে জমিদারী চালাবেন এটা সিদ্ধান্ত নেয়া এখন আপনারই দায়িত্ব। তবে এ উভয় কাজ একত্রে চলতে পারেনা। যে লোকদের উপর আপনি পুলিশ এবং আদালতের সাহায্যে জমিদারীর দাপট চালাবেন, আপনার নৈতিক প্রভাব দ্বারা তারা কখনো প্রভাবিত হতে পারেনা। আর তাদের প্রতি আপনার এ দাওয়াতও তারা কখনো সত্য বলে মেনে নিতে পারেনা যে, সমস্ত হুকুম ও নির্দেশ দানের মালিক শুধুমাত্র আল্লাহ এবং আইন কেবল আল্লাহরই চলতে হবে।

পুতুল ক্রয়-বিক্রয়

প্রশ্ন ঃ চীনা মাটির তাস, রাবারের পাখী এবং মেয়েদের জন্যে পুতুল প্রভৃতি শিশুদের খেলনা সামগ্রী বিক্রয় করা কি জায়েয? তাছাড়া হিন্দুদের প্রয়োজনে তৈরী পুতুল বিক্রয় করা যেতে পারে কি?

জবাব ঃ শিশুদের খেলনা বিক্রয় করাটা অবৈধ নয়। তবে বিশেষ কোনো খেলনা সামগ্রী শরীয়তের দৃষ্টিতে দোষণীয় হওয়া আলাদা কথা। পশু এবং মানুষের পুতুলের দুটি অবস্থা রয়েছে। এক, নিখুঁতভাবে হুবহু মূর্তি তৈরী করা। দুই, মোটামুটিভাবে কোনো জীবজন্তুর আকৃতি তৈরী করা। যেমন ঃ কাঠের ঘোড়া এবং কাপড়ের পুতুল। প্রথমোক্ত ধরনের মূর্তি পুতুল বিক্রি করা বৈধ নয়। অবশ্য শেষোক্ত ধরনের খেলনা বিক্রি করতে পারেন। হিন্দুদের প্রয়োজনে পুতুল বিক্রি করা সে অবস্থায় হারাম হবে, যদি তা মুশরিকী ধ্যান ধারণার প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন ঃ শ্রীকৃষ্ণ বা রামের প্রতিমূর্তি প্রভৃতি।

বিজ্ঞাপনের ছবি

প্রশ্ন ঃ আজকাল বিজ্ঞাপনের ক্যালেন্ডার প্রভৃতিতে নারীদের ছবি ব্যবহারের ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়েছে। এছাড়া খ্যাতিমান ব্যক্তি এবং জাতীয় নেতাদের ছবিও অনুরূপভাবে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া বাণিজ্যিক জিনিসপত্রের ডিব্বা, বোতল এবং প্যাকেটের উপরও অনুরূপ ছবি ব্যবহার করা হয়। এরূপ বিভিন্ন প্রকার ছবির দাপট থেকে একজন মুসলমান ব্যবসায়ী কিভাবে নিজেকে রক্ষা করতে পারে?

জবাব ঃ আপনি নিজে যদি কোনো বিজ্ঞাপন কিংবা ক্যালেন্ডার ছাপেন তবে তা ছবি মুক্ত রাখবেন। আপনার ব্যক্তিগত প্রয়োজেন যদি ক্যালেন্ডার প্রভৃতি ব্যবহার করতে হয় তবে প্রথমত ছবিবিহীন ব্যবহার করবেন, নতুবা ছবি ঢেকে রাখবেন কিংবা মুছে ফেলবেন। কিন্তু ডিব্বা, বোতল এবং প্যাকেটের ছবি তো সব আর আপনি মুছে ফেলতে পারবেননা। বর্তমান ছবিপূজারী বিশ্ব তো কোনো জিনিসকে ছবি মুক্ত না রাখার ব্যাপারে কসম খেয়ে বসেছে। ডাক টিকেট এবং মুদ্রার উপর পর্যন্ত ছবি ব্যবহার করা হয়। এ সর্বগ্রাসী তাগুতী জীবন ব্যবস্থা নিজের অপবিত্রতা ও নোংরামীকে শিকড় থেকে শাখা প্রশাখা এমনকি পত্রপল্লব পর্যন্ত ছড়িয়ে দিচ্ছে। বাস, নিজের সাধ্যের সীমা পর্যন্ত নিজে আত্মরক্ষা করুন, যাতে বাতিল রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিপত্তি খতম হয়ে যায় এবং ইসলামী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বাতিলের জড় কেটে দিলে শাখা প্রশাখার এমনিতেই ভবলীলা সাঙ্গ হবে।

সিপ এবং দালালী

প্রশ্ন ঃ সাধারণত প্রত্যেক গ্রামেই একজন কামার এবং একজন কাঠমিস্ত্রি থাকে। ভূস্বামীরা এদের দ্বারা কাজ করিয়ে থাকে। কিন্তু তাদের মজুরী নগদ প্রদান করেনা এবং বেতনও দেয়না। বরঞ্চ মওসুমী ফসলের সময় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল ওদেরকে দিয়ে দেয়। এখানকার পরিভাষায় এ কাজটাকে 'সিপ' বলা হয়। ভূস্বামীর লোহা কিংবা কাঠের কোনো সরঞ্জাম কিনতে চাইলে নিজেদের কামার বা কাঠ মিস্ত্রিকে সাথে করে নিয়ে যায়। কামার বা কাঠমিস্ত্রি তাদেরকে এমন কারখানা বা দোকানে নিয়ে যায়, যে কারখানা বা দোকানের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক থাকে। সেখানে যাওয়ার সাথে সাথে এরা চোখের ইংগিতে দোকানদার থেকে ফিস আদায় করে নেয়। ভূস্বামী এ ব্যাপারে কিছুই জানতে পারেনা। দোকানদার যদি কামার বা কাঠমিস্ত্রিকে 'কমিশন' প্রদান না করে তবে সে কখনো নিজ ভূস্বামীকে আর ঐ দোকানে নিয়ে যাবেনা। অন্য

কোনো দোকানে গিয়ে একই কায়দার অনুসরণ করবে। দোকানদার যদি তাদের কমিশন প্রদান করতে রাজী হয়, তবে নিকৃষ্ট মাল দেখালেও তারা সে মালের প্রশংসা করবে এবং সেটাই ভূস্বামীর নিকট বিক্রি করে দেয়ার চেষ্টা করবে। এ ষড়যন্ত্র যদি ভূস্বামীর নিকট ধরা পড়ে তবে সে নিজ কামার বা কাঠমিস্ত্রিকে একদিনও গ্রামে থাকতে দেবেনা। ইসলামের দৃষ্টিতে এ দুটি বিষয় কেমন?

জবাব ঃ 'সিপ' গ্রামাঞ্চলে প্রায় প্রচলিত নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে কারণে এটাকে নাজায়েয বলা যেতে পারেনা। তবে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে যাতে কাউকেও বেগার খাটানো না হয়। অর্থাৎ বাস্তবে যাকে দিয়ে যতোটা খেদমত নেয়া হবে, তার পারিশ্রমিক যেনো সে পরিমাণ দেয়া হয়। নির্দিষ্ট কাজের অতিরিক্ত কোনো কাজ করালে তার জন্যে অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দেয়া উচিত। কেবল জমিদারীর দাপট দেখিয়ে লোকদের থেকে অতিরিক্ত খেদমত নেয়া যুলুম।

দালালীর যে চিত্র আপনি উল্লেখ করেছেন, তা নাজায়েয। কিন্তু আসলে এটা ভূস্বামীদের বাড়াবাড়িরই পরিণাম। পেশাদার লোকেরা কাজকর্ম ছেড়ে বাধ্য হয়ে এদের মাল ক্রয় করার জন্যে যায় এবং এর পারিশ্রমিক দোকানদার থেকে যেনো এভাবে আদায় করে যে, তোমরা যদি আমাদের কমিশন দিতে থাকো, তবে আমরাও তোমাদের নিকৃষ্ট মাল জমিদারদের নিকট বিক্রি করে দেবো। এভাবে সেই দালাল, বিক্রেতা এবং জমিদার তিনজনই নৈতিক অপরাধে অপরাধী হয়। জমিদার যদি ফাও সেবা নেয়া ছেড়ে দেয় এবং সুবিচারের সাথে পরিশ্রমের পারিশ্রমিক দিয়ে, তবে অনৈতিক কাজ সংঘটিত হবার সুযোগই থাকেনা।

ব্যবসায়ে প্রচলিত নিয়মের শরয়ী মর্যাদা কি?

প্রশ্ন ঃ চামড়ার ব্যবসায়ে 'ক্রম' করা হয় এবং এখানে ফুটের মিথ্যা মাপ দেয়া হয়। ঘটনার বিবরণ হলো, মাল তৈয়ার হয় কলকাতায়। মাল প্রস্তুতকারী প্রত্যেক থানে মূল পরিমাণ থেকে ফুটের সংখ্যা অধিক লিখে দেয়। যেমন দশ ফুট থানে লিখে দেয় বার ফুট। অতপর কলকাতার ব্যবসায়ীরা এ মাল খরিদ করে এনে আরো কিছু ফুট বাড়িয়ে লিখে দেয়। অতপর বাইরের ব্যবসায়ীরা যখন মাল কিনে আনে, তখন তারা কিছু ফুট বাড়িয়ে লিখে নেয়। এখানে এসে মোহরাংকিত ফুট লাগানো হয় এবং শেষ পর্যন্ত এটাই থেকে যায়। মার্কেটে সঠিক ফুট লাগানো মাল পাওয়া যায়না। প্রায় সকল কারখানায় এবং সকল ব্যবসায়ী এ নকল ফুট ব্যবহার করে। ক্রেতারা সাধারণভাবে এ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকে। তাই পরিমাপের গড়বড় সম্পর্কে আমরা কোনো ব্যাখ্যা দান

করিনা। কিন্তু কোনো ক্রেতা যদি জিজ্ঞেস করে, তখন আমরা তাকে পরিষ্কারভাবে বলে দিই, মালের ফুট সংখ্যা ভুল লাগানো হয়েছে। আমরা এ ভুল ফুটের হিসেবেই মাল কিনে এনেছি এবং এ হিসাবের উপরই কিছু মুনাফা নিয়ে বিক্রি করি। যেমন, আমরা প্রত্যেক (নকল) ফুট বার আনায় কিনি এবং সাড়ে বার আনায় বিক্রি করি। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ ব্যবসা বৈধ কি?

জবাব ঃ *এ জিনিস যখন এ ব্যবসায়ে প্রচলিত হয়ে গেছে, অর্থাৎ ক্রেতা বিক্রেতা সবাই যখন বিষয়টা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, তখন জিনিসটা জায়েয বলে গণ্য হবে বটে, কিন্তু মিথ্যা ও নকল হিসাব প্রচলিত থাকাটা কোনো ভালো পদ্ধতি নয়। যারা এর হেরফের জানেনা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটি উত্তম ও কল্যাণধর্মী সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে ব্যবসা বাণিজ্যকে এসব 'রহস্য' মুক্ত করা। তরজমানুল কুরআন ঃ রমযান ১৩৬৫ হিঃ, আগষ্ট ১৯৪৬ ইং।*
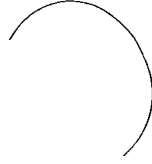
ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিক

প্রশ্ন ঃ আমি হিন্দু মহাসভার কর্মী। গত বছর মহাসভার প্রাদেশিক প্রচার সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছি। আমি আপনার সম্পর্কে জানতে পেরেছি কিছুদিন হলো। ইতোমধ্যে আপনার কতিপয় গ্রন্থও পড়েছি। যেমন, মুসলমান ও বর্তমান রাজনৈতিক সংঘাত ১ম ও ৩য় খন্ড, ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ , ইসলামী বিপ্লবের পথ, শান্তি পথ প্রভৃতি। এ গ্রন্থগুলো অধ্যয়নের ফলে ইসলাম সম্পর্কে আমার ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এ জিনিসটা যদি আরো কিছুকাল আগে প্রতিষ্ঠিত হতো, তবে হিন্দু মুসলমান সমস্যা এতোটা জটিল হতোনা। আপনি যে হুকুমতে ইলাহিয়ার দাওয়াত দিচ্ছেন, তার অধীনে জীবন যাপন করা গৌরবের বিষয়। তবে কতিপয় প্রশ্ন আছে। এগুলোর জবাবের জন্য চিঠিপত্র ছাড়া প্রয়োজন হলে আমি আপনার সান্নিধ্যে হাযির হবো।

আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, হুকুমাতে ইলাহিয়ার অধীনে হিন্দুদেরকে কি মর্যাদা প্রদান করা হবে? তাদেরকে কি আহলে কিতাবদের সমপর্যায়ের অধিকার দেয়া হবে, নাকি যিম্মী ধরা হবে? আহলে কিতাব এবং যিম্মীদের অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ আপনার উক্ত গ্রন্থগুলোতেও নেই। আরবদের সিন্ধু অভিযানের ইতিহাস আমি যতোটা জানি, তাতে দেখা যায় মুহাম্মদ বিন কাসিম এবং তার উত্তরসূরীরা সিন্ধুতে হিন্দুদেরকে আহলে কিতাবের অধিকার প্রদান করেছিল। আশা করি এ বিষয়ে বিস্তারিত ধারণা পেশ করবেন। আহলে কিতাব এবং যিম্মীদের অধিকারের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে তাও লিখবেন। তারা দেশের প্রশাসনিক কাজে সমানভাবে অংশ গ্রহণ করতে পারবে কি? যদি না পারে তবে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে হুকুমতে ইলাহিয়ার অধীনে আপনি হিন্দুদেরকে কোন্ মর্যাদা প্রদান করতে চাচ্ছেন?

দ্বিতীয় প্রশ্ন হলো, কুরআনের ফৌজদারী বিধানসমূহ কি মুসলমানদের মতো হিন্দুদের উপরও কার্যকর হবে? হিন্দুদের জাতীয় আইন (Personal Law) তাদের উপর কার্যকর হবে কিনা ? আমার বক্তব্য হলো হিন্দুরা তাদের উত্তরাধিকার আইন, যৌথ পরিবার ব্যবস্থা, পালক পুত্র গ্রহণ ইত্যাদি বিধিব্যবস্থা অনুযায়ী (মনু শাস্ত্রের ভিত্তিতে) জীবন যাপন করতে পারবে কি? প্রকাশ থাকে যে, প্রশ্নগুলো একজন সত্য সন্ধানীর প্রশ্ন।

জবাব ঃ পত্রে প্রকাশিত আপনার ধ্যান ধারণা আমার নিকট সম্মানার্হ। এটা বাস্তব যে, ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ককে জটিল ও তিক্ত করার ব্যাপারে সেই সব লোকেরাই দায়ী, যারা ন্যায় ও সত্য নীতির পরিবর্তে ব্যক্তিগত

বংশগত, শ্রেণীগত, সম্প্রদায়গত এবং জাতিগত নীতির ভিত্তিতে মানুষের জীবন সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করছে। এর পরিণাম অনিবার্যভাবেই তাই হওয়ার ছিলো যা এখন আমরা স্বচক্ষে দেখছি। আমরা আপনারা সকলেই এ মন্দ পরিণতির সমান অংশীদার। কল্যাণ কেউই লাভ করতে পারিনি।

আপনার প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব ক্রমানুসারে নিম্নে প্রদত্ত হলো ঃ

১. হুকুমতে ইলাহিয়া [ইসলামী রাষ্ট্র] প্রতিষ্ঠিত হলে তার অবস্থা এরূপ হবেনা যে, একটি জাতি বা আরেকটি জাতি অন্য জাতিগুলোর উপর শাসক হয়ে বসবে। বরঞ্চ সে রাষ্ট্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, একটি আদর্শের ভিত্তিতে দেশে সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। একথা পরিষ্কার যে, এরূপ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেশের সেইসব নাগরিকরাই বহন করতে পারবে, যারা হবে উক্ত আদর্শের ধারক ও বাহক। যারা এ আদর্শের ধারক ও বাহক হবেনা, অন্তত এর উপর সন্তুষ্ট হবেনা, স্বাভাবিকভাবেই তারা এ রাষ্ট্রে যিম্মির মর্যাদা লাভ করবে। অর্থাৎ তাদের 'নিরাপত্তার যিম্মাদারী' সেইসব লোকেরা গ্রহণ করবে, যারা উক্ত আদর্শের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের পরিচালক হবে।

২. আহলে কিতাব এবং সাধারণ যিম্মীদের মধ্যে একটি ছাড়া আর কোনো পার্থক্য থাকবেনা। সেটি হচ্ছে এই যে, আহলে কিতাবের মহিলাদেরকে মুসলমানরা বিয়ে করতে পারবে এবং অন্যদের পারবেনা। কিন্তু অধিকারের ক্ষেত্রে আহলে কিতাব এবং অন্য যিম্মীদের মধ্যে কোনো প্রকার পার্থক্য থাকবেনা।

৩. যিম্মীদের অধিকারের বিস্তারিত বিবরণ চিঠিতে দেয়া সম্ভব নয়। তবে এ ব্যাপারে মৌলিক কথা হলো, যিম্মী দু' প্রকারের হতে পারে। এক প্রকার হলো, সেসব যিম্মী, যারা কোনো চুক্তির ভিত্তিতে ইসলামী রাষ্ট্রের যিম্মী হয়েছে বা নিরাপত্তা গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয় প্রকার হলো তারা, যারা কোনো প্রকার চুক্তি ছাড়াই যিম্মী হয়েছে। প্রথম ধরনের যিম্মীদের সংগে কৃত চুক্তি মোতাবেক আচরণ করা হবে। দ্বিতীয় প্রকার যিম্মীদের যিম্মী হওয়া দ্বারাই আমাদের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত হয় যে, আমরা তেমনি করে তাদের জান মাল ও ইজ্জত আবরুর হিফাযত করবো, যেমনি করে হিফাযত করি আমাদের নিজেদের জান মাল ও ইজ্জত আবরুর।

তাদের আইনগত অধিকার তা-ই হবে, যা হবে মুসলমানদের। তাদের রক্তমূল্য তা-ই হবে যা মুসলমানদের রক্তমূল্য। নিজেদের ধর্ম পালনের পূর্ণ আযাদী তাদের থাকবে। তাদের উপাসনালয়সমূহ নিরাপদ থাকবে। তাদেরকে তাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের অধিকার দেয়া হবে এবং বাধ্যতামূলকভাবে তাদের উপর ইসলামী শিক্ষা চাপিয়ে দেয়া হবেনা।

আল্লাহ চাহেন তো অমুসলিম নাগরিকদের সম্পর্কে ইসলামের শাসনতান্ত্রিক ধারাসমূহ আমরা পৃথক পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করবো।

৪. অমুসলিমদের 'পার্সোনাল ল' তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতার আবশ্যিক অংশ। সুতরাং ইসলামী রাষ্ট্র তাদের বিয়ে তালাক, উত্তরাধিকার, পালক পুত্র গ্রহণ এবং অনুরূপ অন্যান্য আইন যা দেশীয় আইনের (Law of the land) সাথে সাংঘর্ষিক নয়, তাদের উপর প্রয়োগ করবে। কেবল সেসব ক্ষেত্রে তাদের 'পার্সোনাল ল'কে বরদাশত করা হবেনা যেগুলোর কুফল জনগণকে প্রভাবিত করবে। যেমন, কোনো অমুসলিম জাতি যদি সুদকে বৈধ রাখতে চায়, তবে ইসলামী রাষ্ট্রে সুদী লেনদেনের অনুমতি আমরা দেবনা। কারণ এতে গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভাবিত হবে। কিংবা কোনো অমুসলিম জাতি যদি ব্যভিচার বৈধ রাখতে চায়, তবে তার অনুমতিও আমরা দেবনা। তারা নিজেদের মধ্যেও এ কুকর্মের (prostitution) ব্যবসা চালু রাখতে পারবেনা। কেননা এটা সর্ব স্বীকৃতভাবে মানবজাতির নৈতিকতা বিরোধী কাজ। আর এটা আমাদের ফৌজদারী আইনের (criminal law) সাথেও সাংঘর্ষিক। একথা স্পষ্ট যে, এটাই হবে রাষ্ট্রীয় আইন। এরি ভিত্তিতে আপনি অন্যান্য বিষয়গুলো অনুমান করতে পারেন।

৫. আপনি প্রশ্ন করেছেন, 'অমুসলিমরা ইসলামী রাষ্ট্রের শাসন পরিচালনার কাজে সমান অংশীদার হতে পারবে কিনা? যেমন, পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় হিন্দুরা অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা? যদি না পারে, তবে আপনারা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে মুসলমানদের জন্যে সেই অবস্থা মেনে নেবেন কি, ইসলামী রাষ্ট্রে যে মর্যাদা আপনারা হিন্দুদের প্রদান করবেন?' আমার মতে আপনার এ প্রশ্নের ভিত্তি ভুল ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ এখানে আপনি একদিকে 'আদর্শিক অজাতীয়তা ভিত্তিক রাষ্ট্রের' (Idiological non-National State) সঠিক মর্যাদার প্রতি লক্ষ্য রাখেননি। দ্বিতীয়ত, এ প্রশ্নের মধ্যে ব্যবসায়িক লেনদেনের মানসিকতা পরিস্ফুট বলে মনে হচ্ছে।

পহেলা নম্বর জবাবেও আমি একথা বলেছি যে, একটি আদর্শিক রাষ্ট্র পরিচালনা এবং তার নিরাপত্তার দায়িত্ব কেবল সেইসব লোকেরাই বহন করতে পারে, যারা সেই আদর্শের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী। তারাই তো এ আদর্শের মূল স্পিরিট অনুধাবন করতে পারবে। এদের থেকেই তো এ আশা করা যেতে পারে যে, পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে নিজেদের দ্বীনী ও ঈমানী দায়িত্ব মনে করে তারা এ রাষ্ট্রের যাবতীয় কাজ পরিচালনা করবে এবং একে টিকিয়ে রাখার জন্যে প্রয়োজনে লড়াইয়ের ময়দানে নিজেদের জীবন কুরবানী করবে।

যারা এ আদর্শে বিশ্বাসী নয়, তাদেরকে যদি এ রাষ্ট্র পরিচালনা ও এর নিরাপত্তার দায়িত্বে অংশীদার করাও হয়, তবে তারা এ আদর্শিক এবং নৈতিক স্পিরিট অনুধাবন করতে সক্ষম হবেনা। সে অনুযায়ী তারা কাজ করতেও সক্ষম হবেনা। যার ওপর রাষ্ট্রীয় অট্টালিকার ভিত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারা যদি বেসামরিক বিভাগে কাজ করে, তবে তাদের থেকে কেবল কর্মচারীসুলভ মানসিকতাই প্রকাশ পাবে এবং কেবল উপার্জনের জন্যেই তারা নিজেদের সময় ও যাবতীয় যোগ্যতা বিক্রি করবে। আর যদি তাদেরকে সামরিক বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে তাদের অবস্থা হবে ভাড়াটে সৈনিকের (Mercenaries) মতো। তারা নৈতিক চরিত্রের সেই দাবীও পূর্ণ করতে পারবেনা, ইসলামী রাষ্ট্র তার মুজাহিদদের থেকে যা আশা করে থাকে।

তাই আদর্শিক ও নৈতিক কারণে ইসলামী রাষ্ট্র তার সামরিক বাহিনীতে যিম্মীদের কোন খেদমত গ্রহণ করেনা। পক্ষান্তরে যাবতীয় সামরিক নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলমানরা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নেয় এবং অমুসলিম নাগরিকদের থেকে শুধু একটা প্রতিরক্ষা কর গ্রহণ করাকেই যথেষ্ট মনে করে। কিন্তু কর এবং সামরিক সেবা এ উভয়টাই একত্রে অমুসলিম নাগরিকদের থেকে নেয়া যেতে পারেনা। যদি অমুসলিম নাগরিকরা স্বয়ং নিজেদেরকে সামরিক সেবার জন্যে পেশ করে তবে তা গ্রহণ করা হবে এবং এমতাবস্থায় তাদের থেকে প্রতিরক্ষা কর গ্রহণ করা হবেনা।

বেসামরিক বিভাগগুলো তো সামরিক বিভাগ থেকেও গুরুত্বপূর্ণ (key positions)। এগুলো নীতিনির্ধারণী কাজের সাথে সম্পর্কিত। এগুলোতে কোন অবস্থাতেই অমুসলিম নাগরিকদের নিয়োগ করা যেতে পারেনা। অবশ্য কর্মচারী হিসেবে তাদের খেদমত নিতে কোন দোষ নেই। এমনি করে রাষ্ট্রীয় পরামর্শ সভায় (মজলিসে শূরা) অমুসলিমদের কোনো সদস্য নেয়া হবেনা। অবশ্য অমুসলিমদের ভিন্ন কাউন্সিল বানিয়ে দেয়া হবে। এ পরিষদ তাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের দেখাশুনা ছাড়াও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে তাদের ইচ্ছা ব্যক্ত করবে। তাদের প্রয়োজন, অভিযোগ এবং প্রস্তাবাবলী পেশ করবে। রাষ্ট্রীয় মজলিসে শূরা (Assembly) এগুলো যথোপযুক্তভাবে বিবেচনা করবে।

মোট কথা, ইসলামী রাষ্ট্র, কোনো জাতির ইজারাকৃত সম্পত্তি নয়। যে কেউ এর আদর্শ গ্রহণ করবে, সে তার পরিচালনায় অংশ গ্রহণ করতে পারবে, চাই সে কোনো হিন্দুর পুত্র হোক কিংবা কোনো শিখের। কিন্তু যে এ রাষ্ট্রের আদর্শকে গ্রহণ করবেনা, মুসলমানের পুত্র হোকনা কেন, সে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে বটে, কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবেনা।

আপনি প্রশ্ন করছেন, হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে কি মুসলমানরা সেই অবস্থা গ্রহণ করবে, হুকুমতে ইলাহিয়ার অধীনে হিন্দুদেরকে যে পজিশন দেয়া

হবে? এ প্রশ্ন আসলে মুসলিম লীগ নেতাদের কাছে করাই উচিত ছিলো। কারণ লেনদেনের কথাতো তারাই বলতে পারে। আমাদের নিকট জানতে চাইলে আমরা তো নিরেট আদর্শিক জবাবই দেবো।

যেখানে হিন্দুরা রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার লাভ করবে, সেখানে আপনারা মূলত দুই ধরনের রাষ্ট্রই প্রতিষ্ঠা করতে পারেন ঃ

হিন্দুধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট প্রতিষ্ঠা করতে পারেন, কিংবা ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেও প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

প্রথমোক্ত অবস্থায় আপনাদের মধ্যে এ প্রশ্ন জাগ্রত হওয়া উচিত হবেনা যে, ইসলামী রাষ্ট্রে হিন্দুদের যতোটুক অধিকার দেয়া হবে, আমরা "রামরাজ্যে"ও মুসলমানদেরকে ততোটুকু অধিকারই দেবো। বরঞ্চ এ বিষয়ে হিন্দু ধর্মে যদি কোন দিক নির্দেশনা থাকে তবে কোনো প্রকার রদবদল ছাড়া হুবহু সেটাই কার্যকর করুন। নিজেদের ধর্মীয় নির্দেশ উপেক্ষা করে এ বিষয়ে অন্যদের অনুসরণ করা ঠিক হবেনা। আপনাদের বিধান যদি আমাদের বিধানের চেয়ে উন্নততর হয় তবে নৈতিক ময়দানে আপনারাই বিজয়ী হবেন এবং এমনও হতে পারে যে, আমাদের হুকুমতে ইলাহিয়া আপনাদের রামরাজ্যে পরিবর্তন হয়ে যাবে। আর প্রকৃত ব্যাপার যদি এর বিপরীত হয়, তবে দেরীতে হোক কিংবা সত্বর, পরিণতি এর বিপরীতই হবে।

আর যদি শেষোক্ত নীতি গ্রহণ করেন, অর্থাৎ ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন, তবে এ অবস্থায় আপনাদেরকে দুটির যে কোন একটি পথ গ্রহণ করতে হবে। হয়তো গণতান্ত্রিক (Democratic) নীতি অবলম্বন করতে হবে এবং মুসলমানদেরকে তাদের সংখ্যার ভিত্তিতে অংশ নিতে হবে। নয়তো একথা পরিষ্কারভাবে বলে দিতে হবে যে, এটা হিন্দু জাতির রাষ্ট্র, মুসলমানদেরকে এখানে বিজিত জাতি (subject nation) হিসেবে থাকতে হবে।

এ দুটি পন্থার যেটির ভিত্তিতে ইচ্ছা আপনারা মুসলমানদের সাথে আচরণ করতে পারেন। সর্বাবস্থায় আপনাদের নীতি ও আচরণ দেখে ইসলামী রাষ্ট্র তার সেইসব নীতিতে বিন্দু পরিমাণ পরিবর্তন সাধন করবেনা, অমুসলমানদের ব্যাপারে কুরআন সুন্নাহতে যেগুলো নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। আপনারা যদি আপনাদের রাজ্যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গণহত্যা অভিযানও চালান এমনকি শিশুদেরও যদি জীবিত না রাখেন, তবু ইসলামী রাষ্ট্র এর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তার অমুসলিম নাগরিকদের একটি পশমও বাঁকা করবেনা। পক্ষান্তরে আপনারা যদি প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, সেনাপতি এসবই মুসলমান নাগরিকদের থেকে মনোনীত করেন, সে অবস্থায়ও ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের সেই একই মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করা হবে যা কুরআন সুন্নাহ নির্ধারিত করে

দিয়েছে। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শাওয়াল ১৩৬৩ হিঃ, জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪ ইং।

উপরোক্ত বিষয়ের অতিরিক্ত ব্যাখ্যা

প্রশ্ন ঃ আপনার রচিত সবগুলো গ্রন্থ এবং পূর্বের চিঠিটা পড়ার পর আমি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, আপনি নির্ভেজাল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। আর এ ইসলামী রাষ্ট্রে যিম্মী এবং আহলে কিতাবের লোকদের পজিশন হবে ঠিক তেমনি, যেমনি হিন্দুদের মধ্যে অচ্ছ্যুতদের পজিশন।

আপনি লিখেছেন, "হিন্দুদের উপাসনালয়সমূহের সংরক্ষণ করা হবে এবং তাদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের অধিকার দেয়া হবে।" কিন্তু হিন্দুদেরকে তাদের ধর্ম প্রচারের সুযোগ দেয়া হবে কিনা সেকথা তো লিখেননি? আপনি আরো লিখেছেনঃ যে কেউ এ রাষ্ট্রের আদর্শ গ্রহণ করবে, সে এর পরিচালনা কাজে অংশগ্রহণ করতে পারবে, চাই সে হিন্দুর পুত্র হোক কিংবা শিখের। মেহেরবানী করে একথাটারও ব্যাখ্যা দিন যে, হিন্দু হিন্দু থেকেও কি আপনাদের রাষ্ট্রের নীতিমালার প্রতি ঈমান এনে তা পরিচালনার কাজে শরীক হতে পারবে?

আপনি লিখেছেন, আহলে কিতাবের মহিলাদেরকে মুসলমানরা বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু আহলে কিতাব মুসলিম মহিলাদের বিয়ে করতে পারবে কিনা সেকথা পরিষ্কার করেননি? এ প্রশ্নের জবাব যদি 'না'সূচক হয়, তবে এ Superiority complex সম্পর্কে আরো ভালোভাবে আলোকপাত করবেন কি? এর যথার্থতার জন্যে আপনি যদি ইসলামের প্রতি ঈমান আনার যিম্মাদারী নেন, তবে কি আপনি একথা মানতে প্রস্তুত আছেন যে, বর্তমানকার তথাকথিত নামের মুসলমানরা আপনার বক্তব্য অনুযায়ী এসব ইসলামী নীতিমালার মানদন্ডে টিকে যাবে? বর্তমানকালের মুসলমানদের কথা বাদই দিলাম, আপনি কি একথা স্বীকার করবেননা যে, খেলাফতে রাশেদার আমলে যেসব লোক ইসলাম গ্রহণ করেছিলো তাদের অধিকাংশই রাজনৈতিক নেতৃত্বের অভিলাষী ছিলো? আপনি যদি একথা স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠিত হন, তবে বলুন তো সেই ইসলামী রাষ্ট্রটি কেন মাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর টিকেছিলো? হযরত আলীর মতো বিচক্ষণ মুজাহিদের এতো বিরোধিতা কেন হয়েছিলো? এবং তাঁর বিরোধীদের মধ্যে হযরত আয়েশা পর্যন্ত কেন ছিলেন?

ইসলামী রাষ্ট্রের অভিলাষী হয়েও আপনি পাকিস্তানের বিরোধিতা করছেন। কোনো রাষ্ট্রীয় সীমা ছাড়াই কি আপনি আপনার হুকুমতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন? অবশ্যই নয়। তবে তো আপনার ইসলামী রাষ্ট্রের জন্যে সেই ভূখন্ডটিই উপযুক্ত, মিঃ জিন্নাহ এবং তার সংগী সাথীরা যেখানে পাকিস্তান

প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। পাকিস্তান না চেয়ে সারা ভারতেই কেন আপনি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন? এমন একটি রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে অতি উচ্চমানের নৈতিক চরিত্রের অধিকারী একদল লোক আপনি কোথা থেকে সৃষ্টি করবেন? যেখানে হযরত আবু বকর, হযরত ওমর এবং হযরত ওসমানের মতো তুলনাহীন মনীষীদের হাতে ঐ রাষ্ট্রটি মাত্র কয়েক বছরের বেশী টিকেনি। আজ চৌদ্দশ' বছর পরে এমন কোন উপযুক্ত পরিবেশ আপনি লক্ষ্য করছেন, যার ভিত্তিতে আপনার দূরদৃষ্টি ইসলামী রাষ্ট্র বাস্তবসম্মত মনে করছে? একথা সত্য যে, আপনার পয়গাম সকল মত ও পথের মুসলমানদের মধ্যেই ব্যাপক ও দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। মুসলমানদের সাথে আমার যতোটা মেশার সুযোগ হয়েছে, তাতে আমি দেখেছি, তারা আপনার চিন্তার প্রতি সহানুভূতিশীল।

তারা বলছে ঃ আপনি যা কিছু বলেছেন সেটাই প্রকৃত ইসলাম। কিন্তু প্রত্যেকের মনে সেই একই প্রশ্ন, যা আমি আপনার সামনে পেশ করলাম। অর্থাৎ খেলাফতে রাশেদার সেই আদর্শ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্যে সেইরূপ উচ্চমানের লোক আপনি কোথায় পাবেন? তাছাড়া সেই তুলনাহীন উচ্চমানের লোকেরাই যখন ঐ রাষ্ট্রটিকে অর্ধ শতাব্দীও সাফল্যের সাথে চালাতে পারেনি, তখন এ যুগে সে ধরনের রাষ্ট্রের চিন্তা করাটা একটি অবাস্তব আশা ছাড়া আর কি হতে পারে?

এছাড়া আরেকটি কথাও নিবেদন করতে চাই। কিছুকাল পূর্বে আমার ধারণা ছিলো, আমরা হিন্দুরা এমন একটি জাতি, যাদের সম্মুখে কোনো একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্তমান নেই। অথচ মুসলমানদের সামষ্টিক ও সংঘবদ্ধ জীবন রয়েছে এবং তাদের সম্মুখে রয়েছে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। কিন্তু এখন ইসলামী রাজনীতির গভীর অধ্যয়নের ফলে জানতে পারলাম যে, ওখানকার অবস্থা আমাদের চেয়েও করুণ। বাস্তব অবস্থা আপনার নিকট গোপন নয়। একজন সত্যসন্ধানী হিসেবে আমি বিভিন্ন ধ্যান ধারণার মুসলিম নেতৃবৃন্দের নিকট তাদের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থা সম্পর্কে কতিপয় বিষয়ের জবাব চেয়ে পাঠাই। তাদের জবাব আমার হাতে পৌঁছার পর আমার পূর্ব ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ হয়েছে। এখন আমি জানতে পারলাম, মুসলমানদের মধ্যেও কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্য লক্ষ্যের ব্যাপারে সাংঘাতিক মতবিরোধ রয়েছে। (প্রশ্নকারী এ প্রসংগে জামায়াতে ইসলামীর সাথে মতবিরোধ রাখেন এমন কতিপয় ব্যক্তির লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করেন।)

দেখলেন তো আপনাদের একই আকীদা বিশ্বাসের নেতাগণ কতো কঠিন মতবিরোধে নিমজ্জিত। এসব বাস্তব সত্যকে উপেক্ষা করে কোনো কিছু কেবল বইয়ের পৃষ্ঠায় মতাদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা এক জিনিস আর সেটার বাস্তবায়ন একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। রাজনীতি একটা বাস্তব সত্য ব্যাপার।

এটাকে কোনো অবস্থাতেই অস্বীকার করা যেতে পারেনা। আমার এ গোটা নিবেদনকে সামনে রেখে আপনি আপনার কর্মপন্থা ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত করাবেন কি?

জবাব ঃ আপনার প্রশ্নাবলীর মূল টারগেট এখনো আমার কাছে পৌঁছায়নি। তাই আমি যেসব জবাব দিচ্ছি, সেগুলো থেকে আপনার আরো এমন কিছু প্রশ্ন সৃষ্টি হচ্ছে, যেগুলো সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ আমার দৃষ্টিতে নেই। আপনি যদি মৌলিক বিষয় থেকে প্রশ্ন আরম্ভ করেন, অতপর শাখা প্রশাখা এবং সমসাময়িক রাজনীতির (Current politics) দিকে প্রত্যাবর্তন করেন তবে আপনি আমার জবাবের সাথে পূর্ণ একমত না হলেও অন্ততপক্ষে আমাকে পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারবেন। এখন তো আমি মনে করি, আমার পজিশন আপনার নিকট পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।

আপনি লিখেছেন ঃ "আপনি যে ইসলামী রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখছেন, তাতে যিম্মী এবং আহলে কিতাবের পজিশন তাই হবে, যা নাকি হিন্দুদের মধ্যে অচ্ছ্যুতদের।" বাক্যটি দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমি স্পষ্টভাবে লেখার পরও আপনি হয়তো ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের পজিশন সম্পর্কে বুঝতে পারেননি। নয়তো হিন্দু সমাজে অচ্ছ্যুতদের পজিশন সম্পর্কে আপনি ওয়াকিফহাল নন। অচ্ছ্যুতদের যে পজিশন মনুর ধর্মশাস্ত্র থেকে জানা যায়, তার সাথে ঐ সকল অধিকার ও সুযোগ সুবিধার কোনো সম্পর্ক নেই, ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রে যা যিম্মীদের প্রদান করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, এ অস্পৃশ্যবাদের ভিত্তি হচ্ছে বংশগত তারতম্য। পক্ষান্তরে যিম্মীর ভিত্তি হচ্ছে আকীদাহ বিশ্বাস। কোনো যিম্মী ইসলাম গ্রহণ করলে তিনি আমাদের নেতা এবং রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত হতে পারেন। কিন্তু শুদ্র তার আকীদাহ বিশ্বাস এবং মত ও পথ পরিবর্তনের পর কি অরুণ আশ্রমের বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত হতে পারে?

আপনি প্রশ্ন করেছেন ঃ কোনো হিন্দু কি হিন্দু থেকেও আপনাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শের প্রতি ঈমান এনে তা পরিচালনায় অংশগ্রহণ করতে পারবে? আপনার এ প্রশ্ন খুবই বিস্ময়কর। সম্ভবত আপনি চিন্তা করে দেখেননি যে, ইসলামী রাষ্ট্রের আদর্শের প্রতি ঈমান আনার পর হিন্দু আর হিন্দু থাকবেনা, বরঞ্চ সে মুসলমান হয়ে যাবে। এদেশের কোটি কোটি মুসলমান তো আসলে হিন্দুরই সন্তান। ইসলামী আদর্শের প্রতি ঈমান আনার ফলেই তারা মুসলমান হয়েছে। এমনি করে ভবিষ্যতেও যেসব হিন্দুর সন্তান এ আদর্শ গ্রহণ করবে, তারাও মুসলমান হয়ে যাবে। আর তারা যখন মুসলমান হয়ে যাবে, তখন অবশ্যি ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তারা আমাদের সংগে সমান অংশীদার হবে।

'ইসলামী রাষ্ট্রে হিন্দুরা তাদের ধর্ম প্রচারের সুযোগ পাবে কি?' আপনার এ প্রশ্নটি যতোটা সংক্ষিপ্ত তার জবাব ততোটা সংক্ষিপ্ত নয়। প্রচার কাজ কয়েক প্রকারের হতে পারে। এক প্রকার হলো, কোনো ধর্মীয় গোষ্ঠী তার ভবিষ্যত বংশধর এবং নিজ জনগণকে নিজস্ব ধর্মের শিক্ষা প্রদান করবে। সকল প্রকার যিম্মীরাই এমনটি করার অধিকার লাভ করবে। দ্বিতীয় প্রকার হলো, কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় লেখনী কিংবা বক্তৃতার মাধ্যমে নিজ ধর্মকে অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট পেশ করবে এবং ইসলামসহ অন্য সকল ধর্মের সাথে তাদের মতভেদের কারণ, জ্ঞানের যুক্তিতে পেশ করবে। এর অনুমতিও যিম্মীদের প্রদান করা হবে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের অধিবাসী থাকা অবস্থায় আমরা কোনো মুসলমানকে নিজের ধর্ম পরিবর্তনের অনুমতি দেবনা। তৃতীয় প্রকার হচ্ছে, কোনো গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় নিজেদের ধর্মীয় আদর্শের ভিত্তিতে এ উদ্দেশ্যে কোনো সংগঠিত আন্দোলন গড়ে তুলবে যে, বর্তমান রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে ইসলামী আদর্শের পরিবর্তে তার নিজের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করবে। আমাদের রাষ্ট্রীয় সীমার মধ্যে এরূপ প্রচার কার্যের অনুমতি কাউকেও প্রদান করবোনা। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা সম্বলিত আমার লিখিত পুস্তিকা 'মুরতাদের শাস্তি' দেখে নিন।

মুসলমানদের জন্যে আহলে কিতাবের নারীদের বিয়ে করা বৈধ হওয়া এবং আহলে কিতাবের জন্যে মুসলিম নারীদের বিয়ে অবৈধ হওয়ার ভিত্তি কোনো প্রকার আভিজাত্য বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বরঞ্চ এর ভিত্তি এক বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। পুরুষরা সাধারণত প্রভাবিত হয় কম এবং প্রভাব বিস্তার করে অধিক। আর নারীরা সাধারণত প্রভাবিত হয় বেশী এবং প্রভাব বিস্তার করে কম। একজন অমুসলিম নারী যদি কোনো মুসলমানের সংগে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, তবে তার দ্বারা এ মুসলমান ব্যক্তিকে অমুসলিম বানানোর আশংকা খবই কম, বরঞ্চ তারই মুসলমান হয়ে যাবার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু একজন মুসলিম নারী কোনো অমুসলিম ব্যক্তির বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে তার অমুসলিম হয়ে যাবার আশংকাই বেশী এবং তার স্বামী ও সন্তানদের মুসলমান বানাতে পারার সম্ভাবনা খুবই কম। এজন্যে নিজ কন্যাদের অমুসলিমদের নিকট বিয়ে দেবার অনুমতি মুসলমানদের দেয়া হয়নি। অবশ্য আহলে কিতাবের কোনো ব্যক্তি নিজ কন্যাকে কোনো মুসলমানের নিকট বিয়ে দিতে রাজী হলে সে তাকে বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু কুরআনে যে স্থানে এ অনুমতি প্রদান করা হয়েছে সেখানে এ ধমকও দেয়া হয়েছে যে, তোমরা যদি অমুসলিম স্ত্রীদের প্রেমে বিগলিত হয়ে নিজেদের দ্বীন খুইয়ে ফেলো তবে তোমাদের সমস্ত সৎকর্ম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকবে। তাছাড়া এ অনুমতি কেবল বিশেষ প্রয়োজনের সময়ই কার্যকর করা যাবে। এটা কোনো সাধারণ অনুমতি

নয় এবং পছন্দনীয় কাজও নয়। বরঞ্চ কোনো কোনো অবস্থায় তো একাজ করতে নিষেধও করা হয়েছে, যাতে মুসলিম সোসাইটিতে অমুসলিম লোকদের আনাগোনার ফলে অনাকাংখিত নৈতিক ও ধ্যান ধারণার বিকাশ ও লালন হতে না পারে।

ইসলামী রাষ্ট্র কেন মাত্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের বেশী টিকেনি আপনার এ প্রশ্ন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। আপনি যদি খুব মনোযোগের সাথে ইসলামের ইতিহাস অধ্যয়ন করেন, তবে এর কারণসমূহ অনুধাবন করা আপনার জন্যে কোনো কঠিন ব্যাপার হবেনা। কোনো আদর্শের পতাকাবাহী দল যে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে তা তার পরিপূর্ণ মর্যাদার সাথে পরিচালিত হওয়া এবং টিকে থাকার জন্যে প্রয়োজন এর নেতৃত্ব এমন বাছাইকৃত লোকদের হাতে থাকা, যারা সেই আদর্শের প্রকৃত ও পরিপূর্ণ অনুসারী। আর এ ধরনের লোকদের হাতে নেতৃত্ব কেবল সেই অবস্থায়ই থাকতে পারে, যখন সাধারণ লোকদের উপর এদের প্রভাব বজায় থাকবে। তাছাড়া সাধারণ নাগরিকদের একদল বিরাট সংখ্যক লোক এতোটা শিক্ষা দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হবে, যাতে করে এ আদর্শের সাথে তাদের গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং তারা ঐসব লোকদের কথা শুনতে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত হবে, যারা তাদেরকে তাদের এ নির্দিষ্ট আদর্শের বিপরীত অন্য কোনো পথে চালাতে উদ্যত হবে। একথা ভালভাবে বুঝে নেয়ার জন্যে ইসলামের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যে সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং যে নতুন জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়, তা মূলত এই ছিলো যে, আরব ভূখণ্ডে এক প্রকার নৈতিক বিপ্লব সাধিত হয়েছে এবং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বে সৎলোকদের যে ছোট দলটি তৈরী হয়েছিল, গোটা আরববাসী তার নেতৃত্ব কবুল করে নিয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে খেলাফতে রাশেদার যুগে যখন দেশের পর দেশ জয় হতে লাগলো, তখন যতোটা দ্রুত ইসলামী রাজ্যের চৌহদ্দী বিস্তৃত হতে থাকলো, আদর্শিক মজবুতি ততোটা দ্রুততার সাথে এগুনো সম্ভব হয়নি। সেযুগে যেহেতু প্রচারণা প্রকাশনা এবং প্রচার প্রশিক্ষণের ব্যাপক কোনো মাধ্যম ছিলনা যেমনটি রয়েছে বর্তমানে, সেযুগে বর্তমানকালের মতো যানবাহনও যেহেতু ছিলনা, এসব কারণে তখন যেসব লোক দলে দলে ইসলামী সমাজে প্রবেশ করছিল, নৈতিক, মানসিক এবং আমলী দিক থেকে তাদেরকে পূর্ণাংগভাবে ইসলামী আন্দোলনের ছাঁচে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। এর ফলে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে খাঁটি মুসলমানদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে একেবারে কম হয়ে যায় এবং কাঁচা ধরনের মুসলমানদের সংখ্যা আনুপাতিক হারে বিপুল সংখ্যায় বেড়ে যায়। কিন্তু আদর্শিক দিক দিয়ে এসব মুসলমানদের ক্ষমতা, অধিকার এবং মর্যাদা খাঁটি

ধরনের মুসলমানদের তুলনায় ভিন্নতর হওয়া মোটেই সম্ভব ছিলনা। এ কারণে হযরত আলীর (রাঃ) খেলাফতামলে যখন প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনসমূহের[১] (Reactionary Movements) ধুম্রজাল সৃষ্টি হয়, তখন সাধারণ মুসলমানদের এক বিরাট অংশ তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যায় এবং যারা বিশুদ্ধ ইসলামী পদ্ধতিতে রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা রাখতেন তাদের হাত থেকে নেতৃত্ব ছুটে যায়। এ ঐতিহাসিক নিগূঢ় সত্যকে উপলব্ধি করার পর খালেস ইসলামী রাষ্ট্র ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের বেশী কেন টিকে ছিলনা সে প্রশ্ন জাগ্রত হবার কোনো অবকাশই থাকেনা।

আজো যদি আমরা সৎলোকদের এমন একটি দলকে সুসংগঠিত করতে পারি, যাদের ধ্যান ধারণা ও মানসিকতা এবং নৈতিক চরিত্র হবে ইসলামের বাস্তব নমুনা, তবে আমি আশা রাখি আধুনিক উপায় উপকরণ ব্যবহার করে আমরা শুধু আমাদের দেশেই নয়, বরঞ্চ অন্যান্য দেশেও একটি নৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত করতে সক্ষম হবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে, এমন লোকদের একটি শক্তিশালী সংগঠন কায়েম হয়ে যাবার পর সাধারণ মানুষের নেতৃত্ব তাদের ছাড়া অন্য কোনো পার্টির হাতে যেতে পারেনা। মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা থেকে আপনি যে মত প্রতিষ্ঠা করেছেন, ঐ উজ্জ্বল অবস্থার সংগে তার তুলনা হতে পারেনা, যা আমাদের সম্মুখে রয়েছে।

বিশুদ্ধ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী লোকেরা বাস্তব ময়দানে নেমে এলে শুধু মুসলমান জনসাধারণই নয়, বরঞ্চ হিন্দু, খৃষ্টান, পারসিক, শিখ সকলেই তাদের ভক্ত অনুরক্ত হয়ে যাবে এবং নিজেদের ধর্মীয় নেতাদের ত্যাগ করে এদের প্রতি আস্থাশীল হয়ে যাবে। শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে সুসংগঠিত করার মাধ্যমে এমন একদল লোক তৈরী করার কাজই এখন আমি হাতে নিয়েছি। আমি আল্লাহর নিকট বিনয়াবনত হয়ে দোয়া করছি, তিনি যেনো এ কাজে আমাকে সাহায্য করেন।

'ইসলামী রাষ্ট্র' এবং 'পাকিস্তান' এর মধ্যে পার্থক্য সম্পর্কে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন, তার জবাব আপনি আমার লেখা গ্রন্থাবলীতেই পেয়ে যেতে পারতেন। কিন্তু সম্ভবত তা আপনার নযরে পড়েনি। পাকিস্তান দাবীর ভিত্তি জাতীয়তাবাদী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ যে এলাকায় মুসলমান জাতি সংখ্যাগুরু সেখানে তাদেরকেই নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার দেয়া হোক। পক্ষান্তরে ইসলামী রাষ্ট্র আন্দোলনের ভিত্তি নিরেট ইসলামী আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। পাকিস্তান দাবী কেবল ঐ লোকদের মধ্যেই আবেদন সৃষ্টি করতে পারে যারা মুসলমান জাতির সাথে সম্পর্কিত। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রের দাওয়াত গোটা বিশ্ব

---

১. অর্থাৎ যেসব আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিলো ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন করে কোনো না কোনো প্রকারে জাহেলিয়াতের দিকে ফিরে যাওয়া।

মানবতার নিকট আবেদনশীল, চাই তারা জন্মগত মুসলমান হোক, কিংবা জন্মগত হিন্দু অথবা অন্য কিছু। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি তো কেবল ঐ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর এ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে একটি নিরেট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা খুব কমই আছে। কারণ, খালেস ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা যে নৈতিক বিপ্লবের উপর নির্ভরশীল তা পাকিস্তান আন্দোলন দ্বারা প্রকাশিত হতে পারেনা। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোনো এলাকায় পূর্ব থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান বর্তমান থাকা জরুরী নয়। এটা একটা নৈতিক, মানসিক এবং সামাজিক বিপ্লবের বিশ্বজনীন দাওয়াত। বিশ্ব মানবতার কল্যাণের জন্যে সে কতিপয় মূলনীতি পেশ করে থাকে। পাঞ্জাব কিংবা সিন্ধু যদি এ দাওয়াতকে সর্বাগ্রে কবুল করে নেয়, তবে ইসলামী রাষ্ট্র সর্বপ্রথম এখানেই কায়েম হতে পারে। যদি মাদ্রাজ, বোম্বাই কিংবা অন্য কোনো এলাকা তা কবুল করার জন্যে এগিয়ে আসে, তবে ইসলামী রাষ্ট্র সেখানেও কায়েম হতে পারে। এর দাওয়াত আমরা মুসলমান, হিন্দু, শিখ, খৃষ্টান সকলের নিকটই পেশ করছি। আমরা মনে করি এটা মুসলমানদের কোনো প্রকার জাতীয় সম্পদ নয়। বরঞ্চ সকল মুসলিমের শান্তি ও কল্যাণের কতিপয় মূলনীতি মাত্র। হতে পারে জন্মগত মুসলমানরা এটা গ্রহণ করতে ব্যর্থতার পরিচয় দেবে এবং জন্মগত হিন্দুরা কবুল করতে এগিয়ে আসবে।

আপনার এ ধারণা সম্পূর্ণ সঠিক যে, বর্তমানে মুসলমানদের একটি একক লক্ষ্য উদ্দেশ্যের অভাব হিন্দুদের চেয়েও বেশী। প্রকৃতপক্ষে এসব কিছুই ইসলাম থেকে বেপরোয়া হয়ে যাবতীয় পার্থিব বিষয় নিজেদের খেয়াল খুশী এবং অমুসলিমদের অন্ধ অনুসরণে সমাধানের চেষ্টা করার ফলশ্রুতি মাত্র। মুসলমানরা যদি নিজেদের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের যাবতীয় সমস্যা খাঁটি ইসলামের ভিত্তিতে সমাধান করার চেষ্টা করতো, তবেই আপনি তাদেরকে একই লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পিছে নিজেদের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করতে দেখতে পেতেন। মুসলমানদের মধ্যে আপনি ধ্যান ধারণা, আমলের গরমিল ও বিচ্ছিন্নতা অনুভব করছেন, আমি দীর্ঘদিন থেকে তাই লক্ষ্য করে আসছি এবং আমাদের ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণী ও উপদলের যেসব দৃষ্টিভংগি রয়েছে, তাও আমার নযরে রয়েছে। কিন্তু এগুলো দ্বারা আমার অন্তরে কোনো প্রকার খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়না। কেননা এর অন্তরালে যে মূল গলদ রয়েছে তা আমি ভালভাবেই উপলব্ধি করি। কিন্তু এজন্যে আমি নিরাশ নই, আমি আশাবাদী। যেমন আপনি নিজেই লিখেছেন ঃ 'মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণীর লোকেরা খুব দ্রুত একথা স্বীকার করে চলছে যে, 'আমি যা পেশ করছি সেটাই মূল ও খাঁটি ইসলাম।' তাছাড়া আমি আরো দেখছি, বর্তমানে মুসলমানদের বিভিন্ন দল উপদল যে পন্থায় কাজ করছে, তাতে তাদের জন্যে

সফলতার মনযিলে পৌঁছা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মুসলমান যুবকরা এসব বিভিন্ন দল উপদল এবং তাদের রাজনীতি থেকে অদূর ভবিষ্যতেই নিরাশ হয়ে পড়বে, আর তখন তাদের জন্যে খাঁটি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে কাজ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবেনা। শুধু তাই নয়, বরঞ্চ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, হিন্দুদের মধ্যেও জাতিপূজার রাজনীতি যখন তার স্বাভাবিক মনযিলে উপনীত হবে, তখন তাদেরও রাজনীতি এবং সমাজ সংস্কৃতির কলকজা চালানোর জন্যে এমন কতিপয় মূলনীতির প্রয়োজন হবে, যা গান্ধিজীর দর্শনে কিংবা কংগ্রেসের মাতৃভূমি পূজার মধ্যে এবং হিন্দু মহাসভার জাতিপূজার মধ্যে পাওয়া সম্ভব হবেনা। তখন তাদের জন্যে মাত্র দু'টি পথই খোলা থাকবে। হয়তো সমাজতান্ত্রিক মূলনীতি গ্রহণ করতে হবে, নয়তো কবুল করতে হবে ইসলামের আদর্শ। সে সময় আসা পর্যন্ত আমরা যদি ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে উৎসর্গী আহবানকারীদের একটি বিশুদ্ধ দল সংগঠিত করতে সফল হই, তবে আমি ৮০% আশা রাখি যে, আমরা হিন্দু এবং শিখ ভাইদেরকে সমাজতন্ত্রের ছোবল থেকে রক্ষা করতে এবং ইসলামী আদর্শের ছায়াতলে সমবেত করতে সমর্থ হবো।

হিন্দু ও মুসলমানদের বর্তমান জাতীয় দ্বন্দ্বই আমাদের এই উদ্দেশ্যের পথে সবচেয়ে বড় বাধা। কিন্তু আমরা আশা রাখি, এখন আমরা যে পন্থায় কাজ করছি তাতে হিন্দু, শিখ এবং অন্যান্য অমুসলিম জাতি ইসলামের বিরুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করছে শেষ পর্যন্ত আমরা তা দূরীভূত করে ফেলবো এবং তাদেরকে এ বিষয়ে সম্মত করতে পারবো যে, তারা যেনো ইসলামকে আদর্শিক দৃষ্টিতে দেখে, সেই জাতির ধর্মের দৃষ্টিতে নয়, যাদের সাথে পার্থিব উদ্দেশ্যে দীর্ঘদিন থেকে দ্বন্দ্ব চলে আসছে। তরজমানুল কুরআন ঃ নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪৪ ইং।

মুসলিম লীগের সংগে মত পার্থক্যের ধরন

প্রশ্ন ঃ [১] ভারতীয় মুসলমানরা বর্তমানের যে অবস্থায় নিমজ্জিত রয়েছে, সে অবস্থায় থেকে কোন্ সব নীতি, সীমারেখা ও বুনিয়াদের উপর ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও দৃষ্টিভংগি অনুযায়ী তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংশোধন সম্ভব? মেহেরবানী করে নিম্নোক্ত পয়েন্টগুলোর উপর বিস্তারিতভাবে আপনার মতামত লিপিবদ্ধ করুন ঃ

---

১. এ হচ্ছে মূলত মুসলিম লীগের কার্যনির্বাহী পরিষদের পক্ষ থেকে প্রচারিত একটি প্রশ্নমালা। অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে তরজমানুল কুরআনের সম্পাদকের নিকটও এর একটি কপি পাঠানো হয়েছিল।

ক. এমন একটি কার্যকর বাস্তবসম্মত সংবিধানের প্রস্তাব করুন, যার মাধ্যমে জাতীয় জাগরণের একক উদ্দেশ্যের জন্যে বিভিন্ন ফেরকা ও পন্থার মুসলমানদের একতাবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করা যায়।

খ. এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নীল নকশা তৈরী করুন যা ইসলামের মূলনীতির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গ. ভারতবর্ষের মুসলমানরা যে বিশেষ পরিবেশ পরিস্থিতিতে নিমজ্জিত রয়েছে, সেকথা মনে রেখে বলুন, তারা যদি এবং যখন এমন সব স্বাধীন রাষ্ট্র অর্জন করে যেখানে তারা হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ, তবে তাদের জন্যে কি এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে যেখানে ধর্ম এবং রাজনীতির মধ্যে সুসম্পর্ক এবং সহাবস্থানের একটি সন্তোষজনক পরিবেশ সৃষ্টি হবে?

ঘ. ইসলামের নীতিমালা, ঐতিহ্য এবং ধ্যান ধারণা অনুযায়ী এমন একটি স্কীম প্রণয়ন করুন, যা মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।

ঙ. সামগ্রিক জাতীয় স্বার্থে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থাৎ ওয়াকফকৃত সম্পত্তিসমূহ এবং অন্যান্য আয়ের উৎসসমূহকে একটি কেন্দ্রের অধীনে এমনভাবে সংগঠিত ও সমন্বিত করার পন্থা ও কাঠামো প্রণয়ন করুন যাতে এসব প্রতিষ্ঠানের উপর দখলদার লোকদের অনুভূতি, প্রবণতা, উদ্দেশ্য এবং দৃষ্টিভংগির প্রতি খেয়াল থাকবে।

আমাদের পক্ষ থেকে এ প্রশ্নমালার নিম্নরূপ জবাব পাঠানো হয় ঃ

জবাব ঃ *আপনি যে বিস্তারিত প্রশ্নমালা পাঠিয়েছেন, তা মূলত একটি বড় প্রশ্নের অংশবিশেষ। তবে কি এটাই উত্তম হয়না যে, এসব প্রশ্নকে পৃথক পৃথক গ্রহণ করে পৃথক পৃথক মত প্রকাশ করার পরিবর্তে সেই বড় প্রশ্নটি নিয়েই আলোচনা করা যাক, আপনার এ প্রশ্নগুলো যার বিভিন্ন অংশমাত্র। আর সেই বড় প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, মুসলমান কিভাবে সেই প্রকৃত মুসলমান হবে যে রকম মুসলমান বানানো কুরআনের আসল উদ্দেশ্য। এটাই হচ্ছে আসল প্রশ্ন। এ প্রশ্নের সমাধান হলে অন্য সকল প্রশ্নের সমাধান এমনিতেই হয়ে যাবে।*

আমার নিকট এ প্রশ্নের সহজ সরল এবং স্পষ্ট জবাব হচ্ছে এই যে, সর্বপ্রথম ইসলামকে এবং ইসলাম মানুষের নিকট যা কিছু দাবী করে সেগুলোকে সুস্পষ্টভাবে মুসলমানদের সম্মুখে পেশ করা হোক এবং সেগুলো বুঝে শুনে গ্রহণ করার দাবী তাদের নিকট করা হোক। অতপর যারা জেনে বুঝে তা কবুল করবে তাদেরকে একটি দল হিসেবে সংগঠিত করার কাজ আরম্ভ করা হোক। আর বাকী মুসলমানদের জন্যে অবিরামভাবে দাওয়াত ও প্রশিক্ষণের কাজ এ উদ্দেশ্যে

চালিয়ে যেতে হবে যে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আমাদের দলে শামিল করে নিতে হবে।

এ দলের সামনে একটিই উদ্দেশ্য থাকবে। অর্থাৎ ইসলামকে একটি জীবন ব্যবস্থা হিসেবে পৃথিবীতে বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করা। এর মূলনীতি হবে একটাই অর্থাৎ নির্ভেজাল ইসলামের অনুসরণ। (আমাদের এ চলার পথ অন্যদেরকে সন্তুষ্ট করুক বা না করুক সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করা চলবেনা)। এ দলকে অনৈসলামের সাথে সর্বপ্রকার আপোষ সমঝোতা (Compromise) এবং মিশ্রণ সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করতে হবে। এরূপ মহান উদ্দেশ্য ও আদর্শের ভিত্তিতে যে দল কাজ করবে তার কাছে প্রথমত, এসব প্রশ্নই সৃষ্টি হবেনা, যা আপনার মনে উদিত হয়েছে। এর মধ্য থেকে কোনো একটি প্রশ্ন উদয় হলেও তার ধরন ঐরকম হবেনা, যেমনটি আপনার মনে সৃষ্টি হচ্ছে। এদের কোনো নতুন স্কীম তৈরী করতে হবেনা। বরঞ্চ শুধুমাত্র সেই শক্তিই সরবরাহ করতে হবে যদ্বারা তৈরী করা স্কীমকে কার্যকর করা যাবে। বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের স্কীম বাস্তবায়নের অনুকূল কিনা, এরকম চিন্তাই তারা করবেনা। শক্তির মাধ্যমে তারা প্রতিকূল পরিবেশ পাল্টে দেবে, যাতে করে স্কীম বাস্তবায়নের জন্যে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে বাধ্য হয়। মোদ্দাকথা, আপনারা যে দৃষ্টিভংগি অবলম্বন করেছেন, এ বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভংগি হবে এর চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

আমার মনে হয়, আপনারা এমন এক গোলক ধাঁধায় পড়েছেন, যার কোনো সমাধান সম্ভবত আপনারা খুঁজে পাচ্ছেননা। সেই গোলকধাঁধাঁ হচ্ছে এই যে, আপনারা একদিকে এ গোটা কওমকে 'মুসলমান' হিসেবে গ্রহণ করছেন, যার ৯৯% জন ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ, ৯৫% জন ইসলাম বিমুখ এবং ৯০% জন ইসলাম বিমুখীতার ব্যাপারে অনড়। অর্থাৎ তারা নিজেরাই ইসলামের পথে চলতে চায়না এবং সে উদ্দেশ্যও তারা সাধন করতে চায়না যেজন্যে তাদেরকে মুসলমান বানানো হয়েছিল। অপরদিকে সামগ্রিকভাবে বিরাজিত বর্তমান পরিবেশ পরিস্থিতিকে সামান্য রদবদল করেই আপনি তা গ্রহণ করতে চাচ্ছেন এবং সাথে সাথে এটাও চাচ্ছেন যে, অবস্থা এরকমই থাকুক, তবে এর মধ্য থেকে ইসলামী স্কীম বাস্তবায়নের কোনো সুযোগ বের হয়ে আসুক। আপনাদের জন্যে এটাই এক বিরাট গোলকধাঁধাঁ। এজন্যেই আমার ধারণা, আপনাদের পেশ করা সমস্যাবলীর কোনো সমাধান পাওয়া আপনাদের জন্যে সম্ভব নয়।

প্রশ্ন ঃ আপনার জানা রয়েছে যে, মুসলিম লীগ কাজ এগিয়ে নেয়ার জন্যে একটি কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করেছে এবং পরিষদ মুসলমানদের সংস্কার ও উন্নতির জন্যে বিভিন্ন সাব কমিটি গঠন করেছে। এর মধ্যে একটি সাব কমিটি গঠন করা হয়েছে ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থার সংস্কার সংশোধনের উদ্দেশ্যে। এ

কমিটির আহবায়কের নিকট থেকে আপনি সম্ভবত একটি প্রশ্নমালা[১] পেয়েছেন। এ প্রশ্নমালাকে বিশেষ মনোনিবেশের দাবীদার মনে করবেন এবং সর্বপ্রকার মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে চিন্তাগত সহযোগিতা করবেন। পাশ্চাত্যের নাস্তিক্যবাদী সয়লাবের মোকাবেলায় যে মুসলমানরা এখনো নিজেদের ধর্মকে বাঁচিয়ে রেখেছে এটাকে সৌভাগ্য মনে করা উচিত। এ সংকটকালে যদি তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করা না হয়, তবে আমাদের যুবকরাও তুরস্ক এবং ইরানের পদাংক অনুসরণ করার আশংকা রয়েছে।

জবাব ঃ আপনার পত্র পাওয়ার পূর্বেই আমি লীগ কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট উল্লিখিত প্রশ্নমালার জবাব পাঠিয়ে দিয়েছি। আপনারা কখনো এমনটি মনে করবেননা যে, কোনো প্রকার মতপার্থক্যের কারণে আমি এ কাজে অংশ গ্রহণ করছিনা। প্রকৃতপক্ষে অপারগতা হচ্ছে এই যে, আমি বুঝতেই পারছিনে, আমি কিভাবে অংশগ্রহণ করবো। আধা কর্মপন্থা (Half measures) আমার মনে কোনোই আবেদন সৃষ্টি করেনা। আপোষমূলক কাজেও (Patchword) আমার কোনো প্রকার আগ্রহ নেই। আপনাদের কার্যনির্বাহী কমিটির দৃষ্টিভঙ্গীতো এরকমই। যদি পূর্ণ ভাংগা এবং পূর্ণ গড়ার দৃষ্টিভংগি থাকতো, তবে আমি জীবন বাজি রেখে প্রতিটি কাজ আঞ্জাম দিতে প্রস্তুত থাকতাম। কিন্তু এখানেতো গোটা দেহ অক্ষুণ্ন রেখে কেবল তার অংশ বিশেষের পরিবর্তন সাধন লক্ষ্য। এরূপ কাজের জন্যে কোনো বাস্তব কর্মপন্থা এবং ফলদায়ক পরিণতি চিন্তা করতে আমার মস্তিষ্ক অক্ষম। এ অধ্যায়ে আমার জন্যে এটাই ভাল যে, কোনো বাস্তব খেদমত আঞ্জাম দেয়ার পরিবর্তে একজন শিক্ষার্থীর মতো দেখবো যে, আপনাদের এ আংশিক সংস্কার সংশোধন কাজের কি ফল দাঁড়ায়। আর এর উদ্যোক্তারা এটাকে বাস্তবায়িত করে কি পরিণতি সৃষ্টি করে। এ পন্থায় যদি সত্যিই কোনো সুফল পাওয়া যায়, তবে এটা হবে আমার জন্যে একটি বাস্তব উদাহরণ এবং সে অবস্থা দেখে হয়তো আমি আমার "সার্বিক পরিবর্তন নীতি" থেকে "আংশিক পরিবর্তন নীতির" দিকে ধাবিত (Convert) হবো। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-সাওয়াল ১৩৬৩ হিঃ, জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪ ইং।

পাকিস্তান দাবীকে ইয়াহুদীদের 'জাতীয় রাষ্ট্রের' দাবীর সাথে তুলনা করার ভ্রান্তি

প্রশ্ন ঃ আমাদের আকীদাহ হচ্ছে, হযরত আদম আলাইহিস সালামকে যে পৃথিবীতে খেলাফতের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে, মুসলমান তারই

১. এ হচ্ছে সেই প্রশ্নমালা, জবাবসহ ইতিপূর্বে যেটি আমরা উল্লেখ করেছি।

উত্তরাধিকারী। মুসলমানের জীবনোদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তোষ অর্জন, তাঁর পবিত্র আইন কানুন অনুযায়ী চলা এবং অন্যদের সে অনুযায়ী চলতে উদ্বুদ্ধ করা। তাই তার সৃষ্টিগত উদ্দেশ্যই হলো, গোটা বিশ্বের উপর খোদায়ী কানুনকে বিজয়ী করবে এবং বিজয়ী রাখবে।

কিন্তু মিঃ জিন্নাহ এবং আমাদের অন্যান্য মুসলিম লীগী ভায়েরা পাকিস্তান দাবী করছে, যা নাকি গোটা ভারতবর্ষের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তাদের ধারণা অনুযায়ী এতে করে মুসলমানরা শান্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে। বিশুদ্ধ দ্বীনি দৃষ্টিভংগি অনুযায়ী তাদের এ ধ্যান ধারণা কি আপত্তিকর নয়?

ইয়াহুদী জাতি অভিশপ্ত জাতি। আল্লাহ পাক তার জন্যে পৃথিবীকে সংকীর্ণ করে দিয়েছেন এবং যদিও তাদের মধ্যে বিশ্বের সেরা সেরা পুঁজিপতি এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বহু সংখ্যক বিশেষজ্ঞ বর্তমান রয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর এক ইঞ্চি যমীনও তাদের দখলে নেই। তাদের জাতীয় আবাসভূমির জন্যে আজ তারা কখনো ইংরেজদের কাছে এবং কখনো মার্কিনীদের নিকট ভিক্ষা চাইছে।

আমার মতে মুসলমান, অন্য কথায় মুসলিম লীগও আজ সে কাজই করছে। ইহুদীদের মতো তারা কখনো হিন্দুদের কাছে আবার কখনো ইংরেজদের কাছে পাকিস্তান ভিক্ষা চাচ্ছে। এটা কি একটি অভিশপ্ত জাতির অনুকরণ নয়? একটি অভিশপ্ত জাতির অনুকরণ কি মুসলমানদেরকেও তাদের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেবেনা?

জবাব : পাকিস্তান দাবী সংক্রান্ত আমার বিস্তারিত ধ্যান ধারণা ও চিন্তা ভাবনা আপনি আমার 'মুসলমান আওর মওজুদা সিয়াসী কাশমাকাশ' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দেখুন।[১] আমার মতে পাকিস্তান দাবীর সাথে ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমির তুলনা খাটেনা। ফিলিস্তিন মূলত ইহুদীদের জাতীয় আবাসভূমি নয়। তারা সেখান থেকে চলে যাওয়ার পর দু'হাজার বছর অতীত হয়ে গেছে। ফিলিস্তিনকে যদি তাদের আবাসভূমি বলা যেতে পারে তবে তা সেই অর্থেই বলা যেতে পারে, যে অর্থে জার্মানীর আর্য বংশোদ্ভূত লোকেরা মধ্য এশিয়াকে নিজেদের জাতীয় আবাসভূমি বলতে পারে। ইহুদীদের আসল অবস্থা এ নয় যে, একটি দেশ সত্যি তাদের জাতীয় আবাসভূমি এবং সেটার স্বীকৃতি তারা নিতে চায়। বরঞ্চ তাদের প্রকৃত অবস্থা হচ্ছে এই যে, একটি দেশ তাদের জাতীয় আবাসভূমি নয়, অথচ তারা দাবী করছে যে, আমাদেরকে দুনিয়ার বিভিন্ন বন্দর থেকে উঠিয়ে এনে সে দেশটিতে বসবাস করতে দেয়া হোক এবং শক্তি বলে

১. গ্রন্থটি বর্তমানে 'উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান' দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। -অনুবাদক

সেটাকে আমাদের জাতীয় আবাসভূমি বানিয়ে দেয়া হোক। পক্ষান্তরে পাকিস্তান দাবীর ভিত্তি হচ্ছে এই যে, যে অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেটা কার্যতই মুসলমানদের জাতীয় আবাসভূমি। মুসলমানদের বক্তব্য তো কেবল এতোটুকু যে, বর্তমান গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভারতের অন্যান্য এলাকার সাথে একত্রে থাকলে তাদের জাতীয় আবাসভূমির রাজনৈতিক মর্যাদায় যে ক্ষতি সাধিত হবে তাকে সে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হোক এবং সংযুক্ত ভারতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পরিবর্তে হিন্দু ভারত এবং মুসলমান ভারতে দুটি স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হোক। অন্য কথায় মুসলমানরা একথা বলছেনা যে, আমাদের জন্যে একটি জাতীয় আবাসভূমি তৈরী করা হোক। বরঞ্চ তারা বলছে, আবাসভূমি কার্যত বর্তমান আছে। সেখানে পৃথকভাবে নিজেদের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার অধিকার লাভ হওয়া উচিত।

এটা এরকমই একটা জিনিস, যা আজকাল বিশ্বের প্রতিটি জাতিই চায়। মুসলমানদের মুসলমান হওয়ার বিষয়টাকে উপেক্ষা করে যদি তাদেরকে কেবলমাত্র একটি জাতি হিসেবে দেখা হয়, তবে তাদের এ দাবী যে যথার্থ সে ব্যাপারে আর কোনো কথা চলেনা। বিশ্বের কোনো জাতি অপর জাতির উপর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব চালাবে, নীতিগতভাবে আমি এর বিরোধী। আমার মতে নীতিগতভাবে প্রত্যেক জাতিরই এ অধিকার রয়েছে যে, তার রাজনীতি ও অর্থনীতির বাগডোর তার নিজেরই মুষ্টিবদ্ধে থাকবে। এ কারণেই একটি জাতি হিসেবে যদি মুসলমানরা এরূপ দাবী করে, তবে অন্যান্য জাতির বেলায় এরূপ দাবী করা যেরূপ সঠিক, তেমনি করে মুসলমানদের ব্যাপারেও তা সঠিক।

এ জিনিসকে উদ্দেশ্য বানানোর ব্যাপারে আমাদের যে আপত্তি তা কেবল এই যে, মুসলমানরা একটি আদর্শিক দল এবং আদর্শিক ব্যবস্থার আহ্বায়ক ও পতাকাবাহী দল হওয়ার মর্যাদাকে উপেক্ষা করে শুধু একটি জাতি হবার মর্যাদা অবলম্বন করেছে। তারা যদি নিজেদের প্রকৃত মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত রাখতো, তবে তাদের জন্যে জাতীয় আবাসভূমি এবং তার স্বাধীনতার প্রশ্ন হতো একটি নগন্য প্রশ্ন, বরঞ্চ আসলে এ প্রশ্ন তাদের মধ্যে সৃষ্টিই হতোনা। এখন তারা সংখ্যায় কোটি কোটি হওয়া সত্ত্বেও একটি ক্ষুদ্র মানচিত্রে নিজেদের জন্যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভকে নিজেদের চূড়ান্ত লক্ষ্য মনে করছে। কিন্তু তারা যদি ইসলামী জীবন ব্যবস্থার আহ্বায়কের ভূমিকা অবলম্বন করে, তবে একজন মুসলমানই সমগ্র বিশ্বের উপর নিজের অর্থাৎ তার সে জীবন ব্যবস্থার ভিত্তিতে যার সে আহ্বায়ক, রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবীদার হতে পারে এবং সঠিক পন্থায় প্রচেষ্টা চালালে তা প্রতিষ্ঠা করতেও সক্ষম হতে পারে। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শাওয়াল ১৩৬৩ হিঃ, জুলাই-অক্টোবর ১৯৪৪ ইং।

জামায়াতে ইসলামী এবং সীমান্ত প্রদেশের গণভোট

প্রশ্ন ঃ আপনার জানা রয়েছে, সীমান্ত প্রদেশে এ প্রশ্নে গণভোট অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যে, ভারত বিভাগের পর এ প্রদেশের লোকেরা নিজেদের প্রদেশকে ভারতের সংগে শামিল করতে চায় নাকি পাকিস্তানের সংগে? জামায়াতে ইসলামীর উপর আস্থা রাখে এমন লোকেরা জানতে চায়, তারা এ গণভোটে অংশ নেবে কিনা এবং নিলে তাদের রায় তারা কোন্ দিকে দেবে? কিছু লোকের মত হচ্ছে, এই গণভোটেও আমাদের পলিসি সেরকমই নিরপেক্ষ হওয়া উচিত যে রকম নিরপেক্ষ ছিলো বিগত পার্লামেন্ট নির্বাচনে। এমনটি না করে আমরা যদি পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিই তবে আপনা আপনি এ ভোট ঐ রাষ্ট্র ব্যবস্থার পক্ষেই গন্য হবে, যে ব্যবস্থার উপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

জবাব ঃ গণভোটের বিষয়টা নীতিগতভাবেই পার্লামেন্ট নির্বাচন থেকে ভিন্ন ধরনের। গণভোটের মাধ্যমে তো কেবল এই বিষয়টিরই মতামত নেয়া হচ্ছে যে, তোমরা কোন্ দেশের সাথে সম্পর্কিত থাকতে চাও? ভারতের সাথে নাকি পাকিস্তানের সাথে? এ বিষয়ে মত প্রকাশ করা সম্পূর্ণ বৈধ। শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এতে কোনো আপত্তি নেই। সুতরাং যেসব অঞ্চলে গণভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে, সেসব অঞ্চলের জামায়াত সদস্যদের নিজেদের মতামত প্রদানের অনুমতি রয়েছে।

বাকী থাকলো কোন্ দিকে মতামত দেয়া হবে এ প্রশ্ন। এ বিষয়ে জামায়াতের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার বাধ্যবাধকতা আরোপ করা যেতে পারেনা। কারণ, জামায়াত তার রুকনদের উপর কেবল ঐসব বিষয়েই বাধ্যবাধকতা আরোপ করে থাকে যেগুলো জামায়াতের আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সংগে সম্পর্কিত। আর এ বিষয়টি আদর্শিকও নয় এবং উদ্দেশ্যর সাথেও সম্পর্কিত নয়। তাই এ বিষয়ে নিজেদের মন যেটাকে সঠিক বলে সেদিকে মত প্রকাশ করার অধিকার জামায়াত সদস্যদের রয়েছে। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমি এটা বলতে পারি যে, আমি নিজে যদি সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী হতাম, তবে এই গণভোটে আমার রায় পাকিস্তানের পক্ষেই পড়তো। কারণ যেহেতু ভারতবর্ষ হিন্দু এবং মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে বিভক্ত হচ্ছে, তখন যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেসব অঞ্চলকে অবশ্যি মুসলিম জাতীয়তার অংশেই শামিল হওয়া উচিত।

ভবিষ্যতে এখানে যে রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে, পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়া, সে রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে ভোট দেয়ার সমার্থক নয়। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সেই ব্যবস্থা যদি সত্যিই ইসলামী হয়, তবে আমরা মনে প্রাণে তার শুভাকাংখী হবো, আর যদি অনৈসলামী ব্যবস্থা হয়, তবে তা পরিবর্তন করে ইসলামী আদর্শের ছাঁচে গড়ার জন্যে আমরা সে রকমই চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যাবো, যেমনটি

করছি বর্তমান ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্যে। অর্ধ সাপ্তাহিক কাওসার তাং ৫ জুলাই ১৯৪৭ ইং।

ইসলামী রাষ্ট্র এবং পোপতন্ত্রের আদর্শিক পার্থক্য

প্রশ্ন ঃ আবু সায়ীদ বযমী সাহেব 'রেসালায়ে হক' নামক সাময়িকীতে তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেন ঃ

"সেটাও ইসলামী রাজনীতির একটি ধারণা, ইদানিং মাওলানা আবুল আলা মওদূদী খুব জোরে শোরে যা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর পেশকৃত ইসলামী রাজনীতির মৌলিক দৃষ্টিকোণ হচ্ছে এই যে, সরকার জনগণের নিকট জবাবদিহী করবেনা। ঐতিহাসিক দিক থেকে এটা কোনো নতুন মূলনীতি নয়। ইউরোপে দীর্ঘকাল পর্যন্ত থিওক্রেসি (Theocracy) নামে এরি চর্চা হচ্ছিল। রোমের প্রধান পোপের নেতৃত্ব এই ধারণারই ফলশ্রুতি। কিন্তু লোকেরা মনে করছে, যেহেতু খোদা কোনো বক্তব্য প্রকাশক প্রতিষ্ঠান নয়, তাই খোদার নামে যে ব্যক্তিই ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভ করে, সে খুব সহজেই তা ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করতে পারে। মাওলানা মওদূদীর সমর্থকরা দাবী করছে যে তাদের উপস্থাপিত রূপরেখা পোপতন্ত্রের চাইতে ভিন্নতর, কিন্তু যেহেতু সেই সরকার জনগণের সামনে জবাবদিহী করতে বাধ্য নয় এবং এর ভিত্তিতে গণতন্ত্রকে ভ্রান্ত মনে করে, তাই এ ধারণা এবং পোপতন্ত্রের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকেনা।"

অতপর বযমী সাহেব নিজের পক্ষ থেকে একটা সমাধান পেশ করেন। কিন্তু সেটাও সন্তোষজনক নয়। মেহেরবানী করে তরজমানুল কুরআনের মাধ্যমে এ ভ্রান্ত-ধারণা দূর করে সঠিক দৃষ্টিকোণ পেশ করবেন।

জবাব ঃ বযমী সাহেব সম্ভবত আমার "ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ" বইটি পড়ে দেখেননি। পড়লে তিনি দেখতেন, আমার নীতির উপর তিনি যেসব আপত্তি তুলেছেন, সেগুলোর পূর্ণ জবাব তাতে রয়েছে। কিন্তু তিনি যদি বইটি পড়ে থাকেন, তবে তাঁর মন্তব্যের ব্যাপারে বিস্ময় প্রকাশ করা ছাড়া আর কিছুই আমার করার নেই। এ ব্যাপারে আমার সে বইটির নিম্নোক্ত বাক্যগুলো দেখুন ঃ

"কিন্তু ইউরোপ যে থিওক্রেসির সাথে পরিচিত, ইসলামী থিওক্রেসি তার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। ইউরোপ তো সেই থিওক্রেসির সাথেই পরিচিত, যাতে একটা বিশেষ ধর্মীয় শ্রেণী খোদার নাম করে নিজেদেরই মনগড়া আইন কানুন চালিয়ে দেয়। তারা কার্যত সকল নাগরিকের উপর নিজেদেরই খোদায়ী চাপিয়ে দেয়। এরকম রাষ্ট্রকে খোদায়ী রাষ্ট্র বলার পরিবর্তে শয়তানী রাষ্ট্র বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত। পক্ষান্তরে ইসলামী থিওক্রেসি এর চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। সেটা কোনো বিশেষ ধর্মীয় শ্রেণীর মুষ্টিবদ্ধ থাকেনা, বরঞ্চ তা থাকে সাধারণ

মুসলমানদের করায়ত্বে। আর মুসলমান সাধারণ এ রাষ্ট্রকে খোদার কিতাব এবং রাসূলের সুন্নাত মুতাবেক পরিচালিত করে। আমাকে যদি একটি নতুন পরিভাষা তৈরী করার অনুমতি দেয়া হয়, তবে আমি এ পদ্ধতির রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে "খোদায়ী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র" (Theo Democratic State) নামে অবিহিত করবো। কেননা এতে খোদার সার্বভৌমত্ব এবং তার সর্বোচ্চ কর্তৃত্বের অধীনে মুসলমানদেরকে একটি সীমিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দান করা হয়েছে। এর নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে মুসলমানদের মতামতের ভিত্তিতে। এ পরিষদকে পদচ্যুত করার ক্ষমতাও মুসলমানদেরই হাতে থাকবে। যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয় যেগুলো সম্পর্কে খোদার শরীয়তের কোনো স্পষ্ট নির্দেশ বর্তমান নেই, সেগুলো মুসলমানদের ইজমার ভিত্তিতে ফায়সালা হবে। আর যেখানে আল্লাহর আইনের ব্যাখ্যা দান প্রয়োজন হবে, সেখানে কোনো উপদল বা গোত্রের লোকেরা নয়, বরঞ্চ সর্ব সাধারণ মুসলমানদের মধ্য থেকে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই তার ব্যাখ্যা প্রদানের জন্যে উপযুক্ত বিবেচিত হবেন, যিনি ইজতিহাদের যোগ্যতা সম্পন্ন।"

অতপর এ বাক্যগুলোর নিচে একটি টীকায় আরো স্পষ্ট করে বলেছি ঃ

"খৃষ্টান পাদ্রী ও পোপদের নিকট ঈসা আলাইহিস সালামের কয়েকটি নৈতিক শিক্ষা ছাড়া আর কিছুই নেই। মানুষের বাস্তব ধর্ম ও সামাজিক জীবনের জন্যে মূলত তাদের নিকট কোনো শরীয়তই ছিলনা। তাই তারা নিজেদের মর্জী মতো নিজেদের লালসা ও ইচ্ছা বাসনা অনুসারে আইন তৈরী করতো এবং সেটাকেই খোদার দেয়া আইন বলে জারি করতো।"

যে ব্যক্তি খৃষ্টান ধর্ম এবং পোপতন্ত্রের ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, এ বাক্যগুলোতে আমি যেদিকে ইংগিত করেছি, তিনি তা বুঝতে ভুল করতে পারেননা। ইউরোপের পোপতন্ত্র ছিলো সেন্ট পলের অনুসারী। ইনি মূসা আলাইহিস সালামের শরীয়তকে অভিশপ্ত আখ্যায়িত করে কেবল সেইসব নৈতিক শিক্ষার উপর খৃষ্টবাদের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেন যা নিউ টেষ্টামেন্টে পাওয়া যায়। এসব নৈতিক শিক্ষার মধ্যে এমন কোনো আইন কানুন বর্তমান নাই, যদ্বারা একটি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনা করা যেতে পারে। কিন্তু পোপরা যখন ইউরোপে বিনা কারণে বা কারণে থিওক্রেসী প্রতিষ্ঠা করলো, তখন তারা একটি আইনের বিধানও তৈরী করলো। এ কথা সুস্পষ্ট যে তাদের এ বিধান কোনো অহী বা ইলহাম থেকে গৃহীত হয়নি। বরঞ্চ এ ছিলো তাদের মনগড়া জিনিস। এতে তারা সেসব আকীদাহ বিশ্বাসের বিধান, ধর্মীয় কর্মকাণ্ড, নযর নিয়াযের প্রথা এবং সামাজিক বিধি বন্ধন প্রভৃতি তৈরী করে নিয়েছিল, তার কোনোটিই আল্লাহর কিতাব থেকে নেয়া হয়নি। এমনি করে খোদা এবং বান্দার মাঝখানে তারা ধর্মীয় নেতাদের যে স্থায়ী মিডিয়া নির্ধারণ করেছে সেটাও সম্পূর্ণই তাদের মনগড়া। এছাড়া গীর্জা ব্যবস্থার কর্মীদের জন্যে তারা যেসব

ক্ষমতা ও অধিকার ধার্য করেছে এবং লোকদের উপর যেসব ধর্মীয় ট্যাক্স ধার্য করেছে তাও তারা গ্রহণ করেছে তাদের নিজেদের ইচ্ছা আকাংখা এবং কামনা বাসনা থেকে। এ ধরণের ব্যবস্থাকে তারা যতই থিওক্রেসি নাম দিক না কেন, প্রকৃতপক্ষে এটা থিওক্রেসি নয়। এটাকে ইসলামী হুকুমাত বা খোদায়ী শরীয়ত ভিত্তিক রাষ্ট্রের সাথে কিভাবে তুলনা করা যেতে পারে? ইসলামী রাষ্ট্র তো কিতাব ও সুন্নাতের এক অপরিবর্তনীয় রদবদল অযোগ্য সমুদ্ভাসিত চিরস্থায়ী শাশ্বত বিধান। এ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব বিশেষ কোনো ধর্মীয় শ্রেণী ইজারা করে নেয়নি।

বযমী সাহেবের এ বক্তব্য আরো অধিক বিস্ময়কর, যাতে তিনি বলেছেন যে, আমি ইসলামের খলীফাকে সেই পজিশন দিয়েছি, খৃষ্টবাদে পোপের যে পজিশন রয়েছে এবং আমি খলীফাকে জনসাধারণের নিকট জবাবদিহী করতে হবেনা বলে মনে করেছি? এর জবাবে আমার সেই বইটি থেকেই আরো কয়েকটি অংশ উল্লেখ করে দেয়াই যথেষ্ট মনে করছি ঃ

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ-

এ আয়াতটি উল্লেখ করে আমি লিখেছি ঃ

"এ আয়াত থেকে দ্বিতীয় যে তত্ত্বটি পাওয়া যায়, তা হচ্ছে এই যে, খলীফা নিযুক্তির প্রতিশ্রুতি সকল মুমিনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। 'মুমিনদের কোনো একজনকে খলীফা বানাবো' আয়াতে এ কথা বলা হয়নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, মূলত সকল মুমিনই খেলাফতের দায়িত্বশীল খলীফা। খোদার পক্ষ থেকে মুমিনদের যে খেলাফত দান করা হয়েছে তা সার্বজনীন খেলাফত।"

আরেকটু সামনে অগ্রসর হয়ে আমি লিখেছি ঃ

"এখানে প্রত্যেক ব্যক্তিই খলীফা। মুসলমান জনসাধারণের খেলাফত অধিকারকে হরণ করে কোনো ব্যক্তি বা সমষ্টি নিজেরাই নিরংকুশ ক্ষমতার মালিক ও হর্তাকর্তা হয়ে বসা সম্ভব নয়। শাসন পরিচালনার জন্যে ইসলামী সমাজের প্রত্যেক নাগরিক, ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী প্রত্যেক খলীফা নিজ নিজ খেলাফত অধিকার যখন স্বেচ্ছায় কোনো বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে, তখন সেই হয় ইসলামী সমাজের শাসনকর্তা। সে ব্যক্তি একদিকে খোদার নিকট দায়ী থাকে। অপরদিকে দায়ী থাকে জনগণ তথা সাধারণ খলীফাদের নিকট, যারা নিজেদের খেলাফত অধিকার তার হাতে সোপর্দ করেছে।"

অতপর বইর অন্য স্থানে আমি স্পষ্ট করে বলেছি যে ঃ

"ইসলামী রাষ্ট্রের ইমাম, আমীর বা রাষ্ট্রপতির প্রকৃত মর্যাদা হলো, স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেক মুসলমান খোদা প্রদত্ত যে খেলাফত লাভ করেছে, সে ক্ষমতা সে নিজ সমাজ থেকে সর্বোত্তম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করে তাঁর হাতে স্বেচ্ছায় আমানত রাখে মাত্র। তাকে যে খলীফা নামে অভিহিত করা হয় তার অর্থ এ নয় যে, তিনি একাই খোদার খলীফা। বরঞ্চ সর্ব সাধারণ মুসলমানের স্বতন্ত্র খেলাফত তার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে বলেই তাকে খলীফা বলা হয় মাত্র।"

অতপর নিম্নোক্ত প্যারাটিও আমার বইটিতে বর্তমান আছে ঃ

"আমীর সমালোচনার উর্ধ্বে নন। প্রত্যেক মুসলমানই তার সমালোচনা করতে পারে। কেবল তার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম সম্পর্কেই যে সমালোচনা করা যাবে তা নয়, বরঞ্চ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও সমালোচনা করার অধিকার প্রত্যেকের আছে। (প্রয়োজনে) আমীরকে পদচ্যুত করা যাবে। আইনের দৃষ্টিতে একজন সাধারণ নাগরিকের মতোই তার মর্যাদা। তার বিরুদ্ধে আদালতে মোকাদ্দমা দায়ের করা যাবে। আদালতকে তার সাথে বিশেষ পরামর্শ করে কাজ করতে হবে। এমন লোকদের নিয়ে তাকে মজলিশ গঠন করতে হবে, যারা হবে সাধারণ মুসলমানদের আস্থাভাজন। মজলিশে শূরার সদস্যদেরকে মুসলমানরা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার ব্যাপারেও শরয়ী কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। সর্বাবস্থায় সর্বসাধারণ মুসলমানরা একথার প্রতি লক্ষ্য রাখবে যে, আমীর তার এই ব্যাপক ক্ষমতা তাকওয়া এবং খোদা ভীতির সাথে ব্যবহার করছে নাকি নিজের খেয়াল খুশী মতো? অন্য কথায়, জনগণের রায় ইসলামী রাষ্ট্রের আমীরকে পদচ্যুত করতে পারে।"

এসব সুস্পষ্ট বক্তব্যের পরও কোনো ব্যক্তি যদি আমাদের থিওক্রেসিকে রোমের পাদ্রীদের তৈরী করা থিওক্রেসির সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করে, তবে আমরা তো আর তাকে তার স্বাধীন মতামত প্রকাশ করা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার রাখিনা। কিন্তু একথা বলার অধিকার অবশ্যি রাখি যে, তার এই মতামত জ্ঞান, যুক্তি ও দলিল প্রমাণের সীমা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব ১৩৬৫ হিঃ, জুন ১৯৪৬ ইং।

কুফরী রাষ্ট্রের বিধানসভায় (Parliament) মুসলমানদের অংশ গ্রহণের প্রশ্ন

প্রশ্ন ঃ আপনার লিখিত 'ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ' বইটি পড়ার পর আমার অন্তরে এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, আইন ও বিধান তৈরী করার অধিকার একমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট। এই প্রকৃত সত্যের বিপরীত আদর্শ ও নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত আইন পরিষদের সদস্য হওয়া শরীয়তের সম্পূর্ণ খেলাফ। কিন্তু এ ব্যাপারে একটি সন্দেহ থেকে যায়। তা হচ্ছে এই যে, সকল

মুসলমানই যদি বিধান সভায় অংশগ্রহণকে হারাম মনে করে তা বর্জন করে, তাহলে তো মুসলমানরা ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রকাশ থাকে যে, রাজনৈতিক শক্তির মাধ্যমেই জাতিসমূহের সাফল্য ও উন্নতি লাভের কাজ করা সম্ভব হতে পারে। আমরা আমাদের রাজনৈতিক শক্তি পুরোটাই যদি অন্যদের হাতে ছেড়ে দিই, তার ফল (Result) এই দাঁড়াবে যে, তারা মুসলিম বিদ্বেষের কারণে এসব আইন কানুন চালু করবে এবং এমন রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলবে, যার অধীনে মুসলমানরা সম্পূর্ণ অবদমিত ও শৃংখলিত হয়ে থাকবে। মুসলমানদের এই রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কবল থেকে মুক্তির জন্য আপনি কি চিন্তা করে রেখেছেন?

জবাব ঃ আপনার প্রশ্নে আপনি ভুল চিন্তা পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। আপনি তো ঐ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ভ্রান্ত বলে উপলব্ধি করতে পেরেছেন, যেখানে মানুষ নিজেরাই নিজেদের আইন প্রণয়নকারী হয়ে বসে কিংবা অন্য মানুষকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে। আপনি একথাও বুঝতে সক্ষম হয়েছেন, সার্বভৌমত্ব এবং আইন ও বিধান প্রণয়নের অধিকার শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট। আর মানুষের কাজ হচ্ছে তাঁর হুকুমের অনুবর্তন করা, হুকুম প্রণয়ন করা নয়। এখন আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, যে মুসলমানের কল্যাণের কথা আপনি ভাবছেন, তাদেরকে কি উদ্দেশ্যে 'মুসলিম' নামের একটি দল বানানো হয়েছে? এই উদ্দেশ্যে নয়কি যে, তারা কুরআন থেকে প্রমাণিত সত্য জীবন ব্যবস্থাকে দুনিয়ার সামনে উপস্থাপন করবে, দুনিয়াকে তার পতাকাতলে শামিল করবে, নিজেদের যিন্দেগীকে তার উপর প্রতিষ্ঠিত করবে এবং দুনিয়ার বুকে তাকে চালু করার জন্যে নিজেদের পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করবে? নাকি এ উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত, পৃথিবীতে যে বাতিল ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠিত থাকুক না কেন (এবং তাদের গাফলাতির কারণেই কায়েম হয়ে থাকুক না কেন), তার সাথে সমঝোতা করে চলা, তাকে মান্য করে চলা এবং তাকে উৎখাত করার চেষ্টা সংগ্রাম থেকে এ কারণে বিরত থাকার জন্যে যে, হয়তোবা এতে তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে?

যদি প্রথম উদ্দেশ্যই সঠিক হয়ে থাকে, তবে মুসলমানরা আজ যা কিছু করছে সবই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত। তাদের স্বার্থ যদি এই ভ্রান্তির সাথেই সম্পর্কিত হয়ে থাকে, তবে এমন স্বার্থ কিছুতেই পরোয়া করার যোগ্য নয়। এমতাবস্থায় একজন প্রকৃত মুসলিমের কাজ হচ্ছে, নিজ জাতির সংগে মিলে জাহান্নামের পথ অবলম্বন করার পরিবর্তে তিনি সত্য জীবন বিধানকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। তার জাতি তার এ কাজে সহযোগিতা করুক কিংবা না করুক তাতে তার কিছুই যায় আসেনা।

কিন্তু আপনি যদি শেষোক্ত উদ্দেশ্যের সমর্থক হয়ে থাকেন, তবে আমার বলার কিছু নেই। সত্যকে সত্য জানা সত্ত্বেও আপনি যদি কেবল জাতীয় স্বার্থে সত্যের বিপরীত পথ অবলম্বন করতে চান, তবে আপনি তা করতে পারেন।

অনেকেই এ আশংকাবোধ করছেন, আমরা যদি এসেম্বলী থেকে দূরে থাকি, তবে অমুসলিমরা তা দখল করে নিয়ে তারা একাই রাষ্ট্রের মালিক ও পরিচালক হয়ে বসবে। আমরা যদি রাষ্ট্রের একটি পূর্ণ অংশ না হই তবে অন্যরা সে স্থান দখল করে নেবে। এভাবে যিন্দেগীর সমস্ত কলকব্জা দখল করে নিয়ে তারা আমাদের অস্তিত্বকেই বিলীন করে দেবে। এমনকি ইসলামের নাম নেবার মতোও কোনো লোক বাকী থাকবেনা।

কিন্তু এই আশংকা বাস্তবে যতোটা না ভয়াবহ তার চাইতে অধিক ভয়াবহ হচ্ছে লোকদের খামখেয়ালীপনা। আমরা যদি একথা বলতাম, একটা নেগেটিভ পলিসি অবলম্বন করে মুসলমানরা জীবনের সকল কর্মকাণ্ড থেকে হাত গুটিয়ে ঘরের কোণে বসে পড়ুক, তখন এ আশংকার কোনো সত্য ভিত্তি থাকতে পারতো। কিন্তু আমরা এ নেগেটিভ নীতি অবলম্বনের সাথে সাথে একটি পজেটিভ কর্মসূচীও পেশ করছি। আর তা হচ্ছে, মুসলমানরা এ বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থা পরিচালনার পরিবর্তে দুনিয়াতে সত্য জীবন ব্যবস্থা (দ্বীন ইসলাম) প্রতিষ্ঠার জন্যে সুসংগঠিত চেষ্টা সংগ্রাম আরম্ভ করে দিক। অন্যান্য জাতির মতো নিজেদের পার্থিব স্বার্থের জন্যে দ্বন্দ্ব সংঘাতে লিপ্ত হবার পরিবর্তে তাদের সম্মুখে সত্য জীবন ব্যবস্থা তুলে ধরুক, যার অনুসরণ অনুবর্তনের মধ্যে গোটা মানবজাতির কল্যাণ নিহিত রয়েছে। তারা কুরআনের মাধ্যমে, সীরাতে রাসূলের মাধ্যমে, ইসলামী চরিত্র অবলম্বনের মাধ্যমে চিন্তা ও চরিত্রের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ণাংগ বিপ্লব সাধনের লক্ষ্যে আপ্রাণ চেষ্টা সংগ্রাম চালিয়ে যাক।

আমাদের এ দাওয়াতের দু' ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে ঃ

একটি প্রতিক্রিয়া এই হতে পারে যে, গোটা ভারতবর্ষের দশ কোটি মুসলমান একই সাথে আমাদের এই দাওয়াত কবুল করে নেবে। মানসিক, নৈতিক এবং আমলী দিক থেকে তারা ইসলামের প্রকৃত আহ্বায়ক হয়ে যাবে। এরা হচ্ছে সেই দশ কোটি মুসলমান, যাদের নিকট রয়েছে বস্তুগত সহায় সম্পদ এবং মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতার আর হাত পায়ের শক্তির অভাবতো তাদের নেই-ই। এমতাবস্থায় তারা সবাই মিলে একই সাথে যদি আমাদের দাওয়াত কবুল করে (বাহ্যিকভাবে যার কোনো সম্ভাবনা নেই), তবে যেখানে আপনি সন্দেহ করছেন, কিছু আপনাদের হাতছাড়া হয়ে যাবে, তার বিপরীত আমি বিশ্বাস রাখি যে, এক্ষেত্রে শুধু ভারতবর্ষই নয়, বরঞ্চ বিশ্বের এক বিরাট অংশ আমাদের হস্তগত হয়ে যাবে। সহসাই ভারতের সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুর

ঝগড়া থেমে যাবে। কোনো শক্তিই ভারতবর্ষে নিরেট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকে ঠেকাতে পারবেনা। অল্প সময়ের মধ্যেই সকল মুসলিম রাষ্ট্রের কায়া পরিবর্তন হয়ে যাবে। যেসব শক্তি আজ দুনিয়ার বুকে সাম্রাজ্যবাদী থাবা বিস্তার করে আছে, অরা কিছুতেই তিরস্কৃত হওয়া থেকে রক্ষা পাবেনা।

দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া এই হতে পারে (আর এখন এমনটি হবার সম্ভাবনাই বেশী) যে, মুসলমানদের মধ্যে যারা পবিত্র আত্মা এবং উন্নত মন মানসিকতার অধিকারী, ধীরে ধীরে তারা আমাদের দাওয়াত কবুল করতে থাকবেন। আর যতোক্ষণ না সুসংগঠিত সৎ লোকদের একটি শক্তিশালী দল তৈরী হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত সাধারণ মুসলমানরা তেমনি করে নেতাদের অনুসরণ করতে থাকবে, দীর্ঘদিন থেকে যেমনি অনুসরণ করে আসছে এবং এখনো করছে। একথা পরিষ্কার, আপনি যে বিপদের আশংকা করছেন, এমতাবস্থায় সে আশংকা থাকতে পারেনা। কেননা ভুল পথে পরিচালিত বিরাট সংখ্যক মুসলমান সেসব কাজ করার জন্যে বর্তমান থাকবে, যেসব কাজ না করার কারণে আপনি মনে করবেন যে, মুসলমানদের স্বার্থ ধুলিস্যাৎ হয়ে যাবে। একথা নিশ্চিত যে, এই সবগুলো কাজও যদি পুরোদমে হতে থাকে, আর সেই একটি কাজই যদি না হয়, যেদিকে আমরা আহ্বান করছি এবং এ সাথে আমরাও যদি এই প্রকৃত কাজ এবং তার দাবী থেকে চক্ষু বন্ধ করে কেবল জাতি এবং তার স্বার্থের চিন্তায় ভ্রান্তপথে ধাবিত হই, যা নাকি বর্তমানে ইসলাম এবং মুসলমানদের স্বার্থের নামে হচ্ছে, তবে বিশ্বাস করুন, ইসলামের পতাকা উত্তোলিত হওয়া তো দূরের কথা, গোটা মুসলিম জাতি ইহুদীদের মতো চরম লাঞ্ছনা ও অধঃপতনের হাত থেকে কিছুতেই রক্ষা পাবেনা, আল্লাহর কিতাব নিজেদের কাছে রেখেও তার দাবী পূর্ণ করা থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শনের ফলে তাদের ভাগ্যে যা ঘটেছে। তরজমানুল কুরআন ঃ মুহাররম ১৩৬৫ হিঃ, ডিসেম্বর ১৯৪৫ ইং।

শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে অনৈসলামী পার্লামেন্টের সদস্য পদ এবং কুফরী রাষ্ট্রের চাকুরী

প্রশ্ন ঃ "মুসলমান হবার কারণে কোনো মুসলমানের জন্যে (বৃটিশ ভারতের) পার্লামেন্টের মেম্বার হওয়া জায়েয কিনা? যদি জায়েয না হয়ে থাকে, তবে কেন? এখানে মুসলমানদের দুটি বড় দল থেকে পার্লামেন্টের সদস্যপদের জন্যে লোকেরা প্রার্থী হচ্ছে এবং ভোট লাভের জন্যে আমার উপর চাপ সৃষ্টি করছে। এমনি করে আলিমদের দাবীও এটাই। মোটামুটিভাবে যদিও একথা জানি, মানুষের সার্বভৌমত্বের মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত পার্লামেন্ট এবং তার সদস্য পদ দুটোই শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। কিন্তু এ ব্যাপারে যতোক্ষণ না যুক্তিসংগত কারণ দেখাতে পারছি, ততোক্ষণ ভোট দানের দাবী থেকে রেহাই পাওয়া কঠিন।

শরীয়তের দৃষ্টিতে এ সরকারের অধীনে চাকুরী করা বৈধ কিনা এ বিষয়টাও জানা দরকার। মোটামুটিভাবে এ ব্যাপারেও নাজায়েযের পক্ষেই আমার মত। কিন্তু আমার সামনে সুস্পষ্ট দলিল প্রমাণ নেই।"

জবাব ঃ নীতিগতভাবে একথা স্পষ্টই জেনে নিন যে, বর্তমানকালে যতোগুলো গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (যেগুলোর একটি শাখা বর্তমান ভারতীয় পার্লামেন্ট), সেগুলো এ বৈশিষ্ট্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, নাগরিকরা তাদের নিজেদের যাবতীয় পার্থিব বিষয় সম্পর্কে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক যাবতীয় নীতিমালা এবং সেগুলোর উপর বিস্তারিত আইন প্রণয়নের অধিকার নিজেদেরই মুষ্টিবদ্ধে রাখে। এ ব্যবস্থার আইন প্রণয়নের জন্যে জনমতের চাইতে উচ্চতর কোনো সনদের প্রয়োজন হয়না। এ মতবাদ ইসলামী মতাদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলামে তাওহীদী আকীদার এক অবিচ্ছেদ্য অংগ হচ্ছে, সকল মানুষ এবং গোটা দুনিয়ার মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। হুকুম ও বিধানকর্তা একমাত্র আল্লাহ। হেদায়াত এবং হুকুম দান শুধুমাত্র তাঁরই কাজ। আর মানুষের কাজ হলো, তারা তাঁরই হেদায়াত এবং ফরমান থেকে নিজেদের জন্যে আইন কানুন গ্রহণ করবে। মতের স্বাধীনতা কেবল সেটুকুই অবলম্বন করবে, যেটুকু স্বয়ং আল্লাহই তাদের প্রদান করেছেন। এই মতাদর্শের দৃষ্টিতে যাবতীয় আইন ও বিধানের উৎস এবং যিন্দেগীর সকল বিষয়ের নির্দেশিকা হলো আল্লাহর কিতাব এবং তার রাসূলের সুন্নাহ। এই মতাদর্শ থেকে দূরে সরে প্রথমোক্ত গণতান্ত্রিক মতবাদ গ্রহণ করা যেনো তাওহীদী আকীদা থেকেই বিচ্যুত হওয়া। এ জন্যে আমি বলছি, যেসব আইন সভা বা পার্লামেন্ট বর্তমানকালের গণতান্ত্রিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলোর সদস্যপদ হারাম এবং এর সদস্য পদের জন্যে ভোট দেয়াও হারাম। কেননা, ভোট দেয়ার অর্থই হচ্ছে, আমরা আমাদের রায় দ্বারা এমন ব্যক্তিকে নির্বাচিত করছি, যার কাজ হবে বর্তমান প্রশাসন ও বিধানের অধীনে আইন প্রণয়ন ও আইন জারি করা, যা নাকি আকীদাগতভাবে সরাসরি তাওহীদের বিপরীত। যদি কোনো আলিম এটাকে বৈধ মনে করেন তবে তাঁর নিকট থেকেই এর স্বপক্ষে দলিল প্রমাণ দাবী করুন। আপনি এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে আমার লেখা "সিয়াসী কাশমাকাশ ৩য় খণ্ড" এবং "ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ" গ্রন্থদ্বয় পাঠ করুন।

এ ধরনের ব্যাপারে এটা কোনো দলীলই নয়, যেহেতু এ ব্যবস্থা আমাদের উপর চেপে রয়েছে এবং যেহেতু জীবনের সকল বিষয় এর সাথে সম্পর্কিত, সে জন্যে আমরা যদি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ না করি এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশ গ্রহণের চেষ্টা না করি তবে আমাদের অমুক অমুক ক্ষতি হয়ে যাবে। যা মূলত হারাম, এ রকম দলীল প্রমাণ দ্বারা তা কোনো অবস্থাতেই বৈধ করা যেতে

পারেনা। তাহলে তো শরীয়তের এমন কোনো হারামই আর বাকী থাকবেনা সুবিধা ও প্রয়োজনের কারণে যাকে হালাল বানিয়ে নেয়া যাবেনা। বাধ্য হয়ে হারাম জিনিস ব্যবহারের অনুমতি শরীয়তে রয়েছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আপনি নিজে গাফলতি করে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে বাধ্য হওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। অতপর এটাকে দলিল হিসেবে গ্রহণ করে সমস্ত হারামকে নিজের জন্যে হালাল বানিয়ে নিতে থাকবেন এবং সেই 'বাধ্য হওয়ার' পরিবেশকে খতম করার জন্যে কোনো প্রচেষ্টা চালাবেননা, পদক্ষেপ গ্রহণ করবেননা। এখন মুসলমানদের উপর যে রাষ্ট্রব্যবস্থা চেপে বসে আছে এবং যার চেপে বসাকে তারা নিজেদের জন্যে 'বাধ্য হবার' দলিল বানাচ্ছে, তা তো তাদের নিজেদেরই গাফলতির পরিণাম ফল। এখন সেখানে তাদের সবটুকু সময় যোগ্যতা ও শক্তি সামর্থের পুঁজিকে এ ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন এবং খালেস ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিয়োজিত করা উচিত, সেখানে তারা এর পরিবর্তে বাধ্য হওয়াকে দলিল বানিয়ে এ বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থার মধ্যে অংশীদার হবার এবং তাকে আরো মজবুত এবং স্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে।

আপনি দ্বিতীয় যে জিনিসটা জানতে চেয়েছেন, তার জবাব হলো, ব্যক্তিগতভাবে একজন মুসলমান বেতন বা পারিশ্রমিকের ভিত্তিতে কোনো অমুসলমানের চাকুরী বা কাজ করে দেয়ার ব্যাপারে একমত বা চুক্তিবদ্ধ হওয়াতে দোষ নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, সেই কাজ বা চাকুরী কোনো অবস্থাতেই সরাসরি হারামের সাথে সম্পর্কিত হতে পারবেনা। কিন্তু একদল আলিম এর ভিত্তিতে কুফরী রাষ্ট্রের চাকুরীকে বৈধ আখ্যায়িত করার যে প্রয়াস চালাচ্ছেন, তা সহীহ নয়। তারা সেই মৌলিক পার্থক্যটাই উপেক্ষা করছেন যা একজন অমুসলিম ব্যক্তি এবং একটি অনৈসলামী সরকারের সামষ্টিক কার্যক্রমের সাথে জড়িত। একটি অনৈসলামী রাষ্ট্র তো প্রতিষ্ঠিতই হয় এজন্যে, যেনো ইসলামের পরিবর্তে অনৈসলামী, আনুগত্যের পরিবর্তে নাফরমানী এবং আল্লাহর খেলাফতের পরিবর্তে মানব জীবনে আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ প্রকাশ পায়। এ রাষ্ট্রের সার্বিক কার্যক্রমই এ উদ্দেশ্যে কাজ করে। এটা পরিষ্কার কথা, এ সবগুলো জিনিসই হারাম এবং সকল হারামের চাইতে বড় হারাম। সুতরাং এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে এরকম কোনো পার্থক্য করা যেতে পারেনা যে অমুক বিভাগের কাজ জায়েয ধরনের আর অমুক বিভাগের কাজ নাজায়েয ধরনের। কারণ এ সবগুলো বিভাগ সমন্বিতভাবে একটি বিরাট খোদাদ্রোহী রাষ্ট্র ব্যবস্থাকেই প্রতিষ্ঠিত রাখছে। ব্যাপারটা সঠিকভাবে বুঝবার জন্যে একটা উদাহরণই যথেষ্ট মনে করছি। কোনো একটি প্রতিষ্ঠান যদি মুসলমান সাধারণের মধ্যে কুফরীর প্রসার এবং তাদেরকে মুরতাদ বানানোর উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে এ প্রতিষ্ঠানের কোনো হালাল ধরনের কাজও পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোনো মুসলমানের জন্যে বৈধ হতে পারেনা। কেননা সে

কাজটিও এ প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করার জন্যে প্রয়োজনীয়। তরজমানুল কুরআন ঃ মুহাররম ১৩৬৫ হিঃ, ডিসেম্বর ১৯৪৫ ইং।

শান্তিপূর্ণ বিপ্লবের পন্থা

প্রশ্ন ঃ নিম্নে দুটি সন্দেহের কথা উল্লেখ করছি। মেহেরবানী করে এ দুটি বিষয়ে সঠিক ধারণা পেশ করবেন ঃ

১. তরজমানুল কুরআনের গত সংখ্যায় একজন প্রশ্নকারীর এ প্রশ্ন প্রকাশ হয়েছে যে, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো সুসংগঠিত রাষ্ট্রশক্তির মোকাবিলা করতে হয়নি। অথচ হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনে ছিলো এক সুপ্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা। তিনি যখন পূর্ণ রাষ্ট্র ক্ষমতা তার হাতে ন্যস্ত করার ব্যাপারে রাষ্ট্রকে সম্মত পেলেন, তখন তিনি এগিয়ে গিয়ে তা কবুল করেন। প্রথমে ঈমানদার সৎ লোকদের একটি জামায়াত তৈরী করতে হবে এ পন্থা তিনি অবলম্বন করেননি। আজকের যুগেও কি তাঁর অনুসৃত সে নীতি অবলম্বন করা যেতে পারেনা? কেননা বর্তমানে রাষ্ট্রব্যবস্থা তো আগের তুলনায় আরো অধিক শক্তি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে?" এ প্রশ্নের জবাবে আপনি যা কিছু লিখেছেন, তাতে আমি পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারিনি। আমার প্রশ্ন হলো, আমাদেরকে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের অনুসরণ কেন করা উচিত? আমাদের জন্যে তো শুধু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণই ওয়াজিব। তিনি তো মক্কাবাসীদের বাদশাহীর প্রস্তাব প্রত্যাখান করে নিজস্ব পন্থায় পৃথক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ফায়সালা করেন এবং বর্তমানে আমাদের জন্যেও এটাই একমাত্র কর্মপন্থা। আমার এ মত কতোটা সঠিক কিংবা কতটা ভুল মেহেরবানী করে বিস্তারিতভাবে জানাবেন।

২. আপনি আরো লিখেছেন ঃ কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে যদি এরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, প্রচলিত সাংবিধানিক পন্থায় বাতিল রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে আমাদের আদর্শের ছাঁচে ঢেলে গড়া সম্ভব, তখন আমরা সে সুযোগ গ্রহণে দ্বিধা করবনা।' এ বাক্য দ্বারা লোকদের এ ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে যে জামায়াতে ইসলামীও পার্লামেন্টে আসার জন্যে অনেকটা প্রস্তুত এবং জামায়াত নির্বাচনকে জায়েয মনে করছে। এ বিষয়ে জামায়াতের নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

জবাব ঃ সকল নবীই আমাদের জন্যে অনুসরণীয়। স্বয়ং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও এই নির্দেশই দেয়া হয়েছিল যে, "সেই পন্থা ও তরীকায় চলো যা ছিলো আম্বিয়ায়ে কিরামের পন্থা ও তরীকা।" কোনো নবী কোনো বিশেষ পন্থা অবলম্বন করেছিলেন বলে যদি আমরা কুরআন থেকে অবগত হই এবং কুরআন যদি সেই কর্মপন্থাকে মনসুখ ঘোষণা না করে থাকে তবে

সেটাও আমাদের জন্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসৃত পন্থার মতোই দ্বীনি কর্মপন্থা।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যে বাদশাহী প্রদানের প্রস্তাব করা হয়েছিল তা ছিলো এই শর্ত সাপেক্ষে যে, আপনি এই দ্বীন এবং এর প্রচার বন্ধ করুন, তাহলে আমরা সবাই মিলে আপনাকে আমাদের বাদশাহ বানিয়ে নেবো। হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সামনেও যদি এই শর্ত পেশ করা হতো তবে তিনি সেই বাদশাহীকে অভিশপ্ত মনে করতেন, যেমন মনে করেছিলেন নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামকে যেসব ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল সেগুলো ছিলো নিঃশর্ত এবং প্রতিবন্ধকতাহীন। তা গ্রহণের সাথে সাথে তিনি রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে সত্য দ্বীন মুতাবিক পরিচালনার ক্ষমতাও লাভ করেছিলেন। এমনটি যদি নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনেও পেশ করা হতো তবে তিনিও তা গ্রহণ করতেন এবং বিনা কারণে লড়াই করে সেই জিনিস লাভ করার প্রয়োজন পড়তোনা যা এমনি তাঁকে দেয়া হচ্ছিল। একইভাবে জনমতের সাহায্যে রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তগত করে নিরেট ইসলামী বিধানের ভিত্তিতে তা পরিচালনা করার সুযোগ যদি আমাদেরও আসে তবে তা গ্রহণ করতে আমরা কোনো প্রকার দ্বিধা করবনা।

২. নির্বাচনী লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া এবং পার্লামেন্টে যাওয়ার উদ্দেশ্য যদি হয় অনৈসলামী সংবিধানের অধীনে একটি ধর্মহীন (Secular) গণতান্ত্রিক (Democratic) রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনা করা, তবে সেটা আমাদের তাওহীদী আকীদাহ এবং আমাদের দ্বীনের সম্পূর্ণ খেলাফ। কিন্তু, আমরা যদি কখনো দেশের জনমতকে আমাদের আকীদাহ ও নীতির পক্ষে এতোটা ব্যাপকভাবে একমত করতে পারি, যার ফলে আমাদের জন্যে রাষ্ট্রীয় সংবিধানে পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে, তখন এ পন্থা অবলম্বন না করার কোনো কারণ থাকবেনা। বিনা লড়াইতে সোজা পন্থায় যে জিনিস লাভ করা সম্ভব, তাকে বিনা কারণে বাঁকা আঙুলে বের করার হুকুম শরীয়াহ আমাদের দেয়নি। কিন্তু একথা ভালোভাবে বুঝে নিন, এ কর্মপন্থা আমরা কেবল তখনই অবলম্বন করবো, যখন :

এক, দেশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থার পক্ষে শুধু জনমত সৃষ্টি হলেই সে ব্যবস্থা বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে;

দুই, দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে আমরা দেশবাসীর একটা বিরাট সংখ্যক লোককে আমাদের ধ্যান ধারণার সংগে একমত করতে পারবো এবং অনৈসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্ব সাধারণের পক্ষ থেকে দাবী উত্থাপিত হবে;

তিন, নির্বাচন এ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হবে যে, দেশের ভবিষ্যত রাষ্ট্রব্যবস্থা কোন ধরনের শাসনতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হবে। তরজমানুল কুরআন : মুহাররম ১৩৬৫ হিঃ, ডিসেম্বর ১৯৪৫ ইং।

দেশের শান্তি শৃংখলা রক্ষা

প্রশ্ন ঃ একটি কুফরী রাষ্ট্রের অধীনে বাস করে লাইসেন্স ছাড়া বন্দুক রাখা, নির্দিষ্ট মওসুম ও সময় ছাড়া অন্য সময়ে শিকার করা এবং রাত্রিবেলা বাতি ছাড়া মোটর বা বাইসাইকেল চালানো কি জায়েয?

জবাব ঃ একটা কুফরী রাষ্ট্রে যখন আপনারা বসবাস করছেনই, তখন দেশের শৃংখলা বজায় রাখার জন্যে যেসব নিয়ম কানুন বানানো হয়েছে এবং একটি সুশৃংখল সমাজ টিকিয়ে রাখার জন্যে যেসব আইন কানুন সর্বাবস্থায় অপরিহার্য, বিনা কারণে সেগুলো ভংগ করা উচিত নয়। আমরা কেবল তখনই আইন ভংগ করতে পারি, যখন আমরা এমন পজিশনে উপনীত হবো যে, প্রচলিত ব্যবস্থা চূর্ণ করে অনতিবিলম্বেই তদস্থলে তার চাইতে উত্তম ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবো। আর সে অবস্থায়ও কেবল সেই সব আইন কানুনই আমরা ভংগ করবো, যেগুলো করা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্যে কল্যাণকর এবং প্রয়োজনীয় বিবেচিত হবে। এছাড়া আইন ভংগ করার অর্থ বিশৃংখলা সৃষ্টি করা, যা নাকি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের খেলাফ। আল্লাহ তায়ালা তাঁর যমীনে শৃংখলা দেখতে চান, বিশৃংখলা নয়। সুতরাং আপনারা যদি বিনা কারণে পৃথিবীর শান্তি শৃংখলা নষ্ট করেন, তবে আপনারা তাঁর সাহায্য থেকে বঞ্চিত হবেন। তরজমানুল কুরআন ঃ মুহাররম-সফর ১৩৬৫ হিঃ, জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী ১৯৪৫ ইং

অনৈসলামী সরকার কি যাকাত উসুল করতে পারবে?

প্রশ্ন ঃ বর্তমান পরিস্থিতিতে সৃষ্ট একটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছি ঃ

আমাদের শরীয়তে কোনো কাফের (সরকার) কে যাকাত উসুল করার অধিকার দেয়া হয়েছে কি? কিংবা কুফরী সরকার পার্লামেন্টে যাকাত বিল পাশ করিয়ে আইনের বলে যাকাত উসুল করতে পারবে কি? আশা করি বিস্তারিত জবাব দেবেন।

জবাব ঃ যাকাত উসুল এবং বন্টনের জন্যে প্রয়োজন মুসলমানদের ক্ষমতা সম্পন্ন স্বাধীন সমাজ ব্যবস্থা।

যে পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য অমুসলিম এবং যে পার্লামেন্ট ইসলামী আইনকে সর্বোচ্চ আইন বলে স্বীকার করেনা, সেই পার্লামেন্টে যাকাত বিল পাশ করানো শরীয়তের দিক থেকেই একটা ভ্রান্ত পন্থা। এ অবস্থায় যদি অমুসলিম সরকারের মাধ্যমে যাকাত উসুল এবং বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়, তবে শরীয়ত অনুযায়ী যাকাত আদায় হবেনা। তরজমানুল কুরআন ঃ শাওয়াল ১৩৬৫ হিঃ, ডিসেম্বর ১৯৪৬ ইং।

জামায়াতে ইসলামী
ও
ইসলামী আন্দোলন
সংক্রান্ত প্রশ্ন

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন

প্রশ্ন : আমি আমার জন্যে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান অত্যাবশ্যক মনে করছি। তা সত্ত্বেও কতিপয় সন্দেহ মনের মধ্যে খটকা সৃষ্টি করছে। সম্ভব হলে আপনার প্রজ্ঞার আলোকে আমার অন্তরের এ অশ্বস্তি দূর করবেন। আমার সন্দেহগুলো হলো ঃ

১. আপনি আপনার লেখনীর মাধ্যমে বিগত বেশ কয়েক বছর থেকে দ্বীন প্রতিষ্ঠার দাওয়াত দিয়ে আসছেন। দু'বছর হলো জামায়াতে ইসলামীও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আপনার বক্তব্য অনুযায়ী এ আন্দোলনের মেযাজ ও প্রকৃতির অনুরূপ খুব কম লোকই পাওয়া গেছে। আর যে ক'জনকে পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে সেইসব গুণবৈশিষ্ট্য খুবই কম, যা এ আন্দোলনের লোকদের মধ্যে থাকা প্রয়োজন। আমি অধিকাংশ সময় চিন্তা করি, কী করে লোকদের মধ্যে এসব গুণবৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হতে পারে? উম্মতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, খেলাফতে রাশেদার পর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগঠিত কোনো আন্দোলন হয়নি। মুজাদ্দিদগণ কলম, যবান এবং ব্যক্তিগতভাবে বেশ কিছু কাজ করেছেন। কিন্তু গোটা ইতিহাসে এ উদ্দেশ্যে সম্ভবত কেবল সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবীর নেতৃত্বেই একটি সংগঠিত জেহাদ হয়েছিল। তাঁর সঙ্গীদের ঈমানী দৃঢ়তা এবং উন্নত আমলের কথা চিন্তা করে আমি বিস্মিত হয়ে যাই যে, কিভাবে তাঁদের মধ্যে এতোটা জোশ ও জযবা সৃষ্টি হয়েছিল। কোনো দলের মধ্যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এমন নেশা কিভাবে সৃষ্টি হয়? তাঁরা যখন নিজেদের সবকিছু আল্লাহর পথে কোরবান করে দেয়াকেই নিজেদের প্রিয়তম ফরয মনে করবে, এ নেশা কি তখনই সৃষ্টি হয়? এসবই কি লেখা, দাওয়াতী বক্তৃতা এবং উত্তম ও বিশুদ্ধ সাহিত্য বিতরণের মাধ্যমে সম্ভব? আমার মতে এগুলোর দ্বারা মানসিক সংশোধন হয় বটে, কিন্তু আমলী ময়দানে পাগল পারা জোশ ও জযবা সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন অন্য কিছুর।

আমরা যখন দেখি, লোকেরা ওয়াদা করে তা পূর্ণ করেনা এবং নিষ্ঠা ও ত্যাগের জযবা পয়দা হয়না, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন সৃষ্টি হয়, কী করে এ জযবা সৃষ্টি করা যায়? আপনার সাহিত্য এবং কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করে আমি আমার নিজের ব্যাপারে এই কামনা করি, আমার আমল ও কর্ম তৎপরতায় যেনো বিপ্লব সৃষ্টি হয়। কিন্তু কোনো একটা জিনিসের যেনো অভাব রয়েছে যার জন্যে এ বিপ্লব সৃষ্টি হয়না। আর সে জিনিস, সে শক্তি যে কি তাও বলতে পারছিনে। তবে এতোটুকু অবশ্যি বলতে পারি যে, সেই জিনিসের অবর্তমানে জামায়াতের

লোকদের মধ্যে ত্যাগ ও আমলের কাংখিত জযবা সৃষ্টি হবেনা এবং আন্দোলন গতিহীন ঠাণ্ডা মেযাজের উপরই অবস্থান করবে।

২. ইকামতে দ্বীনের পথে বিভিন্ন অধ্যায় ও মনযিল সম্পর্কেও একটি সংশয় সৃষ্টি হয়। কুরআন মজীদে এ পথে যেসব অধ্যায়ের উল্লেখ হয়েছে, যেভাবে এসব অধ্যায়ের পথ নির্দেশনা দেয়া হচ্ছিল এবং যেভাবে গায়েবী সাহায্য প্রকাশ পাচ্ছিল, এসব ব্যাপারে রাসূল এবং অহীর নির্দেশনা বর্তমান ছিলো। কিন্তু আমাদেরকে কে বলে দেবে, কোন্ কোন্ অধ্যায় আমাদেরকে অতিক্রম করতে হবে এবং কোন্ পন্থায় তা অতিক্রম করতে হবে?

৩. সাহাবাগণের যিন্দেগী দেখে বিস্মিত হতে হয়। মুসীবত মোকাবিলার জন্যে ছোট বড়, উঁচু নিচু, ধনী দরীদ্র সবাই মিলে তাঁরা একটা বড় পারিবারিক সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁদের একজনের দুঃখ কষ্ট ছিলো সকলের দুঃখ কষ্ট। একজনের অভুক্ত থাকা ছিলো সকলেরই অভুক্ত থাকার মতো। একজনের বোঝা উঠানোর জন্যে সকলের বাহুই আন্দোলিত হতো। কিন্তু সেই তুলনায় আমরা কোথায় অবস্থান করছি? আমাদের সন্তানরা যদি অভুক্ত থাকে এবং আমরা যদি রুটি রোজগারের ধান্দায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকি, তবে আমরা কেমন করে সেই সব সাথীদের সংগে চলতে পারি যারা এসব সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল নন। কখনো কখনো এ সমস্যায় পড়ে যাই যে, রাসূল এবং সাহাবীগণ যে আদর্শ যিন্দেগী লাভ করেছিলেন, সেই যিন্দেগী শুধুমাত্র সেই বিশেষ সময়ের সাথেই সম্পর্কিত ছিলনা তো? আমি মনে করি, আমাদের বন্ধুতা ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক এতোটা জোরদার হওয়া উচিত, যাতে করে জামায়াতে ইসলামী একটি পরিবারের রূপ পরিগ্রহ করে। জামায়াতের মজবুতির জন্যে এ এক অপরিহার্য বিষয়।

জবাব ঃ ১. বছরের পর বছর ধরে আমি এ সমস্যা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে আসছি। অবশেষে মুসলমানদের মুখে মুখে চর্চা হয় এমন একটি বাক্য আমাকে নিশ্চিত করেছে। বাক্যটি হলো ঃ

اَلسَّعْيُ مِنِّيْ وَ الْاِتْمَامُ مِنَ اللّٰهِ

"চেষ্টা করার দায়িত্ব আমার আর পরিপূর্ণতা দানের দায়িত্ব আল্লাহ্র।" আমি তো একথাই বুঝি যে, আমরা কেবল এ জন্যেই আদিষ্ট হয়েছি যেনো বহু পথ ও মতের মধ্য থেকে আমরা যেনো কেবল সেই পথকেই বাছাই করে নিই, যাকে বলা হয়েছে 'সিরাতুল মুস্তাকীম।' আর আমরা যেনো এ পথে চলার জন্যে আমাদের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা সংগ্রাম চালাই। এর পাথেয় যোগান, পথ চলার শক্তি এবং চলার কঠিন পথকে সহজ করে দেয়া, এসব কিছুই আল্লাহ তায়ালার তওফীকের উপর নির্ভরশীল। আমি একথা স্বীকার করিনা যে, বড় ধরনের চেষ্টা

সাধনার পরও যদি উচ্চ স্তরে পৌঁছার সুযোগ না হয়, তবে আমাদেরকে সঠিক পথ ত্যাগ করে এমন ভ্রান্ত পথে অগ্রসর হতে হবে, যে পথে বড় এবং উচ্চ স্তরের কাজ করা সম্ভব হতে পারে (!) আমাদেরকে সর্বাবস্থায়ই সঠিক কাজ করতে হবে। চাই সেটা বড় ধরনের হোক কিংবা ছোট ধরনের।

এ হলো বিষয়টির একদিক। এর আরেকটি দিক হলো, এ কাজে যে ধরনের অসাধারণ নৈতিক শক্তির প্রয়োজন, যেরূপ প্রভাবশালী লোকদের একাজে আত্মনিয়োগ করা জরুরী, সেরূপ নৈতিক শক্তি এবং ব্যক্তিত্ব কোনো অবস্থাতেই হুজরার মধ্যে সৃষ্টি হতে পারেনা। বরঞ্চ সে রকম লোক তৈরী হতে পারে কেবল এ পথের প্রাণান্তকর সংগ্রামের ফলশ্রুতিতেই। সেইরূপ চেষ্টা সংগ্রামের সূচনা করেছি মাত্র আমরা। আমাদের উপর পরীক্ষা এখনো খুব কমই এসেছে। এ কারণেই এ আন্দোলনের সৈনিকদের প্রভাব এখনো আপনার সামনে পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয়নি। কিন্তু সম্মুখে অগ্রসর হলে যেসব পরীক্ষার সম্মুখীন তাদের হতে হবে, তাতে করে দেখতে পাবেন, যেসব লোক আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক রাখেনা, কোনো না কোনো পরীক্ষায় তারা নিজেরাই নিজেদের দুর্বলতার স্বীকার হয়ে এপথ থেকে ছিটকে পড়বে। আর যেসব লোকের বাস্তবিকই আল্লাহর সংগে হবে গভীর সম্পর্ক, তারা কেবল একটি পরীক্ষাতেই কামিয়াব হবেনা, বরঞ্চ প্রতিটি পরীক্ষাই তাদের মধ্যে সৃষ্টি করবে এক নতুন শক্তি, নবতর উদ্দীপনা। এসব পরীক্ষা তাদের অনেক দোষত্রুটি নির্মূল করে দেবে। আর এভাবে আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়েই অবশেষে তারা খাঁটি সোনায় পরিণত হবে। এর পরই ধীরে ধীরে তাদের মধ্যে পরশ পাথরের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হতে থাকবে এবং তখন যেই তাদের স্পর্শ লাভ করবে, সেই সোনায় পরিণত হবে।

মোট কথা, এ ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়েছি যে, ইকামতে দ্বীনের এ কাজ আরম্ভ করার আগে তাতে পূর্ণতর ও কাংখিত মানের লোকদের সমাবেশের শর্তারোপ করা একেবারেই ভুল। এ শর্ত কখনো বাস্তব হতে পারেনা। বরঞ্চ নিষ্ঠার সাথে এ কাজ আরম্ভ করে দেয়ার আন্দোলনই ধীরে ধীরে ঐ ধরনের লোক তৈরী করতে থাকবে। দ্বন্দ্ব সংগ্রামের দুর্গম পথ অতিক্রম করে আন্দোলন যতই মনযিলে মাকসুদের দিকে এগিয়ে যাবে, ততোই এর কর্মী বাহিনী থেকে উন্নততর মানুষ বেরিয়ে আসতে থাকবে। সমুদ্র পাথারের সাথে লড়াই করার জন্যে আপনি সেইসব লোকদের মধ্য থেকে উপযুক্ত সাঁতারু কখনো পাবেননা, যারা কখনো সমুদ্রে সাঁতার কাটেনি। এ শক্তি তো কেবল সমুদ্রে সাঁতার কাটা আর ঢেউয়ের সাথে লড়াই করার মাধ্যমেই অর্জিত হতে পারে। অতপর দুর্বল লোকেরা সমুদ্রের ঢেউয়ে তলিয়ে যাবে। আর যাদের হাতে ও বাহুতে আল্লাহ তায়ালা শক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তারা তো আঘাতের পর আঘাত সহ্য করে, পাথারের সাথে লড়াই করে অবশেষে বীর সাঁতারুতে পরিণত হবে।

২. ইকামতে দ্বীনের অধ্যায়সমূহ নির্ধারিত নেই। বরঞ্চ, দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এবং সেসব পরিবেশ পরিস্থিতি এ সংগ্রাম ব্যাপদেশে যেগুলোর সম্মুখীন হতে হয় আর সেই প্রজ্ঞা, যা দ্বীনের স্পীরিট অনুধাবনকারী নেতৃত্বের মধ্যে সৃষ্টি হয়, এসবগুলো মিলিত হয়েই তা নির্ধারণ করে। এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ হলো আম্বিয়ায়ে কিরামের যিন্দেগী। একাজে তাঁরা সকলে একই ধরণের অধ্যায়সমূহ অতিক্রম করেননি। হযরত ঈসা, হযরত মূসা, হযরত ইউসুফ, হযরত মুহাম্মদ এবং অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কিরাম (আলাইহিমুস্ সালাতু ওয়াসসালাম) গণের যিন্দেগী অধ্যয়ন করলেও একথাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আসল কথা হলো, আমাদের সামনে একটা সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য এবং সে উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে প্রয়োজনীয় হিকমত ও কর্ম কৌশল বর্তমান থাকা দরকার। আর আম্বিয়ায়ে কিরামের কর্মপন্থা ভালোভাবে বুঝে নিয়ে বাস্তব কর্মতৎপরতা ও আন্দোলন শুরু করে দেয়া প্রয়োজন। অতপর আমরা যে যে অবস্থা ও অধ্যায়েরই সম্মুখীন হতে থাকবো, হিকমত ও প্রজ্ঞার দ্বারা তার দাবীসমূহ অনুধাবন করবো এবং আল্লাহর উপর ভরসা করে তার মোকাবিলার জন্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবো।

আপনি প্রশ্ন করেছেন, নবীর সময়তো অহী পথনির্দেশ দান করতো, এজন্যে তখন সঠিক সময় সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব ছিলো। কিন্তু বর্তমানে সে সমস্যার সমাধান কিভাবে সম্ভব? এ প্রশ্নের জবাব খোদ কুরআন মজীদে দিয়ে দেয়া হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.

"যারা আমার পথে চেষ্ট সাধনা করবে, আমি অবশ্যি তাদের পথ নির্দেশ দান করবো।'

পূর্বে যা খোদা পথ নির্দেশ দান করতেন, এখনো তিনিই পথ নির্দেশ দানের জন্যে বর্তমান রয়েছেন। প্রয়োজন শুধু সেসব লোকের যারা তাঁর পথ নির্দেশ থেকে ফায়দা গ্রহণ করবে। আমাদের মধ্যে যদি এমন কিছু লোক বর্তমান থাকেন, যারা কুরআনের স্পীরিট আত্মস্থ করতে পেরেছেন এবং জামায়াতের অধিকাংশ লোক যদি প্রশান্ত মন ও প্রত্যয়ের অধিকারী হয়, সঠিক এবং ভ্রান্ত পথ নির্দেশের মধ্যে পার্থক্য করতে সক্ষম হয় এবং তাদের মধ্যে যদি সঠিক পথের নির্দেশ গ্রহণ ও আনুগত্যের মনোবৃত্তি থাকে, তবে ইনশাআল্লাহ আমাদের পথের প্রতিটি অধ্যায়েই আমরা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে পথনির্দেশ লাভ করবো এবং তাঁর হিদায়াত ও পথ নির্দেশ থেকে আমরা উপকৃত হতে সক্ষম হবো।

৩. আলোচনায় সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে যে চিত্র অংকন করা হয়েছে তা অনেকটা অতিরঞ্জিত এবং কিছু অংশ সত্য। আর সত্য অংশও তাঁদের মধ্যে তখনই বাস্তবরূপ লাভ করেছিলো, যখন এক দীর্ঘ সময়ের চেষ্টা সংগ্রাম তাদের

মধ্যে পারস্পরিক গভীর বন্ধুতার স্পীরিট পয়দা করে দিয়েছিলো। কিন্তু এ এক বিস্ময়কর কথা যে, নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো মহান নেতার চৌদ্দ পনের বছরের অবিরাম প্রশিক্ষণের ফলে তাদের মধ্যে যেসব বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিলো, সেগুলো পা ফেলতেই (Starting point) আমরা আমাদের মধ্যে দেখতে চাই। তাছাড়া মদীনা তাইয়্যেবায় সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দের যে বন্ধন গড়ে উঠেছিলো, এ সুযোগ তাদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিলো অনেকটা এ কারণে যে, তারা একস্থানে একত্রে বসবাস করছিলেন। আরবের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো তাদের সাথে সৌহার্দ্য ও বন্ধুতার অবস্থা সেরকম ছিলনা, যেরকম ছিলো মদীনার লোকদের পরস্পরের মধ্যে। অথচ আমাদের এখানে সামষ্টিক যিন্দেগী এখনো গড়েই উঠেনি। আমরা বিভিন্ন ব্যক্তি দেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছি। পরস্পরের সংগে পরিচয়ের সুযোগ পর্যন্ত এখনো আমাদের হয়নি। এমতাবস্থায় আমাদের ও তাদের মধ্যে বন্ধুতা ও সৌহার্দের সেই অবস্থা কি করে সৃষ্টি হতে পারে, যা নাকি একস্থানে সামষ্টিক জীবন যাপনের ফলে সৃষ্টি হয়?

আমি চাই, আমাদের স্বমতাবলম্বী লোকেরা সাহাবায়ে কিরামের যুগকে কেবলমাত্র মোজেযা ও অলৌকিকতার স্পীরিটে বুঝবার পরিবর্তে স্বাভাবিক কার্যকারণ অনুযায়ী বুঝবার চেষ্টা করুক। তা না হলে সে যুগে যা কিছুই সৃষ্টি হয়েছিলো তার প্রত্যেকটি সম্পর্কে আমরা চাইব তা যেনো চোখের পলকে অলৌকিকভাবে আমাদের মধ্যে প্রকাশিত হয়। আর এভাবে যখন তা প্রকাশিত হবেনা, তখন আমাদের মন ভেংগে পড়বে। এ মানসিকতা আমাদের মধ্যে বিরাজ করলে আমরা কখনো স্বাভাবিক কার্যকারণ সৃষ্টির চেষ্টাই করবনা, যার ফলে সে অবস্থা বা অন্তত সে ধরণের অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে।

আসুন, মিলেমিশে কাজ করুন। এ পথে বিপদ মুসীবত বরণ করুন। এরপর যদি সেই ধরনের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ সৃষ্টি না হয়, তখন এজন্যে আপনি অবশ্যি অলৌকিকতার শর্ত লাগাতে পারবেন। তখন খোদার নিকট বলবেন ঃ হে খোদা, এই খেদমত যদি আমাদের দ্বারাই নিতে চাও, তবে কিছু অলৌকিক অবস্থার সৃষ্টি করো।

এ বিষয়ে যারা চিন্তা করেন, তাদের অধিকাংশই যে ভুলগুলো করেন, তার একটি হলো, তারা এ কাজে যে যে জিনিসের কমতি অনুভব করেন, সেগুলোর উল্লেখ কিছুটা এমনভাবে করে থাকেন, যেনো যাবতীয় অভাব ও কমতি পূরণ করে দেয়া এবং সকল প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করে দেয়া অপর কারো কাজ। আর নিজের উপর এ ব্যাপারে কোনোই দায় দায়িত্ব বর্তায়না। অথচ প্রকৃত পক্ষে, এটা কোনো এক ব্যক্তির একার কাজ নয়। বরঞ্চ সকলের সম্মিলিত কাজ। এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি কেবল কতিপয় ত্রুটির দিকে অংগুলি সংকেত

করে এবং কতিপয় প্রয়োজনীয় জিনিসের কথা উল্লেখ করে দায়িত্ব মুক্ত হতে পারেনা। তার নিজেকেই সেসব অভাব ও কমতি পূরণ করার জন্যে এবং প্রয়োজনীয় জিনিস যোগাড় করার জন্যে নিজ অংশের দায়িত্ব পালন করতে হবে। তরজমানুল কুরআন ঃ জমাদিউল উলা-জমাদিউস সানি ১৩৬৩ হিঃ, মে-জুন ১৯৪৪ ইসায়ী।

ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলনের কাজে বিরোধিতা ও প্রতিবন্ধকতা

প্রশ্ন ঃ আমি সংক্ষিপ্তভাবে আমার অবস্থা বলছি। আমাকে পরামর্শ দিন আমি কোন্ পথ অবলম্বন করবো, যাতে করে আমি ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হই ঃ

১. চাকুরীতে ফিরে যাওয়ার জন্যে আমার বাবা মা উঠতে বসতে আমার প্রতি বাড়াবাড়ি করছেন। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে তাঁরা আমাকে শুধু তাঁদেরই নয়, বরঞ্চ আল্লাহ্র নাফরমান বলেও আখ্যায়িত করছেন। তাঁদের বক্তব্য হলো ঃ কেবল তখনই বাবা মার কথা অমান্য করা বৈধ, যখন তারা খোদাকে স্বীকার করতে নিষেধ করবে। অন্য সকল বিষয়ে তাদের হুকুম মান্য করা শরয়ীভাবে ওয়াজিব। সহসাই তারা এ ঘোষণা দিতে যাচ্ছেন ঃ হয় চাকুরীতে ফিরে যাও, তা না হলে তোমার সংগে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকবেনা। তবে তারা আমাকে এতোটুকু অবকাশ দিতে রাজী যে, স্থায়ীভাবে যদি চাকুরী করতে না চাও তবে অন্তত, এক দেড় বছর চাকুরীতে থাকো। এ অবকাশ এজন্যে দিতে চান, যাতে করে এরি মধ্যে আমার ছোট ভাই বি, এ, পাশ করে আমার শূন্যস্থান পূরণ করে নিতে পারে। এ বিষয়ে কোনো গুনাহ হলে তারা নিজেরা তা মাথা পেতে নিতে রাজী।

২. এদিকে জনসাধারণের মধ্যে আমার প্রভাব প্রতিপত্তি কমে যাচ্ছে। ঘটনা হলো, আমি চাকুরীতে থাকাকালে তারা যেভাবে উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে আমার কথা শুনতো এবং সাহায্য সহযোগিতা করতো, এখন সে অবস্থা খতম হয়ে যাচ্ছে। এখন বরং আমার কথায় তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।

৩. বড় ভাই বলছেন ঃ 'চাকুরী যদি হারাম হয় তবে জমিদারী কোন্ ধরনের হালাল? আমাদের জমিদারী তো সরকার আমাদের বাপ দাদাদেরকে বখশিশ দিয়েছিল। তোমাদের মতাদর্শের দৃষ্টিতে জমিদারী তো মোটেই হালাল আয় দিতে সক্ষম নয়। তাছাড়া জমিদারী প্রথাটাইতো ইসলামে অবৈধ।' তিনি আরো বলেন ঃ আমাদের দাদা তাঁর অর্থ সম্পদ শরয়ী নিয়মে বন্টন করে যাননি। কেবল ছেলেরাই তাঁর সম্পত্তির উত্তারাধিকারী হয়েছে এবং মেয়েদেরকে বঞ্চিত রাখা হয়েছে। যে ব্যক্তি (সরকারী) চাকুরীকে হারাম বলে, তার জন্যে এই অর্থ সম্পদ দ্বারা জীবন নির্বাহ করা কেমন করে বৈধ হতে পারে?

৪. অধিকাংশ মুসলমানই জাহেলিয়্যাত এবং শিরকে নিমজ্জিত। প্রয়োজন পূরণের জন্যে কবরে যাওয়া না যাওয়ার প্রশ্ন বিরাটাকার ধারণ করে আছে। কোনো কল্যাণের কথা চিন্তা করে এ বিষয়ে চুপ থাকার অর্থ হচ্ছে সত্য দ্বীন গ্রহণ করার সাথে সাথে মানুষকে শিরকে লিপ্ত থাকতে অবকাশ দেয়া। অপরদিকে লোকেরা যখন কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে পারে যে, সে মাজারে গিয়ে প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রার্থনা করার বিরোধী, সংগে সংগে সে ব্যক্তি 'ওহাবী' হওয়ার সার্টিফিকেট পেয়ে যান। এ সার্টিফিকেট আমারও মিলেছে।

জবাব ঃ আপনার পত্র পেয়েছি। আপনি এখন সে অবস্থায় গিয়েই পৌছেছেন, যার সম্পর্কে পূর্বেই আমি আপনাকে অবহিত করেছিলাম। এ বিষয়ে আপনি কোন্ দৃষ্টিভংগি গ্রহণ করবেন, এখন তা আমি আপনাকে বলবনা। এ বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে আপনার মনের আওয়াযের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত এবং নিজের সাহস পরখ করে নেয়া উচিত। তবে যে সিদ্ধান্তই আপনি নিননা কেন, তা নেবেন ভেবে চিন্তে সুস্থ মনে। সাথে সাথে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকুন, যেনো আপনি এমন কোনো সিদ্ধান্ত না নেন, যে সিদ্ধান্ত থেকে পিছে হটতে হবে। পিছিয়ে আসার চাইতে পদক্ষেপ গ্রহণ না করাই উত্তম।

কি সিদ্ধান্ত নেবেন তা আপনার মনের উপর ছেড়ে দেয়ার পর আমি কেবল সেই যুক্তিগুলোর জবাব দিয়ে দিচ্ছি, যা আপনার বিপক্ষে পেশ করা হচ্ছে ঃ

১. কেউ কারো আযাব এবং সওয়াবের অংশীদার হতে পারেনা। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই নিজের পাপ পূণ্যের অধিকারী। আমার কথায় আপনি যদি কোনো পাপ করেন, তাহলে বলার জন্যে আমি গুণাহগার হবো এবং তা করার জন্যে গুণাহ্গার হবেন আপনি। আপনার গুণাহ্ সে ব্যক্তির ঘাড়ে চাপবেনা যে তা করতে বলেছে। আর আপনি একথা বলে রেহাই পাবেননা যে, আপনি অপরের কথায় গুণাহ্র কাজ করেছেন।

২. বাবা মার আনুগত্য কেবল ততোখানিই করা যায়, যতোখানি করলে স্রষ্টার নাফরমানিতে নিমজ্জিত হওয়ার আশংকা থাকেনা। তারা যদি এমন কোনো কাজের নির্দেশ দেয় যা পালন করা আল্লাহর নাফরমানির শামিল, এমন হুকুম পালন তো ফরয নয়ই বরঞ্চ গুণাহ।

৩. আপনি নিজে যে কাজকে খোদার নাফরমানি বলে মনে করেন, আপনার স্থলে খান্দানের আরেক ব্যক্তি সেই নাফরমানির জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে, এ কারণে আপনি আরো দেড় দুই বছর তাতে নিমজ্জিত থাকবেন এমনটি হবে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত কর্ম। আপনি যদি আপনার আকীদাহ বিশ্বাসের ব্যাপারে সত্যবাদী হয়ে থাকেন। তবে আপনার আন্তরিক বাসনা তো এই হওয়া উচিত যে, কেবল আপনি নিজেই

এ নাফরমানি থেকে মুক্ত থাকবেননা। বরঞ্চ খোদার প্রতিটি বান্দাহ যেনো তা থেকে মুক্ত থাকে।

৪. ইসলামে জমিদারী একেবারেই নাজায়েয এমনটি বলা ঠিক নয়। অবশ্য ভারত উপমহাদেশে এমন ধরনের কিছু জমিদারী প্রথাও চালু হয়েছে যা বৈধ নয়। আপনি যদি শরয়ীপন্থায় জমিদারী চালান এবং তা থেকে অবৈধ ফায়দা হাসিল না করেন, তবে সে জমিদারীতে কোনো দোষ নেই।

৫. পূর্ব পুরুষদের সূত্রে কোনো ব্যক্তি যে অর্থ সম্পদের উত্তরাধিকারী হয়েছে, তার পূর্ব ইতিহাস দেখার জন্যে শরীয়ত তাকে বাধ্য করেনি। এ ব্যাপারে কুরআনী আইন অতীতের জন্যে কাকেও পাকড়াও করেনা। বরঞ্চ সে চায় ব্যক্তির বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সংশোধন। শরীয়তের দাবী হলো, যখন থেকে সে ঐ সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী হলো, তখন থেকে সে শরয়ী বিধান মোতাবেক তা পরিচালনা ও ব্যয় করবে। অতীতে যারা তা ভ্রান্তপন্থায় লাভ করেছে এবং ভ্রান্ত পন্থায় পরিচালনা ও ব্যয় করেছে তাদের বিষয় খোদার হাতে ছেড়ে দেবে। অবশ্য আপনার দখলে এমন কোনো অর্থ সম্পত্তি যদি থাকে যার সম্পর্কে আপনি নির্দিষ্টভাবে জানেন যে, তাতে অমুক অমুক লোকের হক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা তাদের থেকে আত্মসাৎ করা হয়েছে এবং তারা বর্তমানও আছে; তাছাড়া অংশের পরিমাণও জানা আছে তবে যথাসাধ্য তাদের হক ফেরত দিয়ে দিন।

৬. চাকুরীতে থাকাকালে আপনার ব্যক্তিগত এবং বংশীয় প্রভাবের কারণে যেসব লোক আপনার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তারা মূলত, দ্বীনের দাওয়াত দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। বরঞ্চ শান ও মাল নামক মূর্তির পূজা করছিল। সেই পজিশনে অবস্থান করলে ভবিষ্যতে আর এ ধোকায় নিমজ্জিত হবেননা যে, আপনি লোকদের খোদা পুরস্ত বানাচ্ছেন। সত্যিকার খোদা পুরুস্ত লোক তো তারাই যারা আপনার পার্থিব পজিশন দেখে নয়, বরঞ্চ আপনার দাওয়াতের সত্যতা এবং তাকওয়া দেখে আকৃষ্ট হবে। আমার দৃষ্টিতে আপনি কেবল তখুনি হকের দাওয়াত দানকারী হতে পারবেন, যখন আপনার দুনিয়াবী সকল সম্মান ও ইয্যতের পজিশন কেড়ে নেয়া হবে, যমীন তার বুকে আপনাকে স্থান দিতে অস্বীকার করবে এবং গতকাল পর্যন্ত যারা আপনার সামনে নত হয়ে থাকতো তারা আপনার থেকে বিমুখ হয়ে আপনাকে প্রত্যাখ্যান করবে। এ অবস্থাটা তো খুবই ভয়াবহ বিপজ্জনক। কিন্তু এ পথে এগুলিই উপকারী। আল্লাহর ইচ্ছায় আপনি এগুলো বরদাশত করার যোগ্য হয়ে যান, তবে সম্মুখে অগ্রসর হয়েই আপনি এর প্রকৃত ফায়দা উপলব্ধি করবেন। আর তখনই আল্লাহ তায়ালা মিথ্যা সাথীদের সাথীত্ব থেকে আপনাকে মুক্ত করে সত্যিকার সাথী মিলিয়ে দেবেন।

৭. খামোখা প্রথম ঢিলেই সাধারণের আকীদা বিশ্বাসের উপর আঘাত হানা থেকে বিরত থাকা উচিত। কিন্তু নিজ আকীদা বিশ্বাসের উপর পর্দা টানানোরও

কোনো প্রয়োজন নেই। 'ওহাবী' হবার বদনাম থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা করার কোনো প্রয়োজন নেই। লোকেরা মূলত এটা মুসলমানদেরই আরেক নাম সাব্যস্ত করেছে। তারা মুসলমানদের গালি দিতে চায়। কিন্তু মুসলমান বলে গালি দিলে যেহেতু নিজেদের ইসলামই বিপদে পড়ে, সেজন্যে 'ওহাবী' বলে গালি দেয়। এ নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে পারলে ওহাবী খেতাব পাওয়াতে আপনার মনে কোনো দুঃখ থাকবেনা। শিরকী আকীদা ও আমল থেকে সর্বাবস্থায় দূরে থাকবেন। নির্দ্বিধায় তাওহীদকে তার প্রকৃত দাবীসমূহসহ পেশ করবেন। শিরক এবং মুশরেকী কথাবার্তা থেকে দূরে থাকা এবং তাওহীদ ও তার পরীক্ষানুযায়ী চলা যদি 'ওহাবীবাদ' হয়, তাহলে খোদা তার প্রতিটি বান্দাহকে ওহাবী হবার তৌফিক দিন এবং ওহাবী না হওয়া থেকে রক্ষা করুন।

প্রশ্ন ঃ প্রাদেশিক সম্মেলন থেকে ফিরে এসে এমন কতিপয় দুশ্চিন্তায় নিমজ্জিত হয়ে পড়েছি যা আমার কল্পনায়ও ছিলনা। আপনি অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন জেনেও বিস্তারিত অবস্থা আপনাকে জানানো প্রয়োজন মনে করছি। যেহেতু এ ধরনের সমস্যা দেখা দিলে তা আপনাকে জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। ১৯শে অক্টোবর শ্রদ্ধেয় আব্বাজানের পত্র হস্তগত হয়। পত্রটির হুবহু অনুলিপি আপনাকে পাঠাচ্ছি।[১]

"স্নেহভাজনেষু! তোমার কল্যাণ ও উন্নতির দোয়া করার পর বলছি, তুমি এখন স্বাধীন হয়ে গেছো। আমার অভিভাবকত্বের প্রয়োজন এখন আর তোমার নাই। কারণ, আমি বাড়ীতে অসুখে কাতরাচ্ছি। আর তুমি সম্মেলনে[২] অংশ গ্রহণকে জরুরী মনে করছো। আল্লাহর ফজলে এখন চাকুরী করছো। আমি আমার সকল কোশেশ নিয়োগ করে পড়ালেখায় উত্তীর্ণ করিয়েছি। তার পরিণতি এখন ভোগ করছি। আমলী আলেম হয়ে গেছো। বাপের হুকুম মানাকে যুলুম এবং খোদার হুকুমের খেলাফ বলে আখ্যায়িত করছো। তোমার নিকট এখন অন্যদের হুকুম পালন করা পিতামাতার হুকুম পালন করার চাইতে উত্তম। যাক, তোমার উপার্জন দ্বারা বৃদ্ধাবস্থায় অনেক উপকৃত হয়েছি। এর পর থেকে আর তোমার এক পয়সাও গ্রহণ করতে চাইনা। তোমার যা ইচ্ছা করো। যেখানে ইচ্ছা থাকো। শ্বশুর বাড়ী বা অন্য যে কোনো স্থানে থাকো। যতোক্ষণ না জামায়াতে ইসলামী থেকে ইস্তেফা দিয়েছো, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমাকে স্বাভাবিক পাবেনা। জামায়াতে ইসলামীতে গিয়ে নিজের সমস্ত শিক্ষা বিনষ্ট করেছো। কিন্তু

---

১. পত্রের কিছু অংশ এখানে উল্লেখ করা হয়নি।

২. জামায়াতের সম্মেলনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

আমার উপদেশ তো কোনো কাজে আসবেনা। বাস্ মনে রাখবে, আমার সামনে আর আসবেনা। আমার রাগ খুবই খারাপ। ইতি"

আব্বাজানকে এ চিঠির জবাবে আমি এরূপ লিখে পাঠিয়েছি ঃ

"মুহ্তারামী! গতকাল আপনার পত্র পেয়েছি। পত্রে আপনার অসুখের খবর জেনে খুবই আফসোস হয়েছে। বিশ্বাস করুন, আপনার অসুখের কোনো খবরই আমি জানতামনা। আপনি পত্র লিখেননি এবং অন্য কারো মাধ্যমেও আমি খবর জানতে পারিনি। এটাতো একটা শরয়ী ওযর ছিলো। এর জন্যে সম্মেলনে যাওয়া স্থগিত রাখা যেতো।

পিতামাতার দয়া ও অনুগ্রহের কথা অস্বীকার করতে পারে এমন কে আছে? তাছাড়া আপনি তো আমাকে উচ্চ শিক্ষা এবং দ্বীনী শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন। এ শিক্ষা দ্বারাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে, দুনিয়ায় দ্বীনকে বিজয়ী করা, খোদার কালেমাকে বুলন্দ করা এবং দুনিয়ায় ইসলামের কর্তৃত্ব চালানো এবং সে জন্যে চেষ্টা সংগ্রাম করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে ফরয। বিশ্বের এ অঞ্চলের প্রতি আমি নযর করে দেখেছি। প্রকৃত ইসলামকে বাস্তবায়নের জন্যে সঠিক ও উত্তম কর্মপন্থায় কাজ করছে এমন একটিই মাত্র দল আমার নযরে পড়েছে। আর সে দল হচ্ছে জামায়াতে ইসলামী। তাই দুনিয়ায় দ্বীন ইসলামকে কায়েম করার প্রচেষ্টা যদি আমাকে চালাতেই হয়, তাহলে এ দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকা আমার জন্যে জরুরী। একথা আমার বুঝেই আসেনা, মুসলমানের জীবনের উদ্দেশ্য যদি দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই না হয়, তবে তার জীবনের আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

পিতা মাতার হুকুম মান্য করা আবশ্যক। তাদের আনুগত্য করা ফরয। কিন্তু এর সীমা কোন্ পর্যন্ত? যতোক্ষণ তাঁদের হুকুম আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুমের খেলাফ না হবে, কেবল ততোক্ষণই তাঁদের হুকুম মান্য করা আবশ্যক। দ্বীনেক বিজয়ী করা যদি জরুরীই হয়ে থাকে তবে কিভাবে আরামে ঘরে বসে থেকে বিনা প্রচেষ্টাতেই তা হয়ে যাবে? এটা কি খুবই সহজ কাজ? পেটের জন্যে যতোটা শক্তি ও সময় ব্যয় করছি, দ্বীনের জন্যে কি সেটুকুও করা প্রয়োজন নয়? এটা কি এক ব্যক্তির একার কাজ? তাছাড়া দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্যে যে দলে থেকেই কাজ করা হোকনা কেন, সময় তাতে ব্যয় করতেই হবে। অর্থ সম্পদ খরচ করতে হবে। দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে। এতে দুনিয়াবী কাজও কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কোনো না কোনো শক্তির সাথে সংঘর্ষের আশংকাও এতে আছে এবং সে ক্ষেত্রেও একাজ থেকে বিরত থাকতেই আপনি বলবেন। এখন আল্লাহর ওয়াস্তে আপনি বলুন, এ কর্তব্য পালনের জন্যে অন্য কোনো পন্থা থাকতে পারে কি? আপনার অভিভাবকত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া আমার জন্যে চরম দুর্ভাগ্যের কারণ। কিন্তু আপনি চিন্তা করে দেখুন, কোন্ জিনিস থেকে

আপনি আমাকে বিরত থাকতে বলছেন! একটু ভেবে দেখুন, আপনার নির্দেশ খোদার এ হুকুমের খেলাফ হয়ে যায়না তো!

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَ اَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ
وَعَشِيْرَتُكُمْ وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اَحَبَّ
اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ
فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ وَاللّٰهُ لَا
يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۔ (توبة)

"হে নবী! তুমি বলে দাও যে, তোমাদের পিতামাতা, সন্তান সন্তুতি, ভাইবোন, খান্দান, কষ্টোপার্জিত সম্পদ, সেই ব্যবসায় যার মন্দা হওয়াকে তোমরা ভয় করো এবং তোমাদের প্রিয় বাসস্থান তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং তাঁর পথে জিহাদ করা অপেক্ষা বেশী প্রিয়তর হয়ে থাকে, তবে আল্লাহর চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করো। আর মনে রাখবে, আল্লাহ ফাসিকদের হিদায়াত করেননা।"

আমি অত্যন্ত পেরেশানী এবং আফসোসের সাথে লক্ষ্য করছি, দ্বীনের বিজয়ের জন্যে আমি যে চেষ্টা সংগ্রাম করছি, তাতে আপনি অসন্তুষ্ট। এখন আপনিই বলুন, এমতাবস্থায় আমার কর্তব্য কি? উক্ত আয়াতটি সামনে রেখে চিন্তা করে দেখুন।

মন চায় আপনার নিকট উপস্থিত হতে। কিন্তু আপনার রাগকে ভয় করছি। এ চিঠি পাওয়ার পর আপনার অনুমতির জন্যে অপেক্ষা করছি।"

এ চিঠি লেখার সময় আমার দৃষ্টিভংগি ছিলো, মুহাতারাম আব্বাজান হয়তো সময় অপচয়, অর্থ সম্পদ ব্যয় এবং প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির ভয়ে আমাকে জামায়াতের সাথে কাজ করতে নিষেধ করছেন। তাছাড়া আব্বাজানের ইংগিতে জনাব .... এর পক্ষ থেকে দলীল প্রমাণ সম্বলিত একটি পত্র আমার নিকট আসে। সে চিঠির সারমর্ম হচ্ছে সত্য এবং ইসলাম কেবল জামায়াতে ইসলামীতেই সীমাবদ্ধ নয়। একা কাজ করুন। অথবা অন্য কোনো দলের সাথে কাজ করুন।

আব্বাজানের পক্ষ থেকে আমার উপরোক্ত পত্রের কোনো জবাব এখনো পাইনি। এমতাবস্থায় যথোপযুক্ত পথ নির্দেশ দান করে আমাকে উপকৃত করবেন।

জবাব ঃ আপনি আপনার পিতার ভর্ৎসনার জবাবে যে চিঠি লিখেছেন, তা খুবই যুক্তিসংগত হয়েছে। মুসলমানের জীবন একটা Balanced যিন্দেগী। এখানে অধিকার এবং কর্তব্যের প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। কোনো অধিকার অথবা কর্তব্যের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করা কিছুতেই উচিত নয়। তবে একটা অধিকারকে আরেকটা অধিকারের জন্যে ততোটা কুরবানী করা যেতে পারে, যতোটুকু শরয়ী দৃষ্টিতে জরুরী। আল্লার অধিকারের পরে সবচাইতে বড় অধিকার পিতামাতার। কিন্তু তা অবশ্যি খোদার অধিকারের পরে। কোনো অবস্থাতেই তা খোদার অধিকারের চাইতে বড় নয়। তাই যেক্ষেত্রে খোদার অধিকার আদায় করার জন্যে পিতামাতার অধিকার আদায়ের কিছু কমতি করা অনিবার্য হয়ে পড়ে সেক্ষেত্রে কেবল ততোটুকুই কমতি করা যাবে, যতোটুকু কমতি করলে স্থান কাল পাত্র ভেদে পরিবেশ ঠিক থাকে। সাথে সাথে তাদের রাগ ও তিরস্কারকে অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতার সাথে বরদাশত করতে হবে। তাঁদের কঠোরতার মোকাবিলায় উহ্ পর্যন্ত করবেননা। তবে নিজ দ্বীনি ইলম ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী যে জিনিসকে আপনি দ্বীন বলে বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারবেন, পিতামাতাকে খুশী করার জন্যে তা থেকে একচুল পরিমাণ বিচ্যুত হবেননা। পিতামাতার খিদমত, আনুগত্য এবং তাঁদের সাথে শিষ্টাচার সন্তানের জন্য ফরয বটে, কিন্তু, পিতামাতার জন্যে নিজের সেই ধ্যান ধারণা এবং আকীদা বিশ্বাস কুরবানী করা ফরয নয়, যা নাকি দ্বীনের নূরে রৌশন হয়েছে।

আপনি যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন, তাতে আপনার হযরত ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের আদর্শ ও নীতির অনুসরণ করা উচিত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় বেশ কয়েকজন সাহাবীকে এরূপ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। তখন সাহাবায়ে কিরাম পিতা মাতা কর্তৃক যেরূপ বিরোধিতা ও তিরস্কারের সম্মুখীন হয়েছেন এবং তার প্রেক্ষিতে নবীপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের যেভাবে পথনির্দেশ দান করেছিলেন, তাও সম্মুখে রাখুন।

প্রশ্ন ঃ আমাদের এখানে জামায়াতে ইসলামীর এক যুবক রুকন তার বড় ভাইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যবসা করছে। লেনদেনে শরয়ী বিধানের অনুসরণ এবং সময় মত নামায পড়তে যাওয়ার কারণে তার বড় ভাই তার প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট এবং দারুণ কঠোরতা অবলম্বন করছে। এযাবত সে আমার নিকট কয়েকটি চিঠি লিখেছে। এসব চিঠিতে সে লিখেছে ঃ

আপনার কারণে (অর্থাৎ আমার) আমার বড় ভাই বিগড়ে গেছে! তার উপর পাগলামী চেপে বসেছে। ব্যবসায় তিনি সন্তুষ্ট নন। দিনরাত আপনার নামের অযীফা পড়ে বলে ঃ আপনি শয়তান। মানব বেশে ইবলিস্। পিতামাতা ও

সন্তানের মধ্যে এবং ভাইয়ে ভাইয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করেন। আমার ভাইয়ের সংগে কোনো প্রকার সম্পর্ক রাখবানা। তার নামে কোনো চিঠি লিখবানা। ত্রৈমাসিক ইজতেমায় অংশগ্রহণের দাওয়াতও দিবানা। জামায়াত থেকে ওর নাম কেটে দাও। নতুবা .... ।" এ বিষয়ে যথোপযুক্ত পথ নির্দেশ দান করবেন।

জবাব : যেখানে খান্দানের লোকেরা জাহেলিয়্যাতের ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত এবং হক পথে চলার কারণে নিজের ভাই বন্ধুদের তিরস্কার ও বিরোধিতা করে সেখানে তাদের থেকে নিজেদেরকে আলাদা কের নেয়াইতো আমাদের কাজ। এ ধরনের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের সাথে ঈমানদার লোকদের সম্পর্ক গড়ে দেয়া নয়, ভেংগে কেটে দেয়াই আমাদের কাজ। সুতরাং আমাদের যুবক সাথীটির ভাই আপনার যে বদনাম করেছে, তার জবাব দেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। বরঞ্চ অত্যন্ত কোমলভাবে তাকে একথা জানিয়ে দেয়া প্রয়োজন, তিনি যদি এ কাটা সম্পর্ককে গড়তে চান, তবে তাকে খোদা পুরস্তি ও দ্বীনদারীর কাজে বিরোধিতা করার পরিবর্তে সাহায্য ও সহযোগিতা করার চেষ্টা করতে হবে। তা নাহলে আমরা এবং আমাদের সাথী আমাদের কর্মনীতির উপর কায়েম থাকবো এবং তার মন যা চায় সেই আচরণই তিনি আমাদের সাথে অবলম্বন করতে পারেন।

অবশ্য আপনাদেরকে একথার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে, যেনো আপনাদের পক্ষ থেকে কোনো জিদ বা বাড়াবাড়িমূলক কথা বলা না হয়। বরঞ্চ সবর সহনশীলতার মাধ্যমে তার সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানোই হবে আপনাদের প্রকৃত কাজ।

আসলে এসব দেখে বড়ই অনুতাপ হয়। মুসলমানদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে, সময় মতো নামায পড়াও যাদের সহ্য হয়না। নিজে সময় মতো নামায পড়াতো দূরের কথা, অন্য কেউ এরূপ করতে দেখলে পর্যন্ত তারা বিগড়ে যান। এ ধরনের মুসলমানদের সমালোচনা করলে আমাদের খারেজী বলে আখ্যায়িত করা হয়।

প্রশ্ন : "শিক্ষা লাভের জন্য আমি সালে দেশের বাইরে যাই। অতঃপর দাঁড়ি রেখে ফিরে এলে সকল বন্ধু বান্ধব আমাকে তিরস্কার করতে শুরু করে। এমনকি মুহতারাম আব্বাজানও দাঁড়ি সাফ করে ফেলার জন্যে কড়াকড়ি করতে থাকেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেন, দাঁড়ি রাখলে তোমাকে বুড়ো দেখা যায়। আর দাঁড়ি রাখার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করলে তোমার সংগে আমি কোনো সম্পর্কই রাখবোনা।" ঘর থেকে বের হলে বন্ধু বান্ধবরা খুবই তিরস্কার করে। তাই বাধ্য হয়ে আমি ঘরে অবস্থান করছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন কতিপয়

বন্ধুর পক্ষ থেকে খবর পেলাম, আটদিনের মধ্যে যদি তাদের দাবী পূরণ করা না হয় অর্থাৎ দাঁড়ি কামানো না হয়, তবে তারা সম্মিলিতভাবে আমাকে বয়কট করবে। তাদের কথা হলো, বুড়ো বয়সে সখ হলে রাখবে। কিন্তু এখন দাঁড়ি রাখলে বল প্রয়োগ করা হবে। শরয়ী হুকুম আহকাম পালনের ক্ষেত্রে আমি দাঁড়িকে খুব উপকারী পেয়েছি। যেমন ঃ আমার সিনেমা দেখার সখ ছিলো। কিন্তু এখন দাঁড়ি রাখার পর সিনেমা হলে যেতে লজ্জা হয়। কিন্তু বিরোধীতাকারীদের যুক্তি শ্রবণ করলে কখনো কখনো সন্দেহ জাগে যে, হয়তো তারা ঠিকই বলছে। কিন্তু এর পরই আবার এ আবেগ দেখা দেয় যে, গোটা দুনিয়াও যদি বিরোধিতা করে, তাও আমার নীতির কোনো পরিবর্তন হবেনা। আল্লাহর ওয়াস্তে আমাকে পথ নির্দেশ দিন, যাতে আমার অন্তর আশ্বস্ত হয়।

জবাব ঃ আপনি যখন রাসূলের সুন্নত মনে করেই দাঁড়ি রেখেছেন, তখন কারো অভিযোগ ও বিরোধিতার কোনোই পরোয়া করবেননা। সবাইকে বলে দিন যে, রাখার জন্যেই এ দাঁড়ি গজিয়েছে, ফেলে দেয়ার জন্যে নয়। দাঁড়ি থাকা অবস্থায় যদি তোমরা আমার সাথে সম্পর্ক রাখতে পার, তবে রাখ। আর যদি রাসূলের সুন্নত তোমাদের নিকট এতোটাই অসহনীয় হয় যে, এর কারণে আমার সংগে সম্পর্ক রাখা তোমাদের অপসন্দনীয়, তবে সম্পর্ক ছিন্ন করে দাও। আমার জন্যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই যথেষ্ট। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব-শাবান ১৩৬৪ হিঃ, জুলাই-আগষ্ট ১৯৪৫ ইং।

আবেগধর্মী অবৈজ্ঞানিক প্রচার পন্থা

প্রশ্ন ঃ জনৈক ছাত্রকে আমি জামায়াতে ইসলামীর সাহিত্য পড়তে উৎসাহিত করি এবং মৌখিকভাবেও তাকে জামায়াতে ইসলামীর লক্ষ্য উদ্দেশ্যের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকি। সে প্রভাবিত হয়ে দাওয়াত কবুল করে এবং এতোদ্দেশ্যে কাজ করার জন্যে নিজেকে পেশ করে। এর ফলে তার আপনজন ও আশপাশের পরিবেশ তার শত্রু হয়ে পড়েছে এবং সেও তাদের প্রতি খুবই অসন্তুষ্ট। এখন স্বীয় জীবনোদ্দেশ্যের খাতিরে সে হিজরত করে দারুল ইসলামে চলে যেতে ইচ্ছা পোষণ করছে। শর্ত সাপেক্ষে তার মা এতে সম্মত হয়েছেন। কিন্তু পিতা থেকে অনুমতি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই, পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে হিজরত করবে কিনা আমার নিকট জানতে চেয়েছে। আমি বলেছি ঃ 'মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার প্রাক্কালে সকল মুহাজির নিজেদের পিতামাতার অনুমতি প্রার্থনা করেনি।' সে আমার নিকট আরো বলতে চেয়েছিল ঃ 'জামায়াত আমার সাহায্য সহযোগিতা করতে সম্মত হবে তো? সেখানে আমি উপেক্ষিত এবং বিপদ মুসীবতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ব না তো?' এর জবাবে আমি তাকে

লিখেছি ঃ "এ সম্পর্কে পরিষ্কার কিছু বলা আমার জন্যে কঠিন। কিন্তু একথা মনে রাখবে, বাতিল রাষ্ট্রে হাজার হাজার টাকা কামাই করা এবং দুনিয়ার সমস্ত স্বাদ উপভোগ করা হক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দারিদ্র বরন করার মতো মহান কাজের তুলনায় খুবই তুচ্ছ। রাসূলে আরবীর আদর্শের শিক্ষা এটাই। কিন্তু এর পরও তোমার এ বিশ্বাস ও আস্থা থাকা উচিত যে, জামায়াত সব সময়ই এসব লোকদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত, যারা বাতিল জীবন ব্যবস্থা থেকে হক জীবন ব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়। শুধু তাই নয়, জামায়াত বরং এ ধরনের লোকদের মোবারকবাদ জানায়। তবে শর্ত হচ্ছে, তাদেরকে সত্যান্বেষী এবং সত্যের উপর অটল হয়ে থাকতে হবে।"

উপরোক্ত বিষয়ে এখন সরাসরি আপনার উপদেশ কামনা করছি।

এ প্রসংগে আরেকটা কথা আপনাকে জানানো দরকার। আপনি তো অবগত আছেন, আমি একজন স্কুল শিক্ষক। সরকারের শিক্ষা বিভাগ আমার প্রচার ও দাওয়াতী তৎপরতা সম্পর্কে অবগত হয়। অতপর শিক্ষা বিভাগ থেকে আমাকে কয়েকটি প্রশ্ন করা হয়। তন্মধ্যে জামায়াতের অবস্থা, উদ্দেশ্য এবং আমীরে জামায়াতের ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত প্রশ্ন রয়েছে। এসব প্রশ্ন উত্থাপন করে আমার নিকট কৈফিয়ত চাওয়া হয়েছে আমি কেন একটি ফেরকা এবং দলের সদস্য হয়েছি? কেন একজন ছাত্রকে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিতৃষ্ণ করেছি এবং পিতামাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপর দেশে হিজরত করতে উস্কিয়ে দিয়েছি? প্রভৃতি। এ কৈফিয়তনামার কি জবাব দেবো? পরামর্শ দিন। আমাদের সংগঠন তো স্পষ্টভাষী।

জবাব ঃ *উগ্র আবেগপ্রবন প্রচার ও দাওয়াতী কাজের মাধ্যমে লোকদের হিজরত ও দেশ ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করে আপনি অত্যন্ত ভুল কাজ করতে শুরু করেছেন। অথচ একাধিকবার আপনাদেরকে প্রকৃত বিষয় জানানো হয়েছে। আমাদের স্বমতের সকল লোককে বিভিন্ন স্থান থেকে হিজরত করে এক স্থানে একত্রে বসবাসের দাওয়াত দেয়ার অবস্থায় আমরা এখনো উপনীত হইনি। আমাদের না আছে জায়গা, না আছে উপায় উপকরণ আর না এখানে দারুল ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে, দারুল কুফর থেকে যেখানে লোকদের হিজরত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। কেবলমাত্র আকীদা উদ্দেশ্য কবুল করে 'মক্কী যিন্দেগীর' কঠিন বিরোধিতার পরিবেশ অতিক্রম করা ছাড়াই হিজরত করে একস্থানে একত্র হওয়াটাও নীতিগতভাবে সঠিক নয়। কেননা এভাবে কখনো সেই রকম কোনো দৃঢ় মজবুত চরিত্র গড়ে উঠতে পারেনা, যা দীর্ঘ সময়কালব্যাপী তীব্র বিরোধী দ্বন্দ্ব সংঘাতমুখর পরিবেশে অটল অবিচল থাকার ফলে লোকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়। সুতরাং আমাদের এ কাজের জন্যে এ সময়*

লোকদের হিজরতের দাওয়াত দেয়াটা নীতিগতভাবেও ভুল এবং এটা অত্যন্ত ক্ষতিকরও বটে। আর আমরা যে পলিসিতে কাজ করছি, এটা তারও খেলাফ।

উপায় উপকরণের স্বল্পতা এবং অত্যন্ত সমস্যা সংকুল অবস্থার মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের কেন্দ্রকে ক্রমান্বয়ে মজবুত করছি। আর আমরা এখন কেবল সেই সব লোকদেরই এখানে ডাকছি, সংগঠনের কাজে যাদের বাস্তবেই প্রয়োজন। পরিকল্পনার ক্রমধারার বিপরীত একজন অতিরিক্ত লোক এখানে এসে যাওয়াটা হবে আমাদের সমস্যাগুলোর মধ্যে একটা অস্বাভাবিক সংযোজন। তাছাড়া আমরা চেষ্টা করছি, এ স্তরে আমরা শুধু পরীক্ষিত লোকদেরই ডাকবো, যাদের সম্পর্কে আমরা পূর্ণ আস্থাশীল যে, সামগ্রিক স্কীমে তারা যথাযথ সহযোগিতা করতে পারবে। অপরীক্ষিত লোকদের যাছাই বাছাই ছাড়াই একত্র হওয়াটা জটিলতা সৃষ্টির কারণ হয়। এ সমস্ত লোকদের সমাবেশ দ্বারা কাজে সহযোগিতা পাওয়ার পরিবর্তে ক্ষতিই হয়ে থাকে। আমরা পরিকল্পনা মোতাবিক যতোক্ষণ না একটি বিশুদ্ধ ও মজবুত পরিবেশ সৃষ্টি করে নিতে না পারছি, যে পরিবেশের ব্যাপারে আমাদের এ অবস্থা জন্মাবে যে, এখন যে কেউই এখানে আসবে, সেই এর ছাঁচে গড়ে উঠবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত অপরীক্ষিত কোনো সাথীর নিজেই এখানে হিজরত করে আসাকে আমি সমীচিন মনে করিনা। মোটকথা যারা কেন্দ্রে চলে আসার ইচ্ছা করছেন, তাদেরকে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত নিজ পরিবেশের থেকে সমস্যা, কঠিন অবস্থা ও বিরোধিতার মোকাবিলা করে সবর ও দৃঢ়তা প্রদর্শন করে এ যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হবে যে, কেন্দ্রের আহ্বান পাওয়ার তিনি যোগ্য হয়েছেন।

এখন নৈতিক সাহসের দাবী হলো, আপনি স্বয়ং সেই যুবক বন্ধুকে এই বলে চিঠি লিখে পাঠান যে, আপনাকে হিজরত করার জন্যে আমি যে উৎসাহ প্রদান করেছিলাম, তা আসলে ভুল ছিলো আর এ ভুলটা ছিলো জামায়াতের পলিসির বিপরীত। এর সাথে আপনি তাকে তার দ্বীনি জ্ঞান প্রয়োজনীয় সীমা পর্যন্ত পূর্ণ করার চেষ্টা করতে পরামর্শ দিন। অপর দিকে তাকে একথাও বলুন, জামায়াতের নামে কোনো কাজ করার পূর্বে সে যেনো জামায়াতের যাবতীয় সাহিত্য ভালোভাবে অধ্যয়ন করে জামায়াতের কর্মনীতি ও কর্মপন্থা ভালোভাবে বুঝে নেয়। অতপর যেনো সে অনুযায়ী যথাযথভাবে নিজ পরিবেশে কাজ করার চেষ্টা করে।

আপনি প্রিয় যুবক বন্ধুটিকে তার পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হিজরত করার রায় দিয়েও ভুল করেছেন। এর প্রথম কারণ হলো, মক্কায় কাফির ও মুশরিক পিতামাতার সম্পর্কে যে কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়েছিলো। হুবহু একই কর্মপন্থা মুসলমান পিতামাতার ব্যাপারে অবলম্বন করা সঠিক নয়। আমার দৃষ্টিতে তারা যতোটা গাফলতি ও গোমরাহীতে নিমজ্জিত থাকুক না কেন, সর্বোপরি তারা

তো মুসলমান বটে। দ্বিতীয় কারণ হলো, কোনো অধ্যায়ে পৌঁছে পিতামাতার অনুমতি ছাড়া বরঞ্চ তাদের নির্দেশের বিরুদ্ধে সন্তানের পক্ষে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যদি বৈধ হয়ও, তবে তা কেবল ঐ অবস্থাতেই বৈধ হবে যখন আমীরে জামায়াত শরীয়তের সঠিক দিক সামনে রেখে এমনটি করার নির্দেশ দেবেন। এরূপ নিয়মতান্ত্রিক নির্দেশ ছাড়া কোনো ব্যক্তির পক্ষে নিজে নিজেই এরূপ সিদ্ধান্ত নেয়া কোনো অবস্থাতেই সহীহ্ নয় যে, এখন পিতামাতার নাফরমানী করার সময় হয়েছে।

প্রিয় যুবক ভাইটি সরাসরি যে পত্র আমার নিকট লিখেছেন, তা দেখে আমার ধারণা হয়েছে যে, তিনি জামায়াত, জামায়াতের সাংগঠনিক নিয়ম কানুন এবং কর্মপন্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত। তার মনে জামায়াতের পজিশন সম্পর্কে কিছুটা বিস্ময়কর ধারণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তিনি মনে করছেন, এই জামায়াত সম্ভবত একটি (State) কায়েম করে নিয়েছে এবং সেটা খুব সম্পদশালী (State) । এ কারণে তিনি মনে করেছেন, তার এখানে আসার খরচ আমরা পাঠিয়ে দিবো। এখানে আসার পর তার যাবতীয় খরচের দায়িত্বও আমরা বহন করবো। তাছাড়া বছরে আমাদের খরচে তাকে দু'বার দেশে পাঠানোর ব্যবস্থাও আমরাই করবো। এখন বলুন, এরূপ ধারণা নিয়ে তিনি দারুল ইসলামে আসতে উদগ্রীব না হয়ে পারেন কি? আমাদের দাওয়াত যদি এরূপ দানশীল দাওয়াতই হয়ে থাকে তবে সরকারী চাকুরী কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এখানে চলে আসতে নেক নিয়্যতের অধিকারী কোন্ ঈমানদার ব্যক্তি ইতস্তত করতে পারে? তার এরূপ বক্তব্য থেকে আমার ধারণা হয়েছে যে, আপনার দাওয়াত দান পদ্ধতি খুবই ত্রুটিপূর্ণ। আপনার দাওয়াতে বুদ্ধি, বিজ্ঞতা ও উপলব্ধিগত দিকের কমতি এবং আবেগ প্রবণতার প্রাবল্য রয়েছে। এ কারণেই যেসব লোক আমাদের কর্মনীতি কর্মপন্থার শতকরা পাঁচ ভাগও উপলব্ধি করেনি, তারা সবকিছু ত্যাগ করে আমাদের এখানে চলে আসতে শতকরা পঁচানব্বই ভাগ উদগ্রীব হচ্ছে। মেহেরবানী করে এরূপ দাওয়াত দান পন্থা সংশোধন করে নিন। তা না হলে এই প্রিয় যুবকটির ব্যাপারে যেরূপ জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, ভবিষ্যতে এর চাইতে অধিক জটিলতা সৃষ্টি হবার আশংকা রয়েছে।

এ কথাও এর আগেই আপনাকে বলে দিয়েছি যে, যতোদিন সরকারী চাকুরীতে বহাল থাকছেন, ততোদিন চাকুরী বিধি মেনে কাজ করুন। কারণ, কেউ যেসব শর্তের ভিত্তিতে বেতন প্রদান করে, বেতন নিয়ে সেসব শর্ত অমান্য করাটা নৈতিক দিক থেকেও ঠিক নয়। তাছাড়া নিয়ম বিধির খেলাফ কাজ করার ফলে যদি আপনাকে কোনো শাস্তি ভোগ করতে হয়, তবে এতে আপনার নৈতিক চারিত্রিক প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়বে। অথচ এখন জাহেলী রাষ্ট্র ব্যবস্থার

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে আমাদের সবচাইতে বড় হাতিয়ার হচ্ছে নৈতিক চরিত্র। এ জন্যে উক্ত ছাত্রটিকে আপনি যে পন্থায় দাওয়াত দিয়েছেন এবং তার ফলে আপনাকে যে জবাবদিহী করতে হলো তা সবই সেই নির্দেশিকার খেলাফ যা আপনাকে কেন্দ্র থেকে প্রদান করা হয়েছিল। এখন আপনাকে যেসব প্রশ্ন করা হয়েছে, এগুলোর জবাবে সম্পূর্ণ সরল সহজ ও পরিষ্কার ভাষায় সঠিক ও যথাযথ কথা বলা উচিত। কিন্তু আপনার জবাব কিছুতেই কঠোর হওয়া ঠিক হবেনা। বুদ্ধিমত্তার সাথে কথাবার্তা বলতে হবে। ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করে নেবেন। বিনা দ্বিধায় আপনার ও জামায়াতের প্রকৃত পজিশনই তুলে ধরবেন। তরজমানুল কুরআন ঃ যুলকাদাহ-যুলহজ্জ ১৩৬৪ হিঃ, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯৪৫ ইং।

বাস্তব ইসলাম থেকে দূরে থাকা

প্রশ্ন ঃ ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে আমার খুবই আগ্রহ। কিন্তু কয়েক দিন থেকে একটি প্রশ্ন মস্তিষ্কে ঘুর্ণিপাক সৃষ্টি করছে। সেটি আপনাকে জানিয়ে পথ নির্দেশনা প্রার্থনা করছি। প্রশ্নটি হলো, বর্তমান খোদাদ্রোহী রাষ্ট্রব্যবস্থার সংগে মুসলমান যদি সম্পূর্ণরূপে সম্পর্কচ্ছেদ করে নেয়, তবে ভারতবর্ষে তাদের অবস্থা হবে গোলাম কিংবা অস্পৃশ্যদের মতো। সুতরাং এ পন্থা অবলম্বন করলে কি ভাল হয়না যে, আপনাদের মতো উন্নত জ্ঞানবুদ্ধির অধিকারী ব্যক্তিগণ মুসলমানদেরকে বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে সুবিধা ভোগের অবকাশ সৃষ্টি করে দিয়ে তাদের মানসিক প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজ করতে থাকবেন, যাতে করে সকল মুসলমানের মানসিকতা একই ছাঁচে গড়ে ওঠে। অতপর সুযোগ আসা মাত্রই সকলে একত্রে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে উঠে দাঁড়াবে।

সকল মুসলমান যদি আপনার ইসলামী আন্দোলনে শামিল হয়ে যেতো, তবে তো খোদাদ্রোহী রাষ্ট্রব্যবস্থার সংগে নিজেদেরকে না মিশালেও সফলতার সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু এখন যেহেতু অধিকাংশ মুসলমান ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কেই অবহিত নয় এবং দ্বীনের পুনরুজ্জীবনের সংগ্রাম করা যে আলিম সমাজের কাজ তারাই যখন এটাকে অবাস্তব বলে বেড়াচ্ছে, তখন খোদাদ্রোহী রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে সম্পর্কহীন থেকে সফলতা লাভের কোনো সুযোগই নেই। আপনি কি এ কথার সাথে একমত নন যে, আপনি এখন শুধু দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ করতে থাকবেন এবং সাধারণভাবে মুসলমানেরা যখন ইসলামী আন্দোলন বুঝতে শুরু করবে, তখন বাস্তব কাজের সূচনা করা হবে?

জবাব ঃ আপনার পত্র থেকে আপনার বক্তব্যের উদ্দেশ্য যতদূর বুঝে আসে তা হলো, বর্তমান অবস্থায় কেবল মৌখিক তাবলীগ জারি হবে। অর্থাৎ বক্তৃতা বিবৃতি এবং পুস্তক পুস্তিকা ও পত্র পত্রিকা লেখার মাধ্যমে দ্বীনের প্রচার করতে

হবে বটে, কিন্তু যেসব নীতি ও আদর্শের প্রচার করা হবে সেগুলোর উপর না নিজেরা আমল করবো আর না অন্যদের আমল করতে বলবো। অতপর সমস্ত মুসলমানের মন মানসিকতা যখন আমাদের ধ্যান ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাবে, তখন হঠাৎ করে একেবারেই বিপ্লব সৃষ্টি করে দেয়া হবে।

আপনার চিন্তাতো খুবই নিরাপদ এবং ঝুকিমুক্ত। কিন্তু দাওয়াত ও বিপ্লবের প্রকৃতিই যে এর বিপরীত তার কি করা যায়? প্রভাব সৃষ্টিকারী এবং সুফলদায়ক দাওয়াত ও তাবলীগ তো তখনই হয়, যখন দাওয়াত দানকারী পার্টি স্বয়ং নিজ আদর্শ ও নীতিমালার উপর আমল করে এবং একই আদর্শ ও নীতিমালার উপর আমলকারী লোকদের সংগঠিত করে। নির্ঝঞ্ঝাট ওয়ায তো দীর্ঘদিন থেকেই এদেশে হয়ে আসছে। কিন্তু তার রেজাল্ট কি?

এ এক বিস্ময়কর ব্যাপার! কিছু লোক আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে ঃ তোমরা তো কেবল লেখো আর ছাপাও, কিন্তু কোনো বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করোনা। আবার আপনার মত কিছু লোক পরামর্শ দেয়, যতো পারো লেখো আর ছাপো, কিন্তু মুসলমানদেরকে বাস্তবে আমল করার বিপদে কেন ফেলো? আমাদের আবেদন হচ্ছে, এ ধরনের অভিযোগ করা ও পরামর্শ দেয়ার আগে লোকেরা ভালভাবে একথা বুঝে নিক যে, আমরা আমাদের দাওয়াত ও দাওয়াত দান পদ্ধতিতে আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস সালামের অনুসারী। সুতরাং যিনিই আমাদেরকে কোনো পরামর্শ দিতে চান, কিংবা আমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে চান, তিনি যেন তার পরামর্শ এবং অভিযোগের সমর্থনে আম্বিয়ায়ে কিরামের কথা ও কাজ থেকে দলিল পেশ করেন। কেবল সুবিধা সন্ধান, অলীক কল্পনা এবং ভিত্তিহীন সন্দেহ সংশয়ের কোনো গুরুত্ব আমাদের নিকট নেই। তরজমানুল কুরআন ঃ রবীউস সানী ১৩৬৪ হিঃ, মার্চ ১৯৪৬ ইং।

জামায়াত বিহীন ইসলাম

প্রশ্ন ঃ কোনো ব্যক্তি যদি আপনার জামায়াতের আদর্শ নীতিমালা অনুযায়ী নিজ স্থানে একাকী যথাসাধ্য সঠিক ইসলামী জীবন যাপন করে এবং কোনো কারণে নিয়মতান্ত্রিকভাবে জামায়াতে শরীক না হয়, তবে তার সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

জবাব ঃ তার সম্পর্কে আমার ধারণা তাই, যা রাসূলে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আর তা হলো, জামায়াত ছাড়া সঠিক ইসলামী যিন্দেগী হতে পারেনা। কোনো ব্যক্তির যিন্দেগী সঠিক ইসলামী যিন্দেগী হওয়ার জন্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো ইসলামের মূল উদ্দেশ্যের (অর্থাৎ ইকামতে দ্বীনের) সাথে তার জীবনের সম্পর্ক থাকতে হবে। এ সম্পর্কের দাবী

হচ্ছে, মানুষ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে চেষ্টা সংগ্রামে অবতীর্ণ হবে। আর একথা পরিষ্কার যে, সংঘবদ্ধ শক্তি ছাড়া এ চেষ্টা সংগ্রাম চলতে পারেনা। সুতরাং জামায়াতবদ্ধ জীবন ছাড়া কোনো যিন্দেগীকে সঠিক ইসলামী যিন্দেগী বলা সম্পূর্ণ ভুল। কোন্ জামায়াতের সংগে সম্পর্ক রেখে সে এ দায়িত্ব পালন করবে সেটা বিলকুল ভিন্নকথা। সে ইচ্ছা করলে আমাদের জামায়াতে যোগ দিয়েও একাজ করতে পারে, অথবা অন্য কোনো দলে যোগ দিয়েও তা করতে পারে, যেদল এ উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে এবং যার সাংগঠনিক কাঠামো ও আন্দোলনের পদ্ধতি ইসলামের সঠিক শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এমনটি করলে কোনো ব্যক্তিকে আমরা হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে স্বীকার করে নিতে কোনো প্রকার দ্বিধা করবোনা। কিন্তু কোনো ব্যক্তি যদি কেবল এমন কোনো পদ্ধতির অনুসরণকেই যথেষ্ট মনে করে, যাকে শরীয়াত শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনের সংগে সম্পর্কিত করেছে এবং ইকামতে দ্বীনের চেষ্টা সংগ্রামের উদ্দেশ্যে কোনো জামায়াতের সাথে শরীক না হয়, তবে আমাদের মতে এটা সঠিক ইসলামী যিন্দেগী নয়। এ ধরনের যিন্দেগীকে আমরা অন্তত অর্ধ জাহিলী যিন্দেগী মনে করি। আমাদের জানা মতে ইসলামের মিনিমাম দাবী হলো, কোনো ব্যক্তি যদি তার আশেপাশে এমন কোনো জামায়াতের অস্তিত্ব না দেখে, যে জামায়াত ইসলামকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠার জন্যে ইসলামী পন্থায় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, তবে, তার উচিত এমন একটি জামায়াত প্রতিষ্ঠার জন্যে হক ও খালিস দিলে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। আর যখনই এ ধরনের কোনো জামায়াত তার নযরে পড়বে, সংগে সংগে নিজ আমিত্ব ত্যাগ করে সঠিক সাংগঠনিক মন মানসিকতা নিয়ে সে দলে শামিল হবার জন্য প্রস্তুত থাকা। তরজমানুল কুরআন ঃ জমাদিউল উলা ১৩৬৫ হিঃ, এপ্রিল ১৯৪৬ ইং।

জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে কতিপয় সংশয়

প্রশ্ন ঃ কতিপয় বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষ থেকে জামায়াতে ইসলামী সম্পর্কে নিম্নোক্ত অভিযোগগুলো উত্থাপিত হয়েছে। মেহেরবানী করে প্রশ্নগুলোর জবাব দিয়ে প্রকৃত বিষয় অবহিত করবেন ঃ

১. "জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে একটি নতুন ফেরকা সৃষ্টি হবে।" এ আশংকা নিরসনের কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে?

২. এ আন্দোলন মূলত মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীরই আন্দোলন। আপনার দলবল একটু ভারী হলে আপনার কার্যকলাপও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাবের মতোই হবে।

৩. আপনি বুযুর্গানে দ্বীনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেননা। অতীতের বুযুর্গগণ যে সকল বিরাট বিরাট খেদমত আঞ্জাম দিয়েছেন, আপনি তাদের কার্যক্রমের

উপর কলম ধরতে চান এবং নিজে তাদের চাইতে ভালো কাজ করছেন বলে প্রমাণ করতে চান।

৪. 'জামায়াতে ইসলামীর রুকন ছাড়া অন্য সব মানুষকে আপনি কাফির মনে করেন।'

জবাব ঃ ১. আমি নিজে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করছি এবং আমার সহকর্মীগণও খোদার ফজলে এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক, যেনো জামায়াতে ইসলামী কোনো 'ফেরকা' না হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য আমাদের সংগে মতবিরোধ রাখেন এমন কিছু লোক এ খাহেশ রাখেন যেনো আমাদের থেকে এমন সব ভ্রান্তি প্রকাশিত হয়, যাতে করে অন্যসব সংস্কার প্রচেষ্টার মতো আমাদের এ কাজও ধূলিস্মাত হয়ে যায়।[১] কিন্তু আল্লাহর হাজারো শোকর, আমাদের মধ্যে সেই রোগ বর্তমান নেই, যেগুলো দ্বারা ফেরকা সৃষ্টি হয়। এ ধরনের ফেতনা থেকে আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আমাদের সাধ্যানুযায়ী আমরা এ আশংকা নিরসনের চেষ্টা করছি। কিন্তু শয়তানের দুষ্কর্মের এমন পূর্ণ প্রতিরোধ করা যার ফলে তার প্রবেশের কোনো ছিদ্র পথই না থাকে, আম্বিয়ায়ে কিরামের দ্বারাও সম্ভব হয়নি। তাঁদের তুলনায় আমরা কোন্ ছাই যে, এ ব্যাপারে পূর্ণ সফল হবার দাবী করতে পারি? বান্দাহ্র কাজ তো শুধু এতোটুকুই যে, সে নিজের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবে এবং সাফল্যের জন্যে আল্লাহর নিকট দোয়া করবে।[২]

২. আমাদের বই পুস্তক এবং কর্মকাণ্ড দেখার পর কোনো ব্যক্তি যদি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এটা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওহাব নজদীর আন্দোলন, কিংবা অচিরেই সে আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করবে, তবে এ মত পোষণ করার স্বাধীনতা তার রয়েছে। আমরা কোনো ব্যক্তিকে স্বাধীন মতামত পোষণ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারিনা। আর এ ধরনের বাজে বিতর্কে লিপ্ত হবার সময়ও আমাদের হাতে নেই।

৩. সকল বুযুর্গানে দ্বীনই আমার নিকট শ্রদ্ধেয়। কিন্তু তাঁদের কারো পূজা আমি করিনা। আর আম্বিয়া কিরাম ছাড়া অন্য কাউকেও আমি নিষ্পাপ মনে করিনা। আমার কর্মপন্থা হচ্ছে এই যে, আমি অতীত বুযুর্গদের চিন্তাধারা এবং

১. অনেক লোক আমাদের ভ্রান্তি প্রকাশ পাওয়ার অপেক্ষা করতে করতে বিরক্ত হয়ে জোরপূর্বক আমাদেরকে একটা 'ফেরকা' বলে আখ্যায়িত করছে। কেননা এছাড়া তাদের অদম্য গোস্বা শান্ত হচ্ছিলনা। আমি জানিনা আপনার 'বিজ্ঞ ব্যক্তিরা' কোন্ লোকদের অন্তর্ভুক্ত। ভ্রান্তি প্রকাশিত হবার জন্যে অপেক্ষমান লোকদের অন্তর্ভুক্ত? নাকি অপেক্ষার অপেক্ষায় বিরক্ত হয়ে 'খেতাব' প্রদানকারীদের অন্তর্ভুক্ত?

২. 'সত্যের সাক্ষ্য' বইতে এ অভিযোগের বিস্তারিত জবাব দেয়া হয়েছে।

কর্মকান্ডের প্রতি ব্যাপক অনুসন্ধানী ও সমালোচনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করি। অতপর তাতে আমি যা কিছু সত্য পাই, তাকে সত্য বলে স্বীকার করি। আর কুরআন ও সুন্নাহ্‌র দৃষ্টিতে এবং কর্ম কৌশলের দিক থেকে যে জিনিসকে সঠিক ও দুরস্ত পাইনা, তাকে স্পষ্টভাষায় অসঠিক ও নাদুরস্ত বলে দিই। আমি মনে করি নবী ব্যতীত অপর যে কোনো মানুষের রায় ও কর্মধারার মধ্যে ভুলত্রুটি পাওয়া যাওয়ার ফলে তাঁর মর্যাদা ও বুযুর্গী কমে যায়না। তাই অতীতের কোনো বুযুর্গের কোনো কোনো মতের সাথে মতবিরোধ করা সত্ত্বেও আমি তাঁদের বুযুর্গীর প্রতি পুরোপুরি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু যেসব লোক বুযুর্গী ও নিষ্পাপ হওয়াকে সমার্থক মনে করে, বুযুর্গ ব্যক্তি ভুল ত্রুটি করতে পারেননা আর যিনি ভুলত্রুটি করেন তিনি বুযুর্গ নন বলে মনে করে, মূলত এসব লোকেরাই মনে করে, কোনো বুযুর্গের রায় বা তরীকাকে নাদুরস্ত বলা মানে সেই বুযুর্গের প্রতি অশ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং তার খেদমতের উপর কলম ধরা। তারা এখানেই ক্ষান্ত হয়না, বরং সম্মুখে অগ্রসর হয়ে তার প্রতি এ অপবাদ আরোপ করে যে, সে নিজেকে উক্ত বুযুর্গের চাইতে বড় মনে করে। অথচ ইলমী ক্ষেত্রে এক ব্যক্তির মতের সংগে অপর ব্যক্তির ভিন্ন মত পোষণ করা দ্বারা একথা অনিবার্য হয়ে পড়েনা যে, সে যার সাথে মতবিরোধ করছে তার মোকাবিলায় সে নিজেকে শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম মনে করছে। ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি এবং ইমাম আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহি অধিকাংশ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির সংগে মতবিরোধ করেছেন। আর এই মত বিরোধের অর্থ হলো, তারা বিভিন্ন বিষয়ে নিজেদের মতকে সঠিক মনে করতেন এবং ইমাম সাহেবের মতকে মনে করতেন ভুল। কিন্তু এ থেকে এমনটি ধরে নেয়া কি অনিবার্য হয়ে পড়ে যে, তারা ইমাম আবু হানীফার তুলনায় নিজেদেরকে উত্তম মনে করতেন?

৪. জামায়াতে ইসলামীর রুকন ছাড়া অন্য সব মানুষকে আমি কাফির মনে করি, এ অপবাদটি যদি আমার সেই সব লেখা পড়ার পর আরোপ করা হয়ে থাকে, যা আমি এ অপবাদ খণ্ডন করতে গিয়ে বার বার লিখেছি। তবে সবর করা ছাড়া এর কোনো জবাব নেই।[১] সমস্ত বিষয়ের ফায়সালা তো আর এই দুনিয়াতেই হয়ে যাবেনা। আখিরাতে আদালতে তো অবশ্যি কায়েম হবে। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব ১৩৬৫ হিঃ, জুন ১৯৪৬ ইং।

আধুনিক কালের প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রে ইসলামী আন্দোলনের কর্মপন্থা

প্রশ্ন ঃ একথা আর বেশী দলিল প্রমাণ সহ পেশ করার অপেক্ষা রাখেনা যে, কোনো মুসলমান যদি ইসলামকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করে থাকে, তবে তার

১. তাফহীমাত দ্বিতীয় খন্ডে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত লেখা হয়েছে।

জীবনের কেবলমাত্র একটিই উদ্দেশ্য হতে পারে, আর তা হচ্ছে 'হুকুমাতে ইলাহিয়ার' প্রতিষ্ঠা। একথা খুবই স্পষ্ট, এ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে কেবল সেই কর্মপন্থাই অবলম্বন করা যেতে পারে যা বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে তার প্রকৃতির সংগে সামঞ্জস্যশীল এবং যা তার মূল আহবায়কগণ বাস্তবে অবলম্বন করেছিলেন। হুকুমাতে ইলাহিয়া প্রতিষ্ঠার মূল আহবায়ক ছিলেন আম্বিয়ায়ে কিরাম। সুতরাং এর কর্মনীতি ও কর্মপন্থাও হবে তাই, যা ছিলো আম্বিয়ায়ে কিরামের কর্মপন্থা ও কর্মনীতি।

আম্বিয়ায়ে কিরামের জীবনের দিকে তাকালে মোটামুটি আমরা দু'প্রকার পয়গম্বর দেখতে পাই ঃ এক, সেইসব পয়গম্বর যাঁদের দাওয়াতী কাজের প্রাককালে রাষ্ট্র শক্তি খুবই সংহত এবং প্রভাব প্রতিপত্তি নিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ছিলো। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এসব রাষ্ট্রের অবস্থা এমন ছিল যে রাষ্ট্রের সার্বিক ও সর্বোচ্চ ক্ষমতা ছিলো এক ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত। যেমন হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম এবং হযরত মূসা আলাইহিস সালাম।

দুই, সেইসব আম্বিয়ায়ে কিরাম যাঁদেরকে দ্বীনের কাজ করতে হয়েছিলো এমন সোসাইটিতে যেখানে রাষ্ট্র ছিলো একেবারে প্রাথমিক অবস্থায় এবং খুব বেশী হলে গোত্রীয় প্রধান শাসিত ধরনের (Patriachal) রাষ্ট্র ছিলো। যেমন ঃ শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

উভয় অবস্থায় কর্মপন্থাগত পার্থক্য স্পষ্ট। আর এ পার্থক্য সম্ভবত রাজনৈতিক পরিবেশগত পার্থক্যের কারণেই হয়ে থাকবে।

কিন্তু রাষ্ট্রশক্তি এখন যতোটা সংহতি ও মজবুতি অর্জন করেছে এবং ব্যক্তিকে যেভাবে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে নিয়েছে আর চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে যতোটা সুশৃংখল প্রভাব প্রতিপত্তি লাভ করেছে, সম্ভবত অতীতের ইতিহাসে এর কোনো নজীর নেই। এখন প্রশ্ন হলো, প্রায় রাষ্ট্রহীন (Stateless) সমাজ বা বেশীর পক্ষে গোত্র প্রধান শাসিত রাষ্ট্রে যে কর্মপন্থা সফলভাবে ব্যবহার করা গিয়েছিল এখনো কি সেই একই কর্মপন্থা ঐ ধরনের সফলতার গ্যারান্টি দিতে পারে? এখনকার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে যেসব দল ঐ উদ্দেশ্যে কাজ করছে, বিপ্লব সাধনের জন্যে তাদের কি নিজেদের কর্মপন্থার যথেষ্ট পরিবর্তন করতে হবেনা?

আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো সংগঠিত ও প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তির মোকাবিলা করতে হয়নি। পক্ষান্তরে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের সম্মুখে ছিলো এক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রশক্তি। সুতরাং তিনি যে কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিলেন তা ছিলো এই যে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীকে (Sovereign power) ক্ষমতা হস্তান্তরে আগ্রহী দেখে বললেন ঃ

اِجْعَلْنِىْ عَلٰى خَزَائِنِ الْاَرْضِ -

(দেশের অর্থভাণ্ডার আমার নিকট সোপর্দ করুন) এবং ক্ষমতা হস্তগত করে নিয়ে স্বীয় মিশন পূর্ণ করার জন্য পূর্ব থেকে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রকে ব্যবহার করেন। বর্তমান কালের রাষ্ট্র তো হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের যুগের রাষ্ট্র থেকেও অধিক সংহত ও ক্ষমতাশালী। এ রাষ্ট্রব্যবস্থাকে উৎখাত করে একটি নতুন রাষ্ট্র জন্ম দেয়ার জন্যে যে ধরণের বিপ্লবই সংঘটিত হোকনা কেন, রক্ত বন্যা পেরিয়েই তা সংঘটিত হবে। যেমনটি হয়েছে বলশেভিক রাশিয়ায়। তাছাড়া এটাও জানা কথা যে, কেবল সবকিছু ভেংগে তোলপাড় করে দেয়ার মতো বিপ্লব ইসলামের কাম্য নয়। বরঞ্চ ইসলামের প্রোগ্রাম এর চাইতেও নাজুক।

এমতাবস্থায় পরিবেশের সংগে সামঞ্জস্যশীল পন্থা তো এটাই মনে হয় যে পূর্ণাংগ বিপ্লবের পরিবর্তে যতোটা ক্ষমতা লাভ কর যায় তা গ্রহণ করে সম্মুখে অগ্রসর হতে হবে। এ পন্থা যদি গ্রহণ করা হয় তবে দেশের বর্তমান মুসলমান দলগুলোর বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নেয়া সমীচীন হবেনা। শুধু তাই নয়, বরঞ্চ তাদের সহযোগিতাই প্রয়োজন হয়ে পড়বে।

একথা স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন রাখেনা যে, ক্ষমতা মানে শুধু সিভিল সার্ভিসের পদসমূহ দখল করা নয়। যেমনটি তরজুমানের কোনো এক সংখ্যায় জনৈক নওয়াব সাহেব লিখেছেন। বরঞ্চ এর অর্থ, একটি সুসংগঠিত দলের চেষ্টা সংগ্রামের পর দল হিসেবে সর্বোচ্চ ক্ষমতাধরের (Sovereign power) নিকট থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে তা নিজেদের উদ্দেশ্য হাসিলে ব্যবহার করা।

জবাব ঃ যখন অনৈসলামী রাষ্ট্র ব্যাপক শক্তিশালী ও প্রতিপত্তিশালী হয়, তা নিঃসন্দেহে বিপর্যস্ত সামাজিক ব্যবস্থার প্রাথমিক অবস্থা থেকে অনেক ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এ জন্যে কমপক্ষে পরিবেশের প্রেক্ষিতেও কর্মপদ্ধতিতে কিছুটা রদবদল জরুরী হয়ে পড়ে। কিন্তু মূলনীতির দিক থেকে কর্মপন্থায় কোনো রদবদলের প্রয়োজন পড়েনা। আর মূলনীতিগত কর্মপন্থা হচ্ছে এই যে, আমরা প্রথমে মানুষের নিকট দাওয়াত পেশ করবো। অতপর যারা আমাদের দাওয়াত কবুল করবে তাদের সংগঠিত করতে থাকবো। এরপর গণ রায় কিংবা অবস্থার পরিবর্তনের ফলে কখনো যদি এমন পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যায় যে, প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক পদ্ধতিতে আমাদের হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতা এসে যাওয়া সম্ভব, আর তাতে এ সম্ভাবনা থাকে যে আমরা সমাজে নৈতিক তামাদ্দুনিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা আমাদের মূলনীতির ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে সক্ষম হবো, তখন ঐ সুযোগ থেকে ফায়দা উঠাতে আমরা কোনো প্রকার দ্বিধা করবোনা। কারণ উদ্দেশ্য হাসিলই আমাদের নিকট আসল বিষয়, কর্মপদ্ধতি (Method) নয়। কিন্তু শান্তিপূর্ণ মাধ্যমসমূহ দ্বারা যদি মূল ক্ষমতা (Substance of power)

লাভের সম্ভাবনা না থাকে, তবে আমরা অবশ্যি সাধারণ দাওয়াত অব্যাহত রাখবো এবং শরয়ী দিক থেকে সকল বৈধ মাধ্যম ব্যবহার করে পূর্ণাংগ বিপ্লব সাধনের চেষ্টা করবো। তরজমানুল কুরআন ঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৫ ।

সমকালীন রাজনৈতিক সমস্যা ও ইসলামী আন্দোলন

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে[১] ভারতবর্ষের মুসলমানরা দুটি ফিতনায় নিমজ্জিত। প্রথমটি হচ্ছে কংগ্রেসের স্বদেশী আন্দোলনের ফিতনা। এ ফিতনা ভারতবাসীর সামষ্টিক জীবনকে এক জাতিত্ব এবং পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে ঢেলে সাজাতে চায়। দ্বিতীয়টি হচ্ছে মুসলিম লীগ পরিচালিত মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এ আন্দোলনের পিঠে ইসলামের লেবেল আঁটা আছে বটে, কিন্তু, এর ভিতরে ইসলামের অন্তরাত্মাই অনুপস্থিত। আপনার "মুসলমান আওর মওজুদাহ সিয়াসী কাশমাকাশ" গ্রন্থ অধ্যয়নের ফলে আমাদের নিকট একথা স্পষ্ট হয়ে গেছে, এ উভয় আন্দোলনই ইসলামের খেলাফ। কিন্তু হাদীসে আছে, মানুষ যখন দু'টি পরীক্ষার সম্মুখীন হয় তখন যেনো ছোটটি গ্রহণ করে। কংগ্রেসের আন্দোলন তো নিরেট কুফরী আন্দোলন। তার সহযোগিতা করা মুসলমানদের জন্যে মৃত্যু সমতুল্য। পক্ষান্তরে মুসলিম লীগের আন্দোলন যদিও অনৈসলামী কিন্তু তার দ্বারা তো আর ভারতের দশ কোটি মুসলমানের জাতীয় সত্তা খতম হয়ে যাওয়ার আশংকা নেই। তবে কি আমাদের জন্যে এটা উচিত নয় যে, আমরা মুসলিম লীগের বাইরে থাকবো বটে, কিন্তু তার সহযোগিতা করবো। এখন ভারতবর্ষে নির্বাচনী তোড়জোড় শুরু হয়েছে।[২] আর এ নির্বাচন সিদ্ধান্তকারী নির্বাচন। একদিকে লীগ বিরোধী সমস্ত শক্তি একজোটে মুসলিম লীগকে ধরাশায়ী করার চেষ্টা করছে। এতে যদি তারা সফল হয়, তবে এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি এই হবে যে, কংগ্রেসের একক জাতীয়তার আন্দোলন জবরদস্তি মুসলমানদের উপর চেপে বসবে। অপরদিকে মুসলিম লীগ প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে, মুসলমানরা একটি স্বতন্ত্র জাতি এবং তারা নিজেরাই নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক। এ উভয় বিষয়ের ফায়সালা ভোটারদের রায়ের উপর নির্ভর করছে। এমতাবস্থায় আমাদের সিদ্ধান্ত কি হওয়া উচিত? আমরা কি মুসলিম লীগের পক্ষে নিজেরাও ভোট দেবো এবং অন্যদেরও দিতে বলবো? নাকি নীরব ভূমিকা পালন করবো? আর নাকি আমরা নিজেরা নিজেদের প্রতিনিধি দাঁড় করাবো?

---

১. উল্লেখ্য এটা ১৯৪৫ সালের কথা। এ সময় ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন এবং মুসলমানদের জন্যে একটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন ছিলো প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে।
২. ১৯৪৬ সালের নির্বাচনের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

জবাব : আপনার মনমানসিকতায় দেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা প্রভাব বিস্তার করে আছে। এ কারণে আপনার দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের মুসলমানরা শুধুমাত্র দুটি ফিতনায় নিমজ্জিত রয়েছে। অথচ আপনি যদি আরো একটু প্রশস্ত দৃষ্টিতে তাকাতেন, তবে এই ফিতনা ছাড়াও নৈতিক, চৈন্তিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসংখ্যা ফিতনা আপনি দেখতে পেতেন। এসব ফিতনা মুসলমানদের আষ্টেপৃষ্ঠে বন্দী করে রেখেছে। মূলত, এ এক প্রাকৃতিক শাস্তি, যা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এমন প্রতিটি জাতিই ভোগ করে থাকে, যারা আল্লাহ্র কিতাবের বাহক হওয়া সত্ত্বেও তার অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার দাবী অনুযায়ী চলতে কুন্ঠিত হয়। মুসলমান কেবল তখনই রক্ষা পেতে পারে, যখন সেই মৌলিক যুলম ও অপরাধ থেকে সে বিরত থাকবে, যার ফলে তার উপর এই ফিতনা চেপে বসেছে এবং ঐ কাজ করার জন্যে দণ্ডায়মান হবে, যে জন্যে তাকে আল্লাহ্র কিতাব প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু সে যদি এ কাজ করতে প্রস্তুত না হয় তবে যতোটা তদবীর আর প্রচেষ্টাই করা হোকনা কেন, বিশ্বাস করুন, কোনো একটি ফিতনার প্রতিরোধ হবেনা, বরঞ্চ প্রতিটি তদবীর আরো অনেকগুলো ফিতনার জন্ম দেবে।

আপনি যে প্রশ্নগুলো রেখেছেন, সে সম্পর্কে আমি পরিষ্কারভাবে দুটি কথা বলে দিতে চাই, যাতে আর ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে আপনার এবং আপনার মতো করে যারা চিন্তা করছেন তাদের মধ্যে কোনো প্রকার জটিলতা সৃষ্টি না হয়।

প্রথমত, জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অনুধাবন করুন। কোনো দেশের সমসাময়িক সমস্যাকে সামনে রেখে সাময়িক তদবীর প্রচেষ্টা দ্বারা তার সমাধান করার জন্যে এ জামায়াত প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তার প্রতিষ্ঠার পিছে এ উদ্দেশ্যও কার্যকর ছিলনা যে, উদ্ভূত সমস্যার সমাধান করার জন্যে যখন যে নীতি অবলম্বন করলে সুবিধা হয়, তখন তাই অবলম্বন করা হবে। এ জামায়াতের সম্মুখে রয়েছে তো একটিই মাত্র বিশ্বজনীন চিরন্তন সমস্যা। সকল দেশ ও জাতির সর্বকালীন সমস্যাই এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর সে সমস্যা হচ্ছে এই যে, মানুষের পার্থিব কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি কোন্ জিনিসের মধ্যে নিহিত রয়েছে? এ জামায়াতের নিকট সমস্যাটির একটিই মাত্র সমাধান রয়েছে। আর তা হচ্ছে, খোদার সকল বান্দাহকে (যাদের মধ্যে ভারতবর্ষের মুসলমানরাও শামিল রয়েছে) সঠিক অর্থে খোদার বন্দেগী অবলম্বন করতে হবে এবং গোটা ব্যক্তি ও সামষ্টিক জীবনের সকল বিভাগকে সেই সব মূলনীতির অনুবর্তনকারী বানিয়ে দিতে হবে যা আল্লাহ্র কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাতে বর্তমান রয়েছে। এই একমাত্র সমস্যা এবং তাঁর এই একমাত্র সমাধান ছাড়া দুনিয়ার অপর কোনো জিনিসের প্রতি আমাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। যিনি আমাদের সংগে চলতে চান, সকল দিক থেকে দৃষ্টি গুটিয়ে এনে তাঁর পূর্ণাংগ মনোনিবেশকে

একমুখী করে এই একমাত্র রাজপথে অগ্রসর হওয়া তার জন্যে অবশ্য কর্তব্য। আর যিনি স্বীয় চিন্তা ও কর্মকে এতোটা একই সমতলে আনতে সক্ষম নন, যার মনকে নিজ দেশ কিংবা জাতির সমকালীন ও সাময়িক সমস্যা বার বার ব্যস্ত করে তোলে এবং যার কদম বারবার পিচ্ছিল খেয়ে সেই সব পথ ও পন্থার দিকেই চলে যায় যা বর্তমান দুনিয়ায় প্রচলিত রয়েছে, সেইসব হাংগামী আন্দোলনে গিয়ে দিল ঠাণ্ডা করাই তার জন্যে অধিক উপযোগী।

দ্বিতীয়তঃ ভোট এবং নির্বাচনের ব্যাপারে আমাদের নীতি স্পষ্টভাবে বুঝে নিন। সম্মুখের এই নির্বাচন কিংবা ভবিষ্যতে অনুষ্ঠিতব্য এ ধরনের সকল নির্বাচনের গুরুত্ব যা কিছুই থাকুক না কেন এবং সেগুলোর যে ধরনের প্রভাবই আমাদের জাতি ও দেশের উপর পড়ুকনা কেন, সর্বাবস্থায়ই একটি আদর্শিক সংগঠন হওয়ার কারণে কোনো সাময়িক সুবিধার জন্যে আমাদের পক্ষে সেই আদর্শের কোরবানী দেয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব, যার প্রতি আমরা ঈমান এনেছি। বর্তমান কুফরী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামের ভিত্তিই হচ্ছে এই যে, এই রাষ্ট্রব্যবস্থা 'জনগণের সার্বভৌমত্ব' নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। আর জনগণ যে পার্লামেন্ট ভোটের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের নিঃশর্ত অধিকার প্রদান করে, আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উর্ধ্বতন সনদ কুরআন সুন্নাহর বিধান তার নিকট স্বীকৃত নয়। পক্ষান্তরে আমাদের তাওহীদি আকীদার বুনিয়াদী দাবী হলো, সার্বভৌমত্ব জনগণের নয়, বরঞ্চ সার্বভৌমত্ব আল্লাহর এবং চূড়ান্ত নির্দেশনামা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আইন কানুন যা কিছুই প্রণয়ন করতে হোকনা কেন, তাহবে আল্লাহর কিতাবের অধীন থেকে, তা থেকে মুক্ত স্বাধীন হয়ে নয়। এ এক মৌলিক বিষয়। এটা সরাসরি আমাদের ঈমান ও মৌলিক আকীদার সংগে সম্পর্কিত। ভারতবর্ষের আলিম ও সাধারণ মুসলমানেরা যদি এই সত্যকে উপেক্ষা করে এবং সাময়িক কল্যাণকে ঈমানের দাবীর উপর অগ্রাধিকার দেয়, তবে তারা তাদের খোদার সম্মুখেই এর জবাবদিহী করবে। কিন্তু আমরা কোনো ফায়দার লালসায় এবং কোনো ক্ষতির আশংকায় এই আদর্শিক প্রশ্নে বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থার সাথে কোনো প্রকার সমঝোতা করতে পারিনা। আপনি নিজেই চিন্তা করে দেখুন, এই তাওহীদি আকীদাহ বিশ্বাস নিয়ে আমরা কিভাবে (জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে) এই নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারি? একদিকে আমরা খোদায়ী বিধান থেকে মুক্ত হয়ে আইন প্রণয়ন করাকে শিরক বলে ঘোষণা করছি, অপরদিকে স্বয়ং আমাদের নিজেদের ভোটেই ঐ সমস্ত লোকদের আইন সভার সদস্য নির্বাচিত করবো যারা আল্লাহর ক্ষমতা ও ইখতিয়ারকে খেয়ানত ও পদদলিত করার জন্যে পার্লামেন্টে যেতে চায়। এমনটি করা কি আমাদের জন্যে বৈধ হতে পারে? আমরা যদি আমাদের ঈমান আকীদার ব্যাপারে সত্যবাদী হই; তাহলে এ ব্যাপারে আমাদের জন্যে কেবল একটিই পথ খোলা আছে। আর তা হচ্ছে,

আমাদের সমস্ত শক্তি সামর্থ কেবলমাত্র এই মূলনীতির স্বীকৃতি লাভের জন্যেই ব্যয় করবো যে, সার্বভৌমত্ব শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যে নির্দিষ্ট এবং আইন প্রণীত হবে কেবলমাত্র আল্লাহ্র কিতাবের ভিত্তিতে। যতোক্ষণ না এই মূলনীতি মেনে নেয়া হবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত আমরা কোনো নির্বাচন এবং ভোট প্রদানকে বৈধ মনে করিনা। অবশ্য এই মূলনীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা আলাদা কথা। তরজমানুল কুরআন ঃ রমযান-শাওয়াল ১৩৬৪ হিঃ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৫ ইং।

শ্রমিকদের হরতালে জামায়াতের পলিসি

প্রশ্ন ঃ দেশে আজকাল যখন তখন হরতাল হচ্ছে। শ্রমজীবিদের মধ্যে আমরা যারা জামায়াতে ইসলামীর সংগে সম্পর্কিত, কলকারখানায় ও অফিস আদালতে হরতাল বা ধর্মঘট চলাকালে আমাদের করণীয় কি?

জবাব ঃ এই ব্যাপারে আমাদের মোটামুটি পলিসি হচ্ছে এই যে ঃ

১. শ্রমিক ও শ্রমজীবিদের মধ্যে যারা আমাদের সমর্থক ও প্রভাবিত লোক রয়েছেন, তারা হরতাল চলাকালে কাজে যোগ দেবেন না বটে, কিন্তু বিশৃংখলা ও দাংগাহাংগামায় অংশ গ্রহণ করবেননা।

২. যেসব দাবী আদায়ের জন্যে হরতাল আহ্বান করা হচ্ছে, সেগুলো কি ন্যায্য, এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন।

অতপর ঃ

ক. ন্যায্য দাবীসমূহ আদায় করে নেয়ার জন্যে সকল প্রকার যুক্তিসংগত ও শান্তিপূর্ণ প্রচেষ্টায় অংশ নেবেন। কিন্তু কোনো প্রকার ঝগড়া ও বিশৃংখলায় অংশ নেবেননা।

খ. অন্যায় অন্যায্য দাবী দাওয়ার ব্যাপারে নিজেদের সহকর্মী শ্রমজীবিদের পরিষ্কারভাবে বলে দেবেন যে, আমরা তোমাদের দাবীসমূহকে সঠিক মনে করিনা। তাই বলে আমরা পরিকল্পিতভাবে তোমাদের হরতালকে ব্যর্থ করারও চেষ্টা করবোনা এবং যতোক্ষণ না তোমরা কাজে যোগ দেবে, ততোক্ষণ আমরাও যোগ দেবোনা।

গ. দাবী দাওয়ার কিছু অংশ যদি হয় ন্যায্য আর কিছু অংশ যদি হয় অন্যায় অন্যায্য তবে হরতালকারী এবং কর্তৃপক্ষ (Employers) উভয়কে জানিয়ে দেবেন যে, আমরা এসব দাবী দাওয়ার এই অংশকে সঠিক এবং এই এই অংশকে ভুল

ঘ. যখনই কোনো হরতাল কিংবা শ্রমিক আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ কার্যকর রয়েছে বলে দেখতে পাবেন, তখন চুপ থাকা উচিত হবেনা। বরঞ্চ, সেই মতাদর্শের প্রকাশ্য প্রতিবাদ করতে হবে। শ্রমিকদের বুঝানোর চেষ্টা করতে হবে যে, এ মতবাদ নিতান্তই ভ্রান্ত এবং তাতে প্রকৃতপক্ষে তোমাদের কল্যাণের কিছুই নেই। বরঞ্চ ইসলাম যে দৃষ্টিভংগি পেশ করে, তাই হলো সঠিক ও সত্যিকার আদর্শ। সত্যিকার ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে হলে তা কেবল ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

সর্বোপরি যে জিনিসটি আমাদের সামনে রয়েছে, তা হচ্ছে শ্রমিক ও কৃষকদের আন্দোলন যেনো সমাজতন্ত্রীদের প্রভাবাধীন না থাকে। বরঞ্চ তা যেনো আমাদের প্রভাবাধীন হয়ে যায়, যাতে করে আমরা শ্রেণী সংগ্রামের পরিবর্তে শ্রেণী সমঝোতা এবং মার্ক্সীয় সমাজতন্ত্রের পরিবর্তে ইসলামী আদল ও ন্যায়বিচারের মূলনীতির ভিত্তিতেই শমজীবিদেরকে তাদের বৈধ অধিকার আদায় করে দিতে পারি। তরজমানুল কুরআন ঃ রজব ১৩৬৫ হিঃ, জুন ১৯৪৬ ইং।

রাষ্ট্রীয় দাংগা হাংগামায় আমাদের করণীয় ঃ

প্রশ্ন ঃ "আমরা একটি হিন্দু রাজ্যে বাস করছি। বৃটিশ ভারতের তুলনায় এখানে অনেক বেশী বিধি নিষেধ আরোপিত রয়েছে। কেবলমাত্র নামায রোযা করার স্বাধীনতা আছে। আর এই স্বাধীনতাটুকুও দেশীয় ভাইদের (হিন্দুদের) চোখে কাঁটার মতো ফুটছে। আমাদের নাম শুনতেই তাদের ঘেন্না লাগে। যে মুসলমান যতো বেশী শরীয়তের অনুগামী সে ততো বেশী তাদের ঘৃণা ও শত্রুতার পাত্র। অথচ, আপনি বলেছেন ঃ জামায়াতে ইসলামী তো মযলুমকে মযলুম বলবে আর যালেমকে যালেম এবং প্রয়োজনের সময় নিঃসংকোচে সাক্ষ্য প্রদান করবে।" আপনি আরো বলেছেন ঃ "দাংগা হাংগামায় নিরপেক্ষ থাকাই জামায়াতে ইসলামীর পলিসি।" আমাদের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে আপনার এ বক্তব্য অধিকাংশ লোকেরই বোধগম্য নয়। আপনার এ বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমার এক বন্ধু প্রশ্ন করেছেন ঃ সাক্ষ্য প্রদানের সুযোগ আসা পর্যন্ত কি আমরা অপেক্ষা করতে থাকবো? শহরে দাংগার লেলিহান শিখা জ্বলে উঠেছে। এমতাবস্থায় আমরা বুঝি কেবল নীরব দর্শকের মতো প্রত্যক্ষ করতে থাকবো যে, কে কার উপর যুলুম করছে? যে জাতি মুসলমানদের নামের সাথেই দুশমনি করছে, এ ধরনের অবস্থায় তারা কি আমাদের উপর হাত না উঠিয়ে বসে

থাকবে? তারা কি তখন একথা বিবেচনা করতে যাবে যে জামায়াতে ইসলামীর লোকেরা দাংগায় শরীক নয়, বরঞ্চ তারা শুধু তামাশা দেখছে? তাছাড়া আমার মুসলমান প্রতিবেশীর উপর যদি অমুসলমানরা যালেমের বেশে হামলা করলো, তখন ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে চুপচাপ বসে থাকা কী করে আমার জন্যে বৈধ হতে পারে? এটাও কি করে আমার জন্যে বৈধ হতে পারে যে, তার জীবন রক্ষার জন্যে আমি আমার জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দেবোনা?

বন্ধুটি তাঁর এ মতামত পেশ করার সাথে সাথে কুরআন সুন্নাহর আলোকে এর দুটি সমাধানও পেশ করেছেন ঃ

একটি হলো, আমরা যদি মোকাবিলার শক্তি রাখি, তবে প্রতিরক্ষার খাতিরে তাদের মোকাবিলা করা উচিত। আর দ্বিতীয়টি হলো ঃ যেহেতু আমরা সংখ্যালঘু তাই আমাদেরকে এমন একস্থানে হিযরত করে চলে যাওয়া উচিত যেখানে গেলে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবো।

যে চিত্র এ যাবত আপনার নিকট তুলে ধরলাম আশা রাখি এর প্রেক্ষিতে আমাদেরকে যথাযথ হিদায়াত পাঠাবেন। এদিকে রাজ্যের মুসলমানদের অবস্থা হচ্ছে ঃ তাদের মধ্যে ৫০% সম্পূর্ণ মুর্খ জাহিল ও পূর্বপুরুষ পূজারী। ২৫% সামান্য কিছু লেখাপড়া জানে বটে, তবে তারা গোঁড়া পীরপূজারী। বাকী ২৫% জন শিক্ষিত হলেও তাদের মধ্যে বিশজন দ্বীনি শিক্ষা থেকে বঞ্চিত এবং খানকা প্রভাবিত আর বাকী পাঁচজন দুনিয়ার দাস।

জবাব ঃ আপনি গোয়ালিয়র রাজ্যের যে চিত্র লিখে পাঠিয়েছেন তা পড়ে, অনেক আফসোস হলো। কিন্তু আমার আপনার উপর যে কর্তব্য রয়েছে, তাতো কেবল আফসোস করলেই আদায় হবেনা। আল্লাহর বান্দাহরা যতোবেশী গোমরাহী ও নৈতিক অধঃপতনে নিমজ্জিত হয়, তাদের সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানোর দায়িত্ব একজন মুমিনের উপর তার চাইতেও অধিক কঠিনভাবে অর্পিত হয়।

আপনি যে বন্ধুর প্রশ্নের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, আমার পক্ষ থেকে তাঁকে বলবেন যে, প্রশ্ন যদি শুধু বসে থাকার এবং তামাশা দেখার হতো, তবে নিঃসন্দেহে আমার জবাব অন্য কিছু হতো। এর পূর্বে দাংগাহাংগামার আশংকা সংক্রান্ত যে জবাব আমি দিয়েছিলাম, তা দিয়েছিলাম সেই লোকদের সম্মুখে রেখে, যারা জামায়াতে ইসলামীর সংগে সম্পর্ক রাখে। আর একথা খুবই পরিষ্কার যে, জামায়াতে ইসলামী বসে বসে তামাশা দেখার জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

দুনিয়াতে কল্যাণ ও ইনসাফ ভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়াই এ জামায়াতের লোকদের কাজ। এ প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্যে জাতিপূজা ও সাম্প্রদায়িক ঝগড়া বিবাদ থেকে দূরে থেকে কেবলমাত্র সত্যের সাহায্যকারী এবং সত্যের দিকে আহবানকারী হিসেবে কাজ করে যাওয়া

তাদের জন্যে জরুরী। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সাধারণ মুসলমানদের সাথে তাদের জাতীয় সম্পর্ক থাকা প্রয়োজন। সাধারণ মুসলমান এবং তাদের অমুসলিম প্রতিবেশীদের সংগে যদি সত্যই দ্বীনি কারণে কোনো দাংগা বা সংঘর্ষ বাধে, তবে তা থেকে পৃথক থাকার কোনো কারণ নেই। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, মুসলমানরা না দ্বীনের কারণে সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে, আর না সেই সংঘাত সংঘর্ষ দ্বীনের ভিত্তিতে বা দ্বীনের উদ্দেশ্যে চলছে, যা তাদের মধ্যে এবং অমুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান।

এ কারণে মুসলমানদের এই সংঘাত সংঘর্ষে নিমজ্জিত হওয়া এবং এতে মযলুম কিংবা যালেম হওয়ার কারণে আমরা কেবল পরিতাপই করতে পারি, তাদের সাথে একাজে শরীক হওয়া সম্ভব নয়।

আমাদের এ শরীক না হবার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, কেবল দর্শকদের মতো বসে বসে আমরা তামাশা দেখতে থাকবো। বরঞ্চ আমরা কার্যত বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের সততা ও ইনসাফের দিকে আহ্বান করবো। অন্যায় কাজে বাধা দেবো। যালিমের বিরোধিতা করবো, চাই সে হিন্দু হোক কিংবা মুসলমান। আর আমরা আমাদের কর্মনীতির মাধ্যমে এটা প্রমাণ করবো যে, আমরা বাস্তবিকই ন্যায় ও ইনসাফের পতাকাবাহী এবং কল্যাণের দিকে আহ্বানকারী।

এখানে একটি সন্দেহ বাকী থেকে যায়। তা দূর করা প্রয়োজন। তা হলো, আমরা যতোই ন্যায়ভাবে পক্ষপাতহীন হইনা কেন, কিন্তু যতোক্ষণ আমাদের নাম, পোষাক পরিচ্ছদ এবং সামাজিকতা সাধারণ মুসলমানদের সংগেই সম্পর্কযুক্ত থাকছে, ততোক্ষণ কি করে এটা সম্ভব হতে পারে যে, স্বয়ং আমরা নিজেরাও এই যুলুমের পরিবেশে বাস করে সেইসব বেইনসাফীর লক্ষ্যস্থল হওয়া থেকে মুক্ত থাকবো, যা নাকি কোনো এলাকায় অমুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার কারণে সাধারণ মুসলমানদের উপর চালিয়ে যাচ্ছে?

এর জবাব হলো, আপনি যদি কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে চেষ্টা সংগ্রামরত থাকেন, তবে সেই চেষ্টা সংগ্রামের দাবী হবে এই যে, আইন আপনার নিজেকে এবং আপনার সমস্ত শক্তিকে কেবলমাত্র সেই একটিই উদ্দেশ্য সাধনের তৎপরতায় ওয়াকফ করে দেবেন এবং এমন কোনো কাজ করবেননা, যা এ উদ্দেশ্যের জন্যে ক্ষতিকারক। এই কর্মনীতির উপর অটল অবিচল থাকতে গিয়ে যতোই বিপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হোকনা কেন, সর্বাবস্থায় তা বরদাশত করে নেয়া উচিত।

দ্বিতীয় জবাব হলো, আমাদের মতে মুসলমানদের হিফাযত ও প্রতিরক্ষার জন্যে তাদের নৈতিক চরিত্র ছাড়া আর কোনো গ্যারান্টি তাদের নেই। বর্তমানে মুসলমানরা সাধারণভাবে নিজেদেরকে যে অবস্থার মধ্যে নিমজ্জিত করে নিয়েছে,

তার বড় কারণ হলো, তারা আল্লাহর দ্বীনের জন্যে 'জীবন মরণ নীতি' ত্যাগ করেছে এবং মহৎ নৈতিক গুণাবলী থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে। অথচ এই ছিলো মুমিনদের শ্রেষ্ঠ গুণ বৈশিষ্ট্য। এ জিনিসই তাদের দুর্বল করেছে এবং তাদের মর্যাদাকে লাঞ্ছিত করেছে। এখন যদি আপনারা এ অবস্থা থেকে মুক্ত হতে চান, তবে তা এভাবে সম্ভব নয় যে, এযাবত যা ঘটেছে সেইসব ভ্রান্তিতে অবস্থান করে সেই একই পরিণতির দিকে এগিয়ে যাবেন। বরঞ্চ এ অবস্থা থেকে মুক্ত হবার একটিই মাত্র পথ আছে। আর তা হলো, যে মুসলমানের সম্বিত ফিরে আসবে তিনি আত্মপূজা এবং দুনিয়া পূজা থেকে মুক্ত হয়ে কল্যাণের দিকে দাওয়াত দানকে নিজের জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে নেবেন এবং নিজেকে সেইসব মহৎ গুণাবলী দ্বারা বিভূষিত করবেন, যেগুলো হকের পথে দাওয়াতকারীর জন্যে একান্ত প্রয়োজন ও শোভনীয়। এমনটি করার জন্যে যিনিই অগ্রসর হবেন, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে আশ পাশের সকল মানুষের উপর তিনি নিজ চরিত্র ও মর্যাদার এমন প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন যা কোনো পুলিশ বা সেনাবাহিনীর সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করা কিছুতেই সম্ভব নয়।

আপনি বলছেন ঃ আমরা হিন্দু রাজ্যে বাস করছি। সংখ্যায় আমরা খুবই দুর্বল এবং সেখানে মুসলমানদের কোনো সম্মান ও নিরাপত্তা নেই। কিন্তু আপনি কি ভুলে গিয়েছেন, আজ থেকে আট নয় শত বছর পূর্বে খাজা মুঈনুদ্দীন রাহমাতুল্লাহি আলাইহি যখন আজমীরের হিন্দু রাজ্যে এসে বসবাস করা শুরু করলেন, তখনকার অবস্থা কি এর চাইতে ভালো ছিলো না মন্দ? কোন্ জিনিসটি তখন তাঁর নিরাপত্তা বিধান করেছিল?

আমার দ্বীনি ভায়েরা আমার কথা শুনুক কিংবা নাই শুনুক; আমি কিন্তু একই কথা বলতে থাকবো। আর তা হচ্ছে এই যে, তোমাদের সত্যিকার মুসলমান হয়ে যাওয়া এবং মুসলমান হিসেবে তোমাদের উপর যেসব দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায় সেগুলো পুরোপুরি পালন করা ছাড়া আর কোনো কিছুতেই তোমাদের কোনো কল্যাণ নেই। তরজমানুল কুরআন ঃ রমযান ১৩৬৫ হিঃ, আগষ্ট ১৯৪৬ ইং।

ফিলিস্তিন সমস্যার ব্যাপারে জামায়াতের দৃষ্টিভংগি

প্রশ্ন ঃ কোনো কোনো বন্ধু অভিযোগ করেন ঃ ফিলিস্তিনের রাজনীতিতে আমেরিকা ও বৃটেনের স্বার্থগত অভিলাষ এবং ইসলামের সাথে শত্রুতার ফলশ্রুতি সুস্পষ্ট। এ সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামী কখনো নিজের পলিসি প্রকাশ করেনি কেন?

জবাব ঃ সাময়িক কোনো সমস্যা আমাদের নিকট এতোটা গুরুত্বপূর্ণ নয় যে, আসল কাজ ছেড়ে আমরা তার পিছে লেগে যাবো। আমাদের মতে বৃটেন ও আমেরিকা সাংঘাতিক যুলুম করছে। আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারছি, ফিলিস্তিনীদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা প্রতিটি মানুষেরই মানবিক কর্তব্য। আমরা মুসলমান হবার কারণে আমাদের ভাইদের প্রতি সহমর্মিতা প্রকাশ করা তার চাইতে অনেক গুণ বেশী কর্তব্য। তাছাড়া ফিলিস্তিন সমস্যা এ জন্যেও বেশী গুরুত্বপূর্ণ যে, খোদা না করুন, সেখানে যদি ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, তবে তার দ্বারা ইসলামের কেন্দ্রভূমিও (হেজায) বিভিন্ন প্রকার বিপজ্জনক অবস্থার সম্মুখীন হবে। এর প্রতিরোধকল্পে দুনিয়ার মুসলমানরা যা কিছুই করবে, আমরা তাদের সাথে থাকবো। কিন্তু আমাদের মতে প্রকৃত সমস্যা ফিলিস্তিন, ভারতবর্ষ, ইরান কিংবা তুরস্ক নয়। বরঞ্চ প্রকৃত সমস্যা হচ্ছে কুফর ও ইসলামের সংঘাত। এর পিছেই আমরা আমাদের সমস্ত সময়, গোটা শক্তি ও পূর্ণ মনোনিবেশ নিয়োজিত করা জরুরী মনে করি। আর এ সমস্যার যতোদিন না কোনো সমাধান হবে, ততোদিন পর্যন্ত অন্যান্য সমস্যার সমাধান হলেও কোনো লাভ হবেনা। তরজমানুল কুরআন ঃ শাওয়াল ১৩৬৫ হিঃ, সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ ইং

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঠিক কর্মধারা

প্রশ্ন ঃ যে লোকদের সাথেই দেশের ভবিষ্যত রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্পর্কে আলাপ আলোচনা হয়, তাদের অধিকাংশই এ মত প্রকাশ করে যে, আপনি এবং অন্যান্য বড় বড় আলিমগণ মিলে কেন ইসলামী রাষ্ট্রের একটি শাসনতন্ত্র তৈরী করে দিচ্ছেননা, যাতে করে তা পার্লামেন্টে উত্থাপন করে পাশ করানো যায়? শুধু আমাকেই নয়, অন্যান্য কর্মীদেরকেও অধিকাংশ সময় এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। লোকদের যদিও আমরা যথাসাধ্য বুঝানোর চেষ্টা করি কিন্তু আপনার পক্ষ থেকে প্রশ্নটির জবাব তরজমানুল কুরআনে আসা প্রয়োজন। এতে করে এ প্রশ্নের ভিত্তিতে সৃষ্ট ভুল বুঝাবুঝি দূর হয়ে যেতে পারে।

জবাব ঃ আপনার প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব তো এখানে দেয়া সম্ভব নয়। তবে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি কথা বলবো। আশা করি এতেই আপনি মূল বিষয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।

যেখানকার সমাজ সঠিক অর্থে ইসলামী নয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাব্যবস্থা এখনো অনৈসলামী পদ্ধতিতে অগ্রসর হচ্ছে এবং যেখানে নিরেট একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের বদৌলতে আকস্মিকভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ এসে গেছে, সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারটা বুঝি কেবল এতটুকু জিনিসের জন্যই আটকে রয়েছে যে, আমরা একটি শাসনতন্ত্র

প্রণয়ন করে উত্থাপন করবো আর ক্ষমতাশীন ব্যক্তিরা তা কার্যকর করে দেবে। তাহলেতো ব্যাপারটা ঠিক সে রকম দাঁড়ায়, যেমন কোনো ব্যক্তি ধারণা করলো যে, একটি স্কুল বা ব্যাংককে হাসপাতালে রূপান্তরিত করার জন্যে কেবল কতিপয় ডাক্তার একত্র হয়ে একটি আদর্শ হাসপাতালের রূপরেখা ও নীতিমালা প্রণয়ন করে সেই স্কুলের শিক্ষক বা ব্যাংকের ষ্টাফদের হাতে দিয়ে দেবে। আর তারা সেটা দেখে দেখে সুষ্ঠভাবে হাসপাতালের কাজ আঞ্জাম দিতে থাকবে। আমি খুবই বিস্ময় বোধ করছি, আমাদের দেশের অনেক উচ্চ শিক্ষিত লোকও এতোটা হালকাভাবে চিন্তা করে যেন শাসনতন্ত্রকে তারা কোনো তাবীজ মনে করছে।

একথা পরিষ্কারভাবে বুঝে নিন যে, আমাদের এখানে শুধুমাত্র দুটি পন্থায়ই ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ঃ

একটি হলো এই যে, রাষ্ট্র ক্ষমতা এখন যাদের হাতে রয়েছে ইসলাম সম্পর্কে তারা আন্তরিক হবে। জাতির সাথে কৃত ওয়াদাসমূহের ব্যাপারে তারা সত্যবাদী হবে। ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য তাদের মধ্যে যোগ্যতার যে অভাব রয়েছে তা তারা অনুভব করবে। ঈমানদারীর সাথে একথা স্বীকার করবে যে, পাকিস্তান লাভের পর তাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে এবং এদেশে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা সেইসব লোকদেরই কাজ যারা এ কাজের উপযুক্ত।

উপরে বর্ণিত অবস্থা সৃষ্টি হলে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার যুক্তিসংগত পদ্ধতি হচ্ছে, প্রথমত আমাদের পার্লামেন্ট সেইসব বুনিয়াদী বিষয়ের সুস্পষ্ট ঘোষণা প্রদান করবে, একটি অনৈসলামী রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করার জন্য যেসব মূলনীতি অপরিহার্য। (এসব মূলনীতি আমরা আমাদের "দাবী" আকারে প্রকাশ করেছি)। অতপর ইসলামের ইলম রাখেন এমন লোকদের তারা শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে শরীক করবেন। তাদের সাহায্যে ইসলামী রাষ্ট্র পরিচালনার উপযোগী একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। অতপর নতুন করে নির্বাচন দিতে হবে এবং জাতিকে এমন একদল লোক নির্বাচন করার সুযোগ দিতে হবে যাদেরকে তারা ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার জন্য যোগ্যতম মনে করবে। এভাবেই সহজভাবে সঠিক ও নির্ভেজাল গণতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা যোগ্যতম লোকদের হাতে অর্পিত হবে। আর এ যোগ্য লোকেরা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও যাবতীয় উপায় উপাদানকে কাজে লাগিয়ে, গোটা জীবন ব্যবস্থাকে নতুন ভাবে ইসলামী পন্থা ও পদ্ধতিতে ঢেলে সাজাতে সক্ষম হবে।

দ্বিতীয় পন্থা হলো, সমাজকে গোড়া থেকেই আমূল পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। একটি গণসংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের ক্রমান্বয়ে খাঁটি ইসলামী চেতনা, অনুভূতি ও আকাংখা তীব্র ও চাংগা করে তুলতে হবে। আর এ চেতনা ও আকাংখা তাদের মধ্যে যখন দৃঢ়তা ও মজবুতি অর্জন করবে, তখন স্বাভাবিকভাবেই একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা অস্তিত্ব লাভ করবে।

এখন আমরা প্রথম পদ্ধতির উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাচ্ছি। তাতে যদি আমরা সফলতা অর্জন করি তবে তার অর্থ হবে পাকিস্তান অর্জনের জন্য আমাদের কওম যে চেষ্টা সংগ্রাম করেছিলো, তা ব্যর্থ হয়নি। বরঞ্চ তার বদৌলতে ইসলামী রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য একটি সহজ ও নিকটতম রাস্তা আমাদের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু খোদা না করুন এই পদ্ধতিতে যদি আমরা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হই এবং এই দেশে একটি অনৈসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে দেয়া হয়, তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানরা যে বিরাট কষ্ট ও কুরবানী পেশ করেছিলো তা সবই বৃথা যাবে। এমনটি যদি হয়, তবে তার অর্থ হবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও আমরা সে রকম একটি দেশেই আছি, যেখানে ছিলাম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বে। এমতাবস্থায় আমরা দ্বিতীয় পন্থায় কাজ করে যাবো।

আশা করি এ সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে লোকেরা আমাদের পজিশন ভালভাবে বুঝে নেবে। সময় হবার পূর্বে আমরা কোনো কাজ করতে চাইনা। তরজমানুল কুরআন ঃ যুল কা'দাহ ১৩৬৭ হিজরী, সেপ্টেম্বর ১৯৪৮ ইং।

সমাপ্ত

رسائل ومسائل

রাসায়েল ও মাসায়েল গ্রন্থটি ইসলামকে জানার জন্যে এক অসাধারণ জ্ঞান-ভান্ডার। এ গ্রন্থের সবগুলো খন্ড পড়ুন

সেই সাথে শতাব্দী প্রকাশনীর এই বইগুলোও পড়ুন

শতাব্দী প্রকাশনী

৪৯১/১ মগবাজার ওয়ারলেস্ রেলগেইট

ঢাকা-১২১৭, ফোনঃ ৮৩১১২৯২